আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন জনপদ : ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন জনপদ : ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
এম. ফিল. গবেষক
রেজি. নং- ১০৭
সেশন : ২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা-১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন- ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন জনপদ : ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পর্যালোচনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভ তার মৌলিক গবেষণা এবং অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্যত্র ডিগ্রি লাভ বা প্রকাশনার জন্য ব্যবহার করা হয় নি। অভিসন্দর্ভটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার জন্য সে প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করেছে।

২০/৬/১১

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

465030

ঢাকা
জুন, ২০১১

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন জনপদ : ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পর্যালোচনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেন নি। এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয় নি।

২০.০৬.২০১১

(মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন)
এম. ফিল. গবেষক
রেজি. নং- ১০৭, সেশন : ২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

ঢাকা
জুন, ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
শব্দ সংকেত নির্দেশনা		ক
প্রতিবর্ণায়ন		খ
ভূমিকা		গ-ঘ
প্রথম অধ্যায়	আল-কুরআন পরিচিতি	১-১১
	আল-কুরআনের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা-২	
	আল-কুরআন নাযিলের পদ্ধতি-৭	
	আল-কুরআন নাযিলের সময় ও স্থান-৯	
	আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য-১১	
দ্বিতীয় অধ্যায়	আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন দেশ	১২-৫২
	মিশর-১৩	
	ফিলিস্তিন-৩২	
	সিরিয়া-৪৭	
	জর্ডান-৫০	
তৃতীয় অধ্যায়	আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন শহর	৫৩-১৫৩
	মক্কা-৫৪	
	মদীনা (ইয়াসরিব)-৬৬	
	বাবেল শহর (ব্যবিলিয়ন)-৮৪	
	তায়েফ-৯৪	
	রোম-৯৬	
	ইরাম-১০০	
	লুত (আ)-এর শহর-১০২	
	ইনত্বাকিয়া শহর-১১৯	
	মাদায়েন শহর-১২২	
	দাউদ (আ)-এর রাজ্য-১৩২	
	সাবা শহর (বিলকিসের সিংহাসন)-১৩৫	
	আইকা-১৩৯	
	হিজর-১৪৫	
	মারইয়াম (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর আশ্রয়স্থল-১৫১	
	ফিলিস্তিনের বুহায়রা লূত নামক স্থান-১৫৩	
চতুর্থ অধ্যায়	আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন মসজিদ	১৫৪-১৭৮
	মসজিদ-উল-হারাম-১৫৫	
	মসজিদ-উল-আকসা-১৬৮	
	মসজিদে কুবা-১৭৫	

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন পাহাড়, গুহা, দূর্গ ও উপত্যকা ১৭৯-২৩৮

সাওর পাহাড়-১৮০
সিনাই পর্বত (তূর পর্বত)-১৮২
সাফা-মারওয়া পাহাড়-১৯০
জুদী পাহাড়-১৯২
উহুদ পাহাড়-১৯৭
দাউদ (আ)-এর পাহাড়-২১২
তুয়া উপত্যকা-২১৩
দওরান দূর্গ-২১৫
গুহা (কাহ্ফ) -২১৭
দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান-২৩২
সাইলুল আরিম-২৩৩

ষষ্ঠ অধ্যায় আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন সমুদ্র, কূপ, কারাগার, গর্ত এবং অন্যান্য ২৩৯-৩২৮

হযরত ইউনুস (আ)-এর জাহাজ-২৪০
হযরত ইউনুস (আ)-এর ময়দান-২৪৬
হযরত ইউসুফ (আ)-এর কুয়া-২৪৯
হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারাগার-২৫৩
মারইয়াম (আ)-এর নামাজের স্থান-২৬০
যে স্থানে দুই সমুদ্র একত্রিত হয়েছে-২৬২
দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থান-২৬৬
যে স্থানে সূর্য অস্ত যায়-২৭০
যে স্থানে সূর্য উদিত হয়-২৭১
রস্‌স বা পাথর বেষ্টিত কূপ-২৭২
হুদায়বিয়া-২৭৮
উখদুদ বা গর্ত-২৮৬
বদর-২৮৮
হুনাইন-২৯৮
নীল নদ-৩০১
হযরত নূহ (আ)-এর কিস্তি-৩০৮
আরাফাতের ময়দান ও মুয্দালিফা-৩২৩
আইলা-৩২৬
আহকাফ-৩২৭

উপসংহার ৩২৯-৩৩০
গ্রন্থপঞ্জি ৩৩১-৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র ও চিত্রসূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
মিশরের মানচিত্র	১৬
মুসা (আ) মিশর থেকে মাদায়েন, মাদায়েন থেকে মিশর গমনের স্থান	৩১
বরকতময় স্থান তথা ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও জর্দান	৩২
ফিলিস্তিনের মানচিত্র	৩৪
হযরত মূসা (আ) পরবর্তী ফিলিস্তিন	৩৭
মুকাবিয়া শাসন আমলের ফিলিস্তিন	৪৩
হযরত ঈসার (আ) আমলে ফিলিস্তিন	৪৪
সিরিয়ার মানচিত্র	৪৯
জর্দানের মানচিত্র	৫২
মক্কা শরীফের মানচিত্র-১	৫৪
মক্কা শহরের মানচিত্র-২	৫৯
মক্কা শহরের চিত্র	৬১
মদীনা শহরের চিত্র	৬৬
মদীনার মানচিত্র	৭১
মসজিদে নববী	৮০
বাবেল শহর- এর মানচিত্র-১	৮৪
বাবেল শহর- এর মানচিত্র-২	৮৫
তায়েফ -এর মানচিত্র	৯৫
রোম- এর মানচিত্র	৯৬
লুত (আ)- এর শহর	১১৫
ইনতাকিয়া শহর	১২০
মাদায়েন শহর	১২৯
মাদায়েনে সালেহ (আ)	১৩০
দাউদ (আ) এর রাজ্য	১৩২
কা'বা ঘরের ভিতরের অংশ	১৬৩
কা'বা শরীফ	১৬৪
লূত' এর মানচিত্র	১৫৩
সাবা শহর এর মানচিত্র	১৩৭
আইকা ও মাদায়েন শহরের মানচিত্র	১৪০
আল-মাসজিদুল আকসা	১৭২
আল-মাসজিদুল আকসা	১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদে কূবার স্থান	১৭৫
মসজিদে কূবা	১৭৬
মসজিদে কূবা	১৭৮
সাওর পাহাড়ের চিত্র	১৮০
তূর পাহাড়ের অবস্থান	১৮৭
সাফা-মারওয়া পাহাড়ের দৃশ্য	১৯১
সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সায়ী করার দৃশ্য	১৯১
কওমে নূহ্ (আ) এর এলাকা ওজূদী পাহাড়	১৯৩
জুদী পাহাড়ের এলাকা	১৯৪
উহুদ পাহাড়	১৯৭
উহুদ পাহাড়	২০২
উহুদ পাহাড়ের অবস্থান	২০৩
উহুদ যুদ্ধ	২০৪
উহুদ যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা	২০৫
দাউদ (আ) এর স্থান	২১৩
আসহাবুল জান্নাতের বাগানের স্থান	২১৬
আসহাবে কাহ্ফ এর গুহা	২২৩
কাহ্ফ এর স্থান	২২৪
সাইলুল আরিম	২৩৪
জাবালূন নূর	২৩৭
হেরা গুহা	২৩৮
ইউসুফ (আ)-এর কূপ	২৪৯
কেনআন শহর এর মানচিত্র	২৫০
ইউসূফ (আ) এর কূপ ও কারাগারের স্থান	২৫৪
দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থান	২৭০
আসহাবুর রাস্স	২৭৩
হুদায়বিয়ার সন্ধির স্থান	২৮০
আসহাবে উখদূদ এর এলাকা	২৮৬
বদর যুদ্ধের মানচিত্র	২৮৮
বদর যুদ্ধের মানচিত্র	২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার স্থান	২৯৯
নীল নদ	৩০৪
মুযদালিফা	৩২৩
আরাফাতের ময়দান	৩২৪
Mosque And Pebble Collecting Place At Muzdalifah	৩২৪
আইলা এর মানচিত্র	৩২৬
আহকাফ মরুভূমি	৩২৮

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

অনু. -------------------------------- অনুবাদ/অনূদিত
আ. -------------------------------- আরবী
আ. -------------------------------- আলাইহিস-সালাম/আলাইহিমুস-সালাম
ইং. -------------------------------- ইংরেজি
ঐ. -------------------------------- Ibid
খ. -------------------------------- খণ্ড
খ্রি. -------------------------------- খ্রিষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দে
জ. -------------------------------- জন্ম
মৃ. -------------------------------- মৃত্যু/মৃত
ড. -------------------------------- ডক্টর (পি এইচ.ডি.)
দ্র. -------------------------------- দ্রষ্টব্য
বি.দ্র. -------------------------------- বিস্তারিত দ্রষ্টব্য/বিশেষ দ্রষ্টব্য
প.দ্র. -------------------------------- পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য Infra
পাণ্ডু. -------------------------------- পাণ্ডুলিপি
পূ.গ্র. -------------------------------- পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ op.cit
পৃ. -------------------------------- পৃষ্ঠা
ও. -------------------------------- রহমাতুল্লাহি আলাইহি/রহমাতুল্লাহি আলাইহিম
রা. -------------------------------- রাযিআল্লাহু আনহু/রাযিআল্লাহু আনহুম
স. -------------------------------- সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি. -------------------------------- হিজরী
৩ঃ৪ -------------------------------- ৩ নম্বর সূরার ৪ নম্বর আয়াত (কুর'আন মাজীদের ক্ষেত্রে)
৬৪০/১২৪২-------------------------- হিজরী ৬৪০ সন মোতাবেক ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দ

প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা

আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

ব্যাঞ্জনবর্ণ		ব্যাঞ্জনবর্ণ		স্বরবর্ণ	
আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী স্বরধ্বনি	বাংলা প্রতিস্বর
ا = ء	ঊর্ধ্ব কমা (')	ض	দ	َ	অ, আ
ب	ব	ط	ত	ِ	ই=ি
ت	ত	ظ	য	ُ	উ=ু
ث	স	ع	উল্টো কমা (')	'ا'	আ=া
ج	জ	غ	গ	'ي'	ঈ=ী
ح	হ	ف	ফ	'و'	ও
خ	খ	ق	ক	و	ব
د	দ	ك	ক	اً	আন্
ذ	য	ل	ল	اٍ	ইন্
ر	র	م	ম	اٌ	উন্
ز	য	ن	ন	ْ	্=হস্ চিহ্ন
س	স	و	ব, ও	ّ	বর্ণদ্বিত চিহ্ন/্য
ش	শ	ة =ه	হ্, ঃ		
ص	স	ي	য়		

দ্র. যে সব আরবী শব্দ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং অসংখ্য দরূদ ও সালম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) এর জন্য। আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (স) প্রদর্শিত পথই বিশ্ব মানবতার মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আর পবিত্র কুর'আন হলো মানব জাতির একমাত্র পথ প্রদর্শক। পবিত্র কুর'আন ইসলামী শরী'আতের প্রধান উৎস। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ। পবিত্র কুর'আন আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাঈল (আ) এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (স) এর উপর ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ, মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়ে পুরো একটি গ্রন্থরূপে সংকলিত।

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। আর তাঁদের দিকনির্দেশনার জন্য পাঠিয়েছেন আসমানী কিতাব। আর সে আসমানী কিতাবের ধারাবাহিকতা এবং সারমর্মই হলো মহগ্রন্থ আল-কুর'আন। যা যুগে যুগে মানুষকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেছে।

আল-কুর'আন সর্বপ্রথম ৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নাযিল হতে শুরু করে, দীর্ঘ ২৩ বছরে ৬৩২ খিস্টাব্দে পরিপূর্ণতা লাভ করে। তমসাবৃত্ত জীবন থেকে মানুষকে আলোর পথে বের করে আনার জন্য এবং সরল-সঠিক পথে পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ আল-কুর'আন নাযিল করেন। উক্ত মিশন সামনে রেখে রাসূল (স) তাঁর সাহাবীদের নিকট আল-কুর'আনের বাণী পৌঁছে দেন।

রাসূল (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায় নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল-কুর'আনের আলোকে মানুষের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে বাস্তবে প্রমাণ করে গেছেন যে, জীবন সমস্যার পূর্ন সমাধান নিহিত রয়েছে পবিত্র কুর'আনে। সারা বিশ্বে মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার কোনটিই মানুষের সকল সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করতে পারেনি। একমাত্র আল-কুরআনেই রয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল সমস্যার বাস্তব ও যুক্তিসম্মত সমাধান। আল-কুরআন হল মানব জাতির ইহ ও পরকালীন মুক্তির সনদ, ভারসাম্যপূর্ণ একমাত্র জীবন বিধান, জগত ও জীবনের নির্ভুল বিশ্লেষণ, শাশ্বত আইন, নির্ভুল ভবিষ্যৎ বাণী ও উন্নত সাহিত্য।

একটি সত্য, সুন্দর, ন্যায়, ইনসাফ ও শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হল পবিত্র কুর'আন। কুর'আনের ভাষা যেমন রাসূল (স:)-এর রচিত নয়, তেমনি এর আয়াতসমূহের ক্রমবিন্যাস ও সূরাভিত্তিক বিভক্তিও রাসূল (সঃ) করেননি। সবই আল্লাহর নির্দেশে হয়েছে।

পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ অনেকগুলো জনপদের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এ জনপদগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং বর্তমান ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা জানা একান্ত প্রয়োজন। সে প্রয়োজন বিবেচনা করে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার প্রায়াস পাই।

পবিত্র কুর'আনে উল্লেখিত জনপদগুলোতে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহে মানবজাতির জন্য রয়েছে শিক্ষা, যা জীবন যাপন ও সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনপদগুলোর কোনটিকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন, আবার কোনটিকে ধ্বংস করেছেন। যার মাধ্যমে বুদ্ধিমান মানুষের জন্য স্থাপন করেছেন দৃষ্টান্ত।

বর্তমান সময়ে বিষয়টি অত্যন্ত আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ কোন পুস্তক অথবা গবেষণাকর্ম এখনো দেখা যায় নি, তাই এ বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল-কুর'আনের অর্থ ও এটি নাযিলের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে, আল-কুর'আন যে সার্বজনীন এবং সমাজে পূর্ণাঙ্গ শান্তি প্রতিষ্ঠায় এর অপরিহার্যতা তুলে ধরা। এর পাশাপাশি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য তুলে ধরা:

- সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠায় আল-কুর'আনের অবদান তুলে ধরা।
- পবিত্র কুর'আনের আলোকে জনপদসমূহের পরিচিতি ও জনপদসমূহ সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তুলে ধরা, যা থেকে সাধারণ জনগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
- জনপদসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান, বর্তমান অধিবাসী ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব উল্লেখ করে এগুলোর সঠিক পরিচিতি জনগণের সামনে উপস্থাপন করা ।

আল-কুর'আনের অর্থ ও এটি নাযিলের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে, বর্তমান সময়ে আল-কুর'আনের গুরুত্ব উপস্থাপন করা ও পবিত্র কুর'আনের আলোকে কুরআনে উল্লেখিত জনপদসমূহের পরিচিতি ও জনপদসমূহ সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তুলে ধরা এবং জনপদসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান, বর্তমান অধিবাসী ও জনপদসমূহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরা। সেক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে মুহাম্মদ (স:) এবং খুলাফায়ে রাশেদাসহ বিখ্যাত সাহাবীগণের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে- প্রথম অধ্যায়: আল-কুর'আন পরিচিতি, এই অধ্যায়ে আল-কুর'আনের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা, আল-কুর'আন নাযিলের সময় ও স্থান, আল-কুর'আন নাযিলের পদ্ধতি, আল-কুর'আনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন দেশ, তৃতীয় অধ্যায়ঃ আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন শহর, চতুর্থ অধ্যায়ঃ আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন মসজিদ, পঞ্চম অধ্যায়ঃ আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন পাহাড়, গুহা, দূর্গ ও উপত্যকা, ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন সমুদ্র, কূপ, কারাগার, গর্ত এবং অন্যান্য। এছাড়াও উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি দেয়া হয়েছে।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ। তিনি আমার জন্য যেভাবে শ্রম স্বীকার করেছেন, নিরন্তন উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং গবেষণা পত্রটি আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন তার তুলনা বিরল। তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিলে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কোন দিনই এ ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। এ ছাড়া একই বিভাগের আমার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ আমাকে নানারূপ সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

এই গবেষণাপত্রের তথ্য-উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক গুণীজন ও বহু প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহগযোগিতা আমি অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, শাহবাগ; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরী, ড. এছহাক সেমিনার লাইব্রেরী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ লাইব্রেরী উল্লেখযোগ্য। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি আহরণ করতে অবাধ সুযোগদানের জন্য গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষের কাছে ঋণ শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করছি।

গবেষণা কাজে আমাকে যাঁরা সর্বদা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তারা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ ও পরম শ্রদ্ধেয়া আম্মা মানসুরা খাতুন। তথ্য-উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে সর্বদা সহযোগিতা করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় কাকা ড. মুহাম্মদ সাইদুল হক, যার কাছে আমি ঋণি।

দেশের আরও অনেক সুধী ও পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে মূল্যবান পরামর্শ, সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। নানাবিধ প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার সময় যে সব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন সাহস যুগিয়েছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আল-কুর'আন পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুর'আন পরিচিতি

আল-কুর'আনের শাব্দিক সংজ্ঞা :

আরবি ব্যাকরণে কুর'আন শব্দটি মাসদার (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি قرأ ক্বারা'আ ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে যার অর্থ পাঠ করা বা আবৃত্তি করা। এই ক্রিয়াপদটিকেই কুর'আন নামের মূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। [১]

কুর'আন শব্দটির মাসদার (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য) হচ্ছে গুফরান (غفران) । এর অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত ভাব, অধ্যবসায় বা কর্ম সম্পাদনার মধ্যে একাগ্রতা। উদাহরণস্বরূপ, غفر নামক ক্রিয়ার অর্থ হচ্ছে "ক্ষমা করা"; কিন্তু এর আরেকটি মাসদার রয়েছে যার যা হলো غفران, এই মাসদারটি মূল অর্থের সাথে একত্রিত করলে দাঁড়ায় ক্ষমা করার কর্মে বিশেষ একাগ্রতা বা অতি তৎপর বা অতিরিক্ত ভাব। সেদিক থেকে কুর'আন অর্থ কেবল পাঠ করা বা আবৃত্তি করা নয় বরং আরেকটি অর্থ হচ্ছে একাগ্র ভঙ্গীতে পাঠ বা আবৃত্তি করা। কুর'আনের মধ্যেও এই অর্থেই কুর'আন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কুর'আনের ভাষায়-

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ -

"অতঃপর, আমি যখন তা পাঠ করি (কুরা'নাহু), তখন আপনি সেই পাঠের (কুরআ'নাহু) অনুসরণ করুন।" [২]

অবশ্য এ নিয়ে সংশয় রয়েছে যে, এই শব্দটি আসলেই আরবি ভাষার মূল থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে নাকি সিরিয়াক থেকে এসেছে। এই সংশয়টি প্রথম উত্থাপন করেন জার্মান সেমিটিক বিশেষজ্ঞ থিওডর নোলদেকে। তিনি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে Geschichte des Qorâns (কুর'আনের ইতিহাস) নামীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে আরবি কুর'আন শব্দটি সিরিয়াক ভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ্য পদ qeryānâ (কেরিয়ানা) থেকে এসে থাকতে পারে। সিরিয়াক ভাষার এই শব্দটি আবার সিরিয়াক ক্রিয়াপদ qeryānâ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ পাঠ করা বা আবৃত্তি করা। [৩]

নোলদেকের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে,

"قرأ " পাঠকর"- এর মতো একটি ক্রিয়াপদ প্রাক-সেমিটীয় হতে পারে না, আমরা ধারণা করতে পারি শব্দটি আরবিতে প্রবেশ করেছে, খুব সম্ভবত উত্তরাঞ্চলের কোনো ভাষা থেকে, যেহেতু সিরিয়াক ভাষায় "কেরিয়ানা" নামক ক্রিয়া এবং "কেরিয়ানা" নামীয় একটি বিশেষ্যও রয়েছে যার অর্থ পাঠ করা এবং ভাষণ উভয়টিই হতে পারে, এবং উপর্যুক্ত সকল ধারণার কারণেই এই সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় যে, কুর'আন আরবি ভাষার নিজসৃষ্ট কোনো শব্দ নয় যার অর্থ একই রকম হতে পারে, বরং এটি সিরিয়াক ভাষা থেকে ধার করা শব্দ হতে পারে যা fulān ধরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকবে।[৪]

---

১ 'আব্দুল 'আযীম যারকানী, মানাহিলু'ল ইরফান ফী উলুমিল কুর'আন, প্রকাশ ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৭২ হি. খ. ১, পৃ. ১৬,

২ আল-কুর'আন, ৭৫: ১৮

৩ R.Payne Smith, *A compendious Syriac dictionary founded upon the Thesaurus Syriacus of R.Payne Smith.* Oxford University Press, Jessie Ed., 1903, PP. 516, 519

৪. Noldeke, *Theodore History of Qoran*, Göttingen: 1860, Part I, PP. 33

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্বন্ধে সবচেয়ে আধুনিক মতগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্রিস্টোফ লুক্সেনবার্গ কর্তৃক প্রদত্ত মত। লুক্সেনবাগের্র মতে কুর'আন প্রকৃতপক্ষে একটি সিরিয়াক লেকশনারি ছিলা।

The Arabic word 'qur'an' is derived from the root qara'a, which has various meanings, such as to read,

اوْ يَكُونَ لكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أوْ تَرْقى فِي السَّمَاءِ وَلن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ
سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً -

"অথবা তোমার জন্য সোনার একটি ঘর তৈরি হবে। অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে এবং তোমার আরোহণ করার কথাও আমরা বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি একটি লিখিত পত্র আনবে, যা আমরা পড়বো। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, পাক-পবিত্র আমার পরওয়ারদিগার, আমি কি একজন বাণীবাহক মানুষ ছাড়া অন্য কিছু?" [৫] পাঠ করা,

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ -

"অতঃপর, আমি যখন তা পাঠ করি (কুরা'নাহু), তখন আপনি সেই পাঠের (কুরআ'নাহ্) অনুসরণ করুন।"[৬] প্রর্ভতি আয়াত।[৭]

Qur'an is a verbal noun and hence means the 'reading' or'recitation'. As used in the Qur'an itself, the word refers to the revelation from Allah in the broad sense and is not always restricted to the written form in the shape of a book, as we have it before us today. [৮]

৫। আল-কুর'আন,১৭: ১০৬

৬। আল-কুর'আন, ৭৫:১৮

৭। Christoph Luxenberg, *Die Syro-Aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache*. Berlin: Verlag Hans Schiler. 2004, PP. 81-84

৮। Ahmad Von Denfeer, *Ulum al-Qur'an: An Introduction to the Sciences of the Qur'an*, Published by the Islamic Foundation, UK: 2004, PP. 3.

Ahmad Von Denfeer was born in Germany in 1949. He studied Islamic and social anthropology at the University of Mainz. He was at the Islamic Foundation, Leicester as Research Fellow in 1978-1984. He is currently working with the Islamic Centre, Munich, Germany.

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞা

আল কুর'আনের আলোকে কুর'আনের সংজ্ঞা
মহান আল্লাহ আল কুর'আনের সংজ্ঞায় বলেন-

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ - بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ -

"আল-কুর'আন জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। জিবরাঈল (আ) তা নিয়ে অবতরণ করেছেন আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন। এটা নাযিল করা হয়েছে সুস্পষ্ট 'আরবী ভাষায়'।" [৯]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে আল-কুর'আনুল কারীমের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-
ক. কুর'আন আল্লাহর নিকট থেকে নাযিলকৃত।
খ. রূহুল আমীন তথা জিবরাঈল (আ) মহানবী (স)- এর নিকট কুর'আন পৌঁছিয়ে দেন।
গ. কুর'আন রাসূল (স)- এর উপর নাযিল হয়।
ঘ. কুর'আন রাসূল (স)- এর উপর এজন্য নাযিল হয়, যাতে তিনি কুরআনের দ্বারা উম্মতকে সতর্ক করতে পারেন।
অতএব কুর'আন জগৎবাসীর জন্য সতর্ককারী। মহান আল্লাহ বলেন-

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ -

"রাসূলগণ আসার পর যাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।" [১০]
ঙ. কুর'আন সুস্পষ্ট 'আরবী ভাষায়' নাযিল হয়।

আল্লামা যারকানী (র) বলেন,

الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته -

"যা নবী (স) উপর অবতীর্ণ হয়ে মুতাওয়াতির পরম্পরের মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে আসছে যা তেলাওয়াত করা হয়। এবং যে তেলাওয়াত আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে তাকে কুর'আন বলা হয়।"[১১]

৯। আল-কুর'আন, ২৬ : ১৯২-১৯৫
১০। আল-কুর'আন, ৮ : ১৬৫
১১। 'আব্দুল 'আযীম যারকানী, মানাহিলু'ল ইরফান ফী উলুমিল কুর'আন, খ. ১, পৃ. ২০, প্রকাশ ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৭২ হি.)

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আনের উক্ত সংজ্ঞার তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম, নবী করীম (সা.) প্রতি অবতীর্ণ। সুতরাং কুর'আন হতে হলে নবী (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ হতে হবে। অতএব, যে বিষয় অবতীর্ণ নয় অথবা নবী করীম (স) এর প্রতি অবতীর্ণ নয় তা কুরআনের অন্তর্ভূক্ত হবে না।

দ্বিতীয়, মুতাওয়াতির বর্ণনা পরস্পরার মাধ্যমে বর্ণিত। সুতরাং, মুতাওয়াতির সনদের মাধ্যমে বর্ণিত নয় এমন কোন অংশ কুর'আন নামে অভিহিত হবে না।

তৃতীয়, যা তেলাওয়াত করা হয় এবং যে তেলাওয়াত আল্লাহর নিকট ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। সুতরাং, যে বিষয় তেলাওয়াত করা হয় না, তা কুর'আন হিসেবে পরিগণিত হবে না। অতএব, হাদীসে কুদসী কুর'আনের অন্তর্ভূক্ত নয়।

মান্না' আল-কাত্তান বলেন,

"كلام الله، المنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- المتعبد بتلاوته" -

"কুর'আন মাজীদ আল্লাহ্ তা'আলার কালাম হযরত মুহাম্মদ (স) এর উপর তা অবতীর্ণ। এর তেলাওয়াত করা ইবাদত।"[১২]

এর সংজ্ঞায় উল্লেখিত كلام (কালাম) শব্দটি সকল প্রকার বাণীকে অন্তর্ভূক্ত করে, পরবর্তী শব্দ الله (আল্লাহ্) দ্বারা মানুষ জ্বীন এবং ফেরেশতাগণের কথা কালামের আওতা থেকে বহির্ভূত হয়ে যায়।

আল المنزل (মুনাজ্জাল) শব্দটি আল্লাহ্ পাকের এমন সব কালামকে কুর'আন হওয়া থেকে খারিজ করে দেয় যে সকল কালাম তিনি তার নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার এ ধরনের কালাম সীমাহীন। যেমন তিনি বলেন,

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا -

"বলুন, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কালাম শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরো সমুদ্র আনলেও।"[১৩]

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ-
مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

তিনি আরো বলেন, "পৃথিবীর সকল বৃক্ষ যদি কলম হয়, এবং এই যে সমুদ্র তার সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয় তবু আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [১৪]

---

১২. মান্না' আল-কাত্তান, মাবাহিস ফী উলুমি'ল কুর'আন, মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন্নাসরী ওয়াত-তাওযী', রিয়াদ: ১৪৩১ হি. ১৭ পৃ.

১৩. আল-কুর'আন, ১৮: ১০৯

১৪. আল-কুর'আন, ৩১: ২৭)

Dhaka University Institutional Repository

المنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم (মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ) শর্ত দ্বারা তার পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি কুরআনের সংজ্ঞা থেকে খারিজ হয়ে যায়।

المتعبد بتلاوته (তার তিলাওয়াত করা 'ইবাদত) শর্তের প্রেক্ষিতে আহাদ কিরাআত সমূহ এবং হাদীসে কুদসী কুরআনের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে খারিজ হয়ে যায়।

আহমাদ মোল্লাজিওন (র) বলেন,
"কিতাব বলতে এমন কুর'আনকে বুঝায়, যা রাসূল (স) এর নাযিল করা হইয়াছে। এটি মাছহাবসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি রাসূল (স) এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে নিঃসন্দেহভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।" [১৫]

The Holy Qur'an is the word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him, by the Angel Gabriel. It is for Muslims the uncreated work of God and, in its original form, is preserved beside the throne of God in heaven.
The utterances of God was vouchsafed to the Prophet Muhammad (peace be upon him) who committed the words to memory and later dictated the word of God to his Companions and to secretaries who wrote them down.
The Qur'an can be defined as follows:

- The speech of Allah,
sent down upon the last Prophet Muhammad,
through the Angel Gabriel,
in its precise meaning and precise wording,
transmitted to us by numerous persons (tawatur),
both verbally and in writing.
- Inimitable and unique,
protected by God from corruption.[১৬]

এটি আল্লাহর কালাম বা বক্তব্য, যা তাঁর দাস মুহাম্মদ (স)-এর উপর আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটি একটি মু'জিযা, এর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সূরার ক্ষেত্রেও। এটি লিপিবদ্ধ আছে এবং আমাদের কাছে এটি মুতাওয়াতির বর্ণনায় এসে পৌঁছেছে। এর পঠনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা করি এবং সূরা ফাতেহা দিয়ে এর শুরু এবং সূরা নাস দিয়ে এর সমাপ্তি।[১৭]

---

১৫. আহমাদ মোল্লাজিওন, আল-মানার।

১৬. Ahmad Von Denfeer, *Ulum al-Qur'an: An Introduction to the Sciences of the Qur'an*, Published by the Islamic Foundation, UK: 2004, PP. 4)

১৭. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুর'আন*, খ. ২, পৃ. ১২৭, প্রকাশ, হিজাজী কায়রো ১৩৬৮ হি)

Dhaka University Institutional Repository

এটি আল্লাহর কালাম বা বক্তব্য, যা তাঁর দাস মুহাম্মদ (স)-এর উপর আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটি একটি মু'জিযা, এর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সূরার ক্ষেত্রেও। এটি লিপিবদ্ধ আছে এবং আমাদের কাছে এটি মুতাওয়াতির বর্ণনায় এসে পৌঁছেছে। এর পঠনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা করি এবং সূরা ফাতেহা দিয়ে এর শুরু এবং সূরা নাস দিয়ে এর সমাপ্তি।[১৮]

কুর'আন শরীফ (আরবি: القرآن আল্ কুর'আন, "আবৃত্তি") মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এটি একটি আসমানী গ্রন্থ। ইসলামী ইতহাস অনুসারে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড অংশে জনাব মুহাম্মদের (স) নিকট অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কুর'আনে সর্বমোট ১১৪টি সূরা বা অধ্যায় আছে। আয়াত বা অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৬,৬৬৬ টি। এটি মূল আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়। মুসলিম চিন্তাধারা অনুসারে কুর'আন ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বশেষ। গ্রন্থ অবতরণের এই ধারা ইসলামের প্রথম বাণীবাহক আদম (আ) থেকেই শুরু হয়। কুর'আনে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যার সাথে বাইবেলসহ অন্যান্য ঐশ্বিক গ্রন্থের বেশ মিল রয়েছে, অবশ্য অমিলও কম নয়। তবে কুর'আনে কোনও ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা নেই। মুসলিমদের বিশ্বাসমতে অপরিবর্তণীয় থাকার রহস্য রয়েছে কুরআনেরই একটি আয়াতের মধ্যে:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -

"আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।"[১৯]

আল-কুর'আন নাযিলের পদ্ধতি

রাসূল (স) এর নিকট বিভিন্নভাবে অহী নাযিল হত। বুখারী শরীফের হাদীস-

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا-

বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার হযরত হারেছ ইবনে হিশাম (রা) হুযুর (স) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, হুযুর আপনার প্রতি অহী কিভাবে আসে। উত্তরে রাসূল (স) বললেন– কোন কোন সময় অহী আমার নিকট ঘণ্টা ধ্বনির মত আসে। অহী নাযিলের এই অবস্থা আমার উপর বড় কঠিন ও ক্লান্তিকর বোধ হয়। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর ঘণ্টা ধ্বনির মাধ্যমে প্রত্যাদিষ্ট সবকিছুই মুখস্ত পাই। আবার কখনো কখনো প্রেরিত ফেরেশতা মানুষের আকৃতি নিয়ে উপস্থিত হন।[২০]

---

১৮. জালালুদ্দীন আল-বুলকায়নী, *মাওয়াকি'উ'ল 'উলূম মিন মাওয়াকি'উ'ন-নুজূম*, পৃ. ১১, প্রকাশ, হিজাজী কায়রো ৮০২ হি

১৯. আল-কুর'আন, ১৫: ০৯

২০. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (এরপর থেকে 'ইমাম বুখারী' উল্লেখ করা হবে), আল-জামি আল-মুসনাদ আল-সহী আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়্যামিহী। (এরপর থেকে 'সহীহ আল-বুখারী উল্লেখ করা হবে), অনুচ্ছেদ: বাদউ, ওয়াহী, আল-কুতুস সিত্তাহ্, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, পৃ-২, হাদীস নং- ২

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে কুর'আন -হাদীসে বর্ণিত অহী নাযিলের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হলো-

১। ঘণ্টা ধ্বনির পদ্ধতি

এটি অহী নাযিলের প্রথম পদ্ধতি। হাদীসের ভাষায় এটিকে 'মেসলা সালসালাতুল জারশ' বলা হয়। হাদীসে শুধুমাত্র এতটুকু (أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ) বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে, এ ধরনের অহীকে কি হিসেবে ঘণ্টা ধ্বনির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য কোন কোন আলেম অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এ আওয়াজ হয়তো ফেরেশেতার। আবার কেউ বলেছেন– ফেরেশতা অহী আনার সময় তার ডানা ঝাপটা দিতেন এবং তাতেই এই আওয়াজ হত। আল্লামা খাত্তাবী (র) অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এখানে উপমা, শব্দের ঝঙ্কারের বা বাজনার সাথে নয় বরং তার ধারাবাহিকতার সাথে। যেমন– ঘণ্টার আওয়াজ ধারাবাহিকভাবে হয়ে থাকে। এবং কোন স্থানে বন্ধ হয় না। অনুরূপভাবে অহীর আওয়াজও ধারাবাহিকভাবে হতে থাকত।[২১]

২। ফেরেশতার মানব আকৃতি নিয়ে আগমন

অহী নাযিলের এটি দ্বিতীয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতিকে তামাসসালুল মালা (وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ) বলা হয়। এ পদ্ধতির কথা উপরিউক্ত হাদীসে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে, ফেরেশতা কোন মানুষের বেশে আগমন হুযুর (স)- এর নিকট পয়গাম পৌঁছে দিতেন। এ অবস্থায় হযরত জীবরাঈল (আ)-কে প্রখ্যাত সাহাবী দাহিয়াতুল ক্বালবী (রা)- এর আকৃতিতে দেখা যেত।[২২]

৩। ফেরেশতার স্ব-আকৃতি নিয়ে আগমন

অহী নাযিলের তৃতীয় পদ্ধতি ছিল হযরত জীবরাঈল (আ) অন্য কোন রূপ ধারণ না করে সরাসরি নিজের আসল রূপেই আবির্ভূত হয়েছেন। জীবনে মাত্র তিনবার রাসূল (স) জীবরাঈল (আ)- কে আসল রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। একবার রাসূল (স) নিজে জীবরাঈল (আ)- কে তার আসল আকৃতিতে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার মিরাজের সময়। তৃতীয়বার নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মক্কা শরীফের 'আজইয়াদ' নামক স্থানে। প্রথম দুইবারের কথা সহীহ সনদের মাধ্যমে বলা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয়বারের দেখা সম্পর্কিত বর্ণনা সনদের দিক দিয়ে দুর্বল বা সন্দেহযুক্ত।[২৩]

৪। সত্য স্বপ্ন

অহীর চতুর্থ তরিকা ছিল রাসূল (স) কুর'আনের অবতরণের পূর্বে সত্য স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন, জাগ্রত হলে তাই করতেন। বুখারী শরীফের হাদীস-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ -فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ

---

২১. আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আবুল ফজল আসকালানী (আশ-শাফেয়ী), *ফাতহুল বারী শারহু সহীহ্ আল-বুখারী*, দারুল মা'আরিফা, বৈরূত: ১৩৭৯ হি., খ. ১, পৃ. ১৬)

২২. বদরুদ্দীন আইনী (আল-হানাফী), উমদাতুল কারী শারহু সহীহ্ আল-বুখারী, ১৪২৭/ ২০০৬, খ. ১, পৃ. ৪৭)

২৩. আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আবুল ফজল আসকালানী (আশ-শাফেয়ী), *ফাতহুল বারী শারহু সহীহ্ আল-বুখারী*, দারুল মা'আরিফা, বৈরূত: ১৩৭৯ হি., খ. ১, পৃ. ১৮-১৯)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)- এর উপর অহীর সূচনা নিদ্রা অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে হত। সেসময় তিনি যে কোন স্বপ্ন দেখতেন তা প্রভাতের আলোকের মত সত্য হত।[২৪]

৫। আল্লাহর সাথে সরাসরি বাক্যালাপ

হযরত মূসা (আ)- এর ন্যায় রাসূল (স)- এরও আল্লাহর সাথে সরাসরি কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়েছিল। জাগ্রত অবস্থায় এমন ঘটনা শুধু মেরাজের সময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া একবার স্বপ্নেও রাসূল (স) আল্লাহ তা'আলার সাথে আলাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন।[২৫]

৬। অন্তরে গেথে দেওয়া

অহীর ৬ষ্ঠ তরীকা ছিল হযরত জীবরাঈল (আ) কোন আকৃতি ধারণ করে সামনে না এসেই হুযুরের পবিত্র অন্তরে কোন কথা ঢুকিয়ে দিতেন। রাসূল (স) এরশাদ করেছেন- রুহুর কুদুস (জীবরাঈল আ.) আমার অন্তরে এ কথা স্থাপন করেছেন।[২৬]

আল-কুর'আন নাযিলের সময় ও স্থান

কুর'আন যেহেতু আল্লাহর কালাম এ কারণে আদি থেকেই তা লাওহে মাহফুজে বিদ্যমান। আল্লাহর বাণী

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ - فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ -

অর্থ: বরং এটা কোরআন মাজীদ যা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ।[২৭]

অতএব লাওহে মাহফুজ থেকে দু'বার এর অবতরণ ঘটে। একবার সম্পূর্ণ কোরআন দুনিয়ার আসমানে বায়তুল ইজ্জাতে অবতীর্ণ হয়। তারপর হযরত রাসূল (স) এর উপর অল্প অল্প করে প্রয়োজন মোতাবেক দীর্ঘ ২৩ বছরে নাযিল করা হয়।

কুর'আন কারীমে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, একটি ইনজাল, আর অপরটি তানজীল। ইনজালের অর্থ হচ্ছে কোন জিনিস একেবারেই সম্পূর্ণটা নাযিল করা হয়। এবং তানজীল অর্থ হচ্ছে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করা হয়। সুতরাং কোরআন কারীম নিজের জন্য প্রথম শব্দটি ব্যবহার করেছে সেখানের অর্থ হচ্ছে অবতীর্ণ করা যা লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আসমানে হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন-

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ -

নিশ্চয়ই আমি একে অবতীর্ণ করেছি এক মোবারক রাতে।[২৮]

---

২৪. 'ইমাম বুখারী', 'সহীহ আল-বুখারী, অনুচ্ছেদ: বাদউ' ওয়াহী, আল-কুতুস সিত্তাহ্, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, পৃ-২, হাদীস নং- ৩

২৫. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ৪৬, প্রকাশ, হিজাজী কায়রো ১৩৬৮ হি

২৬. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ৪৬, প্রকাশ, হিজাজী কায়রো ১৩৬৮ হি

২৭. আল-কুর'আন, ৮৫: ২১-২২

২৮. আল-কুর'আন, ৪৪: ৩

Dhaka University Institutional Repository

আর তানজীল অর্থ এমন ভাবে অবতীর্ণ করা যা রাসূল (স) এর উপর অল্প অল্প করে করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে-

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا -

অর্থঃ আমি কোরআনকে যতিচিহ্ন সহ পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি। যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন। এবং আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি।[২৯]

কুর'আন অবতরণের এ দু'টি রূপ স্বয়ং কুর'আন কারীমের বর্ণনা ধারা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া নাসাঈ, হাকেম, বায়হাকী, ইবনে আবী শায়েবা, ইবরানী এবং ইবনে মরদুয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম হচ্ছে, কুর'আনের প্রথম নাযিল একবারে দুনিয়ার আসমানে হয়েছিল, এবং পরবর্তী নাযিল ধীরে ধীরে রাসূল (স)- এর উপর হয়েছিল। [৩০]

প্রথম অবতরণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)- এর বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, এই প্রথম নাযিল লাওহে মাহফূজ থেকে দুনিয়ার আসমানের এক জায়গায় "বাইতুল ইজ্জত"- এ অবতীর্ণ হয়েছিল, যাকে বাইতুল মা'মুরও বলা হয়ে থাকে এবং কাবা ঘরের বরাবর আসমানের ওপর ফিরিশতাগণের ইবাদতখানা।[৩১]

"বাইতুল ইজ্জত"- এ কুর'আন কীভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল? এবং সেই অবতীর্ণের হিকমত বা রহস্য কি ছিল? এ বিষয়ে সঠিকভাবে কোনো কথা বলা যায় না। তবে কোনো কোনো উলামা যেমন, আল্লামা আবু শামা (র) বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল কুর'আন কারীমের উচ্চমর্যাদা প্রকাশ করা এবং সেখানকার ফিরিশতাদের একথা জানিয়ে দেওয়া যে, এটা আল্লাহপাকের শেষ কিতাব যা জগদ্বাসীকে হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করা হচ্ছে। যুরকানী (র) এমনও বলেছেন যে, এভাবে দু'বার অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, এই কিতাব সকল প্রকার সন্দেহ মুক্ত এবং সন্দেহের ঊর্ধ্বে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্বলব মুবারক ছাড়াও এটা আরো দু'টি স্থানে সংরক্ষিত আছে। এক লাওহে মাহফূজে এবং দুই বাইতুল ইজ্জতে। (আল্লাহু আ'লামু।)

সর্বোপরি, আল্লাহ তা'আলার হিকমতের পরিমাপ কে করবে? এ বিষয়ে তাঁরই কেবল সঠিক জ্ঞান আছে এবং তাঁর আরো কি কি হিকমত আছে। তাঁর সেই সকল হিকমত সম্বন্ধে খোঁজাখুঁজির বা অনুসন্ধানের প্রয়োজনই নেই। অবশ্য প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, এই প্রথম নজুল লাইলাতুল কদরে হয়েছিল।

---

২৯. আল-কুর'আন, ১৭: ১০৬

৩০. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ৪১, প্রকাশ, হিজাজী কায়রো ১৩৬৮ হি

৩১. মুহাম্মদ তাহির কারদী, *তারিখে কুর'আন ওয়া গারায়েবু ইসমুহু ওয়া হুকমুহু*, মাওকিউ' ইয়াসুব, ১৪২১ হি., পৃ-২০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অবতরণ

এ ব্যাপারে প্রায় সকলে একমত যে, কুর'আন কারীম দ্বিতীয় বার আস্তে আস্তে অবতরণ সেই সময় শুরু হয়েছিল যখন হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স চল্লিশ বছর হয়েছিল। এই অবতরণটিও বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী লাইলাতুল কদর থেকে শুরু হয়েছিল। (প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (স) রবিউল আউয়াল মাসে নবুওয়াত লাভ করেছিলেন। আল্লামা সুয়ূতী (র) মন্তব্য করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স)- এর নিকট সত্য স্বপ্ন রবিউল আউয়াল মাসে আগমন শুরু হয়েছিল। এই ধারা ছয় মাস পর্যন্ত চালু থাকে। তারপর রমজান মাসে কুর'আন অবতীর্ণ হয়।[৩২]

আর সেদিন ছিল এগার পর গাজওয়ায়ে বদরের দিন। ইরশাদ হয়েছে-

إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ -

অর্থ: যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর ওপর এবং সে বিষয়ের ওপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। [৩৩]

অনুরূপভাবে কুর'আন অবতরণের সূচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা তো স্বয়ং কুর'আন কারীম থেকে প্রমাণিত :

১। এর সূচনা রমজান মাসেই হয়েছে।

২। যে রাতে কুর'আন অবতীর্ণ শুরু হয় সে রাত ছিল লাইলাতুল কদর।

৩। এ ছিল সেই তারিখ যার পরে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

তবে এই রাত রমজানের কত তারিখে ছিল? এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কোনো কোনো বর্ণনায় রমজানের সতের, কারো মতে উনিশে এবং কারো মতে সাতাশে রাত বলে জানা যায়।[৩৪]

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি সাহিত্য এবং ইসলাম শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ইসা বাউলাতা কুর'আনের সাহিত্যিক গঠনপ্রণালি সম্বন্ধে নিম্ন প্রকারের মন্তব্য করেছেন। "কুর'আনের বার্তাগুলো বিভিন্ন সাহিত্যিক গঠনে প্রকাশিত হযয়েছে, যা আরবি সাহিত্যের সবচেয়ে নিখুঁত লিখিত রচনা হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কুর'আনের ভাষার উপর ভিত্তি করেই আরবি ব্যাকরণ রচিত হয়েছে, এবং মুসলিম অলঙ্কার শাস্ত্রবিদদের বর্ণনামতে, কুর'আনের বাগধারাগুলো ভীষণ সুন্দর এবং মহিমান্বিত হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে যে, কুর'আন এর বার্তা প্রকাশ করার নিমিত্তে বিপুল প্রকার ও শ্রেণীর সাহিত্যিক উপাদানের সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছে।[৩৫]

---

৩২. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ৪২, প্রকাশ, হিজাজী কায়রো ১৩৬৮ হি

৩৩. আল-কুর'আন, ৮: ৪১

৩৪. আত-তাবারী, আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, (আল-ইমাম) জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন, বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮/১৯৮০, পৃ. ৭

৩৫. ইসা বাউলাতা, *Literary Structure of Qur'an*, *এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দ্য কুর'আন*, vol.3 p.১৯২, ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন দেশ

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন দেশ

মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র কুর'আনে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের কথা বলেছেন তার মধ্যে অনেক দেশের নাম উল্লেখ করেছেন সেসব দেশের মধ্যে মিশর অন্যতম। এছাড়াও মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'বরকতময় জমীন' এর কথা উল্লেখ করে এর মাধ্যমে ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও জর্ডানকে বুঝিয়েছেন। কেননা এ এলাকাগুলি অসংখ্য নবীদের আবাসভূমি।

মিশর

মিশর (আরবি ভাষায়: مصر মিস্‌র, কথ্য মিশরীয় আরবি مصر মাস্‌র, ইংরেজি ভাষায়: Egypt ইজিপ্ট), সরকারী নাম মিশর আরব প্রজাতন্ত্র, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার একটি প্রাচীন রাষ্ট্র। দেশটির বেশির ভাগ অংশ আফ্রিকাতে অবস্থিত, কিন্তু এর সবচেয়ে পূর্বের অংশটি, সিনাই উপদ্বীপ, সাধারণত এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। সিনাই উপদ্বীপ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে স্থল সেতুর মত কাজ করে। মিশরের অধিকাংশ এলাকা মরুময়। নীল নদ দেশটিকে দুইটি অসমান অংশে ভাগ করেছে। নীল নদের উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলেই মিশরের বেশির ভাগ মানুষ বাস করেন। কায়রো দেশের বৃহত্তম শহর ও রাজধানী।[১]

প্রাচীন মিশরের ভাষায় দেশটির একটি নাম ছিল "কমেট" (km.t) বা কালো মাটির দেশ। নীল নদের বন্যার সাথে বয়ে আনা উর্বর কালো মাটি যা মরুভূমির মাটি "deshret" (dš□t) অথবা "লাল জমি" থেকে আলাদা।[২]

মিশর সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

(وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ)

আর আমি ওহী পাঠালাম মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা উভয়ে তোমাদের কওমের জন্য মিশরে বাসস্থান বহাল রাখ এবং তোমাদের বাসগৃহগুলোকে সালাতের স্থানরূপে গণ্য কর, আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও মু'মিনদের সুসংবাদ দাও।[৩]

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ -

আর মিশরে যে ব্যক্তি তাকে খরিদ করেছিল সে তার স্ত্রীকে বলল- এর সম্মানজনক থাকার ব্যবস্থা কর। হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম, আর এ উদ্দেশ্যে যে, যেন তাকে শিক্ষা দেই স্বপ্ন-ফল বর্ণনা করা। আল্লাহ্‌ স্বীয় অভিপ্রেত কার্যে প্রবল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[৪]

---

১. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ২৩

২. Rosalie, David, প্রকাশক: Routledge, ১৯৯৭, পৃ. ১৮

৩. আল-কুর'আন, ১০ঃ ৮৭

৪. আল-কুর'আন, ১২ঃ ২১

Dhaka University Institutional Repository

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا
وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ -

আর তোমরা যখন বললে: হে মূসা- আমরা কখনও একই রকম খাদ্যে ধৈর্যধারণ করব না। সুতরাং আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, তিনি যেন আমাদের জন্য জমিতে উৎপন্ন করেন তরকারি, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ। মূসা বলল: তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু নিতে চাও ? তাহলে কোন নগরীতে (মিশরে) তোমরা অবতরণ কর, সেখানে তোমরা যা চাও তা পাবে। তাদের উপর আরোপিত হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্র। আর তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে ঘুরতে রইল। এরূপ হল এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তারা নাফরমানি ও সীমালংঘন করেছিল বলেই এমন পরিণতি হয়েছিল।[৫]

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)

আর এরূপেই আমি ইউসুফকে সে দেশে (মিশর) প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে দেশে (মিশর) যেখানে ইচ্ছে সে বসবাস করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছে স্বীয় রহমত পৌঁছে দেই এবং আমি নেক্‌কারদের বিনিময় নষ্ট করি না।[৬]

(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ) -

অবশেষে তারা যখন ইউসুফের কাছে পৌছল, তখন সে তার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিল এবং বলল ঃ আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন ।[৭]

(قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ) -

তারা বলল, "তাকে ও তার ভাইকে আটক করো এবং শহরে শহরে হরকরা পাঠাও" ।[৮]

(وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ) -

আমি মূসার কাছে ওহী পাঠিয়েছি এই মর্মে- "রাতারাতি আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে যাও, তোমাদের পিছু নেয়া হবে।"[৯]

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ
إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ -

---

৫. আল-কুর'আন, ২ঃ ৬১
৬. আল-কুর'আন, ১২ঃ ৫৬
৭. আল-কুর'আন, ১২ঃ ৯৯
৮. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ৩৬
৯. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ৫২

Dhaka University Institutional Repository

ফেরাউন তার দেশে (মিশর) অতিমাত্রায় উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিল। তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে সে হত্যা করত এবং মেয়েদেরকে জীবিত রেখে দিত। বস্তুত সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।[১০]

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ

তিনি যখন শহরে প্রবেশ করলেন, তখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্যজন ছিল তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন- এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী।[১১]

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ

অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে চিৎকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মূসা তাকে বললেন- তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট।[১২]

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ

এসময় শহরের প্রান্ত থেকে একব্যক্তি ছুটে আষল এবং বলল- হে মূসা, রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতঃএব তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী।[১৩]

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল- আযীযের স্ত্রী স্বীয় যুবক দাসকে নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য ফুসলাচ্ছে। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।[১৪]

ভৌগোলিক অবস্থান

মিশর আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। পূর্বে ইসরাইল, আকাবা উপসাগর ও লোহিত সাগর, দক্ষিণে সুদান, পশ্চিমে লিবিয়া এবং উত্তরে ভ-মধ্যসাগর।[১৫]

---

১০. আল-কুর'আন, ২৮ঃ ৪
১১. আল-কুর'আন, ২৮ঃ ১৫
১২. আল-কুর'আন, ২৮ঃ ১৮
১৩. আল-কুর'আন, ২৮ঃ ২০
১৪. আল-কুর'আন, ১২ঃ ৩০
১৫. ভবেশ রায়, দেশ দেশান্তর, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

লিখিত ইতিহাস অনুসারে প্রায় ৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই একটি সংহত রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মিশর বিদ্যমান। সেচভিত্তিক কৃষি, সাক্ষরতা, নগরজীবন, এবং বড় মাপের রাজনৈতিক সংগঠনবিশিষ্ট ইতিহাসের প্রথম সভ্যতাগুলির একটি নীল নদের উপত্যকাতে গড়ে উঠেছিল। সাংবাৎসরিক বন্যা মিশরকে একটি স্থিতিশীল কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এশিয়া ও আফ্রিকার সংযোগস্থলে সামরিক কৌশলগত স্থানে অবস্থিত ছিল বলে এবং ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা এবং ভারত ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত ছিল বলে এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতক থেকে বিভিন্ন বিদেশী শক্তি দেশটি দখল করে এবং এখানে নতুন নতুন ধর্ম ও ভাষার প্রবর্তন করে। কিন্তু মিশরের সমৃদ্ধ কৃষি সম্পদ, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অবস্থান এবং দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক একতার ফলস্বরূপ এখনও পুরনো ঐতিহ্য ও রীতিনীতিগুলি হারিয়ে যায়নি। বর্তমান মিশর আরবিভাষী মুসলিম রাষ্ট্র হলেও এটি অতীতের খ্রিস্টান, গ্রীক-রোমান ও প্রাচীন আদিবাসী ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি এখনও ধরে রেখেছে।

৬৪১ সালে আরব মুসলিম আক্রমণকারীরা মিশর দখল করে। তখন থেকেই মিশর মুসলিম ও আরব বিশ্বের একটি অংশ। আধুনিক মিশরের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী। দেশটি যখন উসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল, তখন ১৮০৫ থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি দেশটির বড়লাট ছিলেন। ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ সেনারা মিশর দখল করে। এরপর প্রায় ৪০ বছর মিশর ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল।

১৯২২ সালে দেশটি একটি রাজতন্ত্র হিসেবে স্বাধীনতা অর্জন করলেও ব্রিটিশ সেনারা মিশরে থেকে যায়। ১৯৫২ সালে গামাল আবদেল নাসের-এর নেতৃত্বে একদল সামরিক অফিসার রাজতন্ত্র উৎখাত করে এবং একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে মিশর প্রতিষ্ঠা করে। নাসের ১৯৫৬ সালের মধ্যে মিশর থেকে সমস্ত ব্রিটিশ সেনাকে সরিয়ে দেন। ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপতি আনওয়ার আল-সাদাতের নেতৃত্বে মিশর প্রথম জাতি হিসেবে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। বর্তমানে মিশর সমগ্র আরব বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ২০০৫ সালে দেশের প্রথম বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ গণআন্দোলনের মুখে হোসনী মোবারকের পতন হয়।

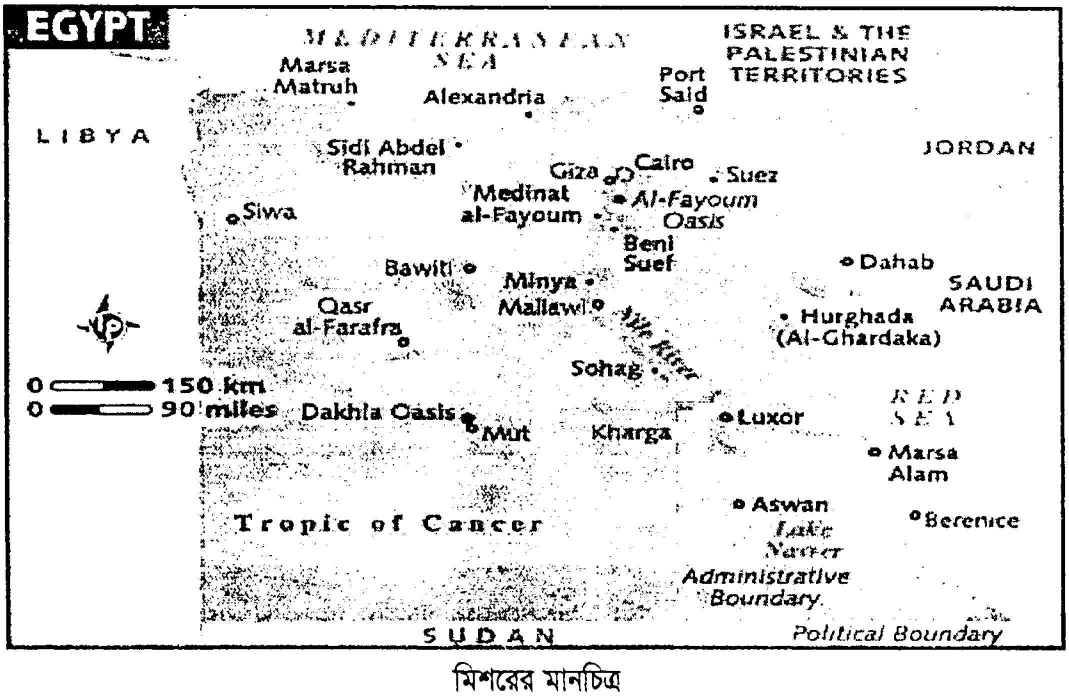

মিশরের মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

বাইবেলের বর্ণনা মতে মিশরে আগমণকারী হযরত ইয়াকূব (আ) এর পরিবারের সদস্য সংখ্যা মোট ৬৭ ছিল। অন্যান্য পরিবারের যেসব মেয়েকে হযরত ইয়াকূব (আ) এর পরিবারে বিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদেরকে এ সংখ্যার অন্তরভুক্ত করা হয়নি। এ সময় হযরত ইয়াকূব (আ) এর পরিবারে বিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদেরকে এ সংখ্যার অন্তরভুক্ত করা হয়নি। এ সময় হযরত ইয়াকূব (আ) এর বয়স ছিল ১৩০ বছর এবং এরপরও তিনি মিশরে ১৭ বছর জীবিত থাকেন। এখানে একজন জ্ঞানানুসন্ধানীর মনে প্রশ্ন জাগে, বনী ইসরাঈল যখন মিশরে প্রবেশ করে তখন হযরত ইউসুফ (আ) সহ তাদের সংখ্যা ছিল ৬৮ এবং প্রায় ৫ শত বছর পর যখন তারা মিশর থেকে বের হয় তখন তাদের সংখ্যা ছিল কায়েক লাখ।

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী মিশর ত্যাগ করার পরের বছর সিনাইয়ের মরু এলাকায় হযরত মূসা (আ) তাদের যে আদমশুমারী করান তাতে কেবলমাত্র যুদ্ধ করতে সমর্থ যুবকদের সংখ্যা ৬,০৩,৫৫০ ছিল। এর মানে এ দাঁড়ায়, নারী পুরুষ-শিশু মিলিয়ে সব শুদ্ধ তাদের সংখ্যা হবে অন্তত ২০ লাখ। কোন হিসেবে কি ৬৮ জন থেকে ৫ শত বছরে বংশবৃদ্ধি পেয়ে ২০ লাখ হতে পারে? যদি ধরা যায়, সারা মিশরের জনসংখ্যা এ সময় ছিল ২ কোটি (যা অবশ্যি খুব বেশী অতিরঞ্জিত বিবেচিত হবে) তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়াবে যে, শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের সংখ্যাই সেখানে ছিল শতকরা ১০ ভাগ। শুধুমাত্র বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে একটি পরিবারের লোকসংখ্যা কি এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে? এ প্রশ্নটি সম্পর্কে চিন্ত-ভাবনা করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রকাশ ঘটে। একথা ঠিক ৫ শত বছরে একটি পরিবারের লোকসংখ্যা এত বেশী বাড়তে পারে না। কিন্তু বনী ইসরাঈল ছিল নবীদের সন্তান। তাদের নেতা হযরত ইউসুফ (আ)-এর বদৌলতে তারা মিশরে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। এ ইউসুফ (আ) নিজেই ছিলেন নবী। তাঁর পর থেকে চার পাঁচশ বছর পর্যন্ত দেশের শাসন কর্তৃত্ব তাদেরই হাতে ছিল। এ সময় নিশ্চয়ই তারা মিশরে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করে থাকবেন। মিশরবাসীদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের কেবল ধর্মই নয়, তামাদ্দুন এবং সমগ্র জীবন ব্যবস্থাই মিশরীয় অমুসলিমদের থেকে আলাদা হয়ে বনী ইসরাঈলের রঙে রঞ্জিত হয়ে গিয়ে থাকবে।

মিশরীয়রা তাদের সবাইকে ঠিক তেমনি আগন্তুক গণ্য করে থাকবে যেমন ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুরা ভারতীয় মুসলমানদেরকে গণ্য করে থাকে। অনারব মুসলমানদের ওপর আজ 'মোহামেডান" শব্দটি যেভাবে লাগানো হয় তাদের ওপর ঠিক তেমনি ভাবেই 'ইসরাঈলী' শব্দটি লাগানো হয়ে থাকবে। আর তাছাড়া তারা নিজেরাও দীনী ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং বিয়ে-শাদীর সম্পর্কের কারণে অমুসলিম মিশরীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বনী ইসরাঈলের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়ে থাকবে। এ কারণে যখন মিসরে জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ার উঠলো তখন কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলই নির্যাতনের শিকার হলো না বরং মিশরীয় মুসলিমরাও তাদের সাথে একইভাবে নির্যাতিত হলো। আর বনী ইসরাঈল যখন মিশর ত্যাগ করলো তখন মিশরীয় মুসলমানরাও তাদের সাথে বের হলো এবং তাদের সবাইকে বনী ইসরাঈলের সাথে গণ্য করা হতে থাকলো। বাইবেলের বিভিন্ন ইংগিত থেকে আমাদের এ ধারণার সমর্থন মেলে। উদাহরণ স্বরূপ "যাত্রা পুস্তকে" যেখানে বনী ইসরাঈলদের মিশর থেকে বের হবার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বাইবেল লেখক বলছেনঃ "আর তাহাদের সাথে মিশ্রিত লোকদের মহাজনতাও গেলো।"[১৬]

---

১৬. পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ঢাকা : বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, তা:/বি:, যাত্রা পুস্তক- ১২:৩৮

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে "ও তিনি আবার বলছেনঃ "আর তাহাদের মধ্যবর্তী মিশ্রিত লোকেরা লোভাতুর হইয়া উঠিল।"[১৭] তারপর পর্যায়ক্রমে এ অইসরাঈলী মুসলমানদের জন্য "আগন্তুক" ও "পরদেশী" পরিভাষা ব্যবহার করা হতে থাকে। বস্তুত তাওরাতে হযরত মুসাকে যেসব বিধান দেয়া হয় তার মধ্যে আমরা পাই-
"তোমরা ও তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশী লোক, উভয়ের জন্য একই ব্যবস্থা হইবে; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি। সদা প্রভুর সামনে তোমরা ও বিদেশীয়েরা, উভয়ে সমান। তোমাদের ও তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশীয়দের জন্য একই ব্যবস্থা ও একই শাসন হইবে।"[১৮]

"কি স্বজাতীয় কি বিদেশী যে ব্যক্তি নিসংকোচে পাপ করে, সে সদাপ্রভুর অবমাননা করে, সেই ব্যক্তি আপন লোকদের মধ্যে হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।"[১৯]

"তোমরা তোমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে, চাই স্বদেশী হোক বা বিদেশী হোক, ন্যায্য বিচার করিও।"[২০]

আল্লাহর কিতাবে অইসরাঈলীদের জন্য আসলে কি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল যাকে অনুবাদকরা বিদেশী বানিয়ে রেখে দিয়েছে, সেটা এখন অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা কঠিন।

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

মূসা বললোঃ "হে ফেরাউন! আমি বিশ্বজাহানের প্রভুর নিকট থেকে প্রেরিত"।[২১]

ফেরাউন শব্দের অর্থ "সূর্য দেবতার সন্তান"। প্রাচীন কালে মিসরীয়রা সূর্যকে তাদের মহাদেব বা প্রধান দেবতা মনে করতো। এ অর্থে তারা তাকে বলতো (রাও) ফেরাউন এ রাও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। মিসরীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী কোন শাসনকর্তা সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হতে হলে তাকে রাও এর শারীরিক অবতার এবং তার দুনিয়াবী প্রতিনিধি হওয়া অপরিহার্য ছিল। এ জন্যেই যতগুলো রাজ পরিবার মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে সূর্য বংশীয় হিসেবে পেশ করেছে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর প্রত্যেকটি শাসক নিজেদের জন্যে ফেরাউন (ফারাও) উপাধী গ্রহণ করে দেশবাসীর সামনে একথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে যে, আমি ই তোমাদের প্রধান রব বা মহাদেব।

এখানেও একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, কুর'আন মজীদে হযরত মূসার ঘটনা বর্ণানা প্রসংগে দুজন ফেরাউনের কথা বলা হয়েছে। একজন ফেরাউনের আমলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং তার গৃহে প্রতিপালিত হন। আর দ্বিতীয় জনের কাছে তিনি ইসলামের দাওয়াত ও বনী ইসরাঈলের মুক্তির দাবী নিয়ে উপস্থিত হন এবং এ দ্বিতীয় ফেরাউনই অবশেষে জলমগ্ন হয়।

---

১৭. প্রাগুক্ত, "গণনা পুস্তক- ১১:৪
১৮. প্রাগুক্ত, গণনা পুস্তক ১৫: ১৫-১৬
১৯. প্রাগুক্ত, গণনা পুস্তক ১৫:৩০
২০. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় বিবরণ ১:১৬
২১. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান যুগের গবেষকদের অধিকাংশের মতে প্রথম ফেরাউন ছিল দ্বিতীয় রামেসাস। তার শাসকালে ছিল ১২৯২ থেকে ১২২৫ খৃষ্টপূর্বব্দ। পিতা দ্বিতীয় রামেসাসের জীবনকালেই সে শাসন কর্তৃত্বের অংশগ্রহণ করে এবং পিতার মৃত্যুর পর পুরোপুরি রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। এ ধারণা বাহ্যত সন্দেহযুক্ত মনে হচ্ছে। কারণ ইসরাঈলী ইতিহাসের হিসেব অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) ইন্তিকাল করেন ১২৭২ খৃস্টাপূর্বাব্দে। তবুও যা হোক আমাদের মনে রাখতে হবে,এগুলো নেহাত ঐতিহাসিক ধারণা ও আন্দাজ অনুমান আর মিশরীয় , ইসরাঈলী ও খৃস্টীয় পঞ্জিকার সাহায্যে একেবারে নির্ভুল সময়কালের হিসেব করা কঠিন।[২২]

ইউসুফ (আ) মিশরের প্রধানমন্ত্রী

সমগ্র মিশর ছিল হযরত ইউসুফ (আ)- এর অধিকারভুক্ত। এ দেশের যে কোন জায়গায় তিনি নিজের আবাস গড়ে তুলতে পারতেন। এ দেশের কোন জায়গায় বসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁকে বাধা দেবার ক্ষমতা কারো ছিল না। এ দেশের ওপর হযরত ইউসুফ (আ)- এর যে পূর্ণাংগ কর্তৃত্ব অধিকার ছিল এ যেন ছিল তার বর্ণনা। ইবনে যায়েদের বরাত দিয়ে আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী তাঁর নিজের তাফসীর গ্রন্থে এর এই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইউসুফকে মিশরে যা কিছু ছিল সব জিনিসের মালিক বানিয়ে দিলাম। দুনিয়ার সেই এলাকার যেখানেই সে যা কিছু চাইতো করতে পারতো। সেই দেশটির সমগ্র এলাকা তার হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি সে যদি ফেরাউনকে নিজের অধীনস্থ করে তার ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইতো তাহলে তাও করতে পারতো।" আল্লামা তাবারী দ্বিতীয় একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, সেটি মুজাহিদের উক্তি। মুজাহিদ হচ্ছেন তাফসীর শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম। তাঁর মতে মিশরের বাদশাহ হযরত ইউসুফের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে মিশরকে তাহ্যীব ও তামাদ্দুনের কেন্দ্রভূমি মনে করা হত। তথাকার শাসক ছিল আমালেক্বা গোত্রের 'হিক্সূস'। যে সময়ে হযরত ইউসুফ (আ) কেন্আ'ন হতে যাযাবর জাতির ক্রীতদাস অবস্থায় মিশরে প্রবেশ করলেন, তৎকালে মিশরের রাজধানী ছিল 'রাআ'ম্সীস্' নামক স্থানে। ইহা খুব সম্ভব ঐস্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে আজ 'ছান' নামক বস্তিটি আবাদ রয়েছে। ভৌগলিক বিবরণ হিসাবে এই স্থানটি পূর্বদিকে 'নীল' নদের নিকটে বলে কথিত। 'ফোতিকার' মিসরীয় সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, তিনি ছিলেন শাহী খানদানের জনৈক রঈস লোক। তিনি বেড়াতে বের হয়ে মিশরের বাজারের উপর দিয়া যাচ্ছিলেন। এমন সময় ইউসুফ (আ) উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল।

তিনি অতি সাধারণ মূল্যে তাঁকে ক্রয় করে নিলেন। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, মিশরীয়রা তৎকালে নিজদিগকে বিশ্বের সেরা সুসভ্য ও সুশৃংখল জাতি বলে মনে করত। মরুবাসী যাযাবর গোত্রগুলিকে অত্যন্ত হীন ও তুচ্ছ দৃষ্টি দেখত। নিজ শহরে তাহাদের সহিত অস্পৃশ্যের মত ব্যবহার করত। এই গোত্রগুলির মধ্যেই একটি গোত্র ইব্রাহীমী বংশের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কেনআনে বসবাস করত। এই অঞ্চলে শহুরে পরিবেশ এবং স্থায়ী অধিবাসের নামচিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। শিকারের উপর তাহাদের জীবনযাপন নির্ভর করত। খড়ের ছাউনিযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরে ছিল তাদের বসতি। আর বকরীর পাল ছিল তাদের ধন-দৌলত।

---

২২. মূসা আনসারী, *আধুনিক মিসরেরঐতিহাসিক বিকাশধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ৫১)

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায় ইউসুফ (আ) সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার অভাবনীয় কার্যকলাপ দেখুন। একজন গ্রামীণ সে আবার অল্প বয়স্ক গোলাম। একজন সুসভ্য, প্রতাপশালী ও আড়ম্বরপূর্ণ ধনবান লোকের গৃহে যখন পৌছলেন। তখন নিজের নিষ্পাপ জীবন, ধৈর্য ও গাম্ভীর্য এবং বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতারূপী পবিত্র গুণাবলীর বদৌলতে, তাঁর প্রভুর চোখের মণি এবং প্রাণের মালিক হয়ে যান। তিনি তাঁর বিবিকে বললেন, কুর'আনের ভাষায়-

أكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أن يَنفَعَنَا أوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا -

"তাকে সসম্মানে রাখ। বিচিত্র নহে যে, আমরা তার দ্বারা উপকৃত হব কিংবা আমরা তাকে পুত্ররূপেই গ্রহণ করব।"[২৩]

তা কি কারণে হল? ইউসুফ (আ)-এর মধ্যে এই পছন্দনীয় চরিত্র ও স্বভাব কোথা হতে আসল? একজন গ্রামীণ সন্তান কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেছে? একজন গোলাম কোন্ মুরব্বি হতে এই পবিত্র স্বভাব প্রাপ্ত হল?

এই প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে কুর'আন মজীদ জবাব দিচ্ছে-

وَلَمَّا بَلَغَ أشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ -

"আর যখন তিনি জ্ঞানবুদ্ধির বয়সে উপনীত হলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ফয়ছালা বা মীমাংসার ক্ষমতা এবং এল্‌ম। আর আমি এরূপেই নেককারদিগকে বিনিময় প্রদান করে থাকি।"[২৪]

যা হোক, ফোতিকার হযরত ইউসুফের সহিত গোলামের ন্যায় ব্যবহার করেন নাই; বরং নিজের সন্তানের ন্যায় সম্মান ও মর্যাদার সাথে রাখলেন; বরং নিজের জমিদারী, ধন-দৌত ও গৃহ জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর সোপর্দ করে দিলেন এবং সে সমস্ত বিষয়ের আমানতদার বানায়ে দিলেন যেন কেন্‌আনের একজন পশুপালকের উপর যে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পিত হবে তা তারই সূচনা ছিল। এই জন্যই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ -

আর মিশরে যে ব্যক্তি তাকে খরিদ করেছিল সে তার স্ত্রীকে বলল- এর সম্মানজনক থাকার ব্যবস্থা কর। হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম, আর এ উদ্দেশ্যে যে, যেন তাকে শিক্ষা দেই স্বপ্ন-ফল বর্ণনা করা। আল্লাহ্ স্বীয় অভিপ্রেত কার্যে প্রবল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সুরা ইউসুফ- ১২ঃ ২১)।
ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমে মিশরের খাদ্যমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে তিনি মিশরের প্রধানমন্ত্রী হলেন।[২৫]

---

২৩. আল-কুর'আন, ১২ঃ ২১
২৪. আল-কুর'আন, ১২ঃ ২২
২৫. মাওলানা হিফযুর রহমান, কাসাসুল কুর'আন, (অনু. মাওলানা নূরুর রহমান), এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা : ২০০৯, খ. ১, পৃ. ২৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

মূসা (আ)- এর ঘটনা :

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ -

মূসাকে আমি তিরিশ রাত-দিনের জন্য (সিনাই পর্বতের ওপর) ডাকলাম এবং পরে দশ দিন আরো বাড়িয়ে দিলাম। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময় পূর্ণ চল্লিশ দিন হয়ে গেলো। যাওয়ার সময় মূসা তার ভাই হারুনকে বললোঃ আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সঠিক কাজ করতে থাকবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথে চলবে না।[২৬]

বাইবেলে এর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়: পরে মিশরের উপরে এক নতুন রাজা উঠলেন, তিনি যোসেফকে জানতেন না। তিনি আপন প্রজাদিগকে বললেন দেখ, আমাদের অপেক্ষা ঈসরায়েল সন্তানদের জাতি বহু সংখ্যক ও বলবান। আইস, আমরা তাদের সাথে বিবেচনা পূর্বক ব্যবহার করি। পাছে তারা বেড়ে উঠে এবং যুদ্ধ উপস্থিত হলে তারাও শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং এদেশ হতে প্রস্থান করে। অতএব তারা ভার বহন দ্বারা তাদেরকে দু:খ দিবার জন্য তাদের উপরে কার্য শাসকদিগকে নিযুক্ত করল। আর তারা ফেরাউনের নিমিত্ত ভান্ডারের নগর পিথোম ও রামিষেষ গাথল। কিন্তু তারা তাদের দ্বারা যত দু:খ পেল ততই বৃদ্ধি পেতে ও ব্যাপ্ত হতে লাগল।

তাই ইসরাইল সন্তানদের বিষয়ে তারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হল। আর মিশরিয়রা নির্দয়তাপূর্বক ইসরাইল সন্তানদিগকে দাস্যকর্ম করাল। তারা কর্দম, ইস্টক ও ক্ষেত্রের সমস্ত কার্যে কঠিন দাস্যকর্ম দ্বারা তাদের প্রাণ তিক্ত করতে লাগল। তারা তাদের দ্বারা যে দাস্যকর্ম করাত সে সমস্ত নির্দয়তাপূর্বক করাত। পরে মিশরের রাজা শিফ্রা ও পুয়া নামে দুই ইব্রিয়া ধাত্রিকে একথা বললেন, যে সময়ে তোমরা ইব্রীয় স্ত্রীলোকদেরকে ধাত্রী কার্য করবে ও তাদেরকে প্রসব আধারে দেখবে, যদি পুত্র সন্তান হয়, তাকে বধ করবে; আর যদি কন্যা সন্তান হয়, তাকে জীবিত রাখবে।[২৭]

এ থেকে জানা যায়, হযরত ইউসূফ (আ) এর যুগ অতিক্রান্ত হবার পর মিশরে একটি জাতীয়তাবাদী বিপ্লব সাধিত হয়েছিল এবং কিবতীদের হাতে যখন পূর্ণর্বার শাসন ক্ষমতা এসেছিল তখন নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার বনী ঈসরাইলের শক্তি নির্মূল করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এ ব্যাপারে শুধুমাত্র বনী ঈসরাঈলকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত এবং তাদেরকে নিকৃষ্ট ধরণের সেবাকর্ম নির্দিষ্ট করেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি বরং এ থেকে আরো অগ্রসর হয়ে তাদের ছেলেদের হত্যা করে মেয়েদের জীবিত রাখার নীতি অবলম্বন করা হয়, যাতে করে তাদের মেয়েরা ধীরে ধীরে কিবতীদের অধীনে এসে যেতে থাকে এবং তাদের থেকে ইসরাঈলের পরিবর্তে কিবতীদের বংশ বিস্তার লাভ করে। তালমূদ এর আরো বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিয়েছে যে, হযরত ইউসূফ (আ)- এর ইন্তিকালের সময় থেকে একশতকের কিছু বেশি সময় অতিক্রান্ত হবার পর থেকে এ বিপ্লব আসে।

---

২৬. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১৪২

২৭. প্রাগুক্ত, যাত্রাপুস্তক- ১: ৮-১৬

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে বলা হয়েছে, নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার প্রথমে বনী ইসরাঈলকে তাদের উর্বর কৃষিক্ষেত্র, বাসগৃহ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন সরকারী পদ থেকে বেদখল করে দেয়। এরপরও যখন কিবতী শাসকরা অনুভব করে যে, বনী ইসরাঈল ও তাদের সমধর্মাবলম্বী মিশরীয়রা যথেষ্ট প্রভাবশালী তখন তারা ইসরাঈলীদেরকে লাঞ্ছিত ও হীনবল করতে থাকে এবং তাদের থেকে কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে সামান্য পারিশ্রমিক বা বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ আদায় করতে থাকে। কুর'আনে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, "তারা মিশরের অধিবাসীদের একটি গোষ্ঠিকে লাঞ্ছিত ও হীনবল করতো" এ বক্তব্য সেই উক্তির ব্যাখ্যা বিবেচিত হতে পারে। আর সূরা আল বাকারায় আল্লাহ্ যে বলেছেন, ফেরাউনের বংশধররা বনী ইসরাঈলদের কঠোর শাস্তি দিতো। (يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ)[২৮] এরও ব্যাখা এটিই।

কিন্তু বাইবেল ও কোরআনে এ ধরণের কোন আলোচনা নেই যাতে বলা হয়েছে যে, কোন জোতিষী ফেরাউনকে বলেছিল, বনী ইসরাঈলে একটি শিশু জন্ম নেবে, তার হাতে ফেরাউনী কর্তৃত্বের মৃত্যু ঘটবে এবং এ বিপদের পথ রোধ করার জন্য ফেরাউন ইসরাঈলীদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। অথবা ফেরাউন কোন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছিল এবং তার তা'বীর এভাবে দেয়া হয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ ধরণের বিশেষ গুণ বিশিষ্ট শিশু জন্ম নেবে। তালমূদ ও অন্যান্য ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে এ কাহিনী আমাদের মুফাসসিরগণ উদ্বৃত করেছেন।[২৯]

মিশর থেকে বের হবার পর বনী ইসরাঈলীদের দাসসুলভ জীবনের অবসান ঘটলো। তারা একটি স্বাধীন জাতির মর্যাদা লাভ করলো। এ সময় বনী ইসরাঈলীদেরকে একটি শরীয়াত দান করার জন্যে মহান আল্লাহর হুকুমে মূসা (আ) কে সিনাই পাহাড়ে ডাকা হলো। কাজেই ওপরে যে ডাকের কথা বলা হয়েছে তা ছিল এ ব্যাপারে প্রথম ডাক। আর এর জন্যে চল্লিশ দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করার বিশেষ কারণ ছিল। হযরত মূসা চল্লিশ দিন পাহাড়ের ওপর কাটাবেন। রোযা রাখবেন। দিনরাত ইবাদত-বন্দেগী চিন্তা-গবেষণা করে মন-মস্তিষ্ককে একমূখী ও একনিষ্ঠ করবেন এবং এভাবে তার ওপর যে গুরুত্বপূর্ণ বাণী নাযিল হতে যাচ্ছিল তাকে যথাযতভাবে গ্রহণ করার যোগ্যতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারবেন।

এ থেকে অনুমান করা যায়, ঘুঁষি খেয়ে মিশরীয়টি যখন পড়ে গেল এবং পড়ে গিয়ে মারা গেল তখন কী ভীষণ লজ্জা ও শংকার মধ্যে হযরত মুসার মুখ থেকে কথা গুলো বের হয়ে গিয়ে থাকবে। হত্যা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘুঁষি মারাও হয়নি। কেউ এটা আশাও করেনি, একটি ঘুঁষি খেয়েই একজন সুস্থ সবল লোক মারা যাবে। তাই হযরত মুসা বললেন, এটা শয়তানের কোন খারাপ পরিকল্পনা বলে মনে হচ্ছে। সে একটি বড় বিপর্যয় ঘটাবার জন্য আমার হাত দিয়ে একাজ করিয়েছে। ফলে আমার বিরুদ্ধে একজন ইসরাঈলীকে সাহায্য করার জন্য একজন কিবতীকে হত্যা করার অভিযোগ আসবে এবং শুধু আমার বিরুদ্ধে নয় বরং সমগ্র ইসরাঈলী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মিসরে একটি বিরাট হাংগামা সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারে বাইবেলের বর্ণনা কুর'আন থেকে ভিন্ন। বাইবেল হযরত মূসার বিরুদ্ধে সেচ্চাকৃত হত্যার আভিযোগ এনেছে। তার বর্ণনা মতে মিশরীয় ও ইসরাঈলীকে লড়াই করতে দেখে হযরত মূসা "এদিক ওদিক চহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ মিশরীয়কে বধ করে বালির মধ্যে পুতে রাখলেন।"[৩০]

---

২৮. আল-কুর'আন, ২ঃ ৪৯

২৯. জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, নিবন্ধ "মুসা এবং The Talmud selections. চ.১২৩-২৪

৩০. প্রাগুক্ত, যাহা পুস্তক ২:১২

Dhaka University Institutional Repository

তালমূদেও একথা বলা হয়েছে। এখন বনী ইসরাঈল কিভাবে নিজেদের মনীষীদের চরিত্রে নিজেরাই কলংক লেপন করেছে এবং কুর'আন কিতাবে তাঁদের ভূমিকা পরিচ্ছন্ন ও কলঙকমুক্ত করেছে তা যে কোন ব্যাক্তি বিচার করতে পারে। সাধারণ বিবেক বুদ্ধিও এ কথা বলে, একজন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যাক্তি, পরবর্তীকালে যাঁকে হতে হবে একজন মহীমান্বিত পয়গম্বর এবং মানুষকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি মর্যাদাশালী আইন ব্যাবস্থা দান করা হবে যাঁর দায়িত্ব, তিনি এমন একজন অন্ধ জাতীয়তাবাদী হতে পারেন না যে, নিজের জাতির একজনকে অন্য জাতির কোন ব্যাক্তির সাথে মারামারি করতে দেখে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে সেচ্ছায় বিপক্ষীয় ব্যক্তিকে মেরে ফেলবেন! ইসরাইলীকে মিশরীয়দের কবজায় দেখে তাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য হত্যা করা যে, বৈধ হতে পারে না, তা বলাই নিস্প্রয়োজন।[৩১]

হযরত মূসা (আ) এ নির্দেশ পালন করার উদ্দেশ্যে সিনাই পাহাড়ে যাবার সময় বর্তমান মানচিত্রে বনী সালেহ ও সিনাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ওয়াদি আল শায়খ (আল শায়খ উপত্যকা) নামে অভিহিত স্থানটিতে বনী ইসরাঈলকে রেখে গিয়েছিলেন। এ উপত্যকার যে অংশে বনী ইসরাঈল তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করেছিল বর্তমানে তার নাম আল রাহা প্রান্তর। উপত্যকার এক প্রান্তে একটি ছোট পাহাড় অবস্থিত। স্থানীয় বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সালেহ (আ) সামূদের এলাকা থেকে হিজরত করে এখানে এসে অবস্থান করেছিলেন। বর্তমানে সেখানে তাঁর স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে জাবাল-ই-হারুন নামে আর একটি ছোট পাহাড়। কথিত আছে, হযরত হারুন (আ) বনী ইসরাঈলদের বাছুর পূজায় অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে এখানে এসে বসেছিলেন।

তৃতীয় দিকে রয়েছে সিনাইয়ের উঁচু পর্বত! এর ওপরের ভাগ সবসময় মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। এর উচ্চতা ৭৩৫৯ ফুট। এ পাহাড়ের শিখর দেশে অবস্থিত একটি গুহা আজো তীর্থ যাত্রীদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে আছে। এ গুহায় হযরত মূসা (আ) চিল্লা দিয়েছিলেন অর্থাৎ চল্লিশ দিন রোযা রেখে দিনরাত আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী ও চিন্তা-গবেষণায় কাটিয়েছিলেন। এর কাছেই রয়েছে মুসলমানদের একটি মসজিদ ও খৃষ্টানদের একটি গীর্জা। অন্যদিকে পাহাড়ের পাদদেশে রোম সম্রাট জস্টিনিনের আমলের একটি খানকাহ আজো সশরীরে বিরাজ করছে।[৩২]

বনী ইসরাঈলের জন বসতি মিশরের কোন এক জায়গায় একসাথে ছিল না। বরং দেশের সমস্ত শহরে ও পল্লীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। বিশেষ করে মামফিস (MAMPHIS) থেকে রামসীস পর্যন্ত এলাকায় তাদের বৃহত্তর অংশ বাস করতো। এ এলাকা জুশান নামে পরিচিত ছিল। কাজেই হযরত মূসাকে যখন হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে, তোমাকে এবার বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে বের হয়ে যেতে হবে, তখন সম্ভবত তিনি দেশের সমস্ত বনী ইসরাঈলী বসতিতে সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে হিজরত করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এজন্য হয়তো একটি রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সে রাতে প্রত্যেক জনপদের মুহাজিরদের বের হয়ে পড়তে হবে। রাতের বেলা হিজরত করার জন্য বের হবার নির্দেশ কেন দেয়া হয়েছিল "তোমাদের পিছু নেয়া হবে" উক্তি থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ ফেরাউনের সেনাবাহিনী তোমাদের পিছনে ধাওয়া করার করার আগে রাতের মধ্যে তোমরা নিজেদের পথে অন্তত এতোদূর অগ্রসর হয়ে যাওয়ার ফলে তারা অনেক পিছনে পড়ে যায়।[৩৩]

---

৩১. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, সীরাত বিশ্বকোষ, সকল খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৩, খ. ৩, পৃ. ৮১

৩২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৪৭৪)

৩৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৯৬১)

Dhaka University Institutional Repository

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ -

ফেরাউন বললোঃ "তুমি যদি কোন প্রমাণ এনে থাকো এবং নিজের দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী হও, তাহলে তা পেশ করো।"[৩৪]

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ -

মূসা নিজের লাঠিটি ছুড়ে দিল। অমনি তা একটি জ্বলজ্যান্ত অজগরের রূপ ধারণ করলো।[৩৫]

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ -

সে নিজের হাত বের করলো তৎক্ষণাত দেখা গেলো সেটি দর্শকদের সামনে চমকাচ্ছে।[৩৬]

হযরত মূসা যে বিশ্ব জাহানের শাসক ও সর্বময় কর্তৃত্বশালী আল্লাহর প্রতিনিধি, একথার প্রমাণ স্বরূপ এ দুটি নিদর্শন তাকে দেয়া হয়েছিল। ইতিপূর্বেও আমি বলেছি যে, নবী রসূলগণ যখনই নিজেদেরকে রব্বুল আলামীনের প্রেরিত হিসেবে পেশ করেছেন তখনই লোকদের পক্ষ থেকে এ দাবীই জানানো হয়েছে যে, সত্যই যদি তুমি রব্বুল আলামীনের প্রতিণিধি হয়ে থাকো তাহলে তোমার মাধ্যমে এমন কিছু ঘটনার প্রকাশ হওয়া দরকার, যাতে প্রাকৃতিক আইনের সাধারণ নীতিমালার ব্যতিক্রম ঘটে এবং যার থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রকাশ হয় যে, বিশ্বপ্রভূ তোমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে নিজের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিদর্শন হিসেবে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন।

এ দাবীর প্রেক্ষিতে নবীগণ বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়েছেন, যাকে কুর'আনের পরিভাষায় আয়াত ও কালাম শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় মুজিযা বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের মুজিযাকে যারা প্রাকৃতিক আইনের অধীনে উদ্ভূত সাধারণ ঘটনা গণ্য করার চেষ্টা করে তারা আসলে আল্লাহর কিতাবকে মানার ও না মানার মাঝামাঝি এমন একটি ভূমিকা গ্রহণ করে, যাকে কোনক্রমেই যুক্তিসংগত মনে করা যেতে পারে না। কারণ কুর'আন যেখানে দ্ব্যর্থহীন প্রাকৃতিক আইন বিরোধী ঘটনা উল্লেখ করছে সেখানে পূর্বাপর আলোচনার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারণ করে তাকে একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা চালানো নিছক একটি উদ্ভট বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। এর প্রয়োজন হয় একমাত্র এমন ধরনের লোকদের যারা একদিকে প্রাকৃতিক আইন বিরোধী ঘটনার উল্লেখকারী কোন কিতাবের প্রতি ঈমান আনতে চায় না আবার অন্যদিকে জন্মগতভাবে পৈতৃক ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে এমন একটি কিতাবকে অস্বীকার করতে চায় না। যাতে প্রাকৃতিক আইন বিরোধী ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

মুজিযার ব্যাপারে আসল ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর প্রশ্ন কেবল একটিই এবং সেটি হচ্ছে, এই যে, মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাকে একই আইনের ভিত্তিতে সচল করে দেবার পর কি নিজে স্থবির হয়ে বসে পড়েছেন এবং বর্তমানে বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনায় কখনো কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারেন না? অথবা তিনি কার্যত নিজের সাম্রাজ্যের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নিজের কর্তৃত্বাধীনে রেখেছেন, প্রতি মুহূর্তে এ বিশ্ব রাজ্যে তার বিধান জারি হচ্ছে এবং সর্বক্ষণ তিনি সকল বস্তুর আকৃতি প্রকৃতিতে এবং ঘটনাবলী স্বাভাবিক গতিধারায় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে যেভাবে এবং যখন চান পরিবর্তন করেন? এরই প্রশ্নের জওয়াবে যারা প্রথম মতটি পোষণ করেন তাদের পক্ষে মুজিযার স্বীকৃতি দেয়া অসম্ভব।

৩৪. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১০৬

৩৫. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১০৭

৩৬. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

কারণ আল্লাহ সম্পর্কে তারা যে ধারণা পোষণ করেন তার সাথে মুজিযা খাপ খায় না। এবং বিশ্ব জাহানের ব্যাপারে তাদের যে ধারণা তার সাথে ও না। এ ধরনের লোকদের পক্ষে কুর'আনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে পরিষ্কারভাবে কুর'আন অস্বীকার করাই সংগত মনে হয়। কারণ কুর'আন তো আল্লাহ সম্পর্কিত প্রথমোক্ত ধারণাটিকে মিথ্যা ও শেষোক্ত ধারণাটিকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই নিজের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা ব্যয় করেছে।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি কুর'আনের উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণে নিশ্চিন্তে হয়ে শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করেন তার জন্যে মুজিযার তাৎপর্য ও স্বরূপ অনুধাবন করা এবং তাকে স্বীকার করে নেয়া মোটেই কঠিন হয় না।সোজা কথায় বলা যায়, কেউ যদি বিশ্বাস করে অজগর সাপের জন্ম যেভাবে হচ্ছে কেবলমাত্র সেভাবেই তার জন্ম হতে পারে,অন্য কোন পন্থায় তাকে জন্ম দেবার ক্ষমতা আল্লাহর নেই, তাহলে সে একটি লাঠি অজগরে পরিণত হয়েছে বা অজগর লাঠিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এ মর্মে কেউ খবর দিলে তা বিশ্বাস করতে পারবে না! পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে আল্লাহর হুকুমে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং যে বস্তকে আল্লাহ যেভাবে চান জীবন দান করতে পারেন,তার কাছে আল্লাহর হুকুমে লাঠির অজগরে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া ঠিক তেমনি স্বাভাবিক সত্য ব্যাপার যেমন সেই একই আল্লাহর হুকুমে ডিমের মধ্যে কতিপয় প্রাণহীন উপাদানের অজগরে পরিণত হওয়া।একটি ঘটনা সবসময় ঘটে চলছে এবং অন্যটি মাত্র তিনবার ঘটেছে, শুধু মাত্র এতটুকু পার্থক্যের জন্যে একটি ঘটনাকে স্বাভাবিক ও অন্যটিকে অস্বাভাবিক বলা চলে না।[৩৬]

قَالَ المَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَـذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ -

এ দৃশ্য দেখে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের প্রধানরা পরস্পরকে বললোঃ নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি একজন অত্যন্ত দক্ষ যাদুকর।[৩৮]

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ -

তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বে-দখল করতে চায়। এখন তোমরা কি বলবে বলো?[৩৯]

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একটি পরাধীন জাতির এক সহায় -সম্বলহীন ব্যক্তি যদি হঠাৎ একদিন ফেরাউনের মত মহা পরাক্রান্ত বাদশাহর কাছে চলে যান। সিরিয়া থেকে লিবিয়া পর্যন্ত এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে ইথিয়োপিয়া পর্যন্ত বিশাল ভূভাগের ওপর যার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত, অধিকন্তু সে নিজেকে জনগণের ঘাড়ের ওপর দেবতা হিসেবেও সওয়ার হয়ে আছে। তাহলে নিছক তার একটি লাঠিকে অজগরে পরিণত করে দেয়ার কাজটি কেমন করে এত বড় একটি সাম্রাজ্যকে আতংকিত করে তোলে। কিভাবেই বা এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে,এ ধরনের একজন মানুষ একাকীই মিশর রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে দেবেন এবং শাসক সম্প্রদায়সহ সমগ্র রাজ পরিবারকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে দেবেন? তারপর ঐ ব্যক্তি যখন কেবলমাত্র নবুওয়াতের দাবী এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দেবার দাবী উত্থাপন করেছিলেন আর এ ছাড়া অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক আলোচনাই করেননি তখন এ রাজনৈতিক বিপ্লবের আশংকা দেখা দিয়েছিল কেমন করে?

---

৩৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৪৭৬

৩৮. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১০৯

৩৯. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১১০

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, মূসা (আ)- এর নবুওয়াতের দাবীর মধ্যেই এ তাৎপর্য নিহিত ছিল যে, তিনি আসলে গোটা জীবন ব্যবস্থাকে সামগ্রীক ভাবে পরিবর্তিত করতে চান। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও নিশ্চিতভাবে এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যক্তির নিজেকে বিশ্ব প্রভু আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এ দাঁড়ায় যে, তিনি মানুষের কাছে নিজের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের দাবী জানাচ্ছে। কারণ রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি কখনো অন্যের আনুগত ও অন্যের প্রজা হয়ে থাকতে আসে না। বরং তিনি আসেন অন্যকে ও প্রজায় পরিণত করতে। কোন কাফেরের শাসনাধিকার মেনে নেয়া তার রিসালাতের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এ কারণেই হযরত মূসার মুখ থেকে রিসালাতের দাবী শুনার সাথে সাথেই ফেরাউন ও তার রাষ্ট্র পরিচালকবর্গের মনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের আশংকা দেখা দেয়। তবে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে যখন তার এক ভাই ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী ছিল না এবং কেবল মাত্র একটি সর্পে রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা সম্পন্ন লাঠি ও একটাই ঔজ্জ্বল্য বিকীরণকারী হাত ছাড়া তাঁর রসূল হিসেবে নিযুক্তির আর কোন প্রমাণ ছিল না তখন মিসরের রাজ দরবারে তাঁর এ দাবীকে এত গুরুত্ব দেয়া হলো কে? আমার মতে এর দুটি বড় বড় কারণ রয়েছে।এক, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে ফেরাউন ও তার সভাসদরা পুরোপুরি অবগত ছিল। তার পবিত্র -পরিচ্ছন ও অনমনীয় চরিত্র। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও যোগ্যতা এবং জন্মগত নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার কথা তাদের সবার জানা ছিল।

তালমূদ ও ইউসীফূসের বর্ণনা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়, হযরত মূসা (আ) এসব জন্মগত যোগ্যতা ছাড়াও ফেরাউনের গৃহে লাভ করেছিলেন বিভিন্ন জাগতিক বিদ্যা, দেশ শাসন ও সমর বিধ্যায় পারদর্শিতা। রাজপরিবারের সদস্যদের এসব শিক্ষা দেয়ার রেওয়াজ ছিল। তাছাড়া ফেরাউনের গৃহে যুবরাজ হিসেবে অবস্থান করার সময় আবিসিনিয়ার সামরিক অভিযানে গিয়েও তিনি নিজেকে একজন সেনাপতি প্রমাণ করতে সক্ষত হয়েছিলেন। তদুপরি রাজ প্রসাদে জীবন যাপন এবং ফেরাউনী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতাধীনে নির্বাহী কর্তৃত্বের আসনে বসার কারণে যে সামান্য পরিমাণ দুর্বলতা তাঁর মধ্যে সৃস্টি হয়ে গিয়েছিল। তাও মাদায়েন এলাকায় আট দশ বছর মরুচারী জীবন যাপন ও ছাগল চরাবার কঠোর দায়িত্ব পালনের করণে দূর হয়ে গিয়েছিল। কাজেই আজ যিনি ফেরাউনের দরবারে দন্ডায়মান, তিনি আসলে এক বয়স্ক, বিচক্ষণ ও তেজোদ্দীপ্ত দরবেশে সম্রাট। তিনি নবুওয়াতের দাবীদার হিসেবে তার সমানে উপস্থিত। এরূপ ব্যক্তির কথাকে হাওয়াই ফানুস মনে করে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। এর দ্বিতীয় কারণটি ছিল এই যে, লাঠি ও শ্বেতহস্তের মুজিযা দেখে ফেরাউন ও তার সভাসদরা অত্যন্ত অভিভূত, বিচলিত ও ভীত হয়ে পড়েছিল। তাদের প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, এ ব্যক্তির পেছনে নিশ্চয়ই কোন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির সহায়তা রয়েছে।

তাদের একদিকে হযরত মূসাকে যাদুকর বলা আবার অন্যদিকে তিনি তাদেরকে এ দেশের শাসন কর্তৃত্ব থেকে উৎখাত করতে চান বলে আশংকা প্রকাশ করা- এ দুটি বিষয় পরস্পরের বিপরীত। আসলে নবুওয়াতের প্রথম প্রকাশ তাদেরকে কিংকর্তব্য বিমূঢ় করে দিয়েছিল। তাদের উল্লেখিত মনোভাব, বক্তব্য ও কার্যক্রম তারই প্রমাণ। সত্যই যদি তারা হযরত মূসাকে যাদুকর মনে করতো, তাহলে তিনি কোন রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাবেন এ আশংকা তারা কখনো করতো না। কারণ যাদুর জোরে আর যাই হোক- দুনিয়ার কোথাও কখনো কোন রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়নি।[৪০]

---

৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৪৭০

Dhaka University Institutional Repository

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ -

তখন তারা সবাই ফেরউনকে পরামর্শ দিলো, তাকে ও তার ভাইকে অপেক্ষারত রাখুন এবং নগরে নগরে সংগ্রাহক পাঠান।[৪১]

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ -

তারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে।[৪২]

ফেরাউনের সভাসদদের এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট ভাবে একথা জানা যায় যে, আল্লাহর নিদর্শন ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্য তাদের কাছে একেবারেই পানির মত পরিষ্কার ছিল। তারা জানতো, আল্লাহর নিদর্শনের সাহায্যে প্রকৃত ও সত্যিকার পরিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। আর যাদু নিছক দৃষ্টিশক্তি ও মনকে প্রভাবিত করে বস্তুর মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের পরিবর্তন অনুভব করায়। তাই তারা হযরত মূসার রিসালাতের দাবী প্রত্যাখ্যান করার জন্যে বলে, এ ব্যক্তি যাদুকর। অর্থাৎ লাঠি আসলে সাপে পরিণত হয়নি, কাজেই তাকে আল্লাহর নিদর্শন বলে মেনে নেয়া যাবে না। বরং সেটি যেন সাপের মত বলে আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে প্রত্যেক যাদুকর এভাবেই তার তেলেসমাতি দেখিয়ে থাকে। তরপর তারা পরামর্শ দেয়, সারা দেশের শ্রেষ্ঠ দক্ষ যাদুকরদেরকে একত্র করা হোক এবং তাদের 'যাদুকরী শক্তি'র মাধ্যমে লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করে লোকদের দেখানো হোক। এর ফলে নবী সুলভ এ মুজিযা দেখে সাধারণ লোকদের মনে যে উচ্চতর ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা পুরোপুরি দূর না হলেও কমপক্ষে সন্দেহ রূপান্তরিত করা যাবে।[৪৩]

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ -

অবশেষে যাদুকরেরা ফেরাউনের কাছে এলো। তারা বললোঃ "যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে অবশ্যি এর প্রতিদান পাবো তো?" [৪৪]

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ -

ফেরাউন জবাব দিলোঃ "হাঁ তাছাড়া তোমরা আমার দরবারের ঘনিষ্ঠ জনেও পরিণত হবে।"[৪৫]

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ -

তখন তারা মূসাকে বললোঃ "তুমি ছুড়ঁবে না, না আমরা ছুঁড়বো?"[৪৬]

---

৪১. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১১১

৪২. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১১২

৪৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা ৫ মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৪৭৭

৪৪. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১১৩

৪৫. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১১৪

৪৬. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

قَالَ اَلْقُوْا فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ -

মূসা জবাব দিলোঃ "তোমরাই ছোঁড়ো।" তারা যখনই নিজেদের যাদুর বাণ ছুঁড়লো তখনই তা লোকদের চোখে যাদু করলো, মনে আতংক ছড়ালো এবং তারা বড়ই জবরদস্ত যাদু দেখালো।[৪৭]

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ -

মূসাকে আমি ইংগিত করলাম, তোমার লাঠিটা ছুঁড়ে দাও। তার লাঠি ছোঁড়ার সাথে সাথেই তা এক নিমিষেই তাদের মিথ্যা যাদু কর্মগুলোকে গিলে ফেলতে লাগলো।[৪৮]

যাদুকরেরা যেসব রশি ও লাঠি ছুঁড়ে ফেলার পর সেগুলো বিভিন্ন প্রকারের সাপ ও অজগরের মত দেখাচ্ছিল হযরত মূসার লাঠি সেগুলোকে গিলে খেয়ে ফেলেছিল, এ ধারণা করা ঠিক হবে না। কুর'আন এখানে যা কিছু বলছে তা হচ্ছে, এই যে, হযরত মূসার লাঠি সাপে পরিণত হয়ে তাদের যাদুর প্রতারণা জাল ছিন্ন করতে শুরু করে। অর্থাৎ এ সাপ যেদিকে গেছে সেদিকেই তাদের যাদুর প্রভাবে যেসব লাঠি ও রশি সাপের মত হেলেদুলে নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছিল তাদের সব প্রভাব খতম করে দিয়েছে এবং তার একটি মাত্র চক্করে যাদুকরদের প্রত্যেক সর্প অবয়বধারী লাঠি ও রশি সংগে সংগেই আগের মত লাঠি ও রশিতে পরিণত হয়ে গেছে।[৪৯]

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

এভাবে যা সত্য ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো এবং যা কিছু তারা বানিয়ে রেখেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।[৫০]

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ -

ফেরাউন ও তার সাথীরা মোকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং (বিজয়ী হবার পরিবর্তে) উল্টো তারা লাঞ্ছিত হলো।[৫১]

وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ -

আর যাদুকরদের অবস্থা হলো এই -যেন কোন জিনিস ভিতর থেকে তাদেরকে সিজদানত করে দিলো।[৫২]

قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

তারা বলতে লাগলোঃ "আমরা ঈমান আনলাম বিশ্বজাহানের রবের প্রতি।[৫৩]

---

৪৭. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১১৬
৪৮. স আল-কুর'আন, ৭ঃ ১১৭
৪৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৪৭৬
৫০. আল-কুর'আন, ৭ঃ১১৮
৫১. আল-কুর'আন, ৭ঃ১১৯
৫২. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১২০
৫৩. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১২১

Dhaka University Institutional Repository

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ -

যিনি মূসা ও হারুণেরও রব।"[৫৪]

قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَـٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ -

ফেরাউন বললোঃ "আমার অনুমতি দেবার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই এটা কোন গোপন চক্রান্ত ছিল। তোমরা এ রাজধানীতে বসে এ চক্রান্ত এঁটেছো এর মালিকদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে। বেশ, এখন এর পরিণাম তোমরা জানতে পারবে।[৫৫]

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ -

তোমাদের হাত -পা আমি কেটে ফেলবো বিপরীত দিক থেকে এবং তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করবো।"[৫৬]

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ -

তারা জবাব দিলোঃ "সে যা হোক আমাদের রবের দিকেই তো আমাদের ফিরতে হবে।[৫৭]

وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ -

তুমি যে ব্যাপারে আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছো, তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমাদের রবের নিদর্শনসমূহ যখন আমাদের সামনে এসেছে তখন আমরা তা মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আমাদের সবর দান করো এবং তোমার আনুগত্য থাকা অবস্থায় আমাদের দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও।"[৫৮]

পরিস্থিতি পাল্টে যেতে দেখে ফেরাউন তার শেষ চালটি চালালো। সে এই সমগ্র ব্যাপারটিকে হযরত মূসা (আ) ও যাদুকরদের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করলো, তারপর যাদুকরদেরকে শারীরিক নির্যাতন ও হত্যার হুমকি দিয়ে তাদের থেকে নিজের এ দোষারুপের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করলো। কিন্তু এবারে এ চালটিরও উল্টো ফল হলো। যাদুকররা নিজেদেরকে সব রকমের শাস্তির জন্যে পেশ করে একথা প্রমাণ করে দিল যে, মূসা (আ) কে সত্য বলে স্বীকার করা ও তাঁর ওপর তাদের ঈমান আনাটা কোন ষড়যন্ত্রের নয় বরং সত্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতির ফল। কাজেই তখন সত্য ও ইনসাফের যে প্রহসন সে সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল তা পরিহার করে সোজাসুজি জুলুম ও নির্যাতনের পথে এগিয়ে আসা ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

---

৫৪. আল-কুর'আন, ৭ : ১২২
৫৫. আল-কুর'আন, ৭ : ১২৩
৫৬. আল-কুর'আন, ৭ : ১২৪
৫৭. আল-কুর'আন, ৭ : ১২৫
৫৮. আল-কুর'আন, ৭ : ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসংগে এ বিষয়টিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঈমানের স্ফলিংগ যাদুকরদের চরিত্রের কি বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই এ যাদুকরদের কী দাপট ছিল! নিজেদের পৈতৃক ধর্মের সাহায্যার্থে তারা নিজ নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে এসেছিল।

তারা ফেরাউনকে জিজ্ঞেস করছিল, আমরা যদি মূসার আক্রমণ থেকে নিজেদের ধর্মেকে রক্ষা করতে পারি তাহলে সরকার আমাদের পুরস্কৃত করবে তো? আর এখন ঈমানের নিয়ামত লাভ করার পর তাদেরই সত্যপ্রীতি, সত্য নিষ্ঠা ও দৃঢ়ত এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে যে বাদশাহর সামনে তারা লোভীর মত দুহাত পেতে দিয়েছিল এখন তার প্রতাপ প্রতিপত্তি ও দর্পকে নির্ভয়ে পদাঘাত করতে লাগলো। সে যে ভয়াবহ শাস্তি দেবার হুমকি দিচ্ছিল তা বরদাশত করার জন্যে তারা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে সত্যের দরজা তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল প্রাণের বিনিময়ে ও তাকে পরিত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না।[৫৯]

وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

ফেরাউনকে তার জাতির প্রধানরা বললোঃ "তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে এমনিই ছেড়ে দেবে যে, তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াক এবং তোমার ও তোমার মাবুদের বন্দেগী পরিত্যাগ করুক? "ফেরউন জবাব দিলঃ "আমি তাদের পুত্রদের হত্যা করবো এবং তাদের কন্যাদের জীবিত রাখবো। আমরা তাদের ওপর প্রবল কর্তৃত্বের অধিকারী।"[৬০]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত মূসা (আ) এর জন্মের পূর্বে দ্বিতীয় রামেসাসের আমলে নির্যাতনের একটা যুগ অতিবাহিত হয়। আর নির্যাতনের দ্বিতীয় যুগটি শুরু হয় হযরত মূসার নবুওয়াত লাভের পর। এ উভয় যুগেই বনী ইসরাঈলেরদের ছেলেদের হত্যা করা এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখা হয়।এভাবে পর্যায়ক্রমে তাদের বংশধারা বিলুপ্ত করার এবং এ জাতিটিকে অন্যজাতির মধ্যে বিলিন করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৬ সালে প্রাচীন মিসরের ধ্বংসাবশেষ খনন করার সময় সম্ভবত এ যুগেরই একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। তাতে এ মিনফাতাহ ফিরাউন নিজের কৃতিত্ব ও বিজয় ধারা বর্ণনা করার পর লিখেছে, আর ইসরাঈলকে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে । তার বীজও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।[৬১]

---

৫৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৪৭৬

৬০. আল-কুর'আন, ৭ : ১২৭

৬১. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৪৭১

Dhaka University Institutional Repository

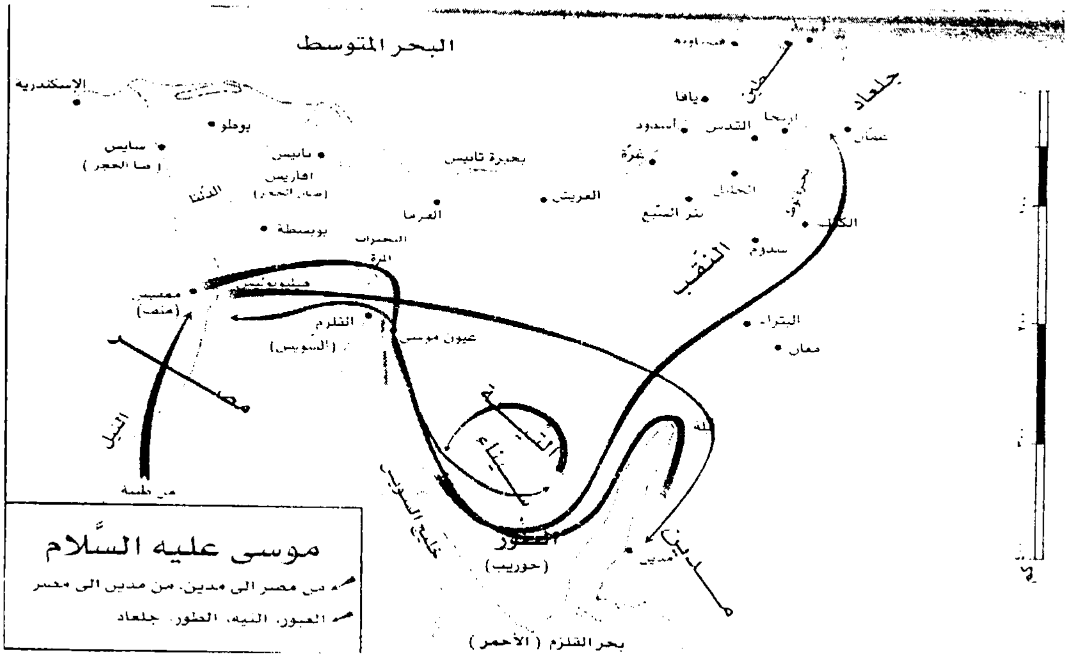

মুসা (আ) মিশর থেকে মাদায়েন, মাদায়েন থেকে মিশর গমনের স্থান

Dhaka University Institutional Repository

ফিলিস্তিন

ফিলিস্তিন সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'বরকতময় জমীন' এর কথা উল্লেখ করে এর মাধ্যমে ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও জর্ডানকে বুঝিয়েছেন। কেননা এ এলাকাগুলি অসংখ্য নবীদের আবাসভূমি।

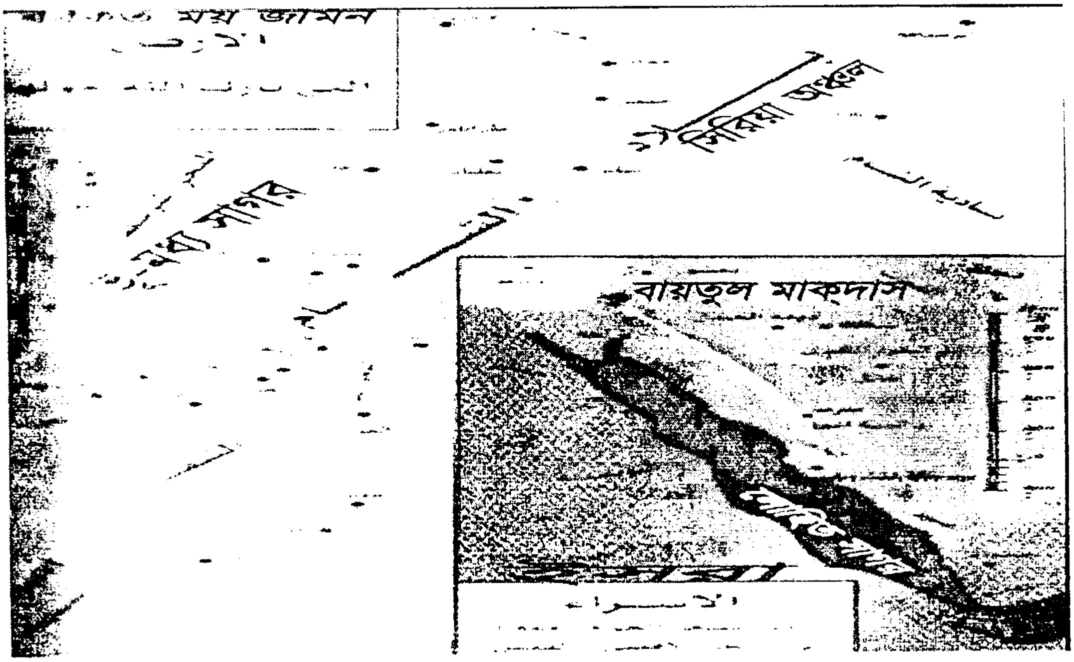

বরকতময় স্থান তথা ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও জর্দান

সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে। তার বরকত তথা সমৃদ্ধি বস্তুগতও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনেরই। বস্তুগত দিক দিয়ে তা দুনিয়ার উর্বরতম এলাকাসমূহের অন্তরর্ভুক্ত। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দু'হাজার বছর থেকে তা থেকেছে আল্লাহর নবীগণের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার কোন এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক নবী আবির্ভুত হয়নি।

وَنَجَّيْنَٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَٰلَمِينَ -

আর আমি তাকে ও লূতকে বাঁচিয়ে এমন দেশের দিকে নিয়ে গেলাম যেখানে আমি দুনিয়াবাসীদের জন্য বরকত রেখেছিলাম।[৬২]

সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে। তার বরকত তথা সমৃদ্ধি বস্তুগতও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনেরই। বস্তুগত দিক দিয়ে তা দুনিয়ার উর্বরতম এলাকাসমূহের অন্তরভুক্ত। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দু'হাজার বছর থেকে তা থেকেছে আল্লাহর নবীগণের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার কোন এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক নবী আবির্ভূত হয়নি।[৬৩]

---

৬২. আল-কুর'আন, ২১ঃ ৭১

৬৩. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণকর অঞ্চল হল সিরিয়া। সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। আভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গম্বরগণের পীঠস্থান। অধিকাংশ নবী এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচুর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার।[৬৪]

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ -

আর সুলায়মানের জন্য আমি প্রবল বায়ু প্রবাহকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুম এমন দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যার মধ্যে আমি বরকত রেখেছিলাম আমি সব জিনিসের জ্ঞান রাখি।[৬৫]

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ -

আর তাদের জায়গায় আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম দুর্বল ও অধোপতিত করে রাখা মানব গোষ্ঠীকে। অতপর যে ভূখণ্ডে আমি প্রাচূর্যে ভরে দিয়েছিলাম, তার পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে তাদেরই করতালগত করে দিয়েছিলাম।এভাবে বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তোমার রবের কল্যানের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। কারণ তারা সবর করেছিল। আর ফেরাউন ও তার জাতি যা কিছু তৈরী করেছিল ও উঁচু করছিল তা সব ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।[৬৬]

বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি। কেউ কেউ এর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, বনী ইসরাঈলকে খোদ মিশরের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এ অর্থ গ্রহন করার স্বপক্ষে একে তো কুর'আনের ইংগিতগুলো যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট নয়। তদুপরি ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী থেকেও এর স্বপক্ষে কোন শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এ অর্থ গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত।[৬৭]

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ -

তাদের এবং যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগলোর মধ্যবর্তীস্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত করেছিলাম। তোমরা এসব জনপদে রাত্রে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।[৬৮]

"সমৃদ্ধ জনপদ" বলতে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন বুঝানো হয়েছে। কুর'আন মাজীদ সাধারণভাবে এ গুণবাচক শব্দ দিয়ে এর উল্লেখ করা হয়েছে।

"দৃশ্যমান জনপদ" হচ্ছে এমন সব জনবসতি যেগুলো সাধারণ রাজপথের পাশে অবস্থিত। কোন এক কোণায় আড়ালে অবস্থিত নয়। আবার এর এ অর্থও হতে পারে যে, এ জনবসতিগুলো বেশী দূরে দূরে অবস্থিত ছিল না এবং লাগোয়া ছিল। একটি জনপদের চিহ্ন শেষ হবার পর দ্বিতীয় জনপদ হয়ে যেত।

---

৬৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ৮৮২।

৬৫. আল-কুর'আন, ২১ঃ ৮১

৬৬. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১৩৭

৬৭. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ৪৬

৬৮. আল-কুর'আন, ৩৪ঃ ১৮

Dhaka University Institutional Repository

একটি আন্দাজ অনুযায়ী ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করার মানে হচ্ছে, ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত পুরা সফর অবিচ্ছিন্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হত, এর এক মঞ্জিল থেকে আর এক মঞ্জিলের দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা ছিল। জনবসতিপূর্ণ এলাকা সফর ও অনাবাদ মরু এলাকা সফরের মধ্যে এ পার্থক্য থাকে। মরুভুমির মধ্যে মুসাফির যতক্ষণ চায় চলে এবং যতক্ষণ চলে কোথাও এক জায়গায় ডেরা বাঁধে। পক্ষান্তের জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পথের এক জনপদ থেকে আর এক জনপদ পর্যন্ত এলাকার মধ্যকার দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা থাকে। পথিক পথে কোন কোন জায়গায় থামবে, দুপুরে কোথায় বিশ্রাম নেবে এবং কোথায় রাত কাটাবে এর পূর্ন কর্মসূচী পূর্বাহ্নেই তৈরি করে নিতে পারে।[৬৯]

- الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا – দ্বারা শামদেশ তথা সিরিয়ার গ্রামাঞ্চল বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শামদেশের জন্য বর্ণিত আছে।[৭০]

ভৌগোলিক অবস্থান

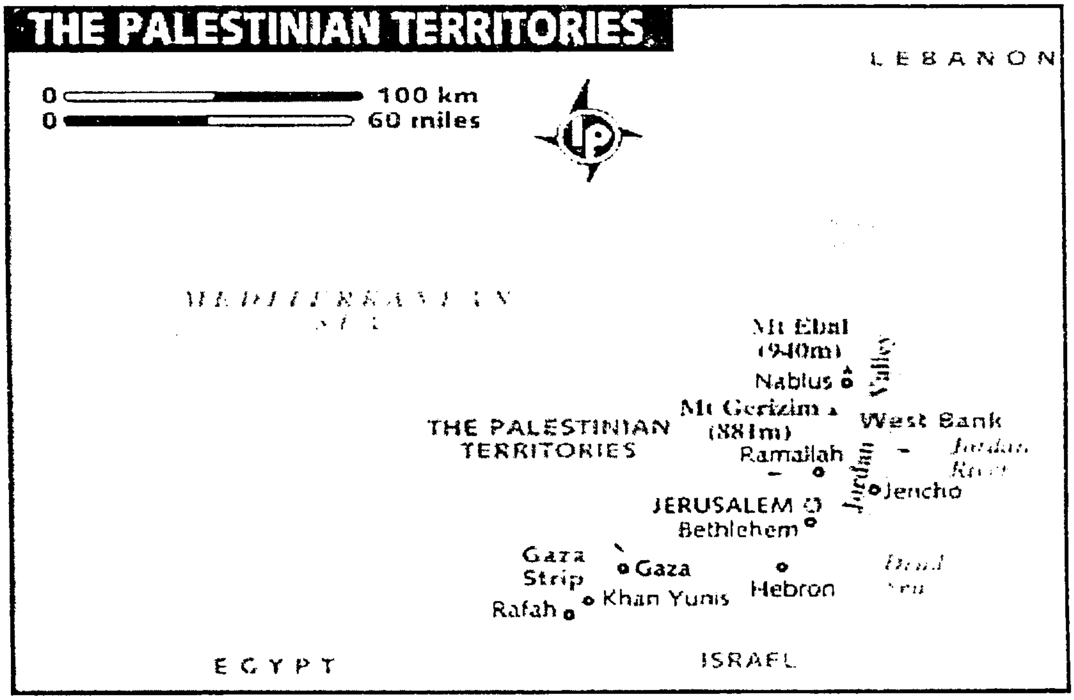

ফিলিস্তিনের মানচিত্র

৬৯. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ৪৭

৭০. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১১১০

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

আল্লাহ জবাব দিলেনঃ ঠিক আছে, তাহলে । ঐ দেশটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম। তারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে, এ নাফরমানদের প্রতি কখনো সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করো না।[৭১]

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বাইবেলের গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ ও যিহোশূয় পুস্তকে পাওয়া যাবে। এর সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছেঃ হযরত মূসা ফিলিস্তিনের অবস্থা জানার জন্য ফারান থেকে বনী ইসরাঈলের ১২ জন সরদারকে ফিলিস্তিন সফরে পাঠান। তারা ৪০ দিন সফর করার পর সেখান থেকে ফিরে আসেন। জাতির এক সাধারণ সমাবেশে তারা জানান যে, ফিলিস্তিন তো খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্য সামগ্রীর প্রাচুর্যে ভরা এক সুখী সমৃদ্ধ দেশ, এতে সন্দেহ নেই। "কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত শক্তিশালী, তাদের ওপর আক্রমণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সেখানে আমরা যত লোক দেখেছি তারা সবাই বড়ই দীর্ঘদেহী। সেখানে আমরা বনী ইনাককেও দেখেছি। তারা মহাপরাক্রমশালী ও দৃধর্ষ। তরা বংশ পরস্পরায় পরাক্রমশালী। আর আমরা তো নিজেদের দৃষ্টিতেই ফড়িংয়ের মতো ছিলাম এবং তাদের দৃষ্টিতেও।"

এ বর্ণনা শুনে সবাই সমস্বরে বলে উঠেঃ "হায়, যদি আমরা মিশরেই মরে যেতাম! হায়, যদি এ মরুর বুকেই আমরা মরে যেতাম! আল্লাহ কেন আমাদের ঐ দেশে নিয়ে গিয়ে তরবারির সাহায্যে হত্যা করাতে চায়? এরপর আমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তো লুটের মালে পরিণত হবে। আমাদের জন্য মিসরে ফিরে যাওয়াই কি মংগলজনক হবে না?" তারপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে এসো আমরা কাউকে নিজেদের সরদার বানিয়ে নিই এবং মিসরে ফিরে যাই। একথা শুনে ফিলিস্তিনে যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল সেই বারোজন সরদারদের মধ্য থেকে দু'জন-ইউশা ও কালেব উঠে দাঁড়ান ।

তারা এ ভীরুতা ও কাপুরুষতার জন্য জাতিকে তিরস্কার করেন। কালেব বলেন, "চলো, আমরা অতর্কিতে আক্রমণ করে সে দেশটি দখল করে নিই। কারণ সে দেশটি পরিচালনা করার যোগ্যতা আমাদের আছে। তারপর তারা দু'জন এক বাক্যে বলে ওঠেন, "যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যি আমাদের সে দেশে পৌঁছাবেন। তবে তোমরা যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করো এবং সে ভয় পেয়ো না। কিন্তু জাতি ভীত না হও। "আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন, কাজেই ওদের ভয় পেয়ো না। কিন্তু জাতি তার জবাব দিল একথা বলে, "ওদেরকে পাথর মেরে হত্যা করো। অবশেষে আল্লাহর ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলো এবং তিনি ফয়সালা করলেন, এখন ইউশা ও কালেব ছাড়া এ জাতির বয়স্ক পুরুষদের মধ্য থেকে আর কেউ সে ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে পারবে না।

এ জাতি চল্লিশ বছর পর্যন্ত গৃহহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে থাকবে। অবশেষে যখন এদের মধ্যকার বিশ বছরের থেকে শুরু করে তার ওপরের বয়সের সমস্ত লোক মরে যাবে এবং নবীন বংশধররা যৌবনে প্রবেশ করবে তখনি এদেরকে ফিলিস্তিন জয় করার সুযোগ দেয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনী ইসরাঈলের ফারান মরুভূমি থেকে পূর্ব জর্দানে পৌছাতে পৌছাতে ৩৮ বছর লেগে যায়। যেসব লোক যুব বয়সে মিসর থেকে বের হয়েছিল তারা সবাই এ সময়ের মধ্যে মারা যায়। পূর্ব জর্দান জয় করার পর হযরত মূসারও ইন্তিকাল হয়। এরপর হযরত ইউশা ইবনে নূনের খিলাফত আমলে বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিন জয় করতে সমর্থ হয়।[৭২]

---

৭১. আল-কুর'আন, ৫ঃ ২৬

৭২. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا -

শেষ পর্যন্ত যখন এদের মধ্য থেকে প্রথম বিদ্রোহের সময়টি এলো তখন হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের মুকাবিলায় নিজের এমন একদল বান্দার আবির্ভাব ঘটালাম, যারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তারা তোমাদের দেশে প্রবেশ করে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, যা পূর্ণ হওয়াই ছিল অবধারিত। [৭৩]

এখানে আসিরীয়াবাসী ও ব্যবিলনবাসীদের হাতে বনী ইসরাঈলদের ওপর যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছিল সে কথাই বলা হয়েছে। এর ঐতিহাসিক পটভূমি অনুধাবন করার জন্য ওপরে আমি নবীগণের সহীফাসমূহ থেকে যে উদ্ধৃতিগুলো দিয়েছি শুধুমাত্র সেটুকু জানাই যথেষ্ট নয়, বরং এখানে একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বর্ণনারও প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে যেসব কারণে মহান আল্লাহ একটি কিতাবধারী জাতিকে মানব জাতির নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে একটি পরাজিত, গোলাম ও অনুন্নত জাতিতে পরিণত করেছিলেন সেই মূল কারণগুলো একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

হযরত মূসা (আ) ইন্তিকালের পর বনী ইসরাঈল যখন ফিলিস্তীনে প্রবেশ করে তখন সেখানে বিভিন্ন জাতি বাস করতো। হিত্তী, আম্মাত্তরী, কানআনী, ফিরিযযী, ইয়াবূসী, ফিলিস্তী ইত্যাদি। এসব জাতি মারাত্মক ধরনের শিরকে লিপ্ত ছিল। এদের সবচেয়ে বড় মাবুদের নাম ছিল "ঈল"। একে তারা বলতো দেবতাগণের পিতা। এদের সবচেয় বড় মাবুদের নাম ছিল "ঈল"। একে তারা বলতো দেবতাগণের পিতা। আর সাধারণত তারা একেষাঁড়ের সাথে তুলনা করতো। তার স্ত্রীর নাম ছিল "আশীরাহ"। তার গর্বজাত সন্তানদের থেকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীদের একটি বিশাল বংশধারা শুরু হয়। এ সন্তানদের সংখ্যা ৭০ এ গিয়ে পৌঁছেছিল। তার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল বা'ল। তাকে বৃষ্টি ও উৎপাদনের ঈশ্বর এবং পৃথিবী ও আকামের মালিক মনে করা হতো। উত্তরাঞ্চলে তার স্ত্রীকে 'উনাস' বলা হতো এবং ফিলিস্তীনে বলা হতো 'ইসরাত'। আএ মহিলাদ্বয় ছিল প্রেম ও সন্তান উৎপাদনের দেবী।

এরা ছাড়া আরো যেসব দেবতা ছিল তাদের মধ্যে কেউ ছিল মৃত্যুর দেবতা, কেউ ছিল স্বাস্থ্যের দেবী আবার কোন দেবতা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আবির্ভাব ঘটাতো এভাবে প্রভুত্বের কাজ কারবার বহু সংখ্যক উপাস্যের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐ সব দেব দেবীকে এমনসব গুণে গুণান্বিত করা হয়েছিল যে, সমাজের নৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুরাচার ব্যক্তিও তাদের সাথে নিজের নাম জড়িত করে লোকসম্মুখে পরিচিত লাভ করা পছন্দ করতো না। এখন একথা সুস্পষ্ট, যারা এ ধরনের বদ ও নিকৃষ্ট সত্তাদেরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের পূজা- উপাসনা করে, তারা নৈতিকতার নিকৃষ্টস্তরে নেমে যাওয়া থেকে নিজেদেরকে কেমন করে রক্ষা করতে পারে।

এ কারণেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করার পর তাদের অবস্থার যে চিত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে তা তাদের মারাত্মক ধরনের নৈতিক অধঃপতনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। শিশু বলিদানের ব্যাপারটি তাদের সমাজে সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। তাদের উপাসনালয়গুলো ব্যভিচারের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। মেয়েদেরকে দেবদাসী বানিয়েউপসনালয়গুলোতে রাখা এবং তাদের দিয়ে ব্যভিচার করানো ইবাদাত ও উপাসনার অংগে পরিণত হয়েছিল। এ ধরনের আরো বহু চরিত্র বিধ্বংসী কাজ তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

---

৭৩. আল-কুর'আন, ১৭: ৫

তাওরাতে হযরত মূসার (আ) সাহায্যে বনী ইসরাঈলকে যে হেদায়াত দেয়া হয়েছিল। তাতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছিল, তোমরা ঐ সব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে ফিলিস্তীন ভূখণ্ড তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে এবং তাদের সাথে বসবাস করা থেকে দূরে থাকবে এবং তাদের নৈতিক ও আকীদা- বিশ্বাসগত দোষ ত্রুটিগুলো এড়িয়ে চলবে।

কিন্তু বনী ইসরাঈল যখন ফিলিস্তীনে প্রবেশ করলো তখন তারা একথা ভুলে গেলো। তারা নিজেদের কোন সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলো না। গোত্র প্রীতি ও গোত্রীয় বিদ্বেষে তারা মত্ত হয়ে গেলো। তাদের বিভিন্ন গোত্র বিজিত এলাকার এক একটি অংশ নিয়ে নিজের এক একটি পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করাই মুশরিকদেরকে পুরোপুরি নির্মূল করে দেবার মতো শক্তি অর্জন করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করাটাই তাদের পছন্দ করে নিতে হলো। শুধু এ নয় বরং তাদের বিজিত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঐ সব মুশরিক জাতির ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রও অক্ষুণ্ণ থাকলো। বনী ইসরাঈলরা সেগুলো জয় করতে পারলো না। যাবুরের (গীতসংহিতা) বক্তব্য এরই অভিযোগ করা হয়েছে। এই সূরার ৬ টীকার শুরুতে আমি এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি।

হযরত মূসার (আ) পরবর্তী ফিলিস্তিন

হযরত মূসার (আ) পর বনী- ইসরাঈলীরা ফিলিস্তিনের সমগ্র অঞ্চল জয় করিয়া লয় বটে। কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত হইয়া নিজেদের কোন একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা এই গোটা অঞ্চলটিকে বিভিন্ন বনী ইসরাঈল গোষ্ঠীয় লোকদের মধ্যে বিভক্ত ও বন্টন করিয়া লয়। ফলে তাহারা নিজেদের ক্ষুদ্রায়তন বহু কয়টি গোত্রীয়রাষ্ট্রকায়েম করে। অত্র চিত্রে দেখানো হইয়াছে যে,ফিলিস্তানের সংক্ষিপ্ততম অঞ্চলটি বনীইসরাঈলের বনু ইয়াহুদাহ, বনু শামউন, বনু দান, বনু বিনইয়াসিন, বনু আফারায়াম, বনু রুবন, বনু জাদ্দ, বনু মুনাসসা, বনু আশকার

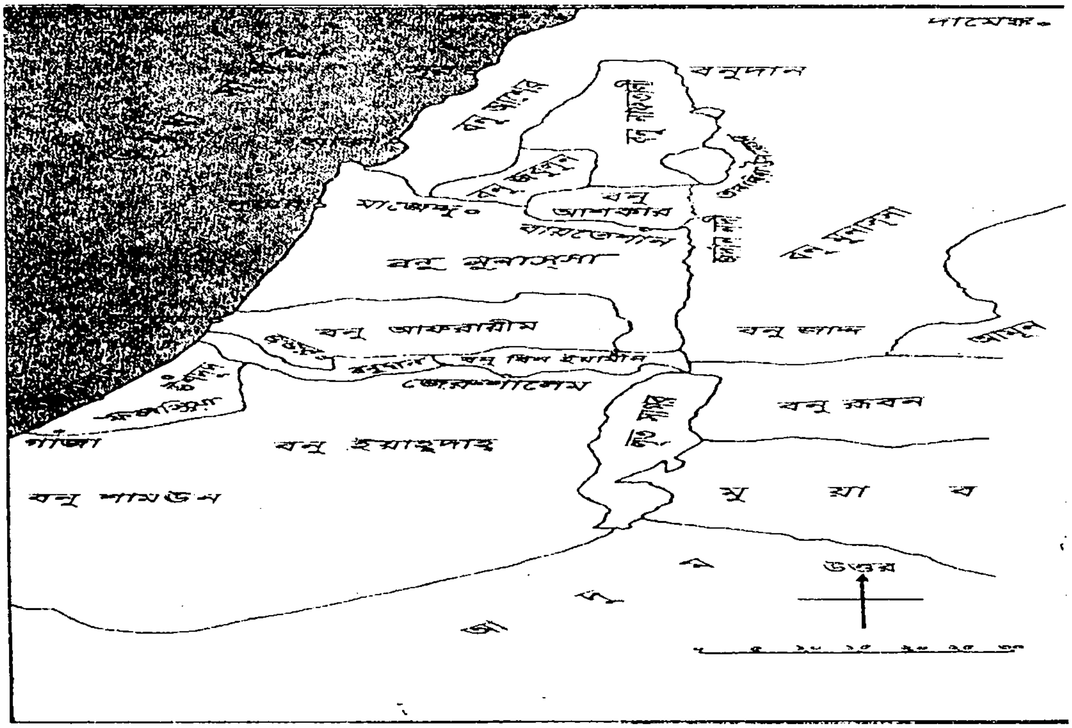

Dhaka University Institutional Repository

বনু জুবুলুন, বনু নাফতালী ও বনু আশের এ গোত্রসমূহের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এ কারণে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই দুর্বল হইয়া থাকিল। ফলে তাহারা তাওরাত কিতাবের লক্ষ অর্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম থাকিয়া গেল। আর সেই লক্ষ ছিল এই অঞ্চলের অধিবাসী মুশরিক জাতিগুলির সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন ও বহিষ্কার।

ইসরাঈলী গোত্রসমূহের অধীন এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মুশরিক কিনয়ানী জাতিসমূহের বহু কতকগুলি নগর রাষ্ট্র রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইবেল পাঠে জানিতে পারা যায় যে, তালূত এর শাসন আমল পর্যন্ত সাইদা, সূর, দুয়ার ও মুজেদ্দু, বাইতেশান, জজর, জেরুশালেম প্রভৃতি শহরগুলি প্রখ্যাত মুশরিক জাতিগুলির দখলে থাকিয়া গিয়াছিল। আর বনী ইনসরাঈলদের উপর এসব শহরে অবস্থিত মুশরিকী সভ্যতার অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার হয়েছিল।

উপরন্তু ইসরাঈলী গোত্রগুলোর অবস্থানের সীমান্ত এলাকায় ফলিস্তিয়া, রোমক, মুয়াবী ও আমূনীয়দের অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও যথারীতি প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারা পরবর্তীকালে উপর্যুপরি আক্রমণ চালাইয়া ইসরাঈলীদের দখল হতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ দাঁড়িয়েছিল যে, সমগ্র ফিলিস্তিন হতে ইয়াহুদীদেরকে কান ধরিয়া ও গলা ধাক্কা দিয়া বহিষ্কৃত করা হত- যদি যথা সময়ে আল্লাহ তায়ালা তালূত এর নেতৃত্বে ইসরাঈলীদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করিয়া না দিতেন।

বনী ইসরাঈলকে এর প্রথম দণ্ড ভোগ করতে হলো এভাবে যে, ঐ জাতিগুলোর মাধ্যমে তাদের মধ্যে শিরক অনুপ্রবেশ করলো। এবং এ সাথে অন্যান্য নৈতিক অনাচারও ধীরে ধীরে প্রবেশ করার পথ পেয়ে গেলো। বাইবেলের বিচারকর্তৃগণ পুস্তকে এ সম্পর্কে এভাবে অনুযোগ করা হয়েছেঃ

"ইসরাঈল সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিতে লাগিল এবং বা'ল দেবগণের সেবা করিতে লাগিল। আর যিনি তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, যিনি তাহদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের, অর্থাৎ আপনাদের চতুর্দিকস্থিত লোকদের দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের কাছে প্রমাণিত করিতে লাগিল, এই রূপে সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিল। তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করে বাল দেবের ও অষ্টারোৎ দেবীরদের সেবা করত। তাতে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হল"।[৭৪]

এরপর তাদের দ্বিতীয় দণ্ড ভোগ করতে হলো। সেটি হচ্ছে, যেসব জাতির নগর রাষ্ট্রগুলোকে তারা ছেড়ে দিয়েছিল তারা এবং ফিলিস্তীয়রা, যাদের সমগ্র এলাকা অবিজিত রয়ে গিয়েছিল, বনী ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত জোট গঠন করলো এবং লাগাতার হামলা করে ফিলিস্তীনের বৃহত্তম অংশ থেকে তাদেরকে বেদখল করলো। এমনকি তাদের কাছ থেকে সদাপ্রভুর অংগীকারের সিন্দুকও (শান্তির তাবুত) ছিনিয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলরা অনুভব করলো, তাদের একজন শাসকের অধীনে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ফলে তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শামুয়েল নবী ১০২০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে তালূতকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করলেন। এ সংযুক্ত রাষ্ট্রের শাসনকর্তা হয়েছিলেন তিনজন। খৃ. পূ. ১০২০ থেকে ১০০৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন তালূত, খৃঃ পূঃ ১০০৪ থেকে ৯৬৫ সাল পর্যন্ত হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং খৃঃ পূ: ৯৬৫ থেকে ৯২৬ সাল পর্যন্ত হযরত সোলাইমান (আ)। হযরত মূসা (আ) এর পর বনী ইসরাঈলরা যে কাজটি অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছিলএ শাসনকর্তাগণ সেটি সম্পূর্ণ করেন। শুধুমাত্র উত্তর উপকূলে ফিনিকিয়দের এবং দক্ষিণ উপকূলে ফিলিস্তিয়দের রাষ্ট্র অপরিবর্তিত থেকে যায়। এ রাষ্ট্র দু'টি জয় করা সম্ভব হয়নি। ফলে এদেরকে শুধু করদ রাষ্ট্রে পরিণত করেই ক্ষান্ত হতে হয়।

৭৪. প্রাগুক্ত, বিচারকর্তৃগণ ২: ১১-১৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সোলাইমান (আ) এর পরে বনী ইসরাঈল আবার ভীষণভাবে দুনিয়াদারী ও বৈষয়িক স্বার্থপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তারা নিজেরদের দু'টো পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করে নিল। উত্তর ফিলিস্তীন ও পূর্ব জর্দানে ইসরাঈল রাষ্ট্র। শেষ পর্যন্ত সামেরীয়া এর রাজধানী হলো। অন্যদিকে দক্ষিণ ফিলিস্তীন ও আদোন অঞ্চলে কায়েম হলো ইহুদিয়া রাষ্ট্র। জেরুশালেম হলো এর রাজধানী। প্রথম দিন থেকেই এ দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো মারাত্মক ধরনের রেষারেষি ও সংঘাত- সংঘর্ষ এবং শেষ দিন পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকলো।

এদের মধ্যে ইসরাঈলী রাষ্ট্রের শাসক ও বাসিন্দারাই সর্বপ্রথম প্রতিবেশী জাতিদের মুশরিকী আকীদা- বিশ্বাস ও নৈতিক বিকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হলো। এ রাষ্ট্রের শাসক আখীয়াব সাইদার মুশরিক মাহজাদী ইসাবেলাকে বিয়ে করার পর এ দুরাবস্থা চরমে পৌঁছে গেল। এ সময় ক্ষমতা ও উপায়- উপকরণের মাধ্যমে শিরক ও নৈতিক আনাচার বন্যার বেগে ইসরাঈলীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। হযরত ইলিয়াস ও হযরত আল- ইয়াসা, আলাইহিমাস সালাম এ বন্যা রুখে দেবার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালালেন।

কিন্তু এ জাতি যে অনিবার্য পতনের দিকে ছুটে চলছিল তা থেকে আর নিবৃত্ত হলো না। শেষে আশূরীয় বিজেতাদের আকারেআল্লাহর গযব ইসরাঈল রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে এলো এবং খৃষ্টপূর্ব নবম শতক থেকে ফিলিস্তীনের ওপর আশূরীয় শাসকদের উপর্যুপরি হামলা শুরু হয়ে গেলো। এ যুগে আমূস (আমোস) নবী (খৃঃ পূঃ ৭৮৭-৭৪৭) এবং তারপর হোসী ' (হোশেয়) নবী (খৃষ্টপূর্ব ৭৪৭-৭৩৫) ইসরাঈলীদেরকে অনবরত সতর্ক করে যেতে থাকলেন। কিন্তু যে গাফলতির নেশায় তারা পাগল হয়ে হিয়েছিল সতর্কবাণীর তিক্ত রসে তার তীব্রতা আরো বেড়ে গেলো। এমন কি ইসরাঈলী বাদশাহ্ আমূস নবীকে দেশত্যাগ করার এবং সামেরীয় রাজের এলাকার চতুঃসীমার মধ্যে তাঁর নবুওয়ারে প্রচার বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

এরপর আর বেশীদিন যেতে না যেতেই ইসরাঈলী রাষ্ট্র ও তার বাসিন্দাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে এলো। খৃষ্টপূর্ব ৭২১ অব্দে অশূরীয়ার দুধর্ষ শাসক সারাগুন সামেরীয়া জয় করে ইসরাঈল রাষ্ট্রের পতন ঘটালো। হাজার হাজার ইসরাঈলী নিহত হলো। ২৭ হাজারেরও বেশী প্রতিপত্তিশীল ইসরাঈলীকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে আশূরীয় রাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্তের জেলাসমূহে ছড়িয়ে দেয়া হলো এবং অন্যান্য এলাকা থেকে ইসরাঈলীদেরকে এনে ইসরাঈলী এলাকায় পুনর্বাসিত করা হলো। এদের মধ্যে বসবাস করে ইসরাঈলীদের দলছুট অংশও নিজেদের জাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে দিনের পর দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকলো।

ইহুদীয়া নামে বনী ইসরাঈলদের যে দ্বিতীয় রাষ্ট্রটি দক্ষিণ ফিলিস্তীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটিও হযরত সুলাইমান আলাইহি সালামের পর অতি শীঘ্রই শিরক ও নৈতিক অনাচারে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু ইসরাঈলী রাষ্ট্রের তুলনায় তার আকীদাগত এবং নৈতিক অধঃপতনের গতি ছিল মন্থর। তাই তার অবকাশকালও ছিল একটু বেশী দীর্ঘ। ইসরাঈলী রাষ্ট্রের মত তার ওপরও আশূরীয়রা যদিও উপর্যুপরি হামলা চালিয়েযাচ্ছিল, তার নগরগুলো ধ্বংস করে চলছিল এবং তার রাজধানী অবরোধ করে রেখেছিল, তবুও এ রাজ্যটি আশূরীয়দের হাতে পুরোপুরি বিজিত হয়নি, বরং এটি তাদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তারপর যখন হযরত ইয়াসইয়াহ (যিশাইয়) ও হযরত ইয়ারমিয়াহর (যিরমিয়) অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা সত্বেও ইয়াহুদিয়ার লোকেরা মূর্তি পূজা ও নৈতিক অনাচার ত্যাগ করলো না তখন খৃষ্টপূর্ব ৫৯৮ সালে ব্যবিলনের বাদশাহ বখতে নসর জেরুশালেমসহ সমগ্র ইয়াহুদীয়া রাজ্য জয় করে নিল এবং ইয়াহুদীয়ার বাদশাহ তার হাতে বন্দী হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

ইহুদীদের অপকর্মের ধারা এখানেই শেষ হলো না। হযরত ইয়ারমিয়াহর হাজার বুঝানো সত্ত্বেও তারা নিজেদের চরিত্র কর্ম সংশোধন করার পরিবর্তে ব্যবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে লাগলো। শেষে ৫৮৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে বখতে নসর একটি বড় আকারের হামলা চালিয়ে ইয়াহুদিয়ার ছোট বড় সমস্ত শহর ধ্বংস করে দিল এবং জেরুশালেম ও হাইকেলে সুলায়মানীকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করলো যে, তার একটি দেয়ালও অক্ষত রইলো না, সবকিছু ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিল। বিপুল সংখ্যক ইহুদীদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে বিভিন্ন দেশে বিতাড়িত করলো। আর যেসব ইহুদী নিজেদের এলাকায় থেকে গেলো তারাও প্রতিবেশী জাতিদের পদতলে নিকৃষ্টভাবে দলিত মথিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকলো।

এটিই ছিল প্রথম বিপর্যয়। বনী ইসরাঈলকে এ বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল। আর এটিই ছিল প্রথম শাস্তি। এ অপরাধে তাদেরকে এ শাস্তি দেয়া হয়েছিল।[৭৫]

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا -

এরপর আমি তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে সাহায্য করেছি অর্থ ও সন্তানের সাহায্যে আর তোমাদের সংখ্যা আগের চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি।[৭৬]

এখানে ইহুদীদেরকে (ইয়াহুদিয়াবাসী) ব্যবিলনের দাসত্বমুক্ত হবার পর যে অবকাশ দেয়া হয় সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সামেরীয়া ও ইসরাঈলের লোকদের সম্পর্কে বলা যায়, আকীদাগত ও নৈতিক পতনের গর্তে পা দেবার পর তারা আর সেখান থেকে উঠতে পারেনি। কিন্তু ইয়াহুদিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে কিছু লোক ছিল, যারা সততা ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সুকৃতি ও কল্যাণের দাওয়াত দিয়ে আসছিল। তারা ইয়াহুদিয়ায় যেসব ইহুদী থেকে গিয়েছিলতাদের মধ্যে সংস্কারমূলক কাজ করতে থাকলো এবং ব্যবিলন ও অন্যান্য এলাকায় যাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তাদেরকেও তাওবা ও অনুশোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত তাদের সহায়ক হলো।

ব্যাবিলন রাষ্ট্রের পতন হলো। খৃষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালে ইরানী বিজেতা সাইরাস (খুরস বা খসরু) ব্যবিলন জয় করে এবং তারপরের বছরই এক ফরমান জারী করে। এ ফরমানের সাহায্যে বনী ইসরাঈলকে নিজেদের স্বদেশভূমিতে ফিরে যাবার এবং সেখানে পুনরায় বসবাস করার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়। এরপর ইয়াহুদিয়ার দিকে ইহুদীদের কাফেলার সারি চলতে থাকে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এর সিলসিলা অব্যাহত থাকে। সাইরাস ইহুদীদেরকে হাইকালে সুলাইমানী পুনর্বার নির্মাণ করারও অনুমতি দেয়। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ এলাকায় নতুন বসতিকারী প্রতিবেশী জাতিগুলো এতে বাধা দিতে থাকে। শেষে প্রথম দারায়ুস (দারা) ৫২২ খৃষ্টপূর্বাব্দে ইয়াহুদিয়ার শেষ বাদশাহর নাতি সরুব্বাবিলকে ইয়াহুদিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করে। সে হাজ্জী (হগয়) নবী, যাকারিয়া (সখরিয়) নবী ও প্রধান পুরোহিত যেশূয়ের তত্ত্বাবধানে পবিত্র হাইকেল পুনরনির্মাণ করে। তারপর খৃষ্টপূর্ব ৪৫৮ সালে হযরত উযাইর (ইয্রা) ইয়াহুদিয়ায় পৌঁছেন। পারস্যরাজ ইরদশীর এক ফরমান বলে তাঁকে এ মর্মে ক্ষমতা দান করেন:

---

৭৫. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ৪৮

৭৬. আল-কুর'আন, ১৭: ৬

Dhaka University Institutional Repository

"হে উযাইর তোমর ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান তোমার বরতলে আছে, তদনুসারে নদী পারস্থ সকল লোকের বিচার করিবার জন্য, যাহারা তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা জানে, এমন শাসনকর্তা ও বিচারকর্তাদিগকে নিযুক্ত করে; এবং যে তাহা না জানে, তোমরা তাহাকে শিক্ষা দাও। আর যে কেহ তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও রাজার ব্যবস্থা পালন হযরত দাউদ ও সোলাইমানের (আ) সম্রাজ্য (১০০০-৯৩০ খৃষ্টপূর্ব)

করিতে অসম্মত তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হউক; তাহার প্রাণদণ্ড নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কিম্বা কারাদণ্ড হউক"।[৭৭]

এ ফরমানের সুযোগ গ্রহণ করে হযরত উযাইর মূসার দ্বীনের পুনরুজ্জীবনের বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করেন। তিনি বিভিন্ন এলাকা থেকে ইহুদী জাতির সকল সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোককে একত্র করে একটি শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাওরাত সম্বলিত বাইবেলের পঞ্চ পুস্তুক একত্র সংকলিত ও বিন্যস্ত করে তিনি তা প্রকাশ করেন। দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অন্য জাতিদের প্রভাবে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যেসব আকীদাগত ও চারিত্রিক অনাচারের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল শরীয়াতের আইন জারী করে তিনি সেগুলো দূর করে দিতে থাকেন। ইহুদীরা যেসব মুশরিক মেয়েকে বিয়ে করে তাদেরকে নিয়ে ঘর সংসার করছিল তাদেরকে তালাক দেবার ব্যবস্থা করেন। বনী ইসরাঈলদের থেকে আবার নতুন করে আল্লাহর বন্দেগী করার এবং আইন মেনে চলার অংগীকার নেন।

খৃষ্টপূর্ব ৪৪৫ সালে নহিমিয়ের নেতৃত্বে আর একটি বহিষ্কৃত ইহুদী দল ইয়াহুদিয়ায় ফিরে আসে। পারশ্যের রাজা নহিমিয়কে জেরুশালেমের গভনৃর নিযুক্ত কর তাকে এই নগরীর প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করার অনুমতি দেয়। এভাবে দেড়শো বছর পরে বায়তুল মাকদিস পুনরায় আবাদ হয় এবং তা ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু সামেরিয়া ও উত্তর ফিলিস্তীনের ইসরাঈলীরা হযরত উযাইরের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন কর্মকাণ্ড থেকে লাভবান হবার কোন সুযোগ গ্রহণ করেনি। বরং বায়তুল মাকদিসের মোকাবিলায় জারযীম পাহাড়ে নিজেদের একটি ধর্মীয় কেন্দ্র নির্মাণ করে তাকে আহলি কিতাবদের কিবলায় পরিণত করার চেষ্টা করে। এভাবে ইহুদী ও সামেরীয়দের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যেতে থাকে।

পারস্য সম্রাজ্যের পতন এবং আলেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযান ও গ্রীকদের উত্থানের ফলে কিছুকালের জন্য ইহুদীরা অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তার সম্রাজ্যে তিনটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে সিরিয়ার এলাকা পড়ে সালূকী রাজ্যের অংশে। এর রাজধানী ছিল ইনতাকিয়ায়। এর শাসনকর্তা তৃতীয় এন্টিউকাস খৃষ্টপূর্ব ১৯৮ সালে ফিলিস্তীন করে দখল নেয়। এ গ্রীক বিজেতা ছিল মুশরিক ও নৈতিক চরিত্রহীন। ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতা- সংস্কৃতিকে সে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো। এর মোকাবিলা করার জন্য সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের মাধ্যমে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে আত্মনিয়োগ করে। এ সঙ্গে ইহুদীদেরে একটি উল্লেখযোগ্য অংশও তার ক্রীড়নকে পরিণত হয়। এ বাইরের অনুপ্রবেশ ইহুদীজাতির মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তাদের একটি দল গ্রীক পোষাক, গ্রীক ভাষা, গ্রীক জীবন যাপন পদ্ধতি ও গ্রীক খেলাধূলা গ্রহণ করে নেয় এবং অন্য দল নিজেদের সভ্যতা- সংস্কৃতিকে কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরে। খৃষ্টপূর্ব ১৭৫ সালে চতুর্থ এন্টিউকাস (যার উপাধি ছিল এপিফানিস বা আল্লাহর প্রকাশ) সিংহাসনে বসে ইহুদী ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সমূলে উৎখাত করার জন্য রাজশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে।

---

৭৭. প্রাগুক্ত, ইয়া ৭ ২৫-২৬

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুল মাকদিসের হাইকেলে সে জোরপূর্বক মূর্তি স্থাপন করে এবং সেই মূর্তিকে সিজদা করার জন্য ইহুদীদেরকে বাধ্য করে। ইতিপূর্বে যেখানে কুরবানী করা হতো সেখানে কুরবানী করাও বন্ধ করিয়ে দেয় এবং ইহুদীদেরকে মুশরিকদের কুরবানী করার জায়গায় কুরবানী করার হুকুম দেয়। যারা নিজেদের ঘরে তাওরাত রাখে অথবা শনিবারের দিনের বিধান মেনে চলে কিংবা নিজেদের শিশু সন্তানদের খতনা করায় তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান জারী করে। কিন্তু ইহুদীরা এ শক্তি প্রয়োগের সামনে মাথা নত করেনি। তাদের মধ্যে একটি দুর্বার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে এ আন্দোলনটি "মাক্কাবী বিদ্রোহ" নামে পরিচিত। যদিও এ সংঘাত- সংঘর্ষকালে গ্রীক প্রভাবিত ইহুদীদের যাবতীয় সহানুভূতি গ্রীকদের পক্ষেই ছিল এবং তারা কার্যত মাক্কাবী বিদ্রোহ নির্মূল করার জন্য ইনতাকিয়ার জালেমদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল তবুও সাধারণ ইহুদীদের মধ্যে হযরত উযাইরের দ্বীনী কার্যক্রমের বিপ্লবাত্মক ভাবধারা এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে তারা সবাই শেষ পর্যন্ত মাক্কাবীদের সাথে সহযোগিতা করে।

এভাবে একদিন তারা গ্রীকদের বিতাড়িত করে নিজেদের একটি স্বাধীন দ্বীনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এ রাষ্ট্রটি খৃষ্টপূর্ব ৬৭ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ রাষ্ট্রটির সীমানা সম্প্রসারিত হতে হতে ধীরে ধীরে পূর্বতন ইয়াহুদিয়া ও ইসরাঈল রাষ্ট্র দু'টির আওতাধীন সমগ্র এলাকার ওপর পরিব্যাপ্ত হয়। বরং ফিলিস্তিয়ার একটি বড় অংশও তার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলাইমানের (আ) আমলেও এ এলাকাটি বিজিত হয়নি। কুর'আন মজীদের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো এ ঘটনাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করে।[৭৮]

إنْ أحْسَنتُمْ أحْسَنتُمْ لِأنفسِكُمْ وإنْ أسَأتُمْ فلَهَا فإذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا
دَخَلُوهُ أوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا -

দেখো, তোমরা ভালো কাজ করে থাকলে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ভাল ছিল আর খারাপ কাজ করে থাকলে তোমাদের নিজেদেরই জন্য তা খারাপ প্রমাণিত হবে। তারপর যখন পরবর্তী প্রতিশ্রুতির সময় এসেছে তখন আমি অন্য শত্রুদেরকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং (বায়তুল মাকদিসের) মসজিদে এমনভাবে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার শত্রুরা ঢুকে পড়েছিল আর যে জিনিসের ওপরই তাদের হাত পড়ে তাকে ধ্বংস করে রেখে দেয়।[৭৯]

এ দ্বিতীয় বিপর্যয়টি এবং এর ঐতিহাসিক শাস্তির পটভূমি নিম্নরূপঃ
মক্কাবীদের আন্দোলন যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দ্বীনী প্রেরণা সহকারে শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। নির্ভেজাল বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও অন্তসারশূন্য লৌকিকতা তার স্থান দখল করে। শেষে তাদের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। তারা নিজেরাই রোমক বিজেতা পম্পীকে ফিলিস্তীনে আসার জন্য আহবান জানায়। তাই খৃষ্টপূর্ব ৬৩ সনে

---

৭৮. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ৪৯

৭৯. আল-কুর'আন, ১৭: ৭

Dhaka University Institutional Repository

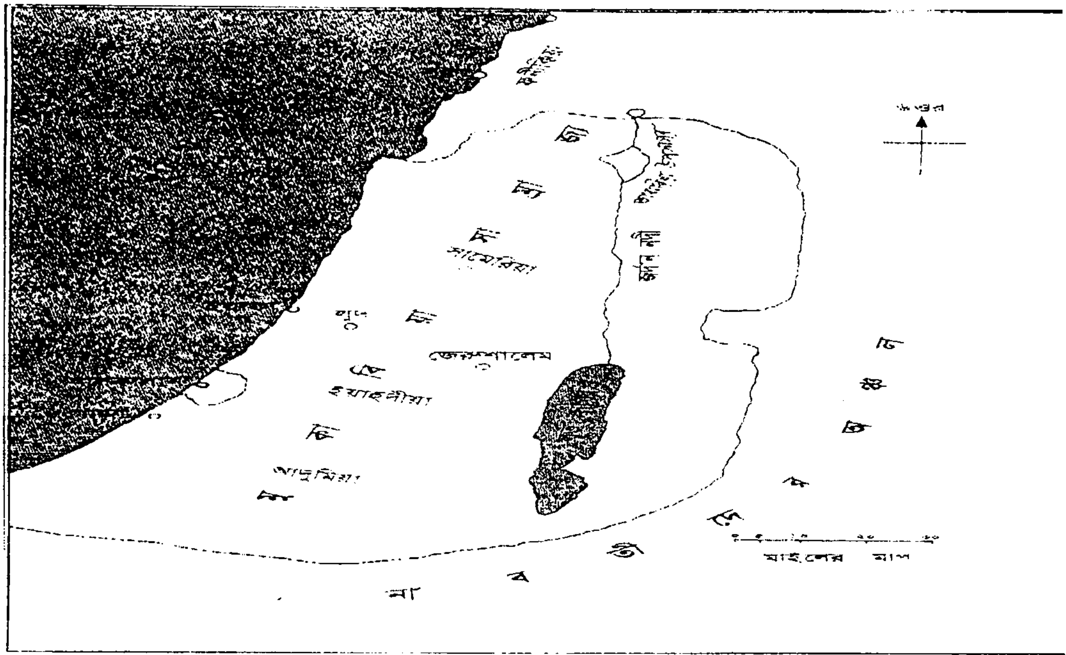

মুকাবিয়া শাসন আমলের ফিলিস্তিন

পম্পী এ দেশের দিকে নজর দেয় এবং বায়তুল মাকদিস জয় করে ইহুদীদের স্বাধীনতা হরণ করে। কিন্তু রোমীয় বিজেতাদের স্থায়ী নীতি ছিল, তারা বিজিত এলাকায় সরাসরি নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতো না। বরং স্থানীয় শাসকদের সহায়তায় আইন শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনা করে পরোক্ষভাবে নিজেদের কার্যোদ্ধার করা বেশী পছন্দ করতো। তাই তারা নিজেদের ছত্রছায়ায় ফিলিস্তীনে একটি দেশীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। খৃঃ পূ: ৪০ সনে এটি হীরোদ নামক এক সুচতুর ইহুদীর কর্তৃত্বাধীন হয়। ইতিহাসে এ ইহুদী শাসক মহান হীরোদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সমগ্র ফিলিস্তীন ও ট্রান্স জর্দান এলাকায় খৃষ্টপূর্ব ৪০ থেকে ৪ সন পর্যন্ত তার শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। একদিকে ধর্মীয় নেতা পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করে সে ইহুদীদেরকে সন্তুষ্ট করে এবং অন্যদিকে রোমান সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করে রোম সাম্রাজ্যের প্রতি নিজের অত্যাধিক বিশ্বস্ততার প্রমাণ পেশ করে। এভাবে কাইসারের সন্তুষ্টিও অর্জন করে। এ সময় ইহুদীদের দ্বীনী ও নৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে ঘটতে তার একেবারে শেষ সমীমানায় পৌঁছে যায়। হীরোদের পর তার রাষ্ট্র তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েঃ

তার এক ছেলে আরখালাউস সামেরীয়া, ইয়াহুদিয়া ও উত্তর উদমিয়ার শাসনকর্তা হয়। কিন্তু ৬ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট আগষ্টাস তাকে পদচ্যুত করে তার কর্তৃত্বাধীন সমগ্র এলাকা নিজের গভর্নরের শাসনাধীনে দিয়ে দেয়। ৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই অপরিবর্তিত থাকে। এ সময় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের সংস্কারের জন্য নবুওয়াতের দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হন। ইহুদীদের সমস্ত ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতরা একজোট হয়ে তাঁর বিরোধিতা করে এবং রোমান গভনর্র পোন্তিসপীলাতিসের সাহায্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দান করার প্রচেষ্টা চালায়।

হীরোদের দ্বিতীয় ছেলে হীরোদ এন্টিপাস উত্তর ফিলিস্তীনের গালীল এলাকা ও ট্রান্স জর্দানের শাসনকর্তা হয়। এ ব্যক্তিই এক নর্তকীর ফরমায়েশে হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের শিরশ্ছেদ করে তাকে নাযরানা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

তার তৃতীয় ছেলের নাম ফিলিপ। হারমুন পর্বত থেকে ইয়ারমুক নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তার অধিকারভুক্ত ছিল। এ ব্যক্তি রোমীয় ও গ্রীক সংস্কৃতিতে নিজের বাপ ও ভাইদের তুলনায় অনেক বেশী ডুবে গিয়েছিল। তার এলাকায় কোন ভাল কথার বা ভাল কাজের বিকশিত হবার তেমন সুযোগ ছিল না যেমন ফিলিস্তীনের অন্যান্য এলাকায় ছিল।

মহামতি হীরোদ তাঁর নিজের শাসনামলে যেসব এলাকার ওপর কর্তৃত্ব করতেন ৪১ খৃষ্টাব্দে তার নাতি হীরোদগ্রীপ্পাকে রোমীয়রা যেসব এলাকার উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। এ ব্যক্তি শাসন কতৃত্ব লাভ করার পর ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর চরম জুলুম- নির্যাতন শুরু করে দেয়। তাঁর তাওয়ারীগণ আল্লাহভীতি ও নৈতিক চরিত্র সংশোধনের যে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তাকে বিধ্বস্ত করার জন্য সে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এ সময়ের সাধারণ ইহুদী এবং তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করে যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলো পাঠ করলে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যাবে। চার ইনজীলে এ ভাষণগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

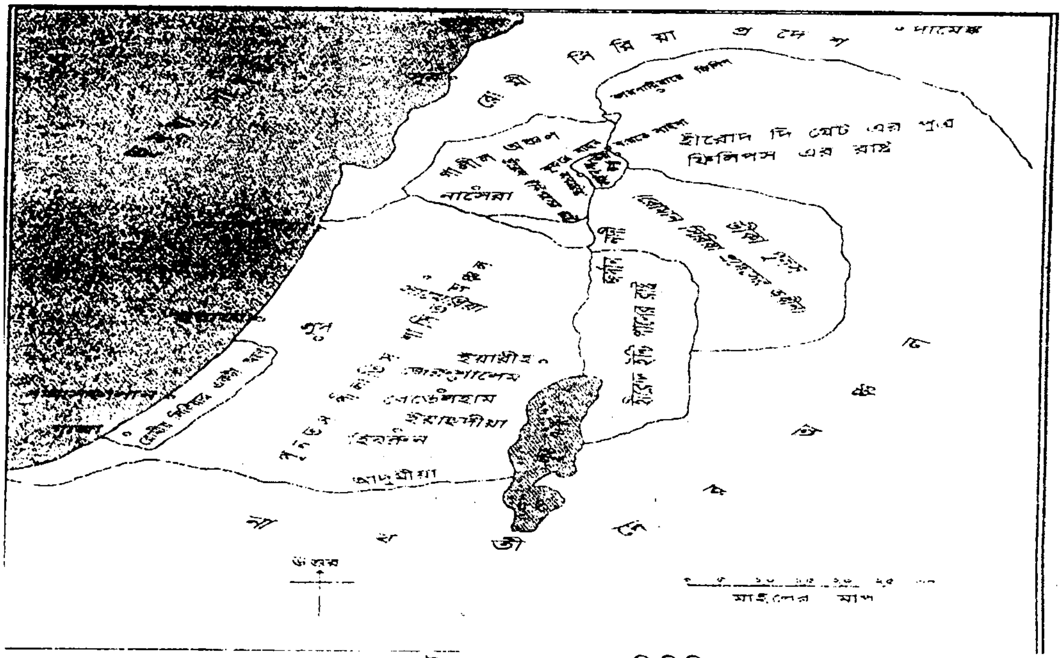

হযরত ঈসার (আ) আমলে ফিলিস্তিন

তারপর এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য এ বিষয়টিও যথেষ্ট যে, এ জাতির চোখের সামনে হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মতো পুন্যাত্মাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হলো কিন্তু এ ভয়ংকর জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি আওয়াজ শোনা গেল না। আবার অন্যদিকে সমগ্র জাতির ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য মৃত্যুদণ্ড দাবী করলো কিন্তু হাতে গোনা গুটিকয় সত্যাশ্রয়ী লোক ছাড়া জাতির এ দুর্ভাগ্য দুঃখ করার জন্য আর কাউকে পাওয়া গেল না। জাতীয় দুরাবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে,পোন্তিসপীলাতিস এ দুর্ভাগ্য লোকদেরকে বললো, আজ তোমাদের ঈদের দিন। প্রচলিত নিয়ম মোতাবিক আজ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের একজনকে মুক্তি দেবার অধিকার আমার আছে। এখন তোমরা বলো, আমি ঈসাকে মুক্তি দেবো, না বারাব্বা ডাকাতকে? সমগ্র জনতা এক কণ্ঠে বললো, বারাব্বা ডাকাতের মুক্তি দাও। এটা যেন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এ জাতির গোমরাহীর পক্ষে শেষ প্রমাণ পেশ।

Dhaka University Institutional Repository

এর কিছুদিন পরেই ইহুদী ও রোমানদের মধ্যে কঠিন সংঘাত- সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলো। ৬৪ ও ৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইহুদীরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। দ্বিতীয় হীরোদাগ্রিপ্পা ও রোম সম্রাট নিযুক্ত প্রাদেশিক দেওয়ান ফ্লোরাস উভয়ই এ বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হলো। শেষ পর্যন্ত রোম সম্রাট বড় ধরনের সামরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ বিদ্রোহ নির্মূল করলো। ৭০ খৃষ্টাব্দে টীটুস সেনাবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ করে জেরুশালেম জয় করলো। এ সময় যে গণহত্যা সংঘটিত হলো তাতে ১ লাখ ৩৩ হাজার লোক মারা গেলো। ৬৭ হাজার লোককে গ্রেফতার করে গোলামে পরিণত করা হলো। হাজার হাজার লোককে পাকড়াও করে মিসরের খনির মধ্যে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো।

হাজার হাজার লোককে ধরে বিভিন্ন শহরে এম্ফী থিয়েটার ও ক্লুসীমুতে ভিড়িয়ে দেয়া হলো। সেখানে তারা বন্য জন্তর সাথে লড়াই বা তরবারি যুদ্ধের খেলার শিকার হয়। দীর্ঘাংগী সুন্দরী মেয়েদেরকে বিজেতাদের জন্য নির্বাচিত করে নেয়া হলো। সবশেষে জেরুশালেম নগরী ও হাইকেলকে বিধ্বস্ত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলো। এরপর ফিলিস্তীন থেকে ইহুদী কর্তৃত্ব ও প্রভাব এমনভাবে নির্মূল হয়ে গেলো যে, পরবর্তী দু'হাজার বছর পর্যন্ত ইহুদীরা আর মাথা উঁচু করার সুযোগ পেলো না। জেরুশালেমের পবিত্র হাইকেলও আর কোনদিন নির্মিত হতে পারেনি। পরবর্তীকালে কাইসার হিড্রিয়ান এ নগরীতে পুনরায় জনবসতি স্থাপন করে কিন্তু তখন এর নাম রাখা হয় ইলিয়া। আর এ ইলিয়া নগরীতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইহুদীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। দ্বিতীয় মহাবিপর্যয়ের অপরাধে ইহুদীরা এ শাস্তি লাভ করে।[৮০]

ফিলিস্তিনের দিকে ইব্রাহীম (আ)- এর হিজরত

অতঃপর ইব্রাহীম (আ) এইরূপভাবে ধর্মপ্রচার করতে করতে ফিলিস্তিনে গিয়ে পৌঁছলেন। এই সফরেও হযরত সারা এবং হযরত লূত (আ) সস্ত্রীক তাঁর সাথে ছিলেন। সূরা-আনকাবূতে উল্লেখ আছে-

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

"অতঃপর লূত (আ) ইব্রাহীম (আ)-এর উপর ঈমান আনলেন এবং বললেন, "আমি আমার পরওয়াদিগারের দিকে হিজরত করব, নিঃসন্দেহে, তিনি ক্ষমতাশালী হেকমতওয়ালা।"[৮১]

হাদীসে এসেছে ওসমান যুন্নূরাইন (রা) যখন নিজের পবিত্র স্ত্রী হযরত রোকাইয়া বিনতে রাসূলুল্লাহ (স) কে সঙ্গে লইয়া আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করে গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "নিঃসন্দেহে লূত (আ)-এর পরে ওসমানই সর্বপ্রথম মুহাজির, যিনি স্ত্রীকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছেন।"

হযরত ইব্রাহীম (আ.) ফিলিস্তিনের পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করলেন। সেকালে এই অঞ্চলটি কেনআনীদের অধীনে ছিল। অতঃপর অনতিকাল পরেই হযরত ইব্রাহীম (আ.) শাকীম (নাবলেস) চলে যান তথায় কিছুকাল অবস্থান করার পর এখানেও বেশী দিন রইলেন না। ক্রমাগত পশ্চিম দিকেই অগ্রসর হতে লাগলেন, এমন কি অবশেষে মিশর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন।[৮২]

---

৮০. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ৫১

৮১. আল-কুর'আন, ২৯ঃ ২৬

৮২. মাওলানা হিফযুর রহমান *কাসাসুল কুর'আন*, (অনু. মাওলানা নূরুর রহমান), এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা : ২০০৯, ১খ, পৃ. ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইবরাহীম (আ)- এর ফিলিস্তিনে বসবাস

হযরত ইবরাহীম (আ) নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে শাম দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে পথিমধ্যে শাম দেশের অন্তর্গত জাযায়েনুল ওয়াজাহ শহরে অবস্থান, সেখানকার রাজকুমারী হযরত সারাহ (আ)-কে বিয়ে, তৎপর আবার শামের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পথিমধ্যে মিশর, মিশরে পাপিষ্ঠ বাদশার কবলে পতিত হয়ে সেখান থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তির পর কেনান হয়ে ফিলিস্তীনে উপনীত হন। ফিলিস্তীনেই বায়তুল মোকাদ্দাস অবস্থিত। তাই এই ভূখণ্ডকে বায়তুল মোকাদ্দাস নামেও অভিহিত করা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌছলে জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে বললেন, হে ইবরাহীম ! এই ভূখন্ডের প্রতি যতই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন ততই উপকৃত হবেন।

তখন হযরত ইবরাহীম (আ) দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেনে, এখানে পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত- ভূমি নরম, বৃক্ষসমূহ ফলদার। পানি ছাড়াই ফসল উৎপন্ন হয়। এখানেই হযরত সারাহ ও হাজেরা (আ)- সহ ইবরাহীম (আ) বসবাস এখতিয়ার করেন। হাজেরা হলেন মিশর রাজ কর্তৃক হযরত সারাহ (আ)-কে প্রদত্ত সেবিকা। হাজেরা নামকণের ইতিবৃত্ত হচ্ছে- মিশর রাজ হযরত সারাহ (আ)-এর প্রতি অসদুদ্দেশে হস্ত প্রসারিত করতে চাইলে তার সমগ্র শরীর আড়ষ্ট-নির্জীব হয়ে অবশ হয়ে যেত। এরূপ কয়েক বার ঘটার পরই পাপিষ্ঠ মিশর রাজ আন্তরিক তওবা করে হযরত সারাহ (আ)-কে বলল, আমার নিকট এক সেবিকা আছে, আপনি নিজের সেবার্থ তাকে নিয়ে যান। কেননা, আমি যখনই তার প্রতি হস্ত প্রসারিত করতে চাইতাম, তখনি আমার শরীর আড়ষ্ট ও নির্জীব হয়ে অবশ হযে যেত। এ কারণেই তাঁর হাজেরা নামকরণ তখনি আমার শরীর আড়ষ্ট ও নির্জীব হয়ে অবষ হয়ে যেত। এ কারণেই তাঁর হাজেরা নামকরণ হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশসূত্র হযরত হাজেরা (আঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত।

হযরত ইবরাহীম (আ) বায়তুল মোকাদ্দাস শহরে অবস্থান গ্রহণ করে এখানে ইমারত নির্মাণ করেন। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস গমন ও তথায় বসবাস অবলম্বনের সময়কাল পর্যন্ত সাম ইবনে নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এখানে তিনি অনেক লোককেই শরীঅতের বিধি-বিধান শেখান। তারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলল, জনাব ! আমাদের একটা নির্দিষ্ট কেবলার প্রয়োজন, যেদিকে ফিরে আল্লাহর এবাদত করব। হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে একটি জান্নাতী পাথর এনে এখন যেখানে বায়তুল মোকাদ্দাস তথায় স্থাপন করেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্যে বলেন, হে ইবরাহীম ! এটা আপনার ও আপনার পরবর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের কেবলা।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধারায় চল্লিশ হাজার নবী-রাসূল জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত ইসমাঈল (আ) এবং সর্বশেষ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স)। জিবরাঈল (আ) কর্তৃক আনীত জান্নাতী পাথরখানাকে কেবলা স্থির করেই লোকজন আল্লাহ তাআলার এবাদত করত। এ পাথরখানার নাম সাখরাতুল্লাহ। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আঃ) ফিলিস্তীনেই বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানেই তাঁর সন্তানাদি জন্ম গ্রহণ করে।[৮৩]

---

৮৩. মাওলানা আবু নায়ীম, কাসাসুল আম্বিয়া, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা : ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সিরিয়া

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'বরকতময় জমীন' এর কথা উল্লেখ করে এর মাধ্যমে ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও জর্ডানকে বুঝিয়েছেন। কেননা এ এলাকাগুলি অসংখ্য নবীদের আবাসভূমি।

সিরিয়া সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে। তার বরকত তথা সমৃদ্ধি বস্তুগতও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনেরই। বস্তুগত দিক দিয়ে তা দুনিয়ার উর্বরতম এলাকাসমূহের অন্তরভুক্ত। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দু'হাজার বছর থেকে তা থেকেছে আল্লাহর নবীগণের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার কোন এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক নবী আবির্ভূত হয়নি।

(وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ) -

আর আমি তাকে ও লূতকে বাঁচিয়ে এমন দেশের দিকে নিয়ে গেলাম যেখানে আমি দুনিয়াবাসীদের জন্য বরকত রেখেছিলাম।[৮৪]

সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে। তার বরকত তথা সমৃদ্ধি বস্তুগতও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনেরই। বস্তুগত দিক দিয়ে তা দুনিয়ার উর্বরতম এলাকাসমূহের অন্তরভুক্ত। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দু'হাজার বছর থেকে তা থেকেছে আল্লাহর নবীগণের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার কোন এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক নবী আবির্ভূত হয়নি।[৮৫]

বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণকর অঞ্চল হল সিরিয়া। সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। আভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গম্বরগণের পীঠস্থান। অধিকাংশ নবী এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচূর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার।[৮৬]

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ -
আর সুলায়মানের জন্য আমি প্রবল বায়ু প্রবাহকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুম এমন দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যার মধ্যে আমি বরকত রেখেছিলাম আমি সব জিনিসের জ্ঞান রাখি।[৮৭]

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ -

---

৮৪. আল-কুর'আন, ২১ঃ ৭১

৮৫. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী *আত-তাফসীরুল-মাজহারী*, মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান: তা. বি., খ. ৩, পৃ. ১৩৬

৮৬. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ৮৮২।

৮৭. আল-কুর'আন, ২১ঃ ৮১

Dhaka University Institutional Repository

আর তাদের জায়গায় আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম দুর্বল ও অধোপতিত করে রাখা মানব গোষ্ঠীকে। অতপর যে ভুখণ্ডে আমি প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছিলাম, তার পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে তাদেরই করতালগত করে দিয়েছিলাম।এভাবে বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তোমার রবের কল্যানের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। কারণ তারা সবর করেছিল। আর ফেরাউন ও তার জাতি যা কিছু তৈরী করেছিল ও উঁচু করছিল তা সব ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।[৮৮]

বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি। কেউ কেউ এর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, বনী ইসরাঈলকে খোদ মিশরের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এ অর্থ গ্রহন করার স্বপক্ষে একে তো কুর'আনের ইংগিতগুলো যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট নয়। তদুপরি ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী থেকেও এর স্বপক্ষে কোন শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এ অর্থ গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ।[৮৯]

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ -

তাদের এবং যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তীস্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত করেছিলাম। তোমরা এসব জনপদে রাত্রে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।[৯০]

"সমৃদ্ধ জনপদ" বলতে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন বুঝানো হয়েছে। কুর'আন মাজীদ সাধারণভাবে এ গুণবাচক শব্দ দিয়ে এর উল্লেখ করা হয়েছে। "দৃশ্যমান জনপদ" হচ্ছে এমন সব জনবসতি যেগুলো সাধারণ রাজপথের পাশে অবস্থিত। কোন এক কোণায় আড়ালে অবস্থিত নয়। আবার এর এ অর্থও হতে পারে যে, এ জনবসতিগুলো বেশী দূরে দূরে অবস্থিত ছিল না এবং লাগোয়া ছিল। একটি জনপদের চিহ্ন শেষ হবার পর দ্বিতীয় জনপদ হয়ে যেত।

একটি আন্দাজ অনুযায়ী ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করার মানে হচ্ছে, ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত পুরা সফর অবিচ্ছিন্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হত, এর এক মঞ্জিল থেকে আর এক মঞ্জিলের দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা ছিল। জনবসতিপূর্ণ এলাকা সফর ও অনাবাদ মরু এলাকা সফরের মধ্যে এ পার্থক্য থাকে। মরুভুমির মধ্যে মুসাফির যতক্ষণ চায় চলে এবং যতক্ষণ চলে কোথাও এক জায়গায় ডেরা বাঁধে। পক্ষান্তের জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পথের এক জনপদ থেকে আর এক জনপদ পর্যন্ত এলাকার মধ্যকার দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা থাকে। পথিক পথে কোন কোন জায়গায় থামবে, দুপুরে কোথায় বিশ্রাম নেবে এবং কোথায় রাত কাটাবে এর পূর্ন কর্মসূচী পূর্বাহ্নেই তৈরি করে নিতে পারে।[৯১]

- الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا – দ্বারা শামদেশ তথা সিরিয়ার গ্রামাঞ্চল বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শামদেশের জন্য বর্ণিত আছে।[৯২]

---

৮৮. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১৩৭

৮৯. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ৪৭০

৯০. আল-কুর'আন, ৩৪ঃ ১৮

৯১. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১১০৮

৯২. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১১১০

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি

সিরিয়া (আরবি ভাষায় السورية আস্সূরিয়্যা) এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্যের একটি রাষ্ট্র। এর সরকারী নাম আরব প্রজাতন্ত্রী সিরিয়া (الجمهورية العربية السورية আল্‌জুম্‌হূরিয়্যা ল্'আরাবিয়্যা স্সূরিয়্যা)।[৯৩]

ভৌগোলিক অবস্থান

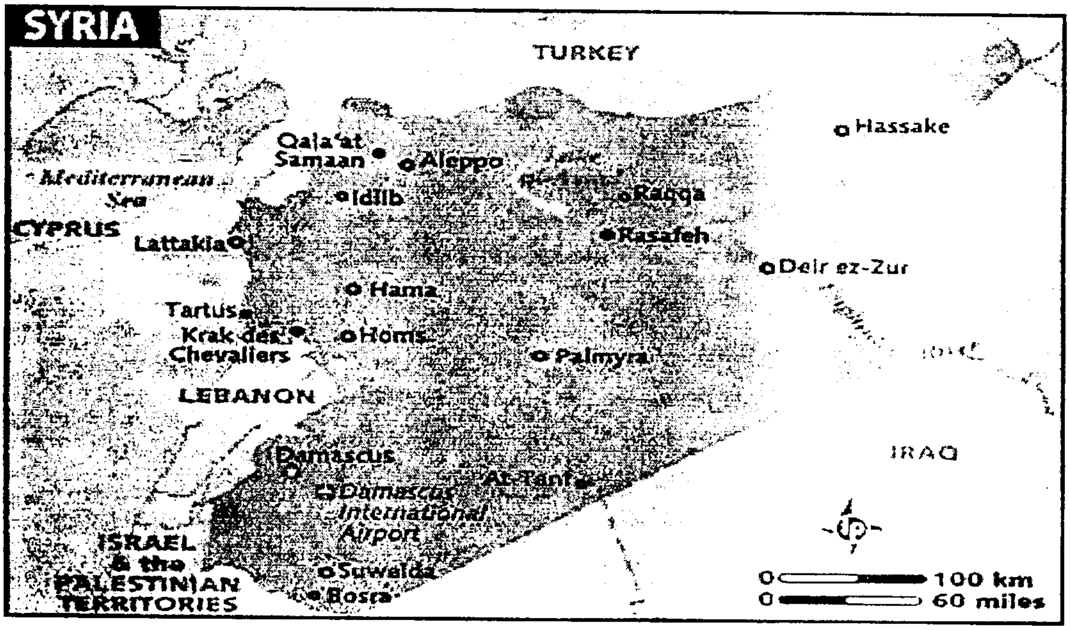

সিরিয়ার মানচিত্র

সিরিয়া এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ। দেশটির পশ্চিমে ভূ-মধ্যসাগর ও লেবানন, দক্ষিণে ইসরাইল ও জর্দান, পূর্বে ইরাক এবং উত্তরে তুরস্ক।[৯৪]

---

৯৩. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ৬১

৯৪. ভবেশ রায়, দেশ দেশান্তর, নিউ এজ পাবলিকেশন্স,ঢাকা : ১৯৯৭, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

জর্ডান

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'বরকতময় জমীন' এর কথা উল্লেখ করে এর মাধ্যমে ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও জর্ডানকে বুঝিয়েছেন। কেননা এ এলাকাগুলি অসংখ্য নবীদের আবাসভূমি। জর্দান (আরবি ভাষায়: الأردن আল্'উর্দুন্) বা হাশেমীয় জর্দান রাজ্য (المملكة الأردنية الهاشمية আল্মাম্লাকাল্'উর্দুনিয়াল্ হাশিমিয়া) মধ্যপ্রাচ্যের একটি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জর্দানের রাজবংশ নিজেদেরকে হযরত মুহাম্মদ (স)- এর পিতামহ হাশেমের বংশধর বলে মনে করে।[৯৫]

জর্দান সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত অর্থসহ

সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে। তার বরকত তথা সমৃদ্ধি বস্তুগতও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনেরই। বস্তুগত দিক দিয়ে তা দুনিয়ার উর্বরতম এলাকাসমূহের অন্তরভুক্ত। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দু'হাজার বছর থেকে তা থেকেছে আল্লাহর নবীগণের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার কোন এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক নবী আবির্ভুত হয়নি।

(وَنَجَّيْنَٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَٰلَمِينَ) -

আর আমি তাকে ও লূতকে বাঁচিয়ে এমন দেশের দিকে নিয়ে গেলাম যেখানে আমি দুনিয়াবাসীদের জন্য বরকত রেখেছিলাম।[৯৬]

সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে। তার বরকত তথা সমৃদ্ধি বস্তুগতও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনেরই। বস্তুগত দিক দিয়ে তা দুনিয়ার উর্বরতম এলাকাসমূহের অন্তরভুক্ত। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দু'হাজার বছর থেকে তা থেকেছে আল্লাহর নবীগণের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার কোন এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক নবী আবির্ভূত হয়নি।[৯৭]

বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণকর অঞ্চল হল সিরিয়া। সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। আভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গম্বরগণের পীঠস্থান। অধিকাংশ নবী এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচূর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার।[৯৮]

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ -

আর সুলায়মানের জন্য আমি প্রবল বায়ু প্রবাহকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুম এমন দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যার মধ্যে আমি বরকত রেখেছিলাম আমি সব জিনিসের জ্ঞান রাখি।[৯৯]

---

৯৫. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ৭১

৯৬. আল-কুর'আন, ২১ঃ ৭১

৯৭. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী *আত-তাফসীরুল-মাজহারী*, মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান: তা. বি., খ. ৩, পৃ. ১৩৬

৯৮. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ৮৮২।

৯৯. আল-কুর'আন, ২১ঃ ৮১

Dhaka University Institutional Repository

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ -

আর তাদের জায়গায় আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম দুর্বল ও অধোপতিত করে রাখা মানব গোষ্ঠীকে। অতপর যে ভুখণ্ডে আমি প্রাচূর্যে ভরে দিয়েছিলাম, তার পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে তাদেরই করতালগত করে দিয়েছিলাম। এভাবে বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তোমার রবের কল্যানের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। কারণ তারা সবর করেছিল। আর ফেরাউন ও তার জাতি যা কিছু তৈরী করেছিল ও উঁচু করছিল তা সব ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।[১০০]

বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছি। কেউ কেউ এর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, বনী ইসরাঈলকে খোদ মিশরের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এ অর্থ গ্রহন করার স্বপক্ষে একে তো কুর'আনের ইংগিতগুলো যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট নয়। তদুপরি ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী থেকেও এর স্বপক্ষে কোন শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এ অর্থ গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ।[১০১]

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ -

তাদের এবং যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগলোর মধ্যবর্তীস্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত করেছিলাম। তোমরা এসব জনপদে রাত্রে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।[১০২]

"সমৃদ্ধ জনপদ" বলতে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন বুঝানো হয়েছে। কুর'আন মাজীদ সাধারণভাবে এ গুণবাচক শব্দ দিয়ে এর উল্লেখ করা হয়েছে। "দৃশ্যমান জনপদ" হচ্ছে এমন সব জনবসতি যেগুলো সাধারণ রাজপথের পাশে অবস্থিত। কোন এক কোণায় আড়ালে অবস্থিত নয়। আবার এর এ অর্থও হতে পারে যে, এ জনবসতিগুলো বেশী দূরে দূরে অবস্থিত ছিল না এবং লাগোয়া ছিল। একটি জনপদের চিহ্ন শেষ হবার পর দ্বিতীয় জনপদ হয়ে যেত।

একটি আন্দাজ অনুযায়ী ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করার মানে হচ্ছে, ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত পুরা সফর অবিচ্ছিন্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হত, এর এক মঞ্জিল থেকে আর এক মঞ্জিলের দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা ছিল। জনবসতিপূর্ণ এলাকা সফর ও অনাবাদ মরু এলাকা সফরের মধ্যে এ পার্থক্য থাকে। মরুভুমির মধ্যে মুসাফির যতক্ষণ চায় চলে এবং যতক্ষণ চলে কোথাও এক জায়গায় ডেরা বাঁধে। পক্ষান্তের জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পথের এক জনপদ থেকে আর এক জনপদ পর্যন্ত এলাকার মধ্যকার দূরত্ব নির্ধারিত ও জানা থাকে। পথিক পথে কোন কোন জায়গায় থামবে, দুপুরে কোথায় বিশ্রাম নেবে এবং কোথায় রাত কাটাবে এর পূর্ন কর্মসূচী পূর্বাহ্নেই তৈরি করে নিতে পারে।[১০৩]

---

১০০. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১৩৭

১০১. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ৪৭০

১০২. আল-কুর'আন, ৩৪ঃ ১৮

১০৩. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১১০৮

Dhaka University Institutional Repository

- الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا – দ্বারা শামদেশ তথা সিরিয়ার গ্রামাঞ্চল বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শামদেশের জন্য বর্ণিত আছে।[১০৪]

পরিচিতি

জর্দানের ভূপ্রকৃতি উষর মরুভূমিময়। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণও কম। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে দেশটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশটি উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে ব্রিটিশরা অঞ্চলটি দখলে নেয়। জর্দান নদীর পূর্বতীরের ট্রান্সজর্ডান এবং পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিন উভয়ই ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৯৪৬ সালে ট্রান্সজর্ডান অংশটি একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৪৯ সালে এর নাম বদলে শুধু জর্দান রাখা হয়। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের অংশবিশেষে ইসরায়েল স্বাধীনতা ঘোষণা করলে জর্দান আরও চারটি আরব রাষ্ট্রের সাথে একত্রে ইসরায়েলিদের আক্রমণ করে। যুদ্ধশেষে ইসরায়েলিরা পশ্চিম জেরুজালেম এবং জর্দানিরা পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম দখলে আনে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরও দখল করে নেয়। জর্দান পশ্চিম তীরকে জর্দানের অংশ হিসেবে দাবী করতে থাকলেও স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনীদের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালে জর্দানের রাজা হুসেন পশ্চিম তীরের উপর থেকে জর্দানে দাবি প্রত্যাহার করে নেন।[১০৫]

বর্তমানে জর্দানের উত্তরে সিরিয়া, পূর্বে ইরাক ও সৌদি আরব, দক্ষিণে সৌদি আরব ও আকাবা উপসাগর এবং পশ্চিমে ইসরায়েল ও পশ্চিম তীর। জর্দানের আয়তন ৮৯,৫৫৬ বর্গকিলোমিটার। আম্মান জর্দানের বৃহত্তম শহর ও রাজধানী। অফিসিয়াল ভাষা আরবী, ইংরেজী, ফ্রেন্স।[১০৬]

ভৌগোলিক অবস্থান

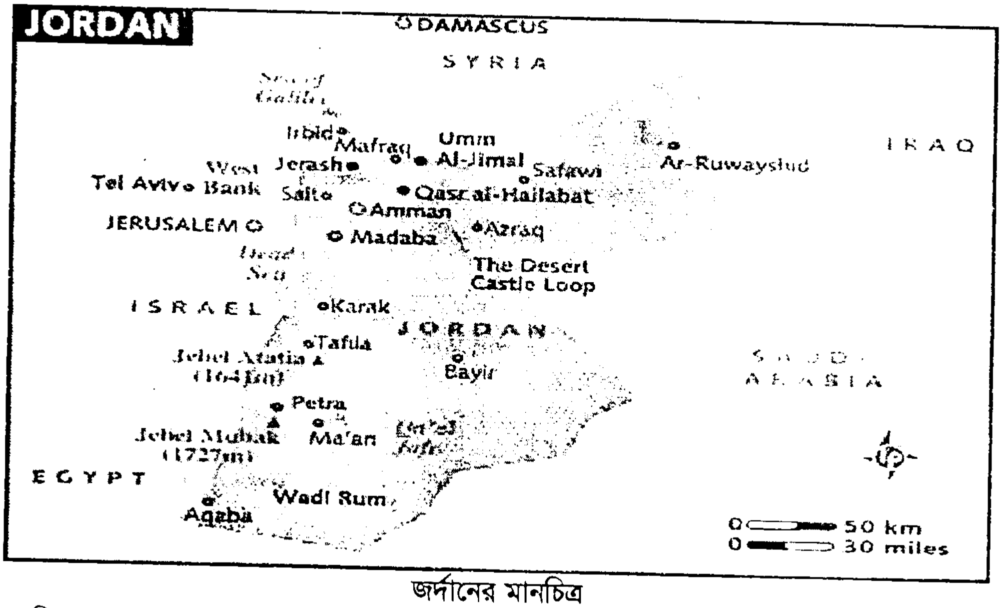

জর্দানের মানচিত্র

জর্দান এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ। দেশটি 'পূর্ব তীর' নামেও পরিচিত। দেশটির পশ্চিমে সিরিয়া, দক্ষিণে ইরাক, পূর্বে সৌদি আরব এবং উত্তরে ইসরাইল।[১০৭]

---

১০৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১১১০।

১০৫. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ৭২

১০৬. ভবেশ রায়, দেশ দেশান্তর, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭, পৃ. ৪৪

১০৭. ভবেশ রায়, দেশ দেশান্তর, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন শহর

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন শহর

মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা সেকল জনপদের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে কতগুলো হচ্ছে শহর। শহরগুলো হলো- মক্কা, মদীনা, বাবেল শহর, তায়েফ, রোম, ইরাম, লুত (আ) এর শহর, ইনত্বাকিয়া শহর, মাদায়েন শহর, দাউদ (আ)-এর রাজ্য, সাবা শহর, আইকা, হিজর, মারইয়াম (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর আশ্রয়স্থল, ফিলিস্তিনের বুহায়রা লূত নামক স্থান।

মক্কা শরীফ

পবিত্র কুর'আনে কাবা শরীফের স্থানকে মক্কা বলে অবহিত করা হয়েছে এবং ঐ স্থান অত্যন্ত পবিত্র জায়গা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া পবিত্র কুর'আনে মক্কাকে বুঝাতে কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্কা বা শহরের মূল, উম্মুল কুরা বা শহর সমূহের মূল, বালাদুল আমিন বা নিরাপদ শহর, উপত্যকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

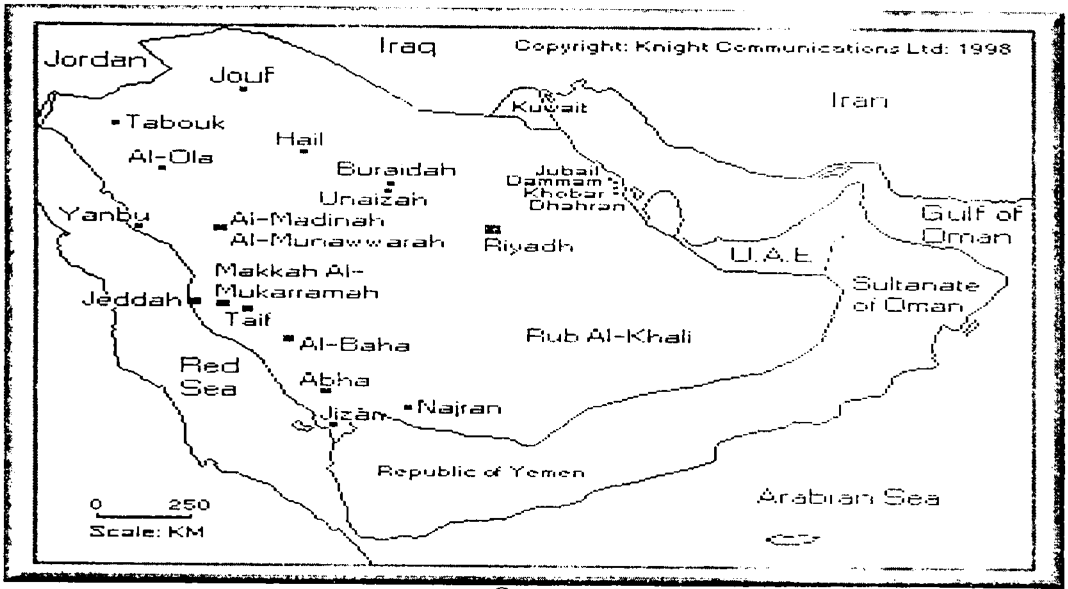

মক্কা শরীফের মানচিত্র

মক্কা সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

বালাদুল আমিন বা নিরাপদ শহর

আর এও স্মরণ করো যে, ইবরাহীম দোয়া করেছিলঃ "হে আমার রব! এই শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও। আর এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখেরাতেকে মানবে তাদেরকে সব রকমের ফলের আহার্য দান করো।" জবাবে তার রব বললেনঃ "আর যে মানবে না, দুনিয়ার গুটিকয় দিনের জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রী আমি তাকেও দেবো। কিন্তু সব শেষে তাকে জাহান্নামের আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবো এবং সেটি নিকৃষ্টতম আবাস ।"[১]

(وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ)
স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলেছিলেনঃ হে আমার রব! এ নগরীকে নিরাপত্তাময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।[২]

(وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ)
ক্বসম এই শান্তিপূর্ণ শহরের (মক্কার)।[৩]

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মধ্যে অনেক বেশী মতবিরোধ দেখা যায়। হাসান বসরী, ইকরামাহ , আতা ইবনে আবী রাবাহ , জাবের ইবনে যায়েদ , মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখয়ী রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, তীন বা ইনজীর (গোল হালকা কালচে বর্ণের এক রকম মিষ্টি ফল) বলতে এই সাধারণ তীনকে বুঝানো হয়েছে, যা লোকেরা খায়। আর যায়তূন বলতেও এই যায়তূনই বুঝানো হয়েছে , যা থেকে তেল বের করা হয়। ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম এরি সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)- এর একটি উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। যেসব তাফসীরকার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন তারা তীন ও যায়তূনের বিশেষ গুণাবলী ও উপকারিতা বর্ণনা করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে , এসব গুণের কারণে মহান আল্লাহ এই দু'টি ফলের কসম খেয়েছেন। সন্দেহ নেই ,একজন সাধারণ আরবী জানা ব্যক্তি তীন ও যায়তূন শব্দ শুনে সাধারণভাবে আরবীতে এর পরিচিত অর্থটিই গ্রহণ করবেন। কিন্তু দু'টি কারণে এই গ্রহণ করা যায় না। এক, সামনে সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের কসম খাওয়া হয়েছে; আর দু'টি ফলের সাথে দু'টি শহরের কসম খাওয়ার ব্যাপারে কোন মিল নেই। দুই, এই চারটি জিনিসের কসম খেয়ে সামনের দিকে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের আলোচনা তার সাথে খাপ খায় কিন্তু এই ফল দু'টির আলোচনা তার সাথে মোটেই খাপ খায় না। মহান আল্লাহ কুর'আন মজীদে যেখানেই কোন জিনিসের কসম খেয়েছেন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উপকারিতা গুণের জন্য খাননি। বরং কসম খাবার পর যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সেই বিষয়ের জন্যই কসম খেয়েছেন। কাজেই এই ফল দু'টির বিশেষ গুণাবলীকে কসমের কারণ হিসেবে উপস্থাপিত করা যায় না।

অন্য কোন কোন তাফসীরকার তীন ও যায়তূন বলতে কোন কোন স্থান বুঝিয়েছেন। কা'ব আহবার, কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ বলেন, তীন বলতে দামেশক এবং যায়তূন বলতে বায়তূল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা)- এর একটি উক্তি ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, তীন বলতে হযরত নূহ (আ) জূদী পাহাড়ে যে মসজিদ বানিয়েছিলেন তাকে বুঝানো হয়েছে। আর যায়তূন বলতে বায়তূল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। কিন্তু একজন সাধারণ আরবের মনে "ওয়াত তীন ওয়ায যায়তূনে" (وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ) শব্দগুলো শুনা মাত্রই এই অর্থ উকি দিতে পারতো না এবং তীন ও যায়তূন যে এই দু'টি স্থানের নাম কুর'আনের প্রথম শ্রোতা আরববাসীদের কাছে তা মোটেই সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত ছিল না।

---

১. আল-কুর'আন, ২ঃ ১২৬
২. আল-কুর'আন, ১৪ঃ ৩৫
৩. আল-কুর'আন, ৯৫ঃ ২

Dhaka University Institutional Repository

তবে যে এলাকায় যে ফলটি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হতো অনেক সময় সেই ফলের নামে সেই এলাকার নামকরণ করার রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই প্রচলন অনুসারে তীন ও যায়তূন শব্দের অর্থ এই ফল দু'টি উৎপাদনের সমগ্র এলাকা হতে পারে। আর এটি হচ্ছে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকা।কারণ সে যুগের আরবে তীন ও যায়তূন উৎপাদনের জন্য এ দু'টি এলাকাই পরিচিত ছিল। ইবনে তাইমিয়া ,ইবনুল কাইয়েম ,যামাখশারী ও আলুসী রাহেমাহুমুল্লাহ এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে ইবনে জারীর প্রথম বক্তব্যটিকে অগ্রাধিকার দিলেও একথা মেনে নিয়েছেন যে, তীন ও যায়তূন মানে এই ফল দু'টি উৎপাদানের এলাকাও হতে পারে।হাফেজ ইবনে কাসীরও এই ব্যাখ্যাটি প্রাধানযোগ্য মনে করেছেন।[৪]

বাক্কা বা শহরের মূলঃ

(اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ) -

নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম যে ঘর মানুষের জন্য স্থাপিত হয়েছিল তা তো সে ঘর যা মক্কায় অবস্থিত যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত।[৫]

ইহুদীদের আপত্তি ছিল এই- মুসলমানেরা বাইতুল মাকদিসকে বাদ দিয়ে কাবাকে কিবলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছো কেন? অথচ এ বাইতুল মাকদিসই ছিল পূর্ববর্তী নবীদের কিবলাহ্। সূরা বাকারায় এ আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা এরপর ও নিজেদের আপত্তির ওপর জোর দিয়ে আসছিল। তাই এখানে আবার এর জবাব দেয়া হয়েছে। বাইতুল মাকিদস সম্পর্কে বাইবেল নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, হযরত মূসা (আ) এর সাড়ে চারশো বছর পর হযরত সুলাইমান (আ) এটি নির্মাণ করেছিলেন।[৬]

আর হযরত সুলাইমান (আ)- এর আমলেই এটি তাওহীদবাদীদের কিবলাহ্ গণ্য হয়।[৭] বিপরীত পক্ষে সমগ্র আরববাসীর একযোগে সুদীর্ঘকালীন ধারাবাহিক বর্ণনায় একথা প্রমাণিত যে, কাবা নির্মাণ করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ) । তিনি হযরত মূসা (আ)- এর আট নয়শ বছর আগে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কাজেই কাবার অগ্রবর্তী অবস্থান ও নির্মাণ সন্দেহাতীতভাবে সত্য।[৮]

উম্মুল কুরা বা শহর সমূহের মূলঃ

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ -

---

৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১১১০
৫. আল-কুর'আন, ৩ঃ ৯৬
৬. প্রাগুক্ত, ১-রাজাবলী, ৬:১
৭. প্রাগুক্ত, ১-রাজাবলী, ৮:২৯-৩০
৮. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

এ কুর'আন এমন কিতাব যা আমি নাযিল করেছি. যা বরকতময়, পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী এবং এজন্য যে, আপনি ভয় প্রদর্শন করেন মক্কাবাসী ও তার পার্শ্ববর্তী লোকদের। আর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং তারা নিজেদের নামাযের হেফাযত করে।[৯]

মানুষের ওপর আল্লাহর কালাম নাযিল হতে পারে এবং কার্যত হয়েছেও এরি স্বপক্ষে দেয়া হয়েছে প্রথম যুক্তিটি। এখন মুহাম্মাদ (স)- এর উপর যে কালামটি নাযিল হয়েছে সেটি আল্লাহরই কালাম, এর স্বপক্ষে দেয়া হচ্ছে এ দ্বিতীয় যুক্তিটি। এ সত্যটি প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য হিসেবে চারটি কথা পেশ করা হয়েছে।

এক: এ কিতাবটি বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য এর মধ্যে সর্বোত্তম মূলনীতি পেশ করা হয়েছে। এখানে নির্ভুল ও সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের শিক্ষা দেয়া হয়েছে সৎকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির উপদেশ দেয়া হয়েছে. পাক-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং অন্যদিকে মূর্খতা, অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ মনতা, জুলুম চরিত্রহীনতা, অশ্লীলতা ও অন্যান্য যেসব অসৎকর্ম তোমরা পবিত্র আসমানী কিতাবসমূহে স্তূপীকৃত করে রেখেছো সেগুলো থেকে এ কিতাবটিকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

দুই: এর আগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব হেদায়াতনামা এসেছিল এ কিতাব সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে অন্য কোন হেদায়াত পেশ করে না বরং সেগুলোয় যা কিছু পেশ করা হয়েছিল তার সত্যতা প্রমাণ করে এবং তার প্রতি সমর্থন যোগায়।

তিন: প্রত্যেক যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উদ্দেশ্য কিতাব নাযিল করা হয়েছে এ কিতাবটিও সে একই উদ্দেশ্য নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে গালতির নিঁদ থেকে জাগিয়ে সতর্ক করা এবং বিপথগামী লোকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই এর উদ্দেশ্য।

চার: মানুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা দুনিয়া পূজারী ও প্রবৃত্তি লালসার দাসত্বে জীবন উৎসর্গকারী, এ কিতাব তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে সমবেত করেনি বরং নিজের চারদিকে এমন সব লোককে সমবেত করেছে যাদের দৃষ্টি দুনিয়ার সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে আরো আগে চলে যায়। তারপর এ কিতাবের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে তাদের জীবনে যে বিপ্লব আসে তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের আল্লাহ প্রীতির কারণে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করে। কোন মিথ্যাচারী ব্যক্তি যে কিতাব রচনা করেছেন এবং নিজের রচনাকে আল্লাহর রচনা বলে চালিয়ে দেবার চরম ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে তার সে কিতাব কি এহেন বৈশিষ্ট ও সুফলের অধীকারী হতে পারে।[১০]

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ
فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ -

এরূপে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কুর'আনকে ওহীরূপে নাযিল করেছি, যেন আপনি সতর্ক করেন মক্কাবাসীদেরকে এবং তার আশপাশের লোকাদেরকে, এবং সতর্ক করেন কেয়ামতের দিন সম্পর্কে, যার সংঘটন সমন্ধে কোন সন্দেহ নেই; সেদিন একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১১]

---

৯. আল-কুর'আন, ৬ঃ ৯২

১০. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ৩৯৫

১১. আল-কুর'আন, ৪২ঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

যদি তোমরা রাসুলকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাঁকে বহিস্কার (মক্কা হতে) করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি স্বীয় সঙ্গীকে বলেছিলেন- বিষণ্ন হবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। তারপর আল্লাহ স্বীয় প্রশান্তি তাঁর উপর নাযিল করলেন এবং তাঁকে শক্তিদান করলেন এমন সেনাবাহিনী দিয়ে যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। বস্তুত আল্লাহ কাফেরদের কথা নিচু করে দিলেন এবং আল্লাহর বাণীই সর্বোপরি সমুন্নত। আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময় ।[১২]

মক্কার কাফেররা যখন নবী (সা) কে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল, এটা সে সময়ের কথা। যে রাতে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সে রাতেই তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেছিলেন। ইতিপূর্বে দুজন চারজন করে যেতে যেতে মুসলমানদের বেশীর ভাগ মদীনায় পৌছে গিয়েছিল। মক্কায় কেবলমাত্র তারাই থেকে গিয়েছিল যারা ছিল একেবারেই অসহায় অথবা যাদের ঈমানের মধ্যে মোনাফেকীর মিশ্রণ ছিল এবং তাদের ওপর কোন প্রকারে ভরসা করা যেতে পারতো না। এ অবস্থায় যখন তিনি জানতে পারলেন,তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তখন তিনি শুধুমাত্র একজন সাথী হযরত আবু বকর (রা)- কে সংগে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়লেন। নিশ্চয়ই তার পেছনে ধাওয়া করা হবে, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি মদিনার পথ ছেড়ে (যা ছিল উত্তরের দিকে) দক্ষিণের পথ অবলম্বন করলেন। এখানে তিন দিন সাওর নামক পর্বত গুহায় আত্মগোপন করে থাকলেন। তাঁর রক্ত পিপাসু দুশমনেরা তাঁকে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মক্কার আশপাশের উপত্যকাগুলোর কোন জায়গা খুঁজতে তারা বাকী রাখেনি। এভাবে তাদের কয়েকজন খুঁজতে খুঁজতে যে গিরি গুহায় তিনি লুকিয়েছিলেন তার মুখে পৌছে গেলো। হযরত আবু বরক (রা) ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, দুশমনদের একজন যদি একটু ভিতরে ঢুকে উকি দেয়, তাহলে তাদের দেখে ফেলবে। কিন্তু নবী (স) একটুও বিচলিত না হয়ে হযরত আবু বকর (স) কে এ বলে সান্তনা দিলেন, "চিন্তিত হয়ো না, মন খারাপ করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন" ।[১৩]

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ -

তারা কি এর প্রতি লক্ষ্য করে না যে, আমি 'হরম'-কে নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি? অথচ তাদের আশপাশের লোকদের উপর অতর্কিতে হামলা করা হয়। তবুও কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর নেয়ামতসমুহের নাশোকরী করবে?[১৪]

সরাসরি মক্কা

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا -

---

১২. আল-কুর'আন, ৯ ঃ ৪০

১৩. আত-তাবারী, আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, (আল-ইমাম), জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন, বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮/১৯৮০, খ. ৬, পৃ. ১১

১৪. আল-কুর'আন, ২৯ঃ ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

আর তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।[১৫]

চাষাবাদহীন অনুর্বর উপত্যকা

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ
النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে কতককে চাষাবাদহীন অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে আবাদ করেছি। হে আমাদের রব! যেন তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং ফলাদি দিয়ে তাদের রুযীর ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা শোকর করে ।[১৬]

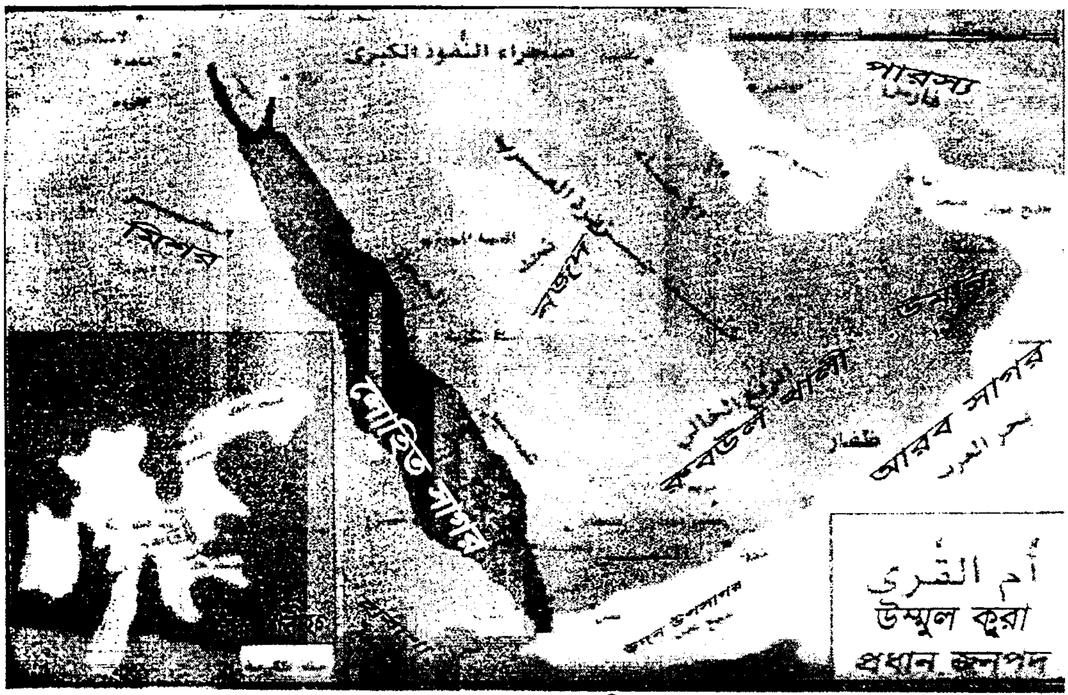

মক্কা শহরের মানচিত্র

দুই গ্রাম

'মিনাল ক্বারইয়াতাইনি' বা দুই গ্রাম দ্বারা মক্কা ও তায়েফকে বুঝানো হয়েছে। দুটি শহর অর্থ মক্কা ও তায়েফ। কাফেররা বলতো সত্যিই যদি আল্লাহর কোন রসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো এবং তিনি সেই রসূলের কাছে তাঁর কিতাব নাযিল করতে চাইতেন তাহলে আমাদের কেন্দ্রীয় মর্যাদার এই শহরগুলোর মধ্য থেকে কোন নামকরা লোককে বাছাই করতেন।

---

১৫. আল-কুর'আন, ৪৮ঃ ২৪

১৬. আল-কুর'আন, ৪ঃ ৩৭)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ রসুল বানানোর জন্য পেলেন এমন ব্যক্তিকে যে ইয়াতীম হয়ে জন্মলাভ করেছে, যে কোন উত্তরাধিকার লাভ করেনি, যে বকরি চরিয়ে যৌবনকাল অতিবাহিত করেছে, যে এখন স্ত্রীর সম্পদ দিয়ে জীবন যাপনও করে, ব্যবসা -বানিজ্য করে এবং যে কোন গোত্রের অধিপতি বা গোষ্ঠীর নেতা নয় । মক্কায় কি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা ও 'উতবা ইবনে রাবীআর মত সম্মানিত ও নামযাদা লোক ছিল না ? তায়েফে কি উরওয়া ইবনে মাসউদ, হাবীব ইবনে 'আমর, কিনানা ইবনে আবদে আমর এবং ইবনে আবদে ইয়ালীলের মত নেতারা ছিল না ? এটা ছিল তাদের, যুক্তি প্রমাণ । কোন মানুষ নবী হতে পারে প্রথমে তারা একথা মানতেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কুর'আন মজীদে যখন একের পর এক যুক্তি -প্রমান দিয়ে তাদের এ ধারনা পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া হলো এবং বলা হলো, ইতি পূর্বেও মানুষই সবসময় নবী হয়ে এসেছেন এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই রসূল হতে পারেন অন্য কেউ নয়। দুনিয়াতে রসূল হিসেবে যিনিই এসেছেন তিনি হঠাৎ আসমান থেকে নেমে আসেননি। মানুষের এসব জনপদেই তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, বাজারসমূহে চলাফেরা করতেন, সন্তানের পিতা ছিলেন এবং পানাহারের প্রয়োজন মুক্ত ছিলেন না।

(وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) -

তারা বলে, দুটি শহরের বড় ব্যক্তিদের কারো ওপর এ কুর'আন নাযিল করা হলো না কেন?[১৭]

দুই শহরে দুইজন প্রভাবশালী ব্যক্তি মক্কায় ওয়ালিদ ইবনে মুগিরাহকে আর তায়েফে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীকে বুঝাত।

দুটি শহর অর্থ মক্কা ও তায়েফ। কাফেররা বলতো সত্যিই যদি আল্লাহর কোন রসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো এবং তিনি সেই রসূলের কাছে তাঁর কিতাব নাযিল করতে চাইতেন তাহলে আমাদের কেন্দ্রীয় মর্যাদার এই শহরগুলোর মধ্য থেকে কোন নামকরা লোককে বাছাই করতেন।আল্লাহ রসুল বানানোর জন্য পেলেন এমন ব্যক্তিকে যে ইয়াতীম হয়ে জন্মলাভ করেছে, যে কোন উত্তরাধিকার লাভ করেনি, যে বকরি চরিয়ে যৌবনকাল অতিবাহিত করেছে, যে এখন স্ত্রীর সম্পদ দিয়ে জীবন যাপনও করে, ব্যবসা -বানিজ্য করে এবং যে কোন গোত্রের অধিপতি বা গোষ্ঠীর নেতা নয় । মক্কায় কি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা ও 'উতবা ইবনে রাবীআর মত সম্মানিত ও নামযাদা লোক ছিল না ? তায়েফে কি উরওয়া ইবনে মাসউদ, হাবীব ইবনে 'আমর, কিনানা ইবনে আবদে আমর এবং ইবনে আবদে ইয়ালীলের মত নেতারা ছিল না ? এটা ছিল তাদের, যুক্তি প্রমান । কোন মানুষ নবী হতে পারে প্রথমে তারা একথা মানতেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কুর'আন মজীদে যখন একের পর এক যুক্তি -প্রমান দিয়ে তাদের এ ধারনা পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া হলো এবং বলা হলো, ইতি পূর্বেও মানুষই সবসময় নবী হয়ে এসেছেন এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই রসূল হতে পারেন অন্য কেউ নয়। দুনিয়াতে রসূল হিসেবে যিনিই এসেছেন তিনি হঠাৎ আসমান থেকে নেমে আসেননি। মানুষের এসব জনপদেই তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, বাজারসমূহে চলাফেরা করতেন, সন্তানের পিতা ছিলেন এবং পানাহারের প্রয়োজন মুক্ত ছিলেন না। তখন তারা কৌশল পরিবর্তন করে বললো, বেশতো, মানুষই রাসূল হয়েছেন তা ঠিক। কিন্তু তাকে তো কোন নামজাদা লোক হতে হবে। তিনি হবেন সম্পদশালী, প্রভাবশালী, বড় দলবদলের অধিকারী এবং মানুষের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বেও প্রভাব থাকবে। সে জন্য মুহাম্মাদ (স) কি করে উপযুক্ত হতে পারেন?[১৮]

---

১৭. আল-কুর'আন, ৪৩ঃ ৩১

১৮. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১২২৭

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি

মক্কা (আরবি: مكة ম্যাক্কা /makka/), পূর্ণ নাম: মাক্কাহ্ আল মুকাররামাহ্, আরবি: مكة المكرمة ম্যাক্যাতুল্ মুক্যার্র‍্যাম্যা / makka muakarrama/) সৌদি আরবে অবস্থিত একটি শহর, যা ইসলাম ধর্মের পবিত্রতম নগরী। এখানেই ইসলাম ধর্মের পবিত্রতম স্থান কাবা শরীফ অবস্থিত। প্রতিবছর হজ্জ্ব উপলক্ষে এখানে লাখ লাখ মুসলিম সারা বিশ্ব হতে আগমন করে থাকে।[১৯]

ভৌগোলিক অবস্থা

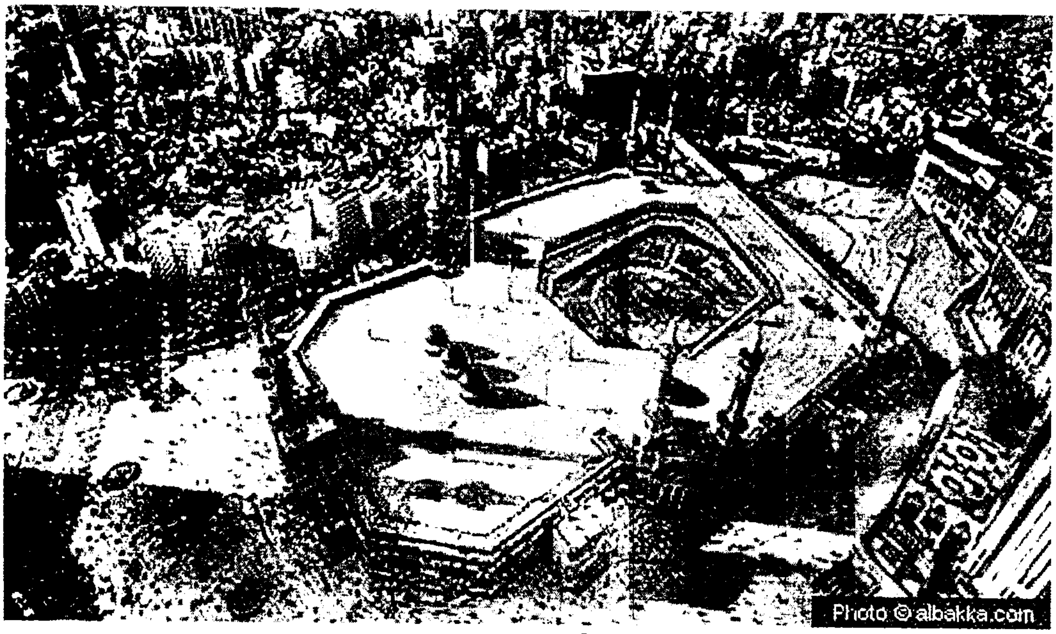

মক্কা শহরের চিত্র

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

মক্কা বিজয় প্রেক্ষাপট

হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তিতে আরব গোত্রগুলোকে এই অধিকার দেয়া হয়েছিলো যে, তারা মুসলমান এবং কাফিরদের মধ্যে যে কোনো পক্ষের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। এই শর্তানুযায়ী বনু খোজা'আ গোত্র মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো আর বনু বকর গোত্র মৈত্রী স্থাপন করলো কুরাইশদের সঙ্গে। এভাবে প্রায় দেড় বছর এই সন্ধি-চুক্তি পূর্ণভাবে পালিত হলো। কিন্তু তারপরই এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। ইতঃপূর্বে খোজা'আ ও বকর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বেশ কিছুকাল যাবত লড়াই চলে আসছিলো ; এদের মধ্যে হঠাৎ একদিন বনু বকর গোত্র খোজা'আদেরকে আক্রমণ করে বসলো এবং এ ব্যাপারে কুরাইশগণ বনু বকরকে সাহায্য প্রদান করলো। কারণ খোজা'আ গোত্র তাদের মর্জীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় কুরাইশরা আগে থেকেই তাদের ওপর খাপ্পা ছিলো।

---

১৯. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে উভয় পক্ষ মিলে খোজা'আ গোত্রের লোকদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করতে শুরু করলো। এমন কি তারা কা'বা শরীফে অশ্রয় গ্রহণ করেও রেহাই পেলো না; বরং সেখানেরও তাদের রক্তপাত করা হলো।

খোজা'আগণ বাধ্য হয়ে হযরত (স)-কে তাদের দুরাবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলো এবং তাঁর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী তারা সাহায্য প্রার্থনা করলো। হযরত (স) খোজা'আদের এই মজলুমী অবস্থার কথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি এই নিষ্ঠুর আচরণ থেকে বিরত থাকার এবং নিম্নোক্ত তিনটি শর্তের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করার আহবান জানিয়ে কুরাইশদের কাছে একজন দূত প্রেরণ করলেন :

১. খোজা'আদের যে সব লোক নিহত হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অথবা
২. বনু বকরের সাথে কুরাইশদের সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে কিংবা
৩. হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

দূত মারফত এই পয়গাম শুনে কোরতা বিন্ উমর নামক জনৈক কুরাইশ বললো : 'আমরা তৃতীয় শর্তটাই সমর্থন করি।' কিন্তু দূত চলে যাবার পর তাদের খুব আফসোস হলো এবং হুদাইবিয়ার সন্ধি পুনর্বহাল করার জন্যে নিজেদের পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ানকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করলো। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি, বিশেষত কুরাইশদের এতদিনকার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত (স) তাদের এই নয়া প্রস্তাব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলেন না। তিনি আবু সুফিয়ানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি

কা'বাগ্রহ ছিলো খালেস তওহীদের কেন্দ্রস্থল। নির্ভেজাল খোদার বন্দেগীর জন্যে এটি হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এ যাবতকাল তা মুশরিকদের অধিকারে থেকে শিরকের সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র-স্থলে পরিণত হয়েছিলো। হযরত মুহাম্মদ (স) প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ) এর প্রচারিত দ্বীনের আহবায়ক এবং খালেস তওহীদের অনুবর্তী ছিলেন। এ কারণে তওহীদের এই পবিত্র কেন্দ্রস্থলকে শিরকের সমস্ত নাপাকী ও নোংরামি থেকে অবিলম্বে মুক্ত করার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু এতদিন এ অবস্থা অনুকূলে ছিলো না। হযরত (স) এবার অনুমান করতে পারলেন যে, অল্লাহর এই পবিত্র ঘরকে শুধু তাঁরই ইবাদতের জন্যে নির্ধারিত করা এবং মূর্তিপূজার সমস্ত অপবিত্রতা থেকে একে মুক্ত করার উপযুক্ত সময় এসেছে। তাই তিনি চুক্তিবদ্ধ সমস্ত গোত্রের কাছে এ সম্পর্কে পয়গাম পাঠালেন। অন্য দিকে এই প্রস্তুতির কথা যাতে মক্কাবাসীরা জানতে না পারে, সেজন্যে তিনি কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করলেন। প্রস্তুতি কার্য সম্পন্ন হলে অষ্টম হিজরীর ১০ রমযান প্রায় দশ হাজার আত্মোৎসর্গী সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে হযরত (স) মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে অন্যান্য আরব গোত্রও এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলো।

আবু সুফিয়ানের গ্রেফতারী

মুসলিম সৈন্যবাহিনী মক্কার সন্নিকটে পৌঁছলে কুরাইশ-প্রধান আবু সুফিয়ান গোপনে তাদের সংখ্যা-শক্তি আন্দাজ করতে এলো। এমনি অবস্থায় হঠাৎ তাকে গ্রেফতার করে হযরত (স)-এর খেদমতে হাযির করা হলো। এ সেই আবু সুফিয়ান, ইসলামের দুশমনি ও বিরুদ্ধতায় যার ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। এই ব্যক্তিই বারবার মদীনা আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিলো এবং একাধিকবার হযরত (স)-কে হত্যা করার গোপন চক্রান্ত পর্যন্ত ফেঁদেছিলো। এই সব গুরুতর অপরাধের কারণে আবু সুফিয়ানকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা উচিত ছিলো। কিন্তু হযরত (স) তার প্রতি করুণার দৃষ্টি প্রসারিত করে বললেন : 'যাও, আজ আর তোমাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিন। তিনি সমস্ত ক্ষমা প্রদর্শনকারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ক্ষমা প্রদর্শনকারী।'

Dhaka University Institutional Repository

আবু সুফিয়ানের সঙ্গে এই আচরণ ছিলো সম্পূর্ণ অভিনব। রাহমাতুল্লিল আলামীন-এর এই অপূর্ব ঔদার্য আবু সুফিয়ানের হৃদয় -নেত্রকে উন্মীলিত করে দিলো। সে বুঝতে পারলো, মক্কায় সৈন্য নিয়ে আসার পেছনে এই মহানুভব ব্যক্তির হৃদয়ে না প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা আছে আর না আছে দুনিয়াবী রাজা-বাদশাদের ন্যায় কোনো স্পর্ধা-অহংকার। এ কারণেই তাকে মুক্তিদান করা সত্ত্বেও সে মক্কায় ফিরে গেলো না; বরং ইসলাম গ্রহণ করে হযরত (স)-এর আত্মোৎসর্গী দলেরই অন্তর্ভুক্ত হলো।

মক্কায় প্রবেশ

এবার হযরত (স) খালিদ বিন অলীদ (রা)-কে আদেশ দিলেন : 'তুমি পিছন দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করো, কিন্তু কাউকে হত্যা করো না। অবশ্য কেউ যদি তোমার ওপর অস্ত্র উত্তোলন করে, তাহলে আত্মরক্ষার জন্যে তুমি ও অস্ত্র ধারন করো।' এই বলে হযরত (স) নিজে সামনের দিক থেকে শহরে প্রবেশ করলেন। হযরত খালিদ-এর সৈন্যদের ওপর কতিপয় কুরাইশ গোত্র তীর বর্ষণ করলো এবং তার প্রত্যুৎত্তর দিতে হলো। ফলে ১৩ জন হামলাকারী নিহত হলো এবং বাকী সবাই পালিয়ে গেলো। হযরত (স) এই পাল্টা হামলার কথা জানতে পেরে হযরত খালিদ-এর কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে বললেন : 'খোদার ফয়সালা এ রকমই ছিলো।' পক্ষান্তরে হযরত (স) কোনোরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করলেন। তাঁর সৈন্যদের হাতে একটি লোকও নিহত হলো না।

মক্কায় সাধরণ ক্ষমা

হযরত (স) মক্কায় প্রবেশ করে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বললেন না, বরং তিনি এই মর্মে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেনঃ

১. যারা আপন ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে থাকবে, তারা নিরাপদ।
২. যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, তারও নিরাপদ এবং
৩. যারা কা'বাগৃহে আশ্রয় নেবে, তারাও নিরাপদ।

কিন্তু এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা থেকে এমন ছয়-সাত ব্যক্তি ব্যতিক্রম ছিলো, ইসলামের বিরুদ্ধতায় ও মানবতা বিরোধী অপরাধে যাদের ভূমিকা ছিলো অসাধারণ এবং যাদের হত্যা করার প্রয়োজন ছিলো অপরিহার্য।

নবী করীম (স) কি অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলেন, তাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পতাকা ছিলো সাদা ও কালো রঙের। মাথায় ছিলো লৌহ শিরস্ত্রাণ এবং তার ওপর ছিলো কালো পাগড়ী বাঁধা। তিনি উচ্চ:স্বরে সূরা ফাতাহ (ইন্না ফাতাহনা) তিলাওয়াত করছিলেন। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা সমীপে তাঁর এমনি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পাচ্ছিলো যে, সওয়ারী উটের পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ার দরুন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল যেনো উটের কুঁজ স্পর্শ করছিলো।

কা'বা গৃহে প্রবেশ

হযরত (স) কা'বা মসজিদে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম মর্তিগুলোকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তখন কাবাগৃহে ৩৬০ টি মূর্তি বর্তমান ছিলো। তার দেয়ালে ছিলো নানারূপ চিত্র অংকিত। এর সবই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো। এভাবে আল্লাহর পবিত্র ঘরকে শিরকের নোংরামি ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা হলো। এরপর হযরত (স) তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন, কা'বা গৃহ তওয়াফ করলেন এবং 'মাকামে ইবরাহীম'-এ গিয়ে নামায আদায় করলেন। এই ছিল তার বিজয় উৎসব। এ উৎসব দেখে মক্কাবাসীদের হৃদয়-চক্ষু খুলে গেলো। তারা দেখতে পেলো, এতোবড়ো একটি বিজয় উৎসবে বিজয়ীরা না প্রকাশ করলো কোনো শান-শওকত আর না কোনো গর্ব-অহংকার, বরং অত্যন্ত বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সাথে তারা খোদার সামনে অবনমিত হচ্ছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর প্রশংসা ও জয়ধ্বনি উচ্চারণ করছে। এই দৃশ্য দেখে কে না বলে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাদশাহী কিংবা রাজত্ব জয় নয়, এ অন্য কিছু।

বিজয়ের পর ভাষণ

মক্কা বিজয় সম্পন্ন হবার পর হযরত (স) এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এর কিছু অংশ হাদীস শরীফে বিধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন-

'এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ (ইলাহ) নেই; কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং সমস্ত শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। জেনে রেখো; সমস্ত গর্ব-অহংকার, সমস্ত পুরনো হত্যা ও রক্তের বদলা এবং তামাম রক্তমূল্য আমার পায়ের নীচে। কেবল কা'বার তত্ত্বাবধান এবং হাজীদের পানি সরবরাহ এর থেকে ব্যতিক্রম। হে কুরাইশগণ! জাহিলী আভিজাত্য ও বংশ-মর্যাদার ওপর গর্ব প্রকাশকে অল্লাহ নাকচ করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ এক আদমের সন্তান আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

অতঃপর তিনি কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ -

"হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে পয়দা করেছি এবং তোমাদেরকে নানান গোত্র ও খান্দানে বিভক্ত করে দিয়েছি, যেনো তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। কিন্তু খোদার কাছে সম্মানিত হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে অধিকতর পরহেজগার। আল্লাহ মহাবিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।"[২০]

ইসলামের শ্রেষ্ঠতম বিজয়ী তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ের পর যে ভাষণ দান করেন, এই হচ্ছে তার নমুনা। এতে না আছে তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিঘাংসা, না আছে কোনো বিদ্বেষ। এতে না আছে তাঁর আপন কৃতিত্বের কোনো উল্লেখ আর না তাঁর আত্মোৎসর্গী সহকর্মীদের কোনো প্রশংসা, বরং প্রশংসা যা কিছু, তা শুধু আল্লাহরই জন্যে আর যা কিছু ঘটেছে তা শুধু তাঁরই করুণার ফলমাত্র।

আরব দেশে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হতো। বংশের কোনো ব্যক্তি কারো হাতে নিহত হলে ঐ বংশের স্মরণীয় ঘটনাবলীর মধ্যে তা শামিল করা হতো। এমনকি ভবিষ্যত বংশধররা পর্যন্ত হত্যাকারীর বংশ থেকে নিহত ব্যক্তিদের রক্তের বদলা না নিয়ে স্বস্তি লাভ করতো না। তাই এ উপলক্ষে হযরত (স) এ ধরনের যাবতীয় রক্তের বদলাকে বাতিল করে দিলেন এবং বলা যায়, তিনি আরববাসীদেরকে সত্যিকর অর্থে এক অনাবিল শান্তি ও স্বস্তিময় জীবন প্রদান করলেন। আরবে বংশ ও গোত্র নিয়ে গৌরব করার এক বহু পুরনো ব্যাধি বর্তমান ছিলো। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে এ ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি সম্পূর্ণ অবৈধ। ইসলামে পার্থক্য সৃষ্টির একমাত্র বৈধ মাপকাঠি হচ্ছে খোদায়ী বিধানের আনুগত্যের প্রশ্ন। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের যতো অনুগত হবে, তাঁর সন্তোষ-অসন্তোষকে ভয় করবে, সে ততোই সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বলে গণ্য হবে। ইসলামে বংশগত শরাফতের কোনে স্থান নেই। বংশ বা খান্দানের সৃষ্টি কেবল পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে। আল্লাহর রাসূল তাই এই ব্যাধিটিরও মূলোৎপাটন করে দিলেন এবং মানুষের জন্যে এমন এম সাম্যের বাণী ঘোষণা করলেন, আজ পর্যন্ত যা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মই মানুষকে দিতে পারে নি।

২০. আল-কুর'আন, ৪৯ঃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository

শত্রুর হৃদয় জয়

হযরত (স) যে জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেখানে বড়ো বড়ো কুরাইশ নেতা, উপস্থিত ছিলো। যে সব ব্যক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে জীবন পণ করেছিলো, সেখানে তারাও হাযির ছিলো। যাদের অকথ্য উৎপীড়নে মুসলমানরা একদিন নিজেদের ঘর-বাড়ি পর্যন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো, তারাও সেখানে ছিলো। যারা হযরত (স)-কে গালি-গালাজ করতো, তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো, তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করতো, প্রতি মুহূর্ত তাঁকে হত্যা করার চিন্তা করতো, তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলো। যে পাষণ্ড হযরত (স) -এর আপন চাচার কলিজা বের করে চিবিয়েছিলো, সেও সেখানে হাযির ছিলো। যারা এক খোদার বন্দেগী করার অপরাধে বেশুমার মুসলমানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলো, তারাও সেখানে ছিলো। হযরত (স) এদের সবার দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : 'বলো তো, আজ তোমাদের সঙ্গে আমি কিরূপ আচরণ করবো?' হযরত (স) কিভাবে মক্কায় পদার্পন করেছেন এবং এ পর্যন্ত কিরূপ ব্যবহার করেছেন, লোকেরা তা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলো। তাই তারা সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো :

'আপনি আমাদের সম্ভ্রান্ত ভ্রাতা ও সম্ভ্রান্ত- ভ্রাতুষ্পুত্র।' একথা শুনেই হযরত (স) ঘোষণা করলেন- 'যাও, আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই; তোমরা সবাই মুক্ত।' যারা মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর দখল করে নিয়েছিলো, হযরত (স) তাও তাদেরকে প্রত্যর্পন করার ব্যবস্থা করলেন না' বরং মুহাজিরদেরকে নিজেদের দাবি পরিত্যাগ করার উপদেশ দিলেন।

হযরত (স)-এর এই বিস্ময়কর আচরণে মুগ্ধ হয়ে বড় বড় কুরাইশ নেতা তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লো। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করলো : 'আপনি সত্যি আল্লাহর নবী, কোনো দেশজয়ী বাদশাহ নন। আপনি যে দাওয়াত পেশ করেন, তাই সত্য।'

এই ছিল মক্কা বিজয়ের দৃশ্য। এ বিজয় কোনো দেশ, সম্পদ বা ধন-রত্ন দখল নয়, এ ছিলো মানুষের হৃদয় - রাজ্য অধিকার আর এটাই ছিলো সবচেয়ে বড়ো জয়।[২১]

২১. আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, (অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), নাকিব পাবলিকেশন, ঢাকা: সর্বশেষ ২০০৬, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

মদীনা (ইয়াসরিব)

মদিনা (আরবি ভাষায় المدينة, সরকারী ভাবে: المدينة المنورة আল-মদিনা আল-মুনাওয়ারাহ) অথবা মদিনাহ হিসেবেও একে আনুবাদ করা হয়ে থাকে। পশ্চিমী সৌদি আরবের হেজায অঞ্চলের একটি শহর এবং আল মদিনাহ প্রদেশের রাজধানী। এইটি ইসলামের দ্বিতীয় পবিত্র শহর যেখানে মুসলমানদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)- এর কবর স্থান। এইটি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হযরত মুহাম্মাদ (স) হিজরতের পরে মদিনায় বসবাস করেছেন।[২২]

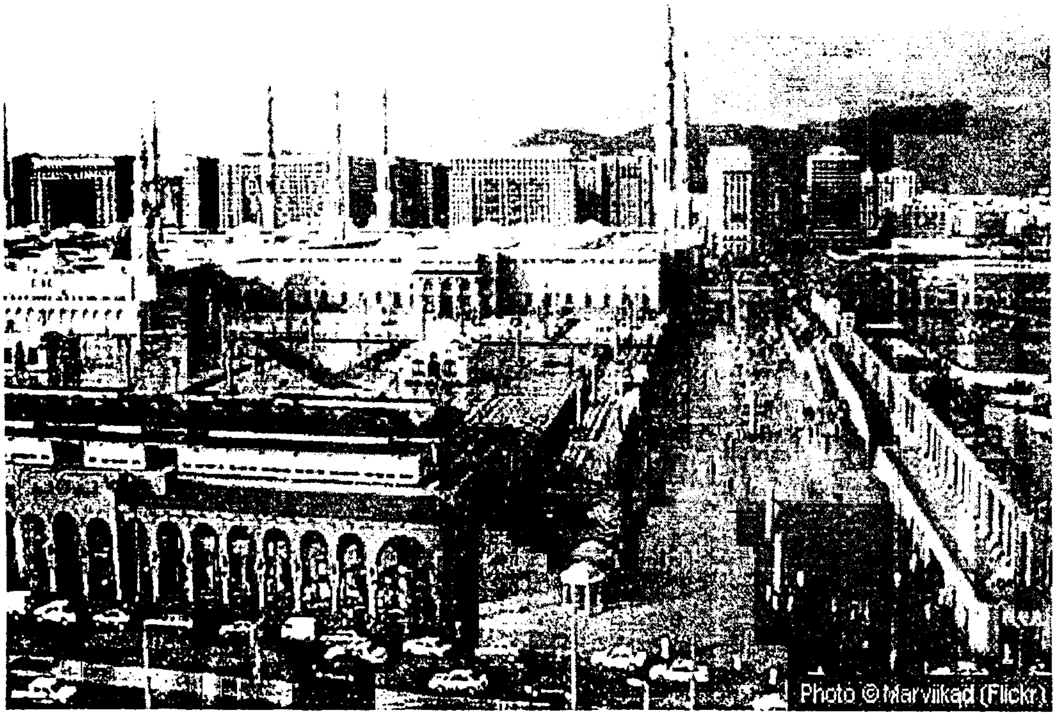

মদীনা শহরের চিত্র

মদীনা সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ -

---

২২. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ১২)

Dhaka University Institutional Repository

আর তোমাদের আশেপাশের মরুবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোক মোনাফেক এবং মদীনাবাসীদের মধ্য থেকেও কিছু লোক, তারা মোনাফেকীতে চরমে পৌঁছেছে। আপনি তাদের পরিচয় জানেন না, তাদের কেবল আমিই জানি। আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব এবং পরে তাদেরকে ভীষণ আযাবের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে ।[২৩]

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ -

মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের পক্ষে সমীচীন নয় আল্লাহর রাসুলের সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসুলের জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করা। এ কারণে যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা ক্লিষ্ট করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের ক্রোধের উদ্রেক করে, আর শত্রুর পক্ষ থেকে যা কিছু তারা প্রাপ্ত হয়, তার প্রতিটির বিনিময়ে তাদের জন্য একটি নেক আমল লিখিত হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।[২৪]

وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا -

তাদের মধ্যে থেকে একদল বলেছিল- হে মদীনাবাসী! এখানে তোমাদের তৃষ্টিবার স্থান নেই, অতএব ফিরে যাও। আর তাদের মধ্যে একদল নবীর কাছে অব্যাহতি চেয়ে বলেছিল- আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত। অথচ তা অরক্ষিত ছিল না। তারা তো শুধু পলায়ন করতেই চেয়েছিল।[২৫]

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

তারা বলেঃ "আমরা যদি মদীনায় ফিরে যাই, তবে প্রতিপত্তিশালীরা সেখান থেকে হীন লোকদেরকে অবশ্যই বের করে দেবে।" তাদের জেনে রাখা উচিত যে, ইজ্জত ও প্রতিপত্তি তো একমাত্র আল্লাহরই এবং তাঁর রাসুলের ও মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফেকরা তা জানে না ।[২৬]

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম বলেন- আমি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এ কথা রাসূলুল্লাহ (স) কে বললাম এবং সে এসে শপথ করে পরিষ্কার ভাষায় তা অস্বীকার করলো তখন আনসারদের প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ লোকজন এবং আমার আপন চাচা আমাকে অনেক তিরস্কার করলেন । এমনকি আমার মনে হলো নবী (স)ও আমাকে মিথ্যাবাদী এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে সত্যবাদী মনে করেছেন । এতে আমার এত দুঃখ ও মনঃকষ্ট হলো যা সারা জীবনে কখনো হয়নি । আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে নিজের জায়গায় বসে পড়লাম । পরে এ আয়াতগুলো নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে ডেকে হাসতে হাসতে আমার কান ধরে বললেন- ছোকরাটার কান ঠিকই শুনেছিল । আল্লাহ নিজে তা সত্য বলে ঘোষণা করেছেন।[২৭]

---

২৩. আল-কুর'আন, ৯ঃ ১০১
২৪. আল-কুর'আন, ৯ঃ ১২০
২৫. আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ১৩
২৬. আল-কুর'আন, ৬৩ঃ ৮
২৭. আত-তাবারী, আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, (আল-ইমাম), জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন, বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮/১৯৮০, খ. ৪, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا
أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

আর তাদেরও হক রয়েছে এ সম্পদে, যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করছে এবং ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা নিজেদের অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না। আর নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে। আর যে ব্যক্তি মনের কার্পণ্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম।[২৮]

এটা মদীনা তাইয়্যেবার আনসারদের পরিচয় ও প্রশংসা । মুহাজিরগণ মক্কা ও অন্যান্য স্থান থেকে হিজরত করে তাঁদের শহরে আসলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে প্রস্তাব দিলেন, আমাদের বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগান দিয়ে দিচ্ছি । আপনি ওগুলো আমাদের এবং এসব মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন । নবী (স) বললেন- এসব লোক তো বাগনের কাজ জানে না । তারা এমন এলাকা থেকে এসেছে যেখানে বাগান নেই । এমনকি হতে পারে না, এসব বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগানে তোমরাই কাজ করো এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ এদের দাও । তারা বলল- আমরা মেনে নিলাম ।[২৯]

এতে মুহাজিরগণ বলে উঠলেনঃ এ রকম আত্মত্যাগী মানুষ তারা আর কখনো দেখেনি । এরা নিজেরা কাজ করবে অথচ আমাদেরকে অংশ দেবে । আমাদের তো মনে হচ্ছে, সমস্ত সওয়াব তারাই লুটে নিয়েছে । নবী (স) বললেনঃ তা নয়, যতক্ষণ তোমরা তাদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে ততক্ষণ তোমরাও সওয়াব পেতে থাকবে ।[৩০]

অত:পর বনী নাযীরের এলাকা বিজিত হলে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন- এখন একটা বন্দোবস্ত হতে পারে এভাবে যে, তোমাদের বিষয়-সম্পদ এবং ইহুদীদের পরিত্যক্ত ফল-ফলাদি ও খেজুর বাগান মিলিয়ে একত্রিত করে সবটা তোমাদের মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যাক । আরেকটা বন্দোবস্ত হতে পারে এভাবে যে, তোমারা তোমাদের বিষয়-সম্পদ নিজেরাই ভোগ দখল করো আর পরিত্যক্ত এসব ভূমি মুহাজিরদের মধে বন্টন করে দেয়া যাক । আনসারগণ বললেনঃ এসব বিষয়-সম্পদ আপনি তাদের মধ্যে বিলি -বন্টন করে দিন । আর আপনি চাইলে আমাদের বিষয়-সম্পদেরও যতটা ইচ্ছা তাদের দিয়ে দিতে পারেন । এতে হযরত আবু বকর চিৎকার করে উঠলেন- "হে আনসারগণ, আল্লাহ্ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দিন।"[৩১]

এভাবে আনসারদের সম্মতির ভিত্তিতেই ইহুদীদের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো। আনসারদের মধ্যে থেকে শুধু হযরত আবু দুজানা, হযরত সাহল ইবনে সা'দ এবং কারো কারো বর্ণনা অনুসারে হযরত হারেস ইবনুস সিমাকে অংশ দেয়া হলো। কারণ, তারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। (বালযুরী, ইবনে হিশাম, রূহুল মায়ানী) বাহরাইন এলাকা ইসলামের রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হলে সে সময়ও আনসারগণ এ ত্যাগের প্রমাণ দেন। রাসূলুল্লাহ (স) ঐ অঞ্চলের বিজিত ভূমি শুধু আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

---

২৮. আল-কুর'আন, ৫৯ঃ ৯

২৯. আত-তাবারী, আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, (আল-ইমাম), জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮/১৯৮০, খ. ৩, পৃ. ১৬৯

৩০. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, দারুল মা'আরিফ, কায়রো, ১৯৫০

৩১. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, (অনু. খাদিজা আক্তার রেজায়ী), আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ঢাকা : চতুর্থ প্রকাশ-২০০০, পৃ. ৪৫৩

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু আনাসারগণ বললেন- যতক্ষণ আমাদের সমপরিমাণ অংশ আমাদের ভাই মুহাজিরদের দেয়া না হবে ততক্ষণ আমরা এ সম্পদের কোন অংশ গ্রহণ করবো না। (ইয়াহইয়াহ ইবনে আদম) আনসারদের এ সব ত্যাগের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন।[৩২]

'রক্ষা পেয়েছে' না বলে বলা হয়েছে 'রক্ষা করা হয়েছে'। কেননা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া কেউ নিজ বাহু বলে মনের ঔদার্য ও ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে না। এটা আল্লাহর এমন এক নিয়ামত যা আল্লাহর দয়া ও করুণায়ই কেবল কারো ভাগ্যে জুটে থাকে। (شُحّ) শব্দটি আরবী ভাষায় অতি কৃপণতা ও বখিলী বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দটিকে যখন (نفس) শব্দের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে (شُحَّ نَفْسِه) বলা হয় তখন তা দৃষ্টি ও মনের সংকীর্ণতা, পরশ্রীকাতরতা এবং মনের নীচতার সমার্থক হয়ে যায় যা বখলী বা কৃপণতার চেয়েও ব্যাপক অর্থ বহন করে। বরং কৃপণতার মূল উৎস এটাই। এই বৈশিষ্টের কারণে মানুষ অন্যের অধিকার স্বীকার করা এবং তা পূরণ করা তো দূরের কথা তার গুণাবলী স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করে । সে চায় দুনিয়ার সবকিছু সে-ই লাভ করুক। অন্য কেউ যেন কিছুই না পায় । নিজে অন্যদের কিছু দেয়া তো দূরের কথা , অপর কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কিছু দেয় তাহলেও সে মনে কষ্ট পায় । তার লালসা শুধু নিজের অধিকার নিয়ে কখনো সন্তুষ্ট নয়, বরং অন্যদের অধিকারেও সে হস্তক্ষেপ করে, কিংবা অন্ততপক্ষে সে চায় তার চারদিকে ভাল বস্তু যা আছে তা সে নিজের জন্য দু'হাতে লুটে নেবে অন্য কারো জন্য কিছুই রাখবে না । এ কারণে এ জঘণ্য স্বভাব থেকে রক্ষা পাওয়াকে কুর'আন মজীদে সাফল্যের গ্যারান্টি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (স)ও এটিকে মানুষের নিকৃষ্টতম স্বভাব বলে গণ্য করেছেন যা বিপর্যয়ের উৎস ।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বর্ণনার ভাষা হলো- "(شُحّ) থেকে নিজেকে রক্ষা করো । কারণ এটিই তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছে।" এটিই তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাত ঘটাতে এবং অপরের মর্যাদাহানি নিজের জন্য বৈধ মনে করে নিতে মানুষকে প্ররোচিত করেছে । এটিই তাদের জুলুম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তাই তারা জুলুম করেছে। পাপের নির্দেশ দিয়েছে তাই পাপ করেছে এবং আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করতে বলেছে তাই তারা আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করেছে । হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) বলেছেনঃ ঈমান ও মনের সংকীর্ণতা একই সাথে কারো মনে অবস্থান করতে পারে না। (ইবনে আবি শায়বা, নাসায়ী, বায়হাকী ফী শুআবিল ঈমান, হাকেম) হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেনঃ দুইটি স্বভাব এমন যা কোন মুসলমানের মধ্যে থাকতে পারে না । অর্থাৎ কৃপণতা ও দুশ্চরিত্রতা । (আবু দাউদ, তিরমিযী, বুখারী ফিল আদাব) কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কথা বাদ দিলে পৃথিবীতে জাতি হিসেবে মুসলমানরা আজও সবচেয়ে বেশী দানশীল ও উদারমনা । সংকীর্ণমন্যতা ও কৃপণতার দিক দিয়ে যেসব জাতি পৃথিবীতে নজিরবিহীন সেই সব জাতির কোটি কোটি মুসলমান তাদের স্বগোত্রীর অমুসলিমদের পাশাপাশি বাসবাস করছে । হৃদয়-মনের ঔদার্য ও সংকীর্ণতার দিক দিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় তা ইসলামের নৈতিক শিক্ষার অবদান । এ ছাড়া তার অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয়া যায় না । এ শিক্ষাই মুসলমানদের হৃদয়-মনকে বড় করে দিয়েছে ।[৩৩]

---

৩২. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১৩৪৯)

৩৩. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

এখানে প্রথমেই একটি বিষয়ে বুঝে নেয়া উচিত, যাতে বনী নাযীরের বহিষ্কারের ব্যাপারে কোন মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয় । নবী (স) এর সাথে বনী নাযীর গোত্রের যথারীতি একটি লিখিত চুক্তি ছিল । এ চুক্তিকে তারা বাতিলও করেছিলো না যে, তার কোন অস্তিত্ব নেই মনে করা চলে । তবে যে কারণে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল তা হলো, এই চুক্তি লংঘনের অনেকগুলো ছোট বড় কাজ করার পর তারা এমন একটি কাজ করে বসেছিল যা সুস্পষ্টভাবে চুক্তিভংগেরই নামান্তর । অর্থাৎ তারা চুক্তির অপর পক্ষ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল । আর তাও এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো যে, সে জন্য তাদেরকে চুক্তিভংগের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে তারা তা অস্বীকার করতে পারেনি । এরপর রাসূল (স) তাদেরকে দশদিন সময় দিয়ে এই মর্মে চরমপত্র দিলেন যে, এই সময়ের মধ্যেই তোমরা মদীনা ছেড়ে চলে যাও । অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে । এই চরম পত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে কুর'আন মজীদের নির্দেশ অনুসারে । কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে- "যদি তোমরা কোন কওমের পক্ষ থেকে বিশ্বাসভংগের (চুক্তি লংঘনের) আশংকা কর তাহলে সেই চুক্তি প্রকাশ্যে তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও ।"[৩৪]

এ কারণে তাদের বহিষ্কারকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন । কারণ, তা ছিল আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক । যেন তাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ বহিষ্কার করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলা নিজে বহিষ্কার করেছেন । দ্বিতীয় যে কারণটির জন্য তাদের বহিষ্কারকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন তা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ।[৩৫]

لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا
إِلَّا قَلِيلًا

যদি বিরত না হয় মুনাফেকরা ও যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা, তবে আমি অবশ্যই আপনাকে তাদের উপর পরাক্রমশালী করব, অতঃপর এ শহরে আপনার প্রতিবেশীরূপে তারা অল্পকালই অবস্থান করতে পারবে ।[৩৬]

---

৩৪. আল-কুর'আন, ৮ : ৫৮)

৩৫. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১৩৫১

৩৬. আল-কুর'আন, ৩৩ঃ ৬০

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক অবস্থান

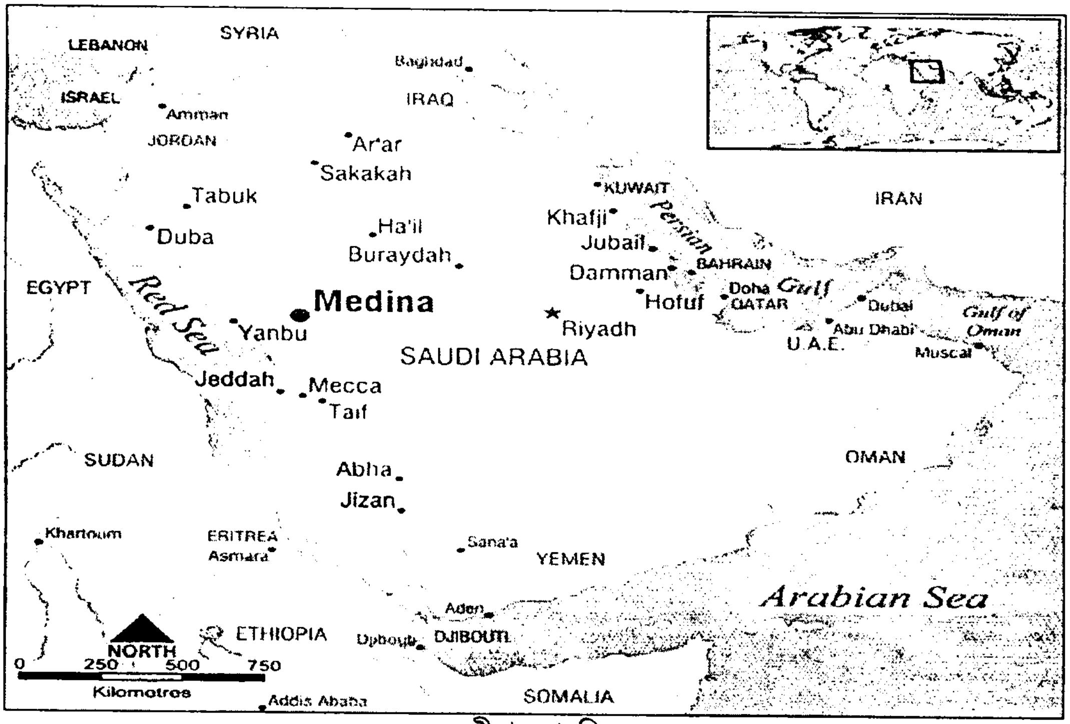

মদীনার মানচিত্র

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

নবী (স) মদীনায় আগমনের আগে খাযরাজ গোত্রে আবু আমের নামে এক ব্যক্তি ছিল। জাহেলী যুগে সে খৃষ্টান রাহেবের (সাধু) মর্যাদা লাভ করেছিল। তাকে আহলে কিতাবদের আলেমদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ্য করা হতো।অন্যদিকে সাধুগিরির কারণে পণ্ডিত সুলভ মর্যাদার পাশাপাশি তার দরবেশীর প্রভাবও মদীনা ও আশেপাশের এলাকার অশিক্ষিত আরব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। নবী (স) যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন সেখানে বিরাজ করছিল আবু আমেরের ধর্মীয় ও আধ্যত্মিক কতৃত্বের রমরমা অবস্থা। কিন্তু এ জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও দরবেশী তার মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যকে চেনার মতো ক্ষমতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে উল্টো তার জন্য একটি বিরাট অন্তরাল সৃষ্টি করলো। আর এ অন্তরাল সৃষ্টির ফলে রসূলের আগমণের পর সে নিজে ঈমানের নিয়ামত থেকে শুধু বঞ্চিতই রইল না । বরং রসূলকে নিজের ধর্মীয় পৌরহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বি এবং নিজের দরবেশী ও সাধু বৃত্তিক কর্মকাণ্ডের শত্রু মনে করে তার ও তার সমুদয় কার্যক্রমের বিরোধিতায় নেমে পড়লো। প্রথম দুবছর তার আশা ছিল কুরাইশী কাফেরদের শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা চরমভাবে পরাজিত হলো। এ অবস্থায় সে আর নীরব থাকতে পারলো না। সেই বছরই সে মদীনা থেকে বের হয়ে পড়লো। সে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করলো। যেসব কুচক্রীর চক্রান্ত ও যোগসাজশে ওহোদ যুদ্ধ বাধে, তাদের মধ্যে এ আবু আমেরও অন্যমত। বলা হয়ে থাকে, ওহোদের যুদ্ধের ময়দানে সে অনেকগুলো গর্ত খুঁড়েছিল। এরই একটির মধ্যে পড়ে গিয়ে নবী (স) আহত হয়েছিলেন। তারপর আহযাব যুদ্ধের সময় চারদিকে থেকে যে সেনাবাহী মদীনার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল তাকে আক্রমণে উস্কে দেয়ার ব্যাপারেও তার অগ্রনী ভুমিকা ছিল। এরপর হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত আরব মুশরিকও মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোতেই এ

Dhaka University Institutional Repository

ঈসায়ী দরবেশ ইসলামের বিরুদ্ধে মুশরিক শক্তির সক্রিয় সহয়ক ছিল। শেষ পর্যন্ত আরবের কোন শক্তি ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখে দিতে পারবে বলে তার আর আশা রইল না। কাজেই সে আরব দেশ ত্যাগ করে রোমে চলে যায় এবং আরব থেকে যে "বিপদ" মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে সে কাইসাকে (সীজার) অবহিত করে। এ সময়ই মদীনায় খবর পৌছে যে, কাইসার আরব আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এরই প্রতিবিধান করার জন্য নবী (স) কে তাবুক অভিযান করতে হয়।

ঈসায়ী রাহেব আবু আমেরের এ ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় তার সাথে শরীক ছিল মদীনার মুনাফিক গোষ্ঠির একটি দল। আবু আমেরকে তার ধর্মীয় প্রভাব ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে রোমের কাইসার ও উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টান আরব রাজ্যগুলোর সামরিক সাহায্য লাভ করতেও এ মুনাঠিকরা তাকে পরামর্শ দেয় ও মদদ যোগায়। যখন সে রুমের পথে রওয়ানা হচ্ছিল তখন তার ও এ মুনাফিকদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো। এ চুক্তি অনুযায়ী স্থির হলো, যে মদীনায় তারা নিজেদের একটি পৃথক মসজিদ তৈরী করে নেবে। এভাবে সাধারণ মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে মুনাফিক মুসলমানদের এমন একটি স্বতন্ত্র জোট গড়ে উঠবে যা ধর্মীয় আলখেল্লায় আবৃত থাকবে। তার প্রতি সহজে কোন প্রকার সন্দেহ করা যাবে না। সেখানে শুধু যে, মুনাফিকরাই সংঘটিত হবে এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য পরামর্শ করবে তা নয়। বরং আবু আমেরের কাছ থেকে যেসব এজেন্ট খবর ও নির্দেশ নিয়ে আসবে তারাও সন্দেহের উর্ধে থেকে নিরীহ ফকীর ও মুসাফিরের বেশে এ মসজিদে অবস্থান করতে থাকবে। এ ন্যাক্করজনক ষড়যন্ত্রটির ভিত্তিতেই এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং এ কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে।

মদীনায় এ সময় দুটি মসজিদ ছিল। একটি মসজিদে কুবা। এটি ছিল নগর উপকণ্ঠে। অন্যটি ছিল মসজিদে নববী। শহরের অভ্যন্তরে ছিল এর অবস্থান। এ দুটি মসজিদ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় একটি মসজিদ নির্মাণ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আর এটা কোন যুক্তিহীন ধর্মীয় আবেগের যুগ ছিল না যে, প্রয়োজন থাকুক ব না থাকুক মসজিদ নামে নিছক একটি ইমারত তৈরী করে দিলেই তখন নেকীর কাজ বলে মনে করা হবে।বরং একটি নতুন মসজিদ তৈরী করার অর্থই ছিল মুসলমানদের জামায়াতের মধ্যে অনর্থক বিভেদ সৃষ্টি করা। একটি সত্যনিষ্ঠা ইসলামী ব্যবস্থা কোনক্রমেই এটা বরদাশত করতে পারে না। তাই তারা নিজেদের পৃথক মসজিত তৈরী কারার আগে তার প্রয়োজনের বৈধতা, প্রমাণ করতে বাধ্য ছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা নবী (স) এর সামনে এ নতুন নির্মাণ কাজের প্রয়োজন পেশ করে। এ প্রসঙ্গে তারা বলে, বৃষ্টি বাদলের জন্য এবং শীতের রাতে সাধারণ লোকদের বিশেষ করে উল্লেখিত দুটি মসজিদ থেকে দুরে অবস্থানকারী বৃদ্ধ, দুর্বল ও অক্ষম লোকদের প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে হাজিরা দেয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় । কাজেই আমরা শুধুমাত্র নামাযীদের সুবিধার্থে এ নতুন মসজিদটি নির্মাণ করতে চাই।

মুখেএ পবিত্র ও কল্যাণমূসক বাসনার কথা উচ্চারণ করে যখন এ "দ্বিরার", (ক্ষতিকর) মসজিদটির নির্মাণ কাজ শেষ হলো তখন এ দুর্বৃত্তরা নবী (স) এর দরবারে হাযির হলো এবং সেখানে একবার নামায পরিয়ে মসজিদটির উদ্বোধন করার জন্য তার কাছে আবেদন জানালো। কিন্তু আমি এখন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি এবং শীঘ্রই আমাকে একটি বড় অভিযানে বের হতে হবে, সেখান থেকে ফিরে এসে দেখা যাবে, একথা বলে তিনি তাদের আবেদন এড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাবুক রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং তার রওয়ানা হওয়ার পর এ মুনাফিকরা এ মসজিদে নিজেদের জোট গড়ে তুলতে এবং ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলো।

এমন কি তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, ওদিকে রোমানদের হাতে মুসলমানদের মুলোৎপাটনের সাথে সাথেই এদিকে এরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মাথায় রাজ মুকূট পরিয়ে দেবে। কিন্তু তবুকের যা ঘটলো তাতে তাদের সে আশার গুড়ে বালি পড়লো। ফেরার পথে নবী (স) যখন মদীনার নিকটবর্তী "যী আওয়ান" নামক

Dhaka University Institutional Repository

স্থানে পৌছলেন তখন এ আয়াত নাযিল হলো। তিনি তখনই কয়েকজন লোককে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন, তার মদীনায় পৌছার আগেই যেন তারা দ্বিরার মসজিদটি ভেংগে ধূলিস্মাত করে দেয়।[৩৭]

হিজরতের প্রস্তুতি

এতৎভিন্ন এ পর্যায়ের কালামে হিজরতের জন্যেও বারবার ইশারা আসতে লাগলো। এই সূরা আনকাবুতেই নির্দেশ করা হলোঃ 'হে আমার বান্দাহ গণ!তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী করতে থাকো। আমার বন্দেগীর কারণে যদি স্বদেশের জমিন তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সে জন্যে কোন পরোয়া করো না। আমার জমিন অত্যন্ত প্রসস্ত ; এজন্য যদি ঘরবাড়িও ও ছেড়ে দিতে হয় দাও, কিন্তু আমার বন্দেগীর সম্পর্ক ছিন্ন করো না।কোন জানদারের পক্ষে সবচেয়ে বড় ভয় যা হতে পারে, তাহলো মৃত্যুভয়। নিশ্চয় জেনে রেখ, প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তার পর সবাইকে আবার আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। কাজেই সেই মৃত্যু যদি আমার পথেই আসে, তাহলে আর চিন্তা কিসের ? যে কেউ ঈমান ও সৎকর্মের পুঁজি নিয়ে আসবে, তাকে এমন আরামদায়ক বাগিচায় স্থান দেয়া হবে, যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে চিরকাল সে অবস্থান করবে। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, যারা কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও আল্লাহর দ্বীনের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং যারা নিজেদের প্রতিটি ক্রিয়াকর্মে শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপরই ভরসা রাখে, তাদের জন্যে এ কত উত্তম বিনিময়!এরপর বলা হলো যে, আল্লাহর পথে ঘর-বাড়ি ছাড়বার দ্বিতীয় ভয় হচ্ছে আর্থিক দুর্গতি। এ সম্পর্কে তাদের এই প্রত্যয়কে আরো মজবুত করা হলো যে, প্রকৃতপক্ষে রিযিক দেবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।দুনিয়ায় বিচরণশীল কত প্রাণী রয়েছে; তাদের কেউই আপন রিযিক সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের রিযিক যুগিয়ে থাকেন। কাজেই রিযিক দাতা হিসেবে তার ক্ষমতা সম্পর্কে তোমরা কেন নিরাশ হও এবং তিনি তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন না বলে কেন ভয় পাও ?

এছাড়া এ পর্যায়ের অপর সূরা বনী ইসরাঈলে হিজরতের জন্যে দু'আ ও শিক্ষাদান করা হলো। বলা হলোঃ দু'আ প্রার্থনা করোঃ 'প্রভু হে! আমায় উত্তম জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও, মক্কা থেকে ভালভাবে বের করে নাও এবং শত্রুর ওপর বিজয় ও সাহায্য দান করো।' আর হে নবী !ঘোষণা করে দাওঃ সত্য এসে পড়েছে এবং মিথ্যা অপসৃত হয়েছে। মিথ্যাকে অপসৃত হতেই হয়েছে।' মোটকথা, এ পর্যায়ের কালামে এগুলো ছাড়াও এ ধরনের আরো বহুতর ইঙ্গিত রয়েছে। এতে একদিকে যেমন সেই প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনি এরূপ পরিস্থিতির মুকাবেলায় যে প্রস্তুতির দরকার, তার প্রতিও বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছিল। আখিরাতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করা, অন্তর থেকে পার্থিব সম্পদের বাসনা মুছে ফেলা, খালেস তওহীদ এবং তার দাবিগুলোকে মনের ভেতর বদ্ধমূল করে নেয়া, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো অবলম্বনকে মনের মধ্যে স্থান না দেয়া, কেবল তারই সত্ত্বার ওপর পুরোপুরি ভরসা করা, তার কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলীকে কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি না করে যথারীতি পেশ করতে থাকা এবং এসব কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনের নিমিত্ত নামাজ কায়েম করা ও তার প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া ইত্যাকার উপায়-উপকরণের মাধ্যমে মুসলমানদের কে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। সেই সঙ্গে এই কঠিনতর পরিস্থিতিতেও দ্বীনের প্রচার অব্যাহত রাখার জন্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছিল।

---

৩৭. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ৫৯১

Dhaka University Institutional Repository

হিজরত

হিজরত শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে পরিত্যাগ কিংবা পরিবর্জন । কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় হিজরত বলতে বুঝায় : দ্বীন ইসলামের খাতিরে নিজের দেশ ছেড়ে এমন স্থানে গমন করা যেখানে প্রয়োজন সমূহ পূর্ণ হতে পারে। কারণ ইসলামী জীবন যাপন করার এবং আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানোর আজাদী যে দেশে নেই, সে দেশকে শুধু আয়-উপার্জন ,ঘর-বাড়ি ,ধন-সম্পত্তি কিংবা আত্মীয়-স্বজনের খাতিরে আঁকড়ে থাকা মুসলমানদের পক্ষে আদৌ জায়েয নয়।

প্রসঙ্গত একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে,আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ঈমান পোষণকারীর পক্ষে কোনো কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করা কেবল দুটি অবস্থায়ই সঙ্গত হতে পারে। একঃ সংশ্লিষ্ট দেশে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরী ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থায় রুপান্তরিত করার জন্যে সে ক্রমাগত চেষ্টা-সাধনা করতে থাকবে - এ যাবত মক্কায় থেকে মুসলমানেরা যেরূপ চেষ্টা-সাধনা করে আসছিল এবং সে জন্যে সর্বপ্রকার দুঃখ-মুসিবত সহ্য করেছিল। দুই :সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে তার বেরোবার কোন পথ যদি সত্যই না থাকে কিংবা ইসলামী ধারায় জীবন যাপন ও ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত চেষ্টা-সাধনা করার উপযোগী কোন জায়গা যদি সে খুঁজে না পায়। কিন্তু দ্বীনের প্রয়োজন পূর্ণ হবার উপযোগী জায়গা যখনি পাওয়া যাবে- এবার মদিনা থেকে যেমন প্রত্যাশা করা গিয়েছিল - তখন অবশ্যই তাদের হিজরত করে সেখানে চলে যেতে হবে। তবে এক্ষেত্রে যারা নিতান্তই অক্ষম ও পঙ্গু এবং যারা অসুস্থতা কিংবা দারিদ্র্যের কারণে কোন প্রকারেই হিজরতের জন্যে সফর করতে সক্ষম নয়, কেবল তারাই ক্ষমা পাবার যোগ্য।

মদিনায় সাধারণ মুসলমানদের হিজরত

মদিনায় ইতোমধ্যেই ইসলাম বেশ কিছুটা প্রচারিত হয়েছিল। এই অবস্থায় মক্কায় যে সব মুসলমান কাফিরদের হাতে উৎপীড়িত হচ্ছিল, মুহাম্মদ (স) তাদেরকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। এটা টের পেয়েই কাফিররা মুসলমানদেরকে বিরত রাখার জন্যে জুলুমের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল এবং যাতে মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে, সে জন্যে সর্বোত ভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু মুসলমানেরা তাদের ধন প্রাণ ও সন্তান-সন্ততির জীবন বিপন্ন করেও নিছক দ্বীনের খাতিরে দেশ ত্যাগ করাকেই পছন্দ করলো। কোন প্রলোভন বা ভয়-ভীতিই তাদেরকে এই সংকল্প থেকে বিরত রাখতে পারলো না। ক্রমান্বয়ে বহু সাহাবী মদিনায় চলে গেলেন। এখন মুহাম্মদ (স) এর সঙ্গে থেকে গেলেন শুধু হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত আলী (রা)। আর থাকলো দারিদ্র্য ও শারীরিক অক্ষমতা হেতু সফর করতে অসমর্থ এমন কিছূ সংখ্যক মুসলমান।

হযরত (স) কে হত্যা করার সলা-পরামর্শ

এভাবে নবুয়্যাতের ত্রয়োদশ বছরের সুচনা পর্যন্ত বহূ সাহাবী মদীনায় হিজরত করলেন। কুরাইশরা দেখতে পেল মুসলমানরা একে একে মদীনায় গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করছে এবং সেখানে ইসলাম ক্রমশ প্রসার লাভ করছে। এর ফলে তারা অত্যন্ত শংকিত হয়ে উঠলো এবং ইসলামকে চিরতরে খতম করে ফেলার পন্থা সর্ম্পকে চিন্তা-ভাবনা করলে লাগলো। সাধারন জাতীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও সলা-পরামর্শ করার জন্যে 'দারুন্নদ্ওয়া' নামে তাদের একটি জায়গা নির্দিষ্ট ছিলো। সেখানে প্রত্যেক গোত্রের প্রধান ব্যক্তিগণ জমায়েত হলো এবং এই আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করার জন্যে কি পন্থা অবলম্বন করা যায়, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলো। কেউ কেউ পরামর্শ দিলো : মুহাম্মদ (স)- কে শৃংখলিত করে কোন ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা উচিত। কিন্তু কেউ কেউ মত প্রকাশ করলো যে, মুহাম্মদ (স) - এর সঙ্গী-সাথীগণ হয়তো আমাদের কাছ থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এবং তার ফলে আমাদের পরাজয়ও ঘটতে পারে; এজন্যে উক্ত পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করা হলো। কেউ কেউ আবার পরামর্শ দিলো যে, তাঁকে নির্বাসিত করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু মুহাম্মদ (স) যেখানে যাবেন সেখানেই তাঁর অনুগামী বাড়তে থাকবে এবং তাঁর আন্দোলনও যথারীতি সামনে অগ্রসর হবে; এ আশংকায় উক্ত পরামর্শও নাকচ করা হলো। অবশেষে আবু জেহেল পরামর্শ দিলো : 'প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক মনোনীত করা হবে; এরা সবাই এক সঙ্গে মুহাম্মদ (স)-এর ওপর হামলা করবে এবং তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এর ফলে তাঁর রক্ত সকল গোত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে। আর সমস্ত গোত্রের সঙ্গে একাকী লাড়াই করা হাশিমী খান্দানের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হবে না।' এ অভিমতটি সবাই পছন্দ করলো এবং শেষ পর্যন্ত এ কাজের জন্যে একটি রাত ও নির্দিষ্ট করা হলো। সিদ্ধান্ত করা হলো যে নির্দিষ্ট রাতে মনোনীত ব্যক্তিগণ হযরত (স) এর বাসভবন ঘেরাও করে থাকবে। ভোরে তিনি যখন বাইরে বেরোবেন, তখন তারা আপন কর্তব্য সমাধা করবে। এরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ এই যে, আরবরা রাতের বেলায় অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করাকে পছন্দ করতো না।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার কৃপায় দুশমনদের ঐসব গোপন অভিসন্ধির কথা হযরত (স) এর কাছে যথারীতি পৌঁছতে থাকে। অতঃপর সেই প্রতিক্ষিত সময়টি এলো,যখন তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় গমন করার জন্যে ওহী যোগে নির্দেশ পেলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিজরতের দুদিন আগে থেকেই তিনি আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর সঙ্গে এ সম্পর্কে পরামর্শ করেন এবং এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তার সাথে হযরত আবু বকর (রা) ও গমন করবেন। সফরের জন্যে দুটি উষ্ট্রী ঠিক করা হলো এবং কিছু পাথেয়ও তৈরি করা হলো।

মক্কা থেকে রওয়ানা

কাফির কুরাইশগণ মুহাম্মদ (স) কে হত্যা করার জন্যে যে রাতটি নির্দিষ্ট করেছিল, সেই রাতেই তিনি আলী (রা) কে ডেকে বললেন : 'আমি হিজরতের নির্দেশ পেয়েছি এবং আজ রাতেই মদিনা রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি । আমার কাছে বহু লোকের আমানত জমা রয়েছে। এগুলো তুমি প্রত্যুষে লোকদের কাছে প্রত্যার্পণ করে দিয়ো। আর আজ রাতে তুমি আমার বিছানায় থেকো,যেন আমি ঘরে আছি ভেবে লোকেরা নিশ্চিন্ত থাকে।

কুরাইশরা ইসলাম বৈরিতার কারণে মুহাম্মদ (স) এর রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল; কিন্তু এ অবস্থায়ও তারা মুহাম্মদ (স)- কে এতোখানি আমানতদার ও বিশ্বাসভাজন মনে করতো যে, তাদের নিজ নিজ আমানত ও মাল-মাত্তা এনে তার কাছে জমা রাখতো।

নির্দিষ্ট রাতে কাফিররা মুহাম্মদ (স) এর গৃহ ঘেরাও করলো। রাত যখন গভীর হলো , হযরত (স) নিরবে ও নিশ্চিন্তে ঘর থেকে বের হলেন । সে সময় তিনি সূরা ইয়াছিনের একটি আয়াত (فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) পাঠ করছিলেন। তিনি এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে 'শাহাতিল ওজুহ '(মুখমন্ডল আচ্ছন্ন হয়ে যাক) কথাটি বলে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং তাদের ব্যূহ ভেদ করে নিবিঘ্নে বেরিয়ে গেলেন। সে সময় আল্লাহর কুদরতে অবরোধকারি গণ যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো; ফলে তারা হযরত (স) কে বেরিয়ে যেতে দেখতে পেলো না। প্রথমে তিনি হযরত আবু বকর (রা) এর গৃহে গমন করলেনএবং সেখান থেকে তাকে নিয়ে মক্কার বাইরে গিয়ে সওর পর্বত গুহায় আশ্রয় নিলেন।

ভোরবেলা কাফিরগণ দেখতে পেলো, মুহাম্মদ (স) মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন। তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লো এবং তাঁর সন্ধানে চারদিকে ছুটাছুটি শুরু করলো। একবার তারা খুঁজতে খুঁজতে' সওর' পর্বত তাদের পদধ্বনি শুনে হযরত আবু বকর (রা) কিছুটা বিচলিতও হয়ে উঠলেন। তার কারণ,তার নিজের জীবন সম্পর্কে তার কোন ভয় ছিল না;বরং মুহাম্মদ (স)- এর ওপর না জানি কোন বিপদ এসে যায় এই ছিল তার আশংকা । তার এই অস্থিরতা লক্ষ্য করে মুহাম্মদ (স) অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে বললেনঃ 'লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা' - ঘাবড়িও না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। কার্যত তা-ই হলো।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে গুহামুখে এমন কতকগুলো নিদর্শন ফুটে উঠলে যে, তা দেখে কাফিররা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। তাদের মনে ধারণা জন্মালো যে, এ গুহার ভেতরে কেউ প্রবেশ করে নি।

হযরত আবু বকর (রা)-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ তখন বয়সে নবীন। তিনি রাতের বেলায় মুহাম্মদ (স) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর কাছে থাকতেন এবং ভোরে মক্কায় এসে কাফিরদের শলা-পরামর্শ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে গুহায় ফিরে গিয়ে বুজর্গদ্বয়কে অবহিত করতেন। কয়েক রাত যাবত হযরত আবু বকর (রা)- এর গোলাম বকরীর দুধ নিয়ে যেত, কখনো বা ঘর থেকে কিছু খাবার নিয়ে পৌঁছতো। এভাবে তিন রাত পর্যন্ত মুহাম্মদ (স) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) সেখানে অবস্থান করলেন।

চতুর্থ দিন মুহাম্মদ (স) সওর পর্বত গুহা থেকে বেরোলেন এবং পুরো এক রাত এক দিন তারা সমানে পথ চললেন। সফরের জন্যে আবু বকর (রা) আগে থেকেই দুটি উষ্ট্রী ঠিক করে রেখেছিলেন। পথ বাতলানোর জন্যে একশো জানাশোনা লোকও নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। পরদিন দুপুর বেলা রোদের তেজ প্রখর হয়ে উঠলে বিশ্রামের জন্যে একটি বৃহদাকার পাথরের ছায়ায় তারা কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। অদূরেই একটি গোয়ালা ছিল ; তার বকরী থেকে মুহাম্মদ (স) দুধ পান করলেন।অতঃপর সেখান থেকে তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন। তিনি সামনে পা বাড়াতেই সোরাকা বিন জাশিম নামক জনৈক্য কুরাইশ হঠাৎ তাকে দেখে ফেললো।এই লোকটি পুরস্কারের লোভে মুহাম্মদ (স) এর সন্ধানে বেরিয়েছিল। সে মুহাম্মদ (স) কে দেখতে পেয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিন্তু ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সে আবার নিজেকে সামলে নিল এবং মুহাম্মদ (স) এর ওপর হামলাকরার জন্যে তৈরি হলো। কিন্তু এবারও সামনে এগুতেই তার ঘোড়া হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে বসে গেল। এবার সোরাকা শংকিত হয়ে উঠলো এবং বুঝতে পারলো। ব্যাপারটা মোটেই সুবিধাজনক নয়। তার পক্ষে মুহাম্মদ (স) এর ওপর হামলা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লো এবং মুহাম্মদ (স) এর কাছে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলো। মুহাম্মদ (স) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এও ছিল মুহাম্মদ (স) এর একটি মু'জিযা।

মদিনায় শুভাগমন

মুহাম্মদ (স) এর আগমন বার্তা পূর্বেই পৌঁছেছিল গোটা শহরই তার শুভাগমনের জন্যে প্রতিক্ষমান ছিল। ছোট-বড় সবাই প্রতিদিন সকালে শহরের বাইরে গিয়ে জমায়েত হতো এবং দুপুর পর্যন্ত ইন্তেজার করে ফিরে আসতো। অবশেষে একদিন তাদের সেই প্রতিক্ষিত শুভ মুহূর্তটি এসেই পড়লো। দূর থেকে মুহাম্মদ (স) এর আসবার আলামত দেখে গোটা শহরটি তকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। প্রতিটি প্রতিক্ষাকারী হৃদয় উজার করে তাকে স্বাগত জানালো। মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে 'কুবা' নামক স্থানে আনসারদের অনেকগুলো খান্দান বসবাস করতো। এদের মধ্যে আমর ইবনে আওফের খান্দান টি ছিল সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয়। কুলসুম বিন আল হাদাম ছিলেন এদের প্রধান ব্যক্তি। এর পরম সৌভাগ্য যে, দো-জাহানের নেতা সবার আগে এরই আতিথ্য কবুল করেন এবং কুবাই এর গৃহেই অবস্থান করেন। মুহাম্মদ (স) এর রওয়ানার তিন দিন পর হযরত আলী (রা) মক্কা থেকে যাত্রা করেছিলেন ; তিনিও এখানে এসে মুহাম্মদ (স) এর সঙ্গে মিলিত হলেন।

কুবায় মুহাম্মদ (স) শুভাগমন করেন নবুয়্যাতের ত্রয়োদশ বছরের ৮ রবিউল আওয়াল (মুতাবেক ২০সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ)।এখানে অবস্থানকালে তার পয়লা কাজ ছিল একটি মসজিদ নির্মাণ করা। তিনি তার পবিত্র হস্ত দ্বারা এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং অন্যসাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে এর নির্মানকাজ সম্পূর্ণ করেন। কয়েকদিন অবস্থান করে তিনি শহরের দিকে রওয়ানা করলেন। দিনটি ছিল শুক্রবার । পথে

বনী সালেমের মহল্লা পর্যন্ত পৌঁছলে জুহর নামাজের সময় হলো। এখানে তিনি সর্বপ্রথম জুম'আর খুতবা প্রদান করেন এবং প্রথম বার জুম'আর নামাজ পড়ালেন।

মদিনায় প্রবেশকালে প্রতিটি আত্মোৎসর্গী মুসলিমের হৃদয়েই তার মেহমানদারীর সৌভাগ্য লাভের আকাঙ্খা জাগলো। তাই প্রত্যেক গোত্রের লোকই তার সামনে এসে আবেদন জানাতে লাগলো : 'হুযুর, এই হচ্ছে আপনার ঘর, অনুগ্রহ করে এখানে আপনি অবস্থান করুন। লোকদের মধ্যে এতখানি আগ্রহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হলো যে প্রতিটি হৃদয়ই যেন পথের ফরাশে পরিণত হলো; প্রতিটি হৃদয়ই উৎসর্গীকৃত হবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো। এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত গৃহের ছাদে উঠে গাইতে লাগলো-

চন্দ্র উদিত হয়েছে,
বিদা পর্বতের ঘাঁটি থেকে,
খোদার শোকর আমাদের কর্তব্য,
যতক্ষণ প্রার্থনাকারীরা প্রার্থনা করে। ,

কিশোরী বালিকারা দফ বাজিয়ে বাজিয়ে গাইতে লাগলো-
আমরা নাজ্জার খান্দানের বালিকা,
আর মুহাম্মদ (স) আমাদের কত উত্তম পড়োশী!
মুহাম্মদ (স) বালিকাদের জিজ্ঞেস করলেন 'তোমরা কি আমায় ভালোবাস? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন- 'আমিও তোমাদের ভালোবাসি।'

মদিনায় অবস্থান

মুহাম্মদ (স) এর মেহমানদারীর সৌভাগ্য কে লাভ করবে? এমন একটি প্রশ্ন যে এর মিমাংসা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। হযরত বললেন যে, আমার উষ্ট্রী যার গৃহের সামনে দাঁড়াবে, এ খেদমত সেই আঞ্জাম দিবে।' ঘটনাক্রমে এ সৌভাগ্য টুকু হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) এর ভাগ্যে পড়লো। বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী অবস্থিত, তার নিকটেই ছিল তার গৃহ। গৃহটি ছিল দ্বিতল বিশিষ্ট । তিনি মুহাম্মদ (স) এর থাকবার জন্যে ওপরের তলাটি পেশ করেন। কিন্তু লোকদের আসা-যাওয়ার সুবিধার্থে মুহাম্মদ (স) নিচের তলায় থাকা পছন্দ করলেন্ হযরত আবু আইয়ুব এবং তার স্ত্রী নিচের তলা ছেড়ে ওপরের তলায় চলে গেলেন। এখানে মুহাম্মদ (স) সাত মাস কাল অবস্থান করলেন। এরপর তার বসবাসের জন্যে মসজিদে নববীর নিকটে একটি কোঠা নির্মিত হলো এবং সেখানেই তিনি স্থানান-রিত হলেন। কয়েক দিনের মধ্যে তার খান্দানের অন্যান্য লোকও মদিনায় চলে এলো ।

মদিনায় ইসলামের আগমন

ইসলামের আওয়াজ যেমন আরবের বিভিন্ন দূর-দারাজ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছলো, তেমনি সে আওয়াজ মদিনায় গিয়েও উপনীত হলো। মদিনায় তখন বেশ কিছু ইহুদী জনবসতি ছিলো। তারা বহু প্রাচীনকাল থেকে সেখানে এসে বাস করতো। তারা মদিনার আশেপাশে ছোট ছোট দুর্গ বানিয়ে নিয়েছিলো। এ ছাড়াও সেখানে ছিলো বড় বড় দু'টি অ-ইহুদী গোত্র।

একদা আওস ও খাযরাজ নামে মদিনায় দুই ভাই ছিলো। এদের আদি নিবাস ছিলো ইয়ামেন; কিন্তু কোনো এক সময় এরা মদিনায় এসে বসবাস শুরু করে। এদেরই সন্তান-সন্ততি থেকে সেখানে 'আওস' ও 'খাজরাজ' নামে দু'টি বড় বড় খান্দান গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এরাই 'আনসার' উপাধিতে ভূষিত হয়। এরা মদিনা এবং তার আশপাশে অনেক ছোট ছোট দুর্গ তৈরি করে রেখেছিলো। ধর্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়ে এরাও মূর্তিপূজক ছিলো বটে, কিন্তু ইহুদীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ওহী, নবুয়্যত, আসমানী কিতাব এবং

আখিরাত সম্পর্কিত আকিদা-বিশ্বাসের সঙ্গেও অনেকটা পরিচিত ছিলো। কিন্তু এদের নিজেদের কাছেই যেহেতু এ ধরণের কোনো জিনিস বর্তমান ছিলো না, সে জন্যে ধর্মীয় ব্যাপারে এরা ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। তাদের কথার ওপর এরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতো। এরা ইহুদী আলেমদের কাছ থেকে এ-ও জানতে পেরেছিলো যে, দুনিয়ায় আরো একজন পয়গম্বর আসবেন। যারা তার অনুগমন করবে, তারাই সফলকাম হবে। পরন্ত এই পয়গম্বরের অনুবর্তীরাই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতেই মদিনাবাসী নবী করীম (স) এবং তার আন্দোলনের প্রতি উৎসুক হয়ে উঠেছিলো। আগেই বলা হয়েছে যে, হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আগত গোত্র প্রধানদের কাছে গমন করা এবং তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হবার আহবান জানানো হযরত (স)-এর একটি নিয়ম ছিলো। দশম নববী সালের কোনো এক সময়ে হযরত (স) মক্কার অদূরবর্তী 'আকাবা' নামক স্থানে খাজরাজ বংশের কতিপয় লোকের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং তাদেরকে কুর'আন মজীদের কিছু আয়াত পড়ে শোনান। সে কালাম শুনে তারা অত্যন্ত প্রভাবিত হলো এবং বুঝতে পারলো : ইহুদী আলেমরা যে নবী আসার কথা বলেন, ইনিই সেই নবী। তারা একে অপরের দিকে চেয়ে বললো : 'না জানি এই নবীর ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে ইহুদিরা শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবটুকু অর্জন করে বসে।' একথা বলেই তারা ইসলাম কবুল করলো। এদের দলে মোট ছয়জন সদস্য ছিলো। এভাবে মদিনার আনসারদের মধ্যে ইসলামের সূচনা হলো এবং যে জনপদটি উত্তরকালে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিলো, তাতে ইসলামের রোশনি প্রবেশ করলো।[৩৮]

কুবায় মসজিদ নির্মাণ

কোবায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (স) এখানে একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু হলে তিনিও মুসলমানদের সাথে একযোগে কাজ করেন। নিজে ভারী পাথর মাথায় বহন করে আনতেন। ভক্ত মুসলমানগণ তাঁকে পরিশ্রম হতে বিরত রাখতে চাইলেও তিনি বিরত হতেন না।[৩৯]

নগর অভিমুখে যাত্রা– ইসলামে প্রথম জুমআ

চৌদ্দ দিন পর্যন্ত শহরতলীর কোবা পল্লীতে অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ (স) নগর অভিমুখে রওয়ানা করেন। তাঁর মাতৃকুল বনী নাজ্জারকে পূর্বাহেই তাঁর শহরে গমনের সংবাদ জানানো হয়। এ সংবাদে শহরবাসীর বিশেষত বনী নাজ্জারের আনন্দ উৎসাহের অবধি রইল না। বীর জাতির প্রথানুসারে তারা সকলে তরবারি ঝুলিয়ে রাসূলে আকরাম (স) কে অভ্যর্থনা জানাতে বের হয়।

রাসূলে আকরাম (স) যেদিন মদীনা নগর অভিমুখে যাত্রা করেন, এ দিনটি ছিল শুক্রবার। তাঁর সাথে আরও বহু লোক আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে চলেছেন কিছু দূর যেতেই বনী সালেম গোত্রের মহল্লা। এখানে পৌছতেই জুমআর নামাযের সময় হয়ে যায়। তিনি এখানে জুমআর নামায আদায় করেন। ইসলামে এটাই প্রথম জুমআ।[৪০]

---

৩৮. আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, (অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), নাকিব পাবলিকেশন, ঢাকা: সর্বশেষ ২০০৬, পৃ. ৩৬

৩৯. মাওলানা আবু নায়ীম, *কাসাসুল আম্বিয়া*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ. ২১১

৪০. মাওলানা আবু নায়ীম, *কাসাসুল আম্বিয়া*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদে নববী নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় আসা পর হতেই এখানে একখানা মসজিদ নির্মাণের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। বিশেষত তিনি আগমনের পর মদীনাস্থ মুসলমানগণ প্রায়শই তাঁর সন্নিধানে আগমত করত, এতে নামায আদায়ের সবিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল। মসজিদ নির্মাণের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স)- এর দৃষ্টি এক খণ্ড ভূমি খুঁজে ফিরছিল। অবশেষে তাঁর দৃষ্টি পড়ে সে ভূখন্ডের উপর যেখানে প্রথম তাঁর বাহন উট থেমে ছিল। সামান্য এক খণ্ড ভূমি। এর একপাশে মানুষ উট বাঁধত, এক দিকে খেজুর শুকাত আর এক দিকে গোরস্থান। তিনি এ ভূমির মালিকের সন্ধান করতে লাগলেন।

অনুসন্ধানে জানা গেল, এ ভূমিখণ্ডের মালিক অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুই এতীম ভ্রাতা– সোহায়ল ও সাহল। এতীম ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিভাবক প্রখ্যাত আনসার গোত্রপতি হযরত আসআদ বিন যোরারা (রা)। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আসআদকে স্বীয় ইচ্ছার কথা বললেন। হযরত আসআদ (রা) পূর্ব হতেই এখানে নামায পড়তেন। এ প্রস্তাবে তিনি খুব খুশীই হন। তিনি খুব খুশীই হন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এহেন শুভ কর্মে এই সামান্য ভূখণ্ডের মূল্য প্রদানের কোন দরকার নাই। বালকদ্বয়ের অভিভাবক হিসাবে আমি এই ভূখণ্ড মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশে দান করে দিচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আসআদ বিন যোরারাকে বললেন– ভ্রাতঃ! তুমি বালকদ্বয়ের অভিভাবক সত্য বটে, কিন্তু তাদের স্বার্থহানিকর কোন কাজ করার অধিকার তোমার নাই। এসব কথাবার্তা শুনে ভূম্যাধিকারী বালকদ্বয় এসে নিবেদন করল– ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এ ভূখণ্ডের কোন মূল্য নেব না, আল্লাহর ওয়াস্তে এ ভূখণ্ড দান করে দিচ্ছি। তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের দান প্রস্তাবও গ্রহণ না করে বনী নাজ্জারের প্রধান ব্যক্তিগণকে ডেকে পাঠান।

তারা উপস্থিত হলে তাদের নিকট মসজিদ নির্মাণের সংকল্প ব্যক্ত করে ভূমিখণ্ডের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে বলেন। তারা বলল, আমরাই বালকদ্বয়ের ক্ষতি পূরণ করে দেব। এ নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না। আপনি নিশ্চিন্তে মসজিদ নির্মাণ করুন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) এতেও সম্মত হলেন না। অবশেষে বনী নাজ্জার প্রধানগণ এ ভূমিখণ্ডের মূল্য নির্ধারণ করে দিলে রাসূলে করীম (স)- এর নির্দেশক্রমে হযরত আবু বকর (রা) মূল্য পরিশোধ করেন।

ভূমি মূল্য পরিশোধের পরই মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এ কাজ সম্পাদনে কাউকে কোন প্রকার গুরুগম্ভীর উপদেশ বর্ষণ না করে রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই একজন সাধারণ দিনমজুরের ন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হন। মসজিদের প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী যোগান দিতে শুরু করেন। মাথা, মুখমণ্ডল, শ্মশ্রুরাশি ধুলাবালু আর মাটিতে ভরে যাচ্ছে, এতদসত্ত্বেও তিনি পরম উৎসাহে নির্মাণ সামগ্রীর বোঝা মাথায় বহন করে চলেছেন। মুহাজির এবং আনসাররাও এ কাজে অংশগ্রহণ করেন।

কেউ কেউ তখনও অংশগ্রহণ করতে পারেন নাই, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং সমজিদ নির্মাণ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন, মাথায় করে বোঝা বহন করছেন, এসব খবরে সমগ্র মদীনায় একটা মহা হুলস্থুল পড়ে যায়। যারা তখনও বাদ ছিলেন তারা সবাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এসে কাজে যোগদান করেন। সবাইর অংশগ্রহণে মসজিদ নির্মিত হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

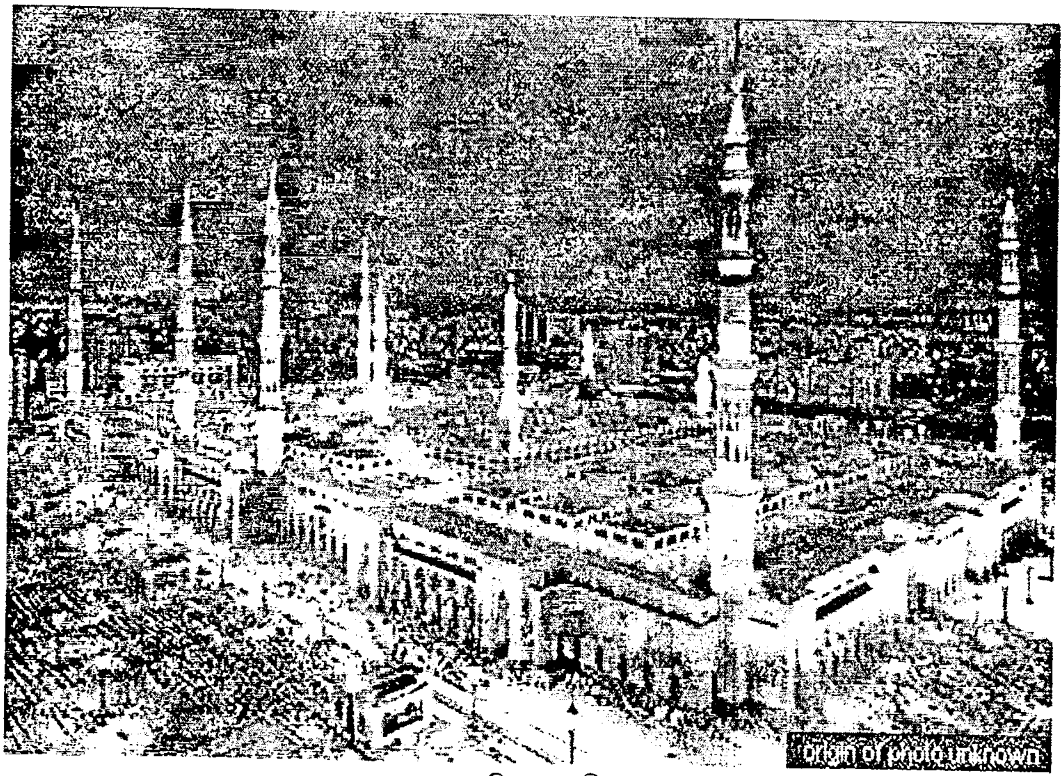

মসজিদে নববী

এ মসজিদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল, এতে কোন প্রকার কৃত্রিম সৌন্দর্যারোপের চিন্তা করা হয় নাই। সম্পূর্ণ সাদামাটাভাবে এ মসজিদখানা তৈরী হয়। কাঁচা ইটের প্রাচীর, খেজুর গাছের আড়া আর খেজুর পাতার ছাউনি, মিম্বর, মেহরাব, মিনার, গম্বুজ কিছুই নাই। ফলে সাদামাটাভাবে নির্মিত এ মসজিদের গুরুত্ব মাহাত্ম্য এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সমকালীন বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তি পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের বীর সেনাপতি এবং দূতদেরও এ মসজিদে প্রবেশ করতে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। হযরত তামীম দারী আনসারী (রা) ইসলাম গহণের পর এ মসজিদে চেরাগ বাতি জ্বালিয়ে আলোকিত করার ব্যবস্থা করেন।[৪১]

আসহাবে সুফ্ফার জন গৃহ নির্মাণ

মসজিদে নববী নির্মাণের পর আসহাবে সুফ্ফার আশ্রয়স্থল নির্মাণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। এ চেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মসজিদ সংলগ্ন ভূমির উপর একটি চবুতরা নির্মাণ করা হয়। উপরে খেজুর পাতার ডাল ও চতুর্দিক উন্মুক্ত। শত শত গৃহ পরিজনহীন ত্যাগী কর্মী এ চবুতরায় অবস্থান করতেন। এ মহাত্মাগণই ইসলামের ইতিহাসে আসহাবে সুফ্ফা নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (স)- এর সাহাবা সহচরগণ দ্বীনী দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে স্ত্রী প্রত্র পরিজনের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য তাঁদেরকে ব্যবসা বাণিজ্যে জড়াতে হত, এতে তাঁদের অনেক সময় কেটে যেত বলে তাঁরা প্রয়োজনীয় দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের জন্য সময় করে উঠতে পারতেন না। পক্ষান্তরে সুফ্ফাবাসীর কোন ঘর সংসার, স্ত্রী পুত্র পরিজন ছিল না। এ দলের যিনি বিয়ে কতেন তাঁকে দল হতে বের হয়ে যেতে হত।

---

৪১. মাওলানা আবু নায়ীম, *কাসাসুল আম্বিয়া*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা মুখনিঃসৃত বাণী শুনতেন এবং আত্মস্থ করতেন। রাতের বেলা নিজের অবস্থানে এবাদতে নিমগ্ন হতেন। কুর'আন পঠন, পাঠন এবং বিপদসংকুল স্থানে ইসলাম প্রচারই আসহাবে সুফ্ফার প্রধানতম সাধনা ছিল। এ দলেরই সত্তর জনকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে নজদে প্রেরণ করা হয়েছিল। পথিমধ্যে এঁরা সবাই কাফের কর্তৃক শহীদ হন।[৪২]

ভাই ভাই সম্বন্ধ

মক্কা থেকে যে সব মুসলমান ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে মদিনায় চলে এসেছিল, তাদের প্রায় সবাই ছিল সহায় সম্বলহীন। তাদের মধ্যে যারা স্বচ্ছল ছিল, তারাও নিজেদের মাল-পত্র মক্কা থেকে আনতে পারেন নি। তাদের সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে একদম রিক্ত হস্তেই আসতে হয়েছিল। এই সব মুহাজির যদিও মুসলমানদের (আনসার) মেহমান ছিলো, তথাপি এদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল । তাছাড়া এরা নিজেরাও স্বহস্তে পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে ভালবাসতো। তাই মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে একদিন মুহাম্মদ (স) আনসারদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি এবং মুহাজিরদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, 'আজ থেকে তোমরা পরস্পর ভাই।' এভাবে সমস- মুহাজিরকে তিনি আনসারদের ভাই বানিয়ে দিলেন। তার ফলেই আল্লাহর এই খাঁটি বান্দাগণ শুধু ভাই-ই নয়, পরস্পরে ভাইয়ের চেয়েও ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হলেন। আনসারগণ মুহাজিরদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে গেল এবং তাদের সামনে নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি ও সামান-পত্রের হিসাব করে বললো : 'এর অর্ধেক তোমাদের আর অর্ধেক আমাদের।' এভাবে বাগানের ফল, ঘরের সামান, বাসগৃহ, সম্পত্তি - মোটকথা, প্রতিটি জিনিসই সহোদর ভাইদের মতো বিভক্ত হলো। ফলে আশ্রয়হীন মুহাজিরগণ সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হলো। তারা যথারীতি ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করলো, দোকান-পাট খুললো এবং অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হলো। এভাবে মুহাজির পুনর্বাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলো এবং এদিক দিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত হলো।

নবপর্যায়ে ইসলাম

হিজরতের আগে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছিল মক্কার মুশরিকদের কাছে। তাদের কাছে এটা ছিল একটি অভিনব জিনিস। কিন্তু হিজরতের পর সমস্যা দেখা দিল মদিনার ইহুদীদের নিয়ে। এরা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, ফেরেশতা, ওহী ইত্যাদি বিশ্বাস করতো এবং একজন পয়গম্বরের (হযরত মূসার) উম্মত হিসাবে খোদার তরফ থেকে আগত একটি শরীয়াতের অনুগামী হবারও দাবিদার ছিল। নীতিগত ভাবে হযরত মুহাম্মদ (স) যে দ্বীন-ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তাদেরও প্রকৃত দ্বীন ছিল তা-ই। কিন্তু শতাব্দী কালের অনাচার ও বেপরোয়া আচরণের ফলে তাদের ভেতর নানারকমের দোষ-ত্রুটি দেখা দিয়েছিল ।তাদের জীবন প্রকৃত খোদায়ী শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং তাদের ভেতর অসংখ্য কুসংস্কার , বিদয়াত ,ও কুপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ।তাদের কাছে তওরাত কিতাব ছিল বটে, কিন্তু তার মধ্যে তারা বহু মানবীয় কালাম শামিল করে নিয়েছিল। তবুও তার মধ্যে খোদায়ী বিধি-বিধান যা কিছু বাকী ছিল , তাও মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ছাঁচে ফেলে তারা ওলট-পালট করে দিয়েছিল। এভাবে খোদার দ্বীনের সাথে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সামাজিক দিক দিয়ে তাদের ভেতর মারাত্মক সব দোষ-ত্রুটি শিকড় গেড়ে বসেছিল। আল্লাহর কোন বান্দাহ যদি তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চাইতো, তার কোন কথা পর্যন্ত তারা শুনতে প্রস্তুত ছিল না। বরং তাকে তারা ঘোরতর দুশমন বলে মনে করতো এবং তার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা চালাতো। যদিও তারা মিলগতভাবে মুসলিমই ছিল, তবুও তাদের এতখানি পতন ঘটেছিল যে, তাদের আসল দ্বীন কি ছিল , তা তাদের নিজেদেরই স্মরণ ছিল না।

---

৪২. মাওলানা আবু নায়ীম, *কাসাসুল আম্বিয়া*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ. ২১৪

এদিক দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সামনে শুধু দ্বীন-ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বুনিয়াদী প্রচারের কাজই ছিলনা, বরং ঐসব বিভ্রান্ত মুসলমানের ভেতর পুনরায় দ্বীনি ভাবাদর্শ জাগ্রত করার দায়িত্বও বর্তমান ছিল। তাছাড়া মুহাম্মদ (স) এর আগমনের পর মুসলমানেরা ক্রমান্বয়ে চারদিক থেকে এসে মদিনায় জমায়েত হচ্ছিল এবং এই সব মুহাজির ও মদিনার আনসার গণ মিলে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির ইসলামী রাষ্ট্রেরও ভিত্তি পত্তন করেছিল। ৩৭ এ কারণে আন্দোলনকে এ যাবত শুধু আদর্শ প্রচার, আকীদা-বিশ্বাসের সংস্কারে এবং কিছু নৈতিক শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান করতে হলেও, এখন সামাজিক জবিনধারার সংস্কার, প্রশাসনিক আইন-কানুন প্রণয়ন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা জারির প্রয়োজন দেখা দিলো। সুতরাং এবার এদিকে পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া হলো।

এ সময় আরো একটি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হলো। এই পর্যন্ত কুফরী পরিবেশেই ইসলামী দাওয়াত পেশ করা হচ্চিলো এবং এরই ভেতর থেকে মুসলমানরা কাফিরদের জুলুম-পীড়ন বরদাশত করেছিল। কিন্তু এবার তারা ক্ষুদ্রাকৃতির হলেও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করলো যা চারদিকে দিয়েই ছিলো কাফিরদের দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই ব্যাপারটি এখন আর শুধু উৎপীড়ন আর হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না, বরং গোটা আরব উপদ্বীপই এবার সংকল্পগ্রহণ করলো যে, এই নগন্য দলটিকে যতো শীঘ্র সম্ভব খতম করে দিতে হবে; নচেৎ ইসলামের এই কেন্দ্রটি শক্তি অর্জন করতে শুরু করলে তাদের জন্যে দাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত থাকবে না। তাই নিজেদের এবং আন্দোলনের নিরাপত্তার তাগিদে এই নয়া ইসলামী দলের সামনে জরুরী কর্তব্য হয়ে দেখা দিলো :

১. পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে জিদের আদর্শ প্রচার করা, দলিল প্রমাণ দ্বারা তার সত্যতা প্রতিপন্ন করা এবং যতো বেশি সম্ভব লোকদেরকে এর সমর্থক বানানোর চেষ্টা করা;

২. বিরুদ্ধবাদীগণ যে সব আকীদা-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছিলো, যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে তার অসারতা প্রমাণ করা, যেনো বিবেকের আলোয় কেউ কিছু বুঝতে চাইলে প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে তাকে কোনো বেগ পেতে না হয়:

৩. ঘরবাড়ি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নষ্ট করে যারা এই নতুন রাষ্ট্রে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদের জন্যে শুধু বসবাসের ব্যবস্থাই নয়, বরং তাদেরকে উন্নত মানের নৈতিক ও ঈমানী শিক্ষা দান করা, যেনো চরম দুঃখ-দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তার মধ্যেও তারা পূর্ণ ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারে এবং কোনো কঠিনতর অবস্থায়ও তাদের পা কেঁপে না ওঠে;

৪. মুসলমানদেরকে চরম প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত করা, যাতে করে তাদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে বিরুদ্ধবাদীগণ কোনো সশস্ত্র হামলা চালালে নিজেদের দুর্বলতা ও অস্ত্রপাতির দৈন্য সত্ত্বেও তারা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে শত্রুর মুকাবিলা করতে পারে এবং আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সত্যতা সম্পর্কে গভীরতর প্রায় ও খোদার প্রতি ঐকান্তিক নিভুরতার কারণে ময়দান থেকে কখনো পশ্চাদপসারণ না করে;

৫. যে সব লোক নানাভাবে বুঝানো সত্ত্বেও ইসলামের কাঙ্খিত জীবন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠার পথে বাদ সাধবে, তাদেরকে প্রয়োজন হলে শক্তি প্রয়োগ করে ময়দান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে আন্দোলনের অনুর্বর্তীদের মধ্যে পূর্ণ হিম্মত ও সৎ সাহস পয়দা করা।[৪৩]

---

৪৩. মাওলানা আবু নায়ীম, *কাসাসুল আম্বিয়া*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা : ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ২১৭

Dhaka University Institutional Repository

মদীনার মর্যাদা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ-

অনুবাদ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি এমন একটি জনপদে হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যা সকল জনপদের ওপর বিজয়ী হবে। লোকেরা তাকে ইয়াসরিব বলে থাকে। অথচ তার (উপযুক্ত) নাম হল মদীনা। এ মদীনা খারাপ লোকদের এমন ভাবে দূর করে দেয় যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।[88]

---

৪৪. ইমাম বুখারী, সহীহ্ আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায়- মদীনার হেরেম, অনুচ্ছেদ- ফাদদুল মদীনা, হাদীস নং ১৭৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বাবেল শহর (ব্যবিলিয়ন)

বাবিল (আরবি ভাষায়: بابل) ইরাকের একটি প্রদেশ। এর আয়তন ৬৪৬৮ বর্গকিলোমিটার। ২০০৩ সালে প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ১৭,৫১,৯০০। আল হিল্লাহ্ শহর বাবিল প্রদেশের রাজধানী। এছাড়াও এই প্রদেশে আল মুসাইয়িব শহর এবং প্রাচীন ব্যাবিলন শহরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। ব্যাবিলন শহরের স্থানীয় নাম বাবিল থেকেই প্রদেশটির নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের আগে প্রদেশটির নাম ছিল হিল্লাহ্ প্রদেশ।[৪৫]

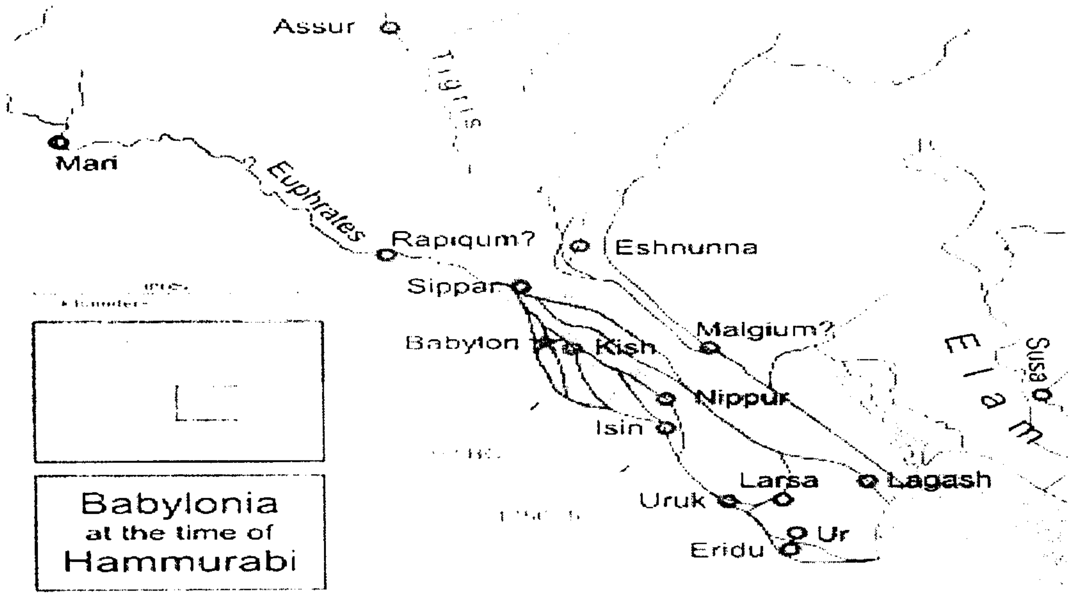

বাবেল শহর- এর মানচিত্র

বাবেল সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ
فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ
مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -

"আর এই সংগে তারা এমন সব জিনিসের অনুসরণ করাতে মেতে ওঠে, যেগুলো শয়তানরা পেশ করতো সুলাইমানী রাজত্বের নামে। অথচ সুলাইমান কোন দিন কুফরী করেনি। কুফরী করেছে সেই শয়তানরা, যারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো। তারা ব্যবিলনে দুই ফেশেতা হারূত ও মারূতের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছির তা আয়ত্ব করার জন্য উঠে পড়ে লাগে । অথচ তারা (ফেরেশতারা)যখনই কাউকে এর শিক্ষা দিতো, তাকে পরিষ্কার ভাষায় এই বলে সতর্ক করে দিতোঃ দেখো , আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তুমি কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না । এরপরও তারা তাদের থেকে এমন জিনিস শিখতো , যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এনে দিতো।

৪৫. *The Cambridge Ancient History: Prologomena & Prehistory*: Vol. 1, Part 1. Accessed 15 Dec 2010.

Dhaka University Institutional Repository

একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর হুকুম ছাড়া এ উপায়ে তারা কাউকেও ক্ষতি করতে পারতো না । কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখতো যা তাদের নিজেদের জন্য লাভজনক ছিল না বরং ছিল ক্ষতিকর । তারা ভালো করেই জানতো , এর ক্রেতার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই । কতই না নিকৃষ্ট জিনিসের বিনিময়ে তারা বিকিয়ে দিল নিজেদের জীবন !হায়, যদি তারা একথা জানতো!"[৪৬]

পরিচিতি

বাবিল প্রদেশের প্রাচীন ব্যাবিলন শহর প্রাচীনকালে বর্তমান বাগদাদের দক্ষিণে ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত ব্যাবিলোনিয়া রাজ্যের রাজধানী ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় সহস্রাব্দ থেকেই এখানে মনুষ্য বসতি ছিল, তবে খ্রিস্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দের শুরুতে এসে ব্যাবিলনের প্রথম রাজবংশের রাজাদের অধীনে শহরটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই রাজবংশের বিখ্যাত ৬ষ্ঠ রাজা হাম্মুরাবি (১৭৯২-১৭৫০ খ্রি.পূ.) ব্যাবিলনকে এক বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন।[৪৭]

ভৌগোলিক অবস্থান

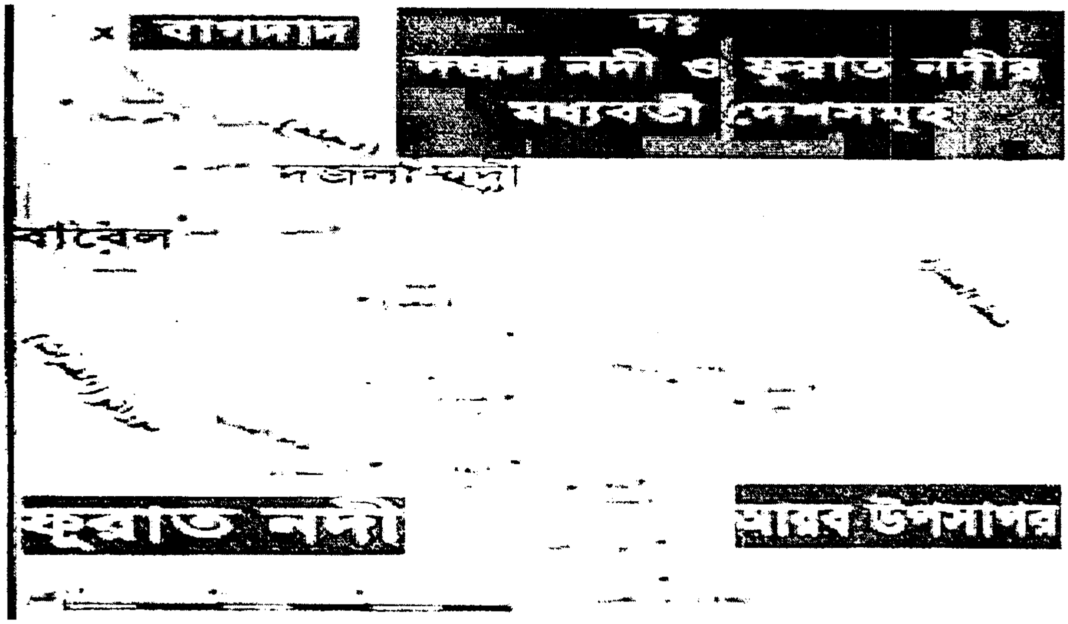

বাবেল শহর- এর মানচিত্র

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

শয়তানরা বলতে জ্বীন জাতি ও মানবজাতি উভয়ের অন্তর্ভূক্ত শয়তান হতে পারে। এখানে উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যখন নৈতিক ও বস্তুগত পতন সূচিত হলো, গোলামি, মূর্খতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য,লাঞ্ছনা ও হীনতা যখন যাদু-টোনা, তাবিজ তুমার, টোটকা ইত্যাদির প্রতি তারা আকৃষ্ট হতে থাকলো বেশী করে। তারা এমন সব পন্থার অনুসন্ধান করতে লাগলো যাতে কোন প্রকার পরিশ্রম ও সংগ্রাম সাধন ছাড়াই নিছক ঝাড়-ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রের জোরে বাজীমাত করা যায়।

৪৬. আল-কুর'আন, ২ঃ ১০২

৪৭. Dietz Otto Edzard: *Geschichte Mesopotamiens. Von den Sumerern bis zu Alexander dem Großen*, Beck, München 2004, p. 121

Dhaka University Institutional Repository

তখন শয়তানরা তাদেরকে প্ররোচনা দিতে লাগলো। তাদেরকে বুঝাতে থাকলো যে, সুলাইমান (আ)- এর বিশাল রাজত্ব এবং তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতা তো আসলে কিছু মন্ত্র-তন্ত্র ও কয়েকটা আঁচড়, নকশা তথা তাবীজের ফল। শয়তানরা তাদেরকে সেগুলো শিখিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিল। বনী ইসরাঈলরা অপ্রত্যাশিত মহামূল্যবান সম্পদ মনে করে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফলে আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকলো না এবং কোন সত্যের আহবায়কের আওয়াজ তাদের হৃদতন্ত্রীতে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না।[৪৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কিন্ত এখানে আমি যা কিছু বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র বনী ইসরাঈল জাতি যে সময় ব্যাবিলনে বন্দী ও গোলামির জীবন যাপন করছিল, আল্লাহ তখন তাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দু'জন ফেরেশতাকে মানুষের বেশে তাদের কাছে হয়তো পাঠিয়ে থাকবেন। লূত জাতির কাছে যেমন ফেরেশতারা গিয়েছিলেন সুদর্শন বালকের বেশ ধারণ করে তেমনি বনী ইসরাঈলদের কাছে তারা হয়তো পীর ও ফকীরের ছদ্মবেশে হাযির হয়ে থাকবে। সেখানে একদিকে তারা নিজেদের যাদুর দোকান সাজিয়ে বসে থাকতেন আর অন্যদিকে লোকদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতেনঃদেখো, আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। কাজেই নিজেদের পরকাল নষ্ট করো না। কিন্তু তাদের এই সতর্কবানী ও সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও লোকেরা তাদের দেয়া ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ-তুমারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ফেরেশতাদের মানুষের আকার ধারণ করে মানুষের মধ্যে কাজ করার ব্যাপারটায় অবাক হবার কিছুই নেই। তারা আল্লাহর সাম্রাজ্যের কর্মচারী । নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য যে সময় যে আকৃতি ধারণ করার প্রয়োজন হয় তারা তাই করেন । এখনই এ মুহূর্তে আমাদের চারদিকে কতজন ফেরেশতা মানুষের আকার ধরে এসে কাজ করে যাচ্ছেন তার কতটুকু খবরই বা আমরা রাখি । তবে ফেরেশতাদের এমন একটা কাজ শেখাবার দায়িত্ব নেয়া, যা মূলত খারাপ, এর অর্থ কি? এটা বুঝার জন্য এ ক্ষেত্রে এমন একটি পুলিশের দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে যে পুলিশের পোশাক ছেড়ে সাধারণ নাগরিকের পোশাক পরে কোন ঘুষখোর প্রশাসকের কাছে হাযির হয় তার ঘুষখোরীর প্রমাণ সংগ্রহের জন্য । একটি নোটের গায়ে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে সে ঘুষ হিসেবে প্রশাসককে দেয়, যাতে ঘুষ নেয়ার সময় হাতেনাতে তাকে ধরতে পারে এবং তার পক্ষে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার কোন অবকাশই না থাকে ।[৪৯]

সেই বাজারে সবচেয়ে বেশী চাহিদা ছিল এমন তাবীজের যার সাহায্যে এক ব্যক্তি অন্য একজনের স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজের প্রতি প্রেমাসক্ত করতে পারে । তাদের মধ্যে নৈতিক পতন দেখা দিয়েছিল এটি ছিল তার নিকৃষ্টতম পর্যায় । যে জাতির সদস্যবৃন্দ পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হওয়া ও অন্যের বিয়ে করা বউকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়াকে নিজেদের সবচেয়ে বড় বিজয় মনে করে এবং এটিই তাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বাধিক আকষণীয় কাজে পরিণত হয়, তার নৈতিক অধপতন যে ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে গেছে তা নিসন্দেহে বলা যেতে পারে ।

---

৪৮. মাওলানা আবু নায়ীম, *কাসাসুল আম্বিয়া*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা : ১৯৯৯,পৃ. খ. ১, ২৭১

৪৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৫১

আসলে দাম্পত্য সম্পর্ক হচ্ছে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল । নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সুস্থতার ওপর সমগ্র মানব সভ্যতার সুস্থতা এবং অসুস্থতার ওপর সমগ্র মানব সভ্যতার অসুস্থতা নির্ভরশীল । কাজেই যে বৃক্ষটির দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকার ওপর ব্যক্তির ও সমগ্র সমাজের টিকে থাকা নির্ভর করে তার মূলে যে ব্যক্তি কুঠারঘাত করে তার চাইতে নিকৃষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আর কে হতে পারে ?হাদীসে বলা হয়েছে ,ইবলিস তার কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকায় নিজের এজেন্ট পাঠায় । এজেন্টরা কাজ শেষে ফিরে এসে নিজেদের কাজের রিপোর্ট শুনাতে থাকে । কেউ বলে আমি অমুক ফিতনা সৃষ্টি করেছি । কেউ বলে, আমি অমুক পাপের আয়োজন করেছি । কিন্তু ইবলিস প্রত্যেককে বলে যেতে থাকে , তুমি কিছুই করোনি । তারপর একজন এসে বলে, আমি এক জোড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এসেছি । একথা শুনে ইবলিস তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে । সে বলতে থাকে, তুমি একটা কাজের মতো কাজ করে এসেছো । এ হাদীসটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে বনী ইসরাঈলদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল তাদের কেন যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার 'আমল 'লোকদেরকে শিখাবার হুকুম দেয়া হয়েছিল তা সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যায় । আসলে তাদের নৈতিক অধপতনের যথাযথ পরিমাপের জন্য এটিই ছিল একমাত্র মানদন্ড ।[৫০]

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সূরা সাবায় এভাবে-

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ -

"আর সুলায়মানের জন্য আমি বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত" ।[৫১]

এর আরো বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে সূরা সাদ-এ সেখানে বলা হয়েছে-

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ -

"কাজেই আমি তার জন্য বায়ূকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুমে সহজে চলাচল করতো যেদিকে সে যেতে চাইতো" ।[৫২]

এ থেকে জানা যায়, বাতাসকে হযরত সুলায়মানের হুকুমের এভাবে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর রাজ্যের এক মাস দূরত্বের পথ পর্যন্ত যে কোন স্থানে তিনি সহজে সফর করতে পারতেন। যাওয়ার সময়ও সব সময় তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অনুকূল বাতাস পেতেন আবার ফেরার সময়ও। বাইবেল ও আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ বিষয় বস্তুর ওপর যে আলোকপাত হয় তা হচ্ছে এই যে, হযরত সুলায়মান তাঁর রাজত্বকালে নৌবাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটান। এদিকে ইস্য়ূন জাবের বন্দর থেকে তাঁর বাণিজ্যবহর লোহিত সাগরে ইয়ামেন এবং অন্যান্য পূর্ব ও দক্ষিণ দেশসমূহে যাতায়াত করতো এবং অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরের বন্দরসমূহ থেকে তাঁর নৌবহর (যাকে বাইবেলে তর্শীশী নৌবহর বলা হয়েছে)পশ্চিম দেশসমূহে যেতো। ইস্য়ূন জাবেরে তাঁর সময়ের যে বিশাল চুল্লী পাওয়া গেছে তার সাথে তুলনীয় কোন চুল্লী আজ পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া যায়নি।

---

৫০. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৫২

৫১. আল-কুর'আন, ৩৪: ১২

৫২. আল-কুর'আন, ৩৮: ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্মতত্ব বিশেষজ্ঞগণের মতে এখানে আদুমের আরাবাহ এলাকার খনি থেকে আশোধিত লোহা ও তামা আনা হতো এবং এই চুল্লিতে গালাবার পর সেগুলো অন্যান্য কাজ ছাড়া জাহাজ নির্মাণ কাজেও ব্যবহার করা হতো। এ থেকে কুর'আন মজীদে হযরত সুলায়মান (আ) সম্পর্কে সূরা সাবায় যে কথা বলা হয়েছে- "আর আমি তার জন্য গলিত ধাতুর ঝরণা প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম।"তার ওপর আলোকপাত হয়। তাছাড়া এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সামনে রাখলে হযরত সুলায়মানের জন্য এক মাসের পথ পর্যন্ত বায়ূ প্রবাহকে "বশীভূত" করার অর্থ অনুধাবন করা যায়। সেকালে সামুদ্রিক সফর পুরোপুরি অনুকূল বাতাসের ওপর নির্ভর করতো। মহান আল্লাহ হযরত সুলায়মানের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন, যার ফলে তাঁর দুটি সামুদ্রিক বহর সব সময় তার ইচ্ছা অনুযায়ী এই অনুকূল বাতাস পেতো। তবুও যদি বাতাসের ওপর হযতর সুলায়মানকে হুকুম চালাবার কোন কর্তৃত্ব ক্ষমতা দেয়া হয়ে থাকে যেমন- (তার হুকুমে চলতো) এর শব্দাবলীর বাহ্যিক অর্থ থেকে মনে হয়, তাহলে আল্লাহর কুদরাতের জন্য এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তিনি নিজের রাজ্যের মালিক। নিজের যেকোন বান্দাকে যে কোন ক্ষমতা তিনি চাইলে দিতে পারেন। তিনি কাউকে কোন ইখতিয়ার ও ক্ষমতাও দান করলে আমাদের মনকষ্টের কোন কারণ নেই।[৫৩]

সূরা সাবা-য় এর বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ-

"আর সুলাইমানের জন্য আমি বাতাসকে বশীভূত করে দিয়েছি, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত। আমি তার জন্য গলিত তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করি। আর জিনদের মধ্য থেকে এমন জিনকে আমি তার জন্য অনুগত করে দিয়েছিলাম যারা তার রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করতো। আর তাদের মধ্য থেকে যে কেউ আমার হুকুম অমান্য করতো আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ আস্বাদন করাতাম।"[৫৪]

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ -

"তারা তার জন্য যেমন সে চাইতো প্রাসাদ, মূর্তি, হাউজের মতো বড় আকারের পাত্র এবং দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করত।"[৫৫]

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ
أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ -

তারপর যখন আমি সুলায়মানকে মৃত্যুদান করলাম, এই জিনদেরকে তার মৃত্যুর কথা জানালো কেবল মাটির পোকা (অর্থাৎ ঘূণ)যারা তার লাঠি খাচ্ছিল। তাই যখন সে পড়ে গেলো তখন জিনেরা বুঝতে পারলো যে, তারা যদি সত্যিই অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকতো তাহলে এ লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে এত দীর্ঘ সময় আবদ্ধ থাকতো না।[৫৬]

---

৫৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৮৮১

৫৪. আল-কুর'আন, ৩৪: ১২

৫৫. আল-কুর'আন, ৩৪: ১৩

৫৬. আল-কুর'আন, ৩৪: ১৪

এ আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত সুলায়মানকে যেসব জিনের ওপর কতৃত্ব দেয়া হয়েছিল এবং যারা তাঁর বিভিন্ন কাজ করে দিতো তারা এমন পর্যায়ের জিন ছিল যাদের সম্পর্কে আরব মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল এবং তারা নিজেরাও এ ভুল ধারণা পোষণ করতো যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে। এখন যে ব্যক্তি সতর্ক দৃষ্টিতে কুর'আন মজীদ পড়বে এবং নিজের পূর্বাহ্নে বদ্ধমুল ধ্যান-ধারণার অনুসারী না হয়ে পড়বে, সে নিজেই দেখে নিতে পারে যেখানে কুর'আন নির্বিশেষে "শয়তান"ও "জিন" শব্দ ব্যবহার করে সেখানে তার অর্থ হয় কোন ধরনের সৃষ্টি এবং আরবের মুশরিকরা যাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করতো কুর'আনের দৃষ্টিতে তারা কোন ধরনের জিন। "

আধুনিক যুগের মুফাস্সিরগণ একথা প্রমাণ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছেন যে, হযরত সুলায়মানের জন্য যেসব জিন ও শয়তানকে আনুগত করে দেয়া হয়েছিল তারা মানুষ ছিল এবং আশেপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে তাদেরকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু কুর'আনের শব্দাবলীর মধ্যে তাদের এ ধরনের জটিল অর্থ করার শুধু যে, কোন অবকাশই নেই তাই নয় বরং কুর'আনের যেখানেই এ ঘটনাটি এসেছে সেখানে আগে পিছের আলোচনা ও বর্ণনাভংগীই এ অর্থের পথে পরিস্কার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। হযরত সুলায়মানের জন্য ইমরাত নির্মাণকারীরা যদি মানুষই হয়ে থাকবে তাহলে তাদের এমন কি বিশেষত্ব ছিল যে, তাদের কথা কুর'আন মজীদে এমন বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? মিশরের পিরামিড থেকে শুরু করে নিউইয়র্কের গগনচুম্বী ইমারতগুলো পর্যন্ত কোনটি মানুষ তৈরী করেনি? অথচ কোন বাদশাহ, ধনকুবের ও বিশ্বখ্যাত ব্যবসায়ীরা জন্য এমন ধরনের "জিন" ও "শয়তান" সরবরাহ করা হয়নি যা হযরত সুলায়মান (আ)- এর জন্য করা হয়েছিল।[৫৭]

বর্তমান যুগের কোন কোন মুফাসসির এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন- হযরত সুলাইমান (আ)- এর ছেলে রাহুবআম যেহেতু ছিলের অযোগ্য, বিলাশী ও তোষামোদকারী মোসাহেব পরিবৃত, তাই নিজের মহিমান্বিত পিতার ইন্তেকালের পর তার ওপর যে মহান দায়িত্ব এসে পড়েছিল তা পালন করতে তিনি সক্ষম হননি। তার ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন পরেই রাষ্ট্রব্যবস্থা পতনমুখী হয় এবং আশপাশের সীমান্ত এলাকার যেসব উপজাতিকে (অর্থাৎ জিন) হযরত সুলাইমান (আ) তার প্রবল পরাক্রমের মাধ্যমে নিজের দাসে পরিণত করে রেখেছিলেন তারা সবাই নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা কোনক্রমেই কুর'আনের শব্দাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কুর'আনের শব্দাবলী আমাদের সামনে যে নকশা পেশ করছে তা হচ্ছে যে, হযরত সুলাইমান এমন সময় মৃত্যবরণ করেন যখন তিনি একটি লাঠিতে ভর দিয়ে দাড়িয়ে বা বসে ছিলেন। এ লাঠির কারণে তার নিস্প্রাণ দেহ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তিনি জীবিত আছেন মনে করেই জিনেরা তার কাজ করে চলছিল । শেষে যখন লাঠিতে ঘূন ধরে গেল এবং তা ভেতর থেকে অন্তসারশূন্য হয়ে গেল তখন তার মরদেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়লো এবং জিনেরা জানতে পারল তিনি মারা গেছেন। এই পরিস্কার ও দ্ব্যর্থহীন ঘটনা বর্ণনার গায়ে এ ধরনের অর্থের প্রলেপ লাগাবার কি যুক্তিসংগত কারন থাকতে পারে যে, ঘূন অর্থ হচ্ছে হযরত সুলাইমানের ছেলের অযোগ্যতা, লাঠি অর্থ হচ্ছে তা কর্তৃত্ব ক্ষমতা এবং তার মৃতদেহ পড়ে যাবার মানে হচ্ছে তার রাজ্য টুকরো হয়ে যাওয়া?

---

৫৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৮৮২

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়টি বর্ণনা করাই যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে কি এ জন্য সাবলীল আরবী ভাষায় শব্দের আকাল হয়ে গিয়েছিল? এভাবে হেরফের করে তা বর্ণনা করার কি কোন প্রয়োজন ছিল? এ ধরনের হেয়ালি ও ধাঁধার ভাষা কুর'আনের কোথায় ব্যবহার হয়েছে? আর এ বানী প্রথমে সে যুগের সাধারণ আরবদের সামনের যখন নাযিল হয় তখন তারা কিভাবে এ ধাঁধার মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

তারপর এ ব্যাখ্যার সবচেয়ে বেশী অদ্ভুত বিষয়টি হচ্ছে এই যে, এখানে জিন বলতে বুঝানো হয়েছে সীমান্ত উপজাতিগুলোকে, যাদেরকে হযরত সুলাইমান নিজের সেবাকর্মে নিযুক্ত করে রেখেছিলন। প্রশ্ন হচ্ছে, এ উপজাতিগুলো মধ্যে কে অদৃশ্যজ্ঞানের দাবীদার ছিল এবং মুশরিকরা কাকে অদৃশ্য জ্ঞানী মনে করতো? আয়াতের শেষের শব্দগুলো একটু মনোযোগ সহকারে পড়লে যে কোন ব্যক্তি নিজেই দেখতে পারে, জিন বলতে এখানে অবশ্যই এমন কোন দল বুঝানো হয়েছে যারা নিজেরাই অদৃশ্যজ্ঞানের দাবীদার ছিল অথবা লোকেরা তাদেরকে অদৃশ্যজ্ঞানী মনের করতো এবং তাদের অদৃশ্য বিষয়ক অজ্ঞতার রহস্য এ ঘটনাটিই উদঘাটন করে দিয়েছে যে, তারা হযরত সুলাইমানকে জীবিত মনে করেই তা খেদমতে নিযুক্তি থাকে অথচ তার ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। কুর'আনের এই মতটি বর্ণনা দেবার পর জিন বলতে সীমান্ত উপজাতিদেরকে বুঝানো হয়েছে এই মতটি পুনরবিবেচনা করা একজন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বস্তুবাদী দুনিয়ার সামনে জিন নামের একটি অদৃশ্য সৃষ্টির অস্তিত্ব মেনে নিতে যারা লজ্জা অনুভব করছিলেন তারা কুআনের এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পর নিজেদের জটিল মনগড়া ব্যাখ্যার ওপরই জোর দিতে থাকেন। কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ বলেছেন- আরবের মুশকিরা জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো, তাদেরকে আল্লাহর সন্তান মনে করত এবং তাদের কাছে আশ্রয় চাইত-

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ -

"আর তারা জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নিয়েছে অথচ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।"[৫৮]

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ -

"আর তারা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়েছে।"[৫৯]

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا -

"আর ব্যাপার হচ্ছে মানব জাতির মধ্য থেকে কিছু লোক জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোকের কাছে আশ্রয় চাইত।"[৬০]

---

৫৮. আল-কুর'আন, ০৬: ১০০

৫৯. আল-কুর'আন, ৩৭: ১৫৮)

৬০. আল-কুর'আন, ৭২: ৬

Dhaka University Institutional Repository

তাদের এসব বিশ্বাসের মধ্যে একটি বিশ্বাস এও ছিল যে, তারা জিনদেরকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান সম্পন্ন মনে করত এবং অদৃশ্য বিষয় জানার জন্য জিনদের শরণাপন্ন হত। এ বিশ্বাসটির অসারতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ এখানে এ ঘটনাটি শুনাচ্ছেন এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আরবের কাফেরদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, তোমরা অনর্থক জাহেলিয়াতের মিথ্যা বিশ্বাসের ওপর জোর দিয়ে চলছো অথচ তোমাদের এ বিশ্বাস গুলো একেবারেই ভিত্তিহীন।[৬১]

لقَدْ أرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِه فقَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكم مَنْ إلـهِ غَيْرُهُ إنّي أخَافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ - عظِيم

"নুহকে আমি তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই। সে বলেঃ হে আমার স্বগোত্রীয় ভাইয়েরা! আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করছি।"[৬২]

হযরত নূহ (আ) ও তার সম্প্রদায় থেকে এ ঐতিহাসিক বিবরণের সূচনা করা হয়েছে। কারণ কুর'আনের দৃষ্টিতে হযরত আদম (আ) তাঁর সন্তানদের যে সৎ ও সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে যান, তাতে প্রথম বিকৃতি দেখা দেয় হযরত নূহের যুগে এবং এরি সংশোধন ও এ জীবনে ব্যবস্থাকে আবার সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যে মহান আল্লাহ্ হযরত নূহকে পাঠান।

কুর'আনের ইংগিত ও বাইবেলের সুস্পষ্ট বর্ণনার পর একথা আজ নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে যে, বর্তমান ইরাকেই হযরত নূহের সম্প্রাদায়ের বসবাস ছিল। বেবিলনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেসে অভ্যন্তরে বাইবেলের চাইতেও যে প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে , তা থেকেও এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুর'আনে ও তাওরাতে যে ঘটনা বর্নিত হয়েছে ঐ প্রাচীন লিপিতেও তদ্রুপ এক কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘটনাটি মুসেল এর আশেপাশে ঘটেছিল বলে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কুর্দিস্তান ও আরমেনিয়া এলাকায় প্রাচীনকাল থেকে বংশ পরম্পরায় যেসব কিংবদন্তী চলে আসছে তা থেকেও জানা যায় যে, প্লাবনের পর হযরত নূহের নৌকা এ এলাকার কোন এক স্থানে থেমেছিল। আজো মুসেলের উত্তরে ইবনে উমর দ্বীপের আশেপাশে এবং আরমেনিয়া সীমান্তে "আরারাত" পাহাড়ের আশেপাশে নূহ আলাইহিস সালামের বিভিন্ন নিদর্শন চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। 'নখচীওয়ান' শহরের অধিবাসীদের মধ্যে আজো এ প্রবাদ প্রচলিত যে, হযরত নূহ এ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

নূহের প্লাবনের মত প্রায় একই ধরনের ঘটনার কথা গ্রীক, মিসর, ভারত ও চীনের প্রাচীন সাহিত্যেও পাওয়া যায়।এছাড়াও বার্মা, মালয়েশিয়া, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি এবং আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায় ও এ একই ধরনের কিংবদন্তী প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এ ঘটনাটি এমন এক সময়ের সাথে সম্পর্কিত যখন সমগ্র মানব জাতির দুনিয়ার একই এলাকায় অবস্থান করতো, তারপর সেখান থেকে তাদের বংশধরেরা দুনিয়ার চতুরদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সকল জাতি তাদের উন্মেষকালীন ইতিহাসে একটি সর্বব্যাপী প্লাবনের ঘটনা নির্দেশ করেছে। অবশ্য কালের আবর্তনের এর যথার্থ বিস্তারিত তথ্যাদি তারা বিস্মৃত হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকে নিজের চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী আসল ঘটনার গায়ে প্রলেপ লাগিয়ে এক একটা বিরাট কল্পকাহিনী তৈরী করে নিয়েছে।[৬৩]

---

৬১. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ১১০৪

৬২. আল-কুর'আন, ৭: ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬

কুর'আন মজীদের এ স্থানে ও অন্যান্য স্থানে হযরত নূহ ও তাঁর সম্প্রদায়ের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ সম্প্রদায়টি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না ,তাঁর সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞও ছিল এবং তাঁর ইবাদত করতেও তারা অস্বীকার করতো না। বরং তারা প্রকৃতপক্ষে যে গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল সেই ছিল শিরক। অর্থাৎ তারা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে অন্যান্য সত্তাকেও শরীক করতো এবং ইবাদাতের লাভের অধিকারে তাদেরকে তাঁর সাথে হিস্সাদার মনে করতো। তারপর এ মৌলিক গোমরাহী থেকে এ জাতির মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি ও দুষ্কৃতির জন্ম নেয়। যেসব মনগড়া মাবুদকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অংশীদার গণ্য করা হয়েছিল,তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে জাতির মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেনীর জন্ম হয়। এ শ্রেনীটি সমস্ত ধর্মীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসে। জাতিকে তারা উচ্চ শ্রেনী ও নিম্ন শ্রনীতে বিভক্ত করে।

সমাজ জীবন জুলুম ও বিপর্যয়ে ভরপুর করে তোলে। নৈতিক উচ্ছৃংখলতা, চারিত্রিক নৈরাজ্য ও পাপাচারের মাধ্যমে মানবতার মূলে কুঠারাঘাত করে। এ অবস্থার পরিবর্তন করার জন্যে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম অত্যন্ত সবর, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালান। কিন্তু সাধারণ মানুষকে তারা নিজেদের প্রতারনা জালে এমনভাবে আবদ্ধ করে নেয় যার ফলে সংশোধনের কৌশল কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। অবশেষে হযরত নূহ (আ) আল্লাহর কাছে এ মর্মে দোয়া করেন! হে আল্লাহ! এ কাফেরদের একজনকেও পৃথিবীর বুকে জীবিত ছেড়ে দিয়ো না। কারণ এদের কাউকে জীবিত ছেড়ে দিলে এরা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করতে থাকবে এবং এদের বংশে যাদেরই জন্ম হবে তারাই হবে অসৎকর্মশীল, দুশ্চরিত্র ও বিশ্বাসঘাতক।[৬৪]

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বাবেল ত্যাগ

নমরূদ জাহান্নামযাত্রী হবার পর সে জাতির অবশিষ্ট লোকজন লুত (আ)-এর পক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলতে লাগল, এই সেদিন পর্যন্ত অত্র দেশ পাপিষ্ঠ নমরূদের করতলগত ছিল। এখন এদেশ এ রাজ্য আপনার। হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন রাজ্য দিয়ে আমার কোন কাজ নাই। এই দেশ রাজ্যের মালিকানা সর্বদার জন্যই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, অক্ষয়, অব্যয় সত্তা আল্লাহ তাআলার। আমি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তা মহান আল্লাহর এক অস্থায়ী মরণশীল বান্দা। মিশর ও অনারব দেশসমূহ রাজরাজড়াদের জায়গা। সেখানে তাদের বিধি-বিধান আর নির্দেশই প্রচলিত রয়েছে। আর শাম দেশ হচ্ছে সর্বদার জন্যই আম্বিয়ায়ে কেরামের বাসস্থান। আমি শাম দেশে গিয়েই থাকব। লোকজন বলল, তা হলে আমরাও আপনার সাথে শাম দেশে গিয়ে বসবাস করব। হযরত ইবরাহীম (আ) শাম দেশের উদ্দেশে রওয়ানা করে রাহইয়া নামক স্থানে উপনীত হন। কিছু দিন এস্থানে অবস্থান করে একে সম্মানিত করেন। রাহইয়া থেকে তিনি ফোরাত নদীর তীরে উপনীত হন। এখানে রোকাইয়া নামে এক শহরের পত্তন করেন। ফোরাত নদীর তীরস্থ রোকাইয়া শহর থেকে তিনি হলব শহরে এসেন। হলব থেকে হলবে আহমারে এবং সেখান থেকে ইয়ামানে গমন করেন্ ইয়ামানের বাদশাহ তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হন। যে তাঁর সাক্ষাতে আসত, সে-ই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হত। ইয়ামান থেকে দামেশকে পৌছেন। দামেশকবাসীকেও ইসলামের জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন্ দামেশক থেকে তিনি তাইয়্যেব শহরে উপনীত হন। তাঁর আগমনে শহরবাসী সকলে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যায়। মুসলমানগণ সেখান থেকে গনীমতের মাল-সম্পদ আহরণ করে তাঁর সঙ্গে কেনানে পৌছেন।

৬৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ৭৬০

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে তিনি একটি ঝর্ণা প্রবাহমান দেখতে পেয়ে সঙ্গীদেরকে বললেন, এই ঝর্ণার পানি মেলাদ, কাসূর ও ও খাসায়েম প্রভৃতি সাত জায়গায় গিয়ে পতিত হয়। সেখানকার লোকেরা সমকামিতা দোষে দুষ্ট। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে তাদের সকলেই মানবতা বিরোধী এই ঘৃণ্য অপকর্মে লিপ্ত। তাদের আরেক নৈতিক অপরাধ হল, তারা রাহাজানি করে। পথিক মুসাফিরদের সম্পদ ছিনতাই করে। তারা এ নৈতিক অপরাধে লিপ্ত থেকেই আল্লাহর আযাবে লিপ্ত হবে। আলোচ্য স্থানটিই ছিল হযরত লূত (আঃ)- এর সম্প্রদায়ের অধিবাস।[৬৫]

৬৫. মাওলানা আবু নায়ীম, কাসাসুল আম্বিয়া, খ. ১, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

তায়েফ

'মিনাল ক্বারইয়াতাইনি' বা দুই গ্রাম দ্বারা মক্কা ও তায়েফকে বুঝানো হয়েছে। দুটি শহর অর্থ মক্কা ও তায়েফ। কাফেররা বলতো সত্যিই যদি আল্লাহর কোন রসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো এবং তিনি সেই রসূলের কাছে তাঁর কিতাব নাযিল করতে চাইতেন তাহলে আমাদের কেন্দ্রীয় মর্যাদার এই শহরগুলোর মধ্য থেকে কোন নামকরা লোককে বাছাই করতেন। আল্লাহ রসুল বানানোর জন্য পেলেন এমন ব্যক্তিকে যে ইয়াতীম হয়ে জন্মলাভ করেছে, যে কোন উত্তরাধিকার লাভ করেনি, যে বকরি চরিয়ে যৌবনকাল অতিবাহিত করেছে, যে এখন স্ত্রীর সম্পদ দিয়ে জীবন যাপনও করে, ব্যবসা -বানিজ্য করে এবং যে কোন গোত্রের অধিপতি বা গোষ্ঠীর নেতা নয় । মক্কায় কি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা ও 'উতবা ইবনে রাবীআর মত সম্মানিত ও নামযাদা লোক ছিল না ? তায়েফে কি উরওয়া ইবনে মাসউদ, হাবীব ইবনে 'আমর, কিনানা ইবনে আবদে আমর এবং ইবনে আবদে ইয়ালীলের মত নেতারা ছিল না ? এটা ছিল তাদের, যুক্তি প্রমাণ । কোন মানুষ নবী হতে পারে প্রথমে তারা একথা মানতেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কুর'আন মজীদে যখন একের পর এক যুক্তি -প্রমান দিয়ে তাদের এ ধারণা পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া হলো এবং বলা হলো, ইতি পূর্বেও মানুষই সবসময় নবী হয়ে এসেছেন এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই রসূল হতে পারেন অন্য কেউ নয়। দুনিয়াতে রসূল হিসেবে যিনিই এসেছেন তিনি হঠাৎ আসমান থেকে নেমে আসেননি। মানুষের এসব জনপদেই তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, বাজারসমূহে চলাফেরা করতেন, সন্তানের পিতা ছিলেন এবং পানাহারের প্রয়োজন মুক্ত ছিলেন না।[৬৬]

তায়েফ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত:

(وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ)

"তারা বলে, দুটি শহরের বড় ব্যক্তিদের কারো ওপর এ কুর'আন নাযিল করা হলো না কেন? "[৬৭]

দুই শহরে দুইজন প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে মক্কায় ওয়ালিদ ইবনে মুগিরাহকে আর তায়েফে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীকে বুঝাত।

পরিচিতি

মক্কার তুলনায় তায়েফে শীত বেশি। হিজরতের আগে নবী (স) বনু সাকিফ এর নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করার জন্য সর্বপ্রথম তায়েফে গমন করেছিলেন। তায়েফে তিনটি উপত্যকা রয়েছে। হাদ্দা, তাবরা এবং ছাদ্দা। তায়েফ শহরটি মক্কা ও জেদ্দা শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত। নবম হিজরীতে তায়েফ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়। কৃষি কাজের জন্য তায়েফের ভূমি উর্বর। এখানে অনেক ফসল উৎপাদিত হয়। আঙ্গুর ও মধুউৎপাদনে তায়েফ বিখ্যাত।[৬৮]

---

৬৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ১২২৭

৬৭. আল-কুর'আন, ৪৩ঃ ৩১

৬৮. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., কুতুবুল বুলদান অধ্যায়, পৃ. ১৯)

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক অবস্থান

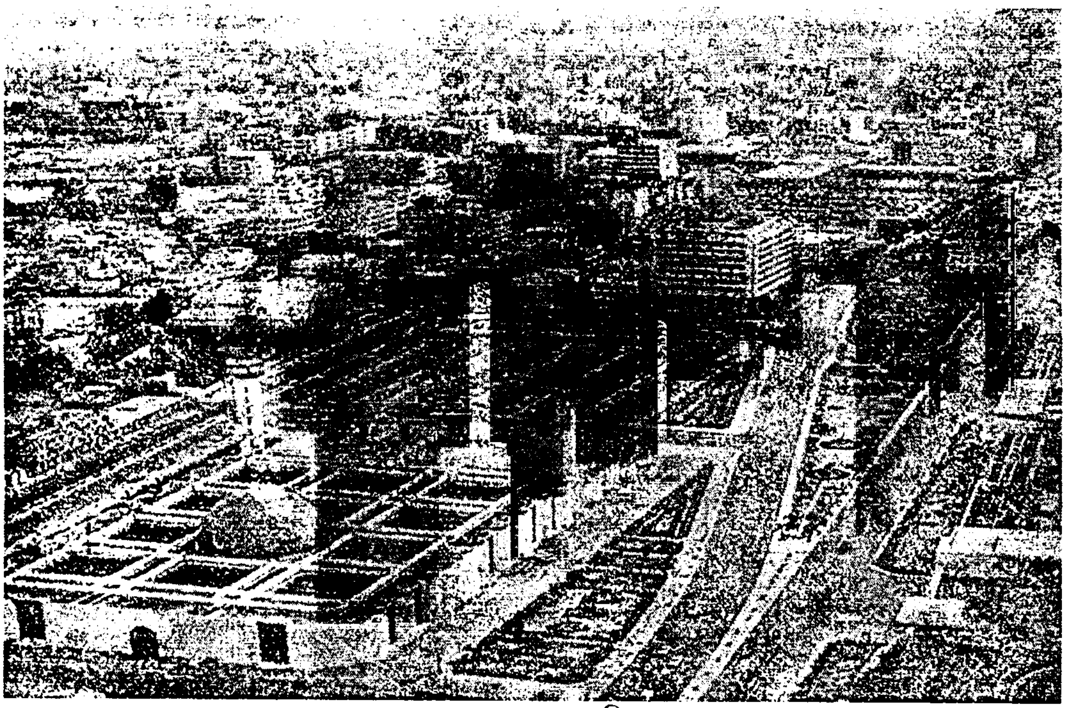

তায়েফ -এর মানচিত্র

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

দুটি শহর অর্থ মক্কা ও তায়েফ। কাফেররা বলতো সত্যিই যদি আল্লাহর কোন রসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো এবং তিনি সেই রসূলের কাছে তাঁর কিতাব নাযিল করতে চাইতেন তাহলে আমাদের কেন্দ্রীয় মর্যাদার এই শহরগুলোর মধ্য থেকে কোন নামকরা লোককে বাছাই করতেন।আল্লাহ্ রসুল বানানোর জন্য পেলেন এমন ব্যক্তিকে যে ইয়াতীম হয়ে জন্মলাভ করেছে, যে কোন উত্তরাধিকার লাভ করেনি, যে বকরি চরিয়ে যৌবনকাল অতিবাহিত করেছে, যে এখন স্ত্রীর সম্পদ দিয়ে জীবন যাপনও করে, ব্যবসা -বানিজ্য করে এবং যে কোন গোত্রের অধিপতি বা গোষ্ঠীর নেতা নয় । মক্কায় কি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা ও 'উতবা ইবনে রাবীআর মত সম্মানিত ও নামযাদা লোক ছিল না ? তায়েফে কি উরওয়া ইবনে মাসউদ, হাবীব ইবনে 'আমর, কিনানা ইবনে আবদে আমর এবং ইবনে আবদে ইয়ালীলের মত নেতারা ছিল না ? এটা ছিল তাদের, যুক্তি প্রমান । কোন মানুষ নবী হতে পারে প্রথমে তারা একথা মানতেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কুর'আন মজীদে যখন একের পর এক যুক্তি -প্রমান দিয়ে তাদের এ ধারনা পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া হলো এবং বলা হলো, ইতি পূর্বেও মানুষই সবসময় নবী হয়ে এসেছেন এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই রসূল হতে পারেন অন্য কেউ নয়। দুনিয়াতে রসূল হিসেবে যিনিই এসেছেন তিনি হঠাৎ আসমান থেকে নেমে আসেননি। মানুষের এসব জনপদেই তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, বাজারসমূহে চলাফেরা করতেন, সন্তানের পিতা ছিলেন এবং পানাহারের প্রয়োজন মুক্ত ছিলেন না। তখন তারা কৌশল পরিবর্তন করে বললো, বেশতো, মানুষই রাসূল হয়েছেন তা ঠিক। কিন্তু তাকে তো কোন নামজাদা লোক হতে হবে। তিনি হবেন সম্পদশালী, প্রভাবশালী, বড় দলবদলের অধিকারী এবং মানুষের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বেও প্রভাব থাকবে। সে জন্য মুহাম্মাদ (স) কি করে উপযুক্ত হতে পারেন ?[৬৯]

---

৬৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী, পৃ. ১২২৮

Dhaka University Institutional Repository

রোম

দেশের নাম ইতালি। ইতালি অঞ্চল লাজিও প্রদেশ রোম (আরএম)। সরকার ব্যবস্থা- মেয়র, পার্টি-পিডিএল। মেয়র- জাননী আলেমাননো। আয়তন- মোট ১,২৮৫.৩১ km^2 (৪৯৬.৩ sq mi), উচ্চতা ২০ মিটার (৬৬ ফুট), জনসংখ্যা (জুলাই ২০০৯) - মোট জনসংখ্যা- ২৭,৩০,১২৫, জনঘনত্ব-ন২,১২৪.১/km^2 (৫,৫০১.৪/sq mi), সময় অঞ্চল- CET (ইউটিসি+১) - গ্রীষ্মকাল (ডিএসটি) CET +২ (ইউটিসি), পোষ্ট কোড- ০০১২১ থেকে ০০১৯৯, আঞ্চলিক কোড- ০৬।[৭০]

রোম সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

غُلِبَتِ الرُّوْمُ - فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ -

"রোমানরা নিকটবর্তী দেশে পরাজিত হয়েছে এবং নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয় লাভ করবে।"[৭১]

ভৌগোলিক অবস্থান

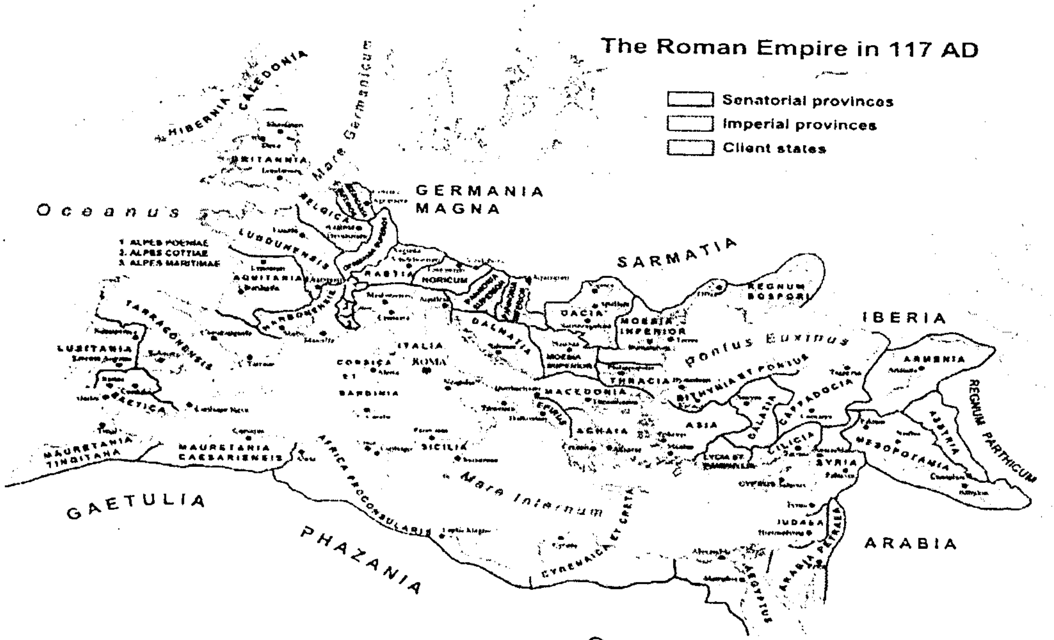

রোম- এর মানচিত্র

---

৭০. উইকিপিডিয়া

৭১. আল-কুর'আন, ৩০ঃ ২-৩

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

সূরা রূমে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সূরা আনকাবুতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর জন্য জিহাদ করে আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের উদ্দেশ্য সফলতার জন্য প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রোম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তা সেই খোদাই সাহায্যেরই একটি প্রতিক। এই সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ছিল কাফের। তাদের মধ্যে কারও বিজয় কারও পরাজয় বাহ্যতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোন কৌতুহলের বিষয় ছিলনা। কিন্তু উভয় কাফের দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক। এবং রোমকরা ছিল খ্রীষ্টান আহলে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা ধর্মের অনেক মূলনীতি যথা পরকালে বিশ্বাস, রেসালাত ও অহিতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রাসূল (স) ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কুরআনের এই আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন- - قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ [৭২]

রাসূল (স) এর মক্কায় অবস্থায়ন কালে পারসিকরা রোমদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফের ইবনে হাজর প্রমূখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শামদেশের আযরুয়াত ও বুশরার মধ্যে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পরসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা ধর্ম মাযহাবের দিক দিয়ে তারা ছিল ইসলামের নিকটবর্তী।কিন্তু তখনকারমত পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমনকি তারা কনষ্টান্টিনোপল ও অধিকার করে নিল। এবং সেখানে উপাসনার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এর পর তার পতন শুরু হয়। অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[৭৩]

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমাদের লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাকে সমর্থন করতে তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয় বরং আহলে কিতাব রোমরা যেমন পারসিকদের মোকাবেলায় পরাজয় বরণ করেছে তেমনি আমাদের মোকাবেলায় তোমরাও একদিন পরাজয় হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হলো।[৭৪]

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যত বাণি করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। হযরত আবু বকর রা যখন এসব আয়াত শুনলেন তখন মক্কার চতুর্দিকে এবং মুসরিকদের সমাবেশ এবং বাজারে গিয়ে ঘোষণা করলেন তোমাদের আনন্দিত হওয়ার কোন কারণনেই । কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করবে। মুসরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল এবং বলল তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। আবু বকর রা বললেন আল্লাহর দুশমন তুমি মিথ্যাবাদী। আমি এ ঘটনার জন্য বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয় তবে আমি দশটি উষ্ট্রি দিব।

---

৭২. আল-কুর'আন, ৩ : ৬৪

৭৩. আল-কুরতুবী, *আল-জামি লিআহকামিল-কুর'আন* , দারু ইহয়াইত-তুরাছ আল আরাবী, বৈরূত : তা. বি., খ. ২, পৃ. ১১৬

৭৪. আত-তাবারী, আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, (আল-ইমাম), জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন, বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮/১৯৮০, খ. ৩, পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

উবাই এতে সম্মত হলো। এ কথা বলে আবু বকর রা এর রাসূল সা এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূল স বললেন আমি তো তিন বছরের জন্য নির্দিষ্ট করে নি। কুর'আনে এর জন্য (بِضْعِ سِنِيْنَ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এ ঘটনা ঘটতেপারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে আমি দশটি উষ্ট্রির স্থলে একশ উষ্ট্রি বাজি রাখছি কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর। কোন কোন রেওয়াত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। আবু বকর রা আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হলো।[৭৫]

বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায় যে হিযরতের পাঁচ বছর পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। তখন উবাই ইবনে খালফ বেচে ছিল না। হযরত আবু বকর রা তার উত্তরাধীকারীদের কাছ থেকে একশত উষ্ট্রি দাবী করে আদায় করে নিলেন।[৭৬]

ইবনে আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী ও তাবেঈগণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রোম ও ইরানের এ যুদ্ধে মুসলমানদের সহানুভূতি ছিল রোমের পক্ষে এবং মক্কার কাফেরদের সহানুভূতি ছিল ইরানের পক্ষে। এর কয়েকটি কারণ ছিল। এক, ইরানীরা এ যুদ্ধকে খৃষ্টবাদ অগ্নি পূজার মতবাদের যুদ্ধের রূপ দিয়েছিল। তারা দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে অতিক্রম করে একে অগ্নি পূজার মতবাদ বিস্তারের মাধ্যমে পরিণত করছিল। বায়তুল মাকদিস জয়ের পর খসরু পারভেজ রোমের কায়সারের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে পরিষ্কারভাবে নিজের বিজয়কে তিনি অগ্নি উপাসনাবাদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছিলেন। নীতিগতভাবে অগ্নি উপাসনাবাদের সাথে মক্কার মুশরিকদের ধর্মের মিল ছিল। কারণ, তারাও ছিল তাওহীদ অস্বীকারকারী। তারা দুই খোদকে মানতো এবং আগুনের পূজা করতো। তাই মুশরিকরা ছিল তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের মোকাবিলায় খৃষ্টানরা যতই শিরকে লিপ্ত হয়ে যাক না কেন তবুও তারা তাওহীদকে ধর্মের মূল ভিত্তি বলে স্বীকার করতো। তারা আখেরাতে বিশ্বাস করতো এবং অহী ও রিসালাতকে হিদায়েতের উৎস বলে মানতে। তাই তাদের ধর্ম তাঁর আসল প্রকৃতির দিক থেকে মুসলমানদের ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল ।এ জন্য মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাদের ওপর মুশরিক জাতির বিজয়কে তারা অপছন্দ করতো। দ্বিতীয় কারণটি ছিল, এক নবীর আগমনের পূর্বে পূর্ববর্তী নবীকে যারা মানতো নীতিগতভাবে তারা মুসলমানের সংজ্ঞারই আওতাভুক্ত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী আগমনকারী নবীর দাওয়াত তাদের কাছে না পৌঁছে এবং তারা তা অস্বীকার না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের মধ্যেই গণ্য হতে থাকে। সে সময় নবী (স) এর নবুওয়াত লাভের পর মাত্র পাঁচ-ছয় বছর অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর দাওয়াত তখনো বাইরে পৌঁছে নি। তাই মুসলমানরা খৃষ্টানদেরকে কাফেরদের মধ্যে গণ্য করতো না। তবে ইহুদীরা তাদের দৃষ্টিতে ছিল কাফের। কারণ তারা ঈসা (আ) এর নবুওয়াত অস্বীকার করতো। তৃতীয় কারণ ছিল, ইসলামের সূচনায় খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের সাথে সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার করা হয়েছিল। বরং তাদের মধ্য থেকে বহু লোক খোলা মন নিয়ে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করছিল। তাঁরপর হাবশায় হিজরাতের সময় খৃষ্টান বাদশাহ মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেন এবং তাদের ফেরত পাঠাবার জন্য মক্কায় কাফেরদের দাবী প্রত্যাখান করেন। এরও দাবি ছিল মুসলমানরা অগ্নি পূজারীদের মোকাবিলায় খৃষ্টানদের কল্যাণকামী হোক।

---

৭৫. আত-তাবারী, আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, (আল-ইমাম), জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন, বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮/১৯৮০, খ. ৩, পৃ. ৭৭

৭৬. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র), তফসীর মাআরেফুল কুর'আন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ১০৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে আব্বাস (রা) আবু সাঈদ খুদরী (রা), সুফিয়ান সওরী (রা), সুদ্দী প্রমুখ মনীষীগণ বর্ণনা করেন, ইরানীদের ওপর রোমীয়রা এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের ওপর মুসলমানরা একই সময় বিজয় লাভ করেন। এ জন্য মুসলমানরা দ্বিগুণ আনন্দিত হয়। ইরান ও রোমের ইতিহাস থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। ৬২৪ সালে বদরের যুদ্ধ হয়। এ বছরই রোমের কায়সার অগ্নি উপাসনাবাদের প্রবর্তক জরথুস্ট্রের জন্মস্থান ধ্বংস করেন এবং ইরানের সবচেয়ে বড় অগ্নিকুণ্ড বিধ্বস্ত করেন।[৭৭]

রোম সাম্রাজ্য

গ্রীসের পতনের পর রোম সাম্রাজ্যকেই তখন দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা শক্তি বলে বিবেচনা করা হত। কিন্তু ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যই অধঃপতনের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়। রাষ্ট্র-সরকারের অব্যাবস্থা,শত্রুর ভয়,অভ্যন্তরীন অশান্তি, নৈতিকতার বিলুপ্তি, বিলাসিতার আতিশয্য-এক কথায় তখন এমন কোন দুষ্কৃতি ছিলো না ,যা লোকেদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি। ধর্মীয় দিক থেকে তো কিছু লোক নক্ষত্র ও দেবতার কল্পিত মূর্তির পূজা-উপাসনায় লিপ্ত ছিলোই;কিন্তু যারা ঈসার ধর্মের অনুসারী বলে নিজেদের দাবি করত, তারাও তাওহীদের ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলো। তারা হযরত ঈসা (আঃ) ও মরিয়মের খোদায়ী মর্যাদায় বিশ্বাসী ছিলো। পরন্ত তারা অসংখ্য ধর্মীয় ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো এবং পরস্পর লড়াই-ঝগড়ায় লিপ্ত থাকতো। তাদের মধ্যে কবর পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। পাদ্রীদের তারা সিজদা করত। পোপ ও বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্মীয় পদাধিকারীগণ বাদশাহী,এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে খোদায়ী ক্ষমতা পর্যন্ত করায়ত্ত করে রেখেছিলো। হারাম ও হালালের মাপকাঠী তাদের হাতেই নিবদ্ধ ছিলো। তাদের কথাকে 'খোদায়ী আইন' বলে গণ্য করা হত। পাশাপাশি সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাস ব্রতকে ধার্মিকতার উচ্চাদর্শ বলে মনে করা হতো এবং সকল প্রকার আরাম আয়েশ থেকে দেহকে মুক্ত রাখাই শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলে বিবেচিত হতো।[৭৮]

---

৭৭. আত-তাবারী, আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, (আল-ইমাম), জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন, বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮/১৯৮০, খ. ২, পৃ. ৬৭

৭৮. আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, (অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), নাকিব পাবলিকেশন, ঢাকা: সর্বশেষ ২০০৬, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ইরাম

ইরাম মিশরের আলেকজান্ডরিয়া অথবা সিরিয়ার দামেস্কে অবস্থিত। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, সানা ও হাযরামাউতের মধ্যবর্তী স্থান।

ইরাম সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ - الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ -

"ইরাম গোত্রভূক্ত, যাদের দেহাবয়ব ছিল সুউচ্চ স্তম্ভের মত। যাদের সদৃশ্য সারা বিশ্বের জনপদসমুহে কোন মানুষ সৃষ্টি হয়নি।"[৭৯]

পরিচিতি

আলোচ্য আয়াতে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'দ গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আ'দে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আ'দের তুলনায় আ'দের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'দে-ইরাম শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকে সূরা আল ফজর-এ আ'দে-ইরাম এবং সূরা নাজ্‌ম -এ (عَادًا الْأُولَى) শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- - وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى – "তিনি প্রথম আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন।"[৮০]

এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে (ذَاتِ الْعِمَادِ)- عِمَادِ - عمود শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকার জাতি ছিল বিধায় তাদের (ذَاتِ الْعِمَادِ) বলা হয়েছে। এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কুর'আন পাকে তাদের স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলা হয়েছে-

- لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ -

"যাদের সদৃশ্য সারা বিশ্বের জনপদসমুহে কোন মানুষ সৃষ্টি হয়নি।"[৮১]

এতদসত্ত্বেও কুর'আন তাদের দেহের সাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরাঈলীরেওয়ায়েতসমূহে তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অদ্ভুতধরণের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুকতিল (র) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট বর্ণিত আছে। উলা বাহুল্য, তাঁরা ইসরাঈরী রেওয়ায়েত দৃষ্টেতেই একথা বলেছেন।

---

৭৯. আল-কুর'আন, ৮৯ : ৭-৮
৮০. আল-কুর'আন, ৫৩ : ৫০)
৮১. আল-কুর'আন, ৮৯ : ৮

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন : ইরাম আ'দ তনয় শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণে (ذَاتِ الْعِمَادِ) কেননা, এই অনুপম প্রাসাদটি বহু স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এ নগদ বেহেশত পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল,তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হল। ফলে সবাই ধ্বংস এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল।[৮২]

এ তাফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ'দ গোত্রের একটি বিশেষ আযাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের উপর নাযিল হয়েছে। প্রথম তাফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের সমস্ত আযএবর কথাই বর্ণিত হয়েছে।[৮৩]

---

৮২. কুরতুবী

৮৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ১৪৫৪

Dhaka University Institutional Repository

লুত (আ)-এর শহর

লুত (আ)-এর শহর সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ -

আর লূতকে আমি পয়গম্বর করে পাঠাই। তারপর স্মরণ করো, যখন সে নিজের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললোঃ "তোমরা কি এতই নির্লজ্জ হয়ে গেলে যে, দুনিয়ার ইতিপূর্বে কেউ কখনো করেনি এমন অশ্লীল কাজ করে চলেছো?[৮৪]

বর্তমানে যে এলাকাটিকেট্রান্স জর্ড বলা হয় সেখানেই ছিল এ জাতিটির বাস। ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে এ এলাকাটি অবস্থিত। বাইবেলে সাদূম কে এ জাতির কেন্দ্রস্থল বলা হয়েছে। মৃত সাগরের (Dead sea) নিকটবর্তী কোথাও এর অবস্থান ছিল। তালমূদে বলা হয়েছে, সাদূম ছাড়া তাদের আরো চারটি বড় বড় শহর ছিল। এ শহরগুলোর মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ এমনই শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ ছিল যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করতো। কিন্তু আজ এ জাতির নাম- নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনকি তাদের জনপদগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত ছিল তাও আজ সঠিকভাবে জানা যায় না। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে। বর্তমানে এটি 'লুত সাগর' নামে পরিচিত। হযরত লূত আলাইহিস সালাম ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাইপো। তিনি চাচার সাথে ইরাক থেকে বের হন এবং কিছু কাল সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসর সফর করে দাওয়াত ও তাবলীগের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন। অতপর স্বতন্ত্রভাবে রিসালাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে এ পথ ভ্রষ্ট জাতিটির সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হন।সাদূমবাসীদের সাথে সম্ভবত তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তাদেরকে তার সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইহুদীদের হাতে বিকৃত বাইবেলে হযরত লূতের চরিত্রের বহুতর কলংক কালিমা লেপন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, তিনি নাকি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করে সাদূম এলাকায় চলে গিয়েছিলেন।[৮৫]

কিন্তু কুর'আন এ মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করছে। কুর'আনের বক্তব্য মতে আল্লাহ তাকে রসূল নিযুক্ত করে এ জাতির কাছে পাঠান।[৮৬]

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ -

"তোমরা মেয়েদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করছো? প্রকৃতপক্ষে তোমরা একেবারেই সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী।"[৮৭]

---

৮৪. আল-কুর'আন, ৭: ৮০

৮৫. প্রাগুক্ত, আদিপুস্তক ১৩:১-১২)

৮৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ৭৬১

৮৭. আল-কুর'আন, ৭: ৮১

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য স্থানে এ জাতির আরো কয়েকটি নৈতিক অপরাধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধটির উল্লেখ করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ অপরাধটির ফলে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়। এ ঘৃণ্য অপকর্মটির বদৌলতে এ জাতি যদিও দুনিয়ার বুকে চিরদিনই দিক্কার ও কুখ্যাতি কুড়িয়েছে। কিন্তু অসৎ ও দুষ্কর্মশীল লোকেরা এ অপকর্মটি থেকে কখনো বিরত থাকেনি। তবে একমাত্র গ্রীকরাই এ একক কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে যে, তাদের দার্শনিকরা এ জঘন্য অপরাধটিকে উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণের পর্যায়ে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছে। এরপর আর যেটুকু বাকি ছিল, আধুনিক ইউরোপ তা পূর্ণ করে দিয়েছে। ইউরোপে এর স্বপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। এমনকি একটি দেশের (জার্মানী) পার্লামেন্ট একে রীতিমতো বৈধ গণ্য করেছে। অথচ সমকামিতা যে সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী একথা একটি অকাট্য সত্য। মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন ও বংশরক্ষার উদ্দেশ্যই সকল প্রানীর মধ্যে নর-নারীর পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। আর মানব জাতির মধ্যে এ বিভিন্নতার আর একটি বাড়তি উদ্দেশ্য হচ্ছে নর ও নারী মিলে এক একটি পরিবারের জন্ম দেবে এবং তার মাধ্যমে সমাজ-সভ্যতা -সংস্কৃতির ভিত গড়ে উঠবে। এ উদ্দেশ্যেই নারী ও পুরুষের দুটি পৃথক লিংগের সৃষ্টি করা হয়েছে।তাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে।

পারস্পরিক দাম্পত্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করার উপযোগী করে তাদের শারীরিক ও মানসিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ ও মিলনের মধ্যেএমন একটি আনন্দ মধুর স্বাদ রাখা হয়েছে যা প্রকৃতির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে একই সংগে আকর্ষনকারী ও আহবায়কের কাজ করে এবং এ সংগে তাদেরকে দান করে এ কাজের প্রতিদানও। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতির এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচারণ করে সমমৈথুনের মাধ্যেম যৌন আনন্দ লাভ করে সে একই সংগে কয়েকটি অপরাধ করে। প্রথমত সে নিজের এবং নিজের স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক কাঠামোর সাথে যুদ্ধ করে এবং তার মধ্যে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এর ফলে তাদের উভয়ের দেহ, মন ও নৈতিক বৃত্তির ওপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। দ্বিতীয়ত, সে প্রকৃতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

কারণ প্রকৃতি তাকে যে আনন্দ স্বাদ মানব জাতির ও মানসিক সংস্কৃতির সেবায় প্রতিদান হিসেবে দিয়েছিল, এবং যা অর্জন করাকে তার দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের সাথে শর্তযুক্ত করেছিল, সেই স্বাদ ও আনন্দ সে কোন প্রকার সেবামূলক কার্যক্রম , কর্তব্য পালন, অধিকার আদায় ও দায়িত্ব সম্পাদন ছাড়াই ভোগ করে। তৃতীয়ত সে মানব সমাজের সাথে প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকা করে। কারণ সমাজে যে সমস্ত তামাদ্দুনিক প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে সেগুলোকে সে ব্যবহার করে এবং তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিন্তু যখন তার নিজের দেবার পালা আসে তখন অধিকার ,দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করার পরিবর্তে সে নিজের সমগ্র শক্তিকে নিরেট স্বার্থপরতার সাথে এমনভাবে ব্যবহার করে, যা সামাজিক সংস্কৃত ও নৈতিকতার জন্যে কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় ও অলাভজনকই হয় না বরং নিদারুনভাবে ক্ষতিকরও হয়। সে নিজেকে বংশ ও পরিবারের সেবার অযোগ্য করে তোলে।নিজের সাথে অন্ততপক্ষে একজন পুরুষকে নারী সূলভ আচরনের লিপ্ত করে। আর এই সংগে কমপক্ষে দুটি মেয়ের জন্যে যৌন ভ্রষ্টতা ও নৈতিক অধপতনের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।[৮৮]

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

"কিন্তু তার সম্প্রদায়ের জওয়াব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে- এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা বড়ই পবিত্রার ধ্বজাধারী হয়েছে।"[৮৯]

---

৮৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ৭৭৬)

৮৯. আল-কুর'আন, ৭: ৮২

Dhaka University Institutional Repository

এ থেকে জানা যায়,এ লোকগুলো কেবল নির্লজ্জ, দুষ্কৃতিকারী, ও দুশ্চরিত্রই ছিল না বরং তারা নৈতিক অধাপতনের এমন চরমে পৌঁছে গিয়েছিল যে, নিজেদের মধ্যে কতিপয় সৎব্যক্তির ও সৎকর্মের দিকে আহবানকারী ও অসৎকর্মের সমালোচনাকারীর অস্তিত্ব পর্যন্ত বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিল না।তারা অসৎকর্মের মধ্যে এতদূর ডুবে গিয়েছিল যে, সংশোধনের সামান্যতম আওয়াজও ছিল তাদের সহ্যের বাইরে। তাদের জঘন্যতম পরিবেশে পবিত্রতার যে সামান্যতম উপাদান অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল তাকেও তারা উৎখাত করতে চাইছিল। এ ধরনের একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত হয়। কারণ যে জাতির সমাজ জীবনে পবিত্রতার সামান্যতম উপাদানও অবশিষ্ট থাকে না তাকে পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখার কোন কারণই থাকতে পারে না। পচা ফলের ঝুড়িতে যতক্ষণ কয়েকটি ভাল ফল থাকে ততক্ষণ ঝুড়িটি যত্নের সাথে রেখে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ভাল ফলগুলো ঝুড়ি থেকে বের করে নেয়ার পর এই ঝুড়িটি যত্নের সাথে সংরক্ষিত করে রাখার পরিবর্তে পথের ধারে কোন আবর্জনার স্তুপে নিক্ষেপ করারই যোগ্য হয়ে পড়ে।[৯০]

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ -

"এবং এ সম্প্রদায়ের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি। তারপর সেই অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিল দেখো।"[৯১]

বৃষ্টি মানে এখানে পানি -বৃষ্টি নয় বরং পাথর-বৃষ্টি । কুর'আনের অন্যান্য স্থানে এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে । তাছাড়া কুর'আনে একথাও বলা হয়েছে যে, তাদের জনপদের উল্টিয়ে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।[৯২]

এখানে এবং কুআনের আরো বিভিন্ন স্থানে কেবল এতটুকুন বলা হয়েছে, যে, লূত জাতি একটি অতি জঘন্য ও নোংরা পাপ কাজের অনুশীলন করে যাচ্ছিল । এবং এ ধরনের পার কাজের পরিণামে এ জাতির ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা থেকে আমরা একথা জানতে পেরেছি যে, এটি এমন একটি অপরাধ সমাজ অংগনকে যার কুলুষমুক্ত রাখার চেষ্টা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়ীত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং এ ধরনের অপরাধকারীদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া উচিত।এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে বলা হয়েছে- (এঅপরাধকারী ও যার সাথে সে অপরাধ করেছে তাদের উভয়কে হত্যা করো), আবার কোনটিতে এর ওপর এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে- (বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত)।

আবার কোথাও এও বলা হয়েছে- (ওপরের ও নীচের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করো।) কিন্তু যেহেতু নবী (স)- এর যুগে এ ধরনের কোন মামলা আসেনি তাই এর শাস্তি কিভাবে দেয়া হবে, তা অকাট্যভাবে চিহ্নিত হতে পারেনি। সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলীর (রা) মতে অপরাধীকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করতে হবে এবং কবরস্থ করার পরিবর্তে তার লাশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। হযরত আবু বকর (রা) এ মত সমর্থন করেন। হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমানের (রা) মতে কোন পতনোন্মুখ ইমারতের নীচে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ইমারতটিকে তার ওপর ধ্বসীয়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের (রা) ফতোয়া হচ্ছে, মহল্লার সবচেয়ে উঁচু বাড়ির ছাড় থেকে তাকে পা উপরের দিকে এবং মাথা নিচের দিকে করে নিক্ষেপ করতে এবং এই সংগে উপর থেকে তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে হবে।

---

৯০. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ৭৭৯

৯১. আল-কুর'আন, ৭: ৮৪

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬২

Dhaka University Institutional Repository

ফকীহদের মধ্যে ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, অপরাধী ও যার সাথে অপরাধ করা হয়েছে তারা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত , তাদের উভয়কে হত্যা করা ওয়াজিব। শাবী যুহরী, মালিক ও আহমদ (র)- এর মতে তাদের শাস্তি হচ্ছে রজম অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করা। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, আতা, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান সওরী, ও আওযাঈর (র)- এর মতে যিনার অপরাধে যে শাস্তি দেয়া হয় এ অপরাধের সেই একই শাক্তি দেয়া হবে। অর্থাৎ অবিবাহিতকে একশত বেত্রাঘাত করে দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে, এবং বিবাহিতকে রজম করা হবে। ইমাম আবু হানিফার (র) মতে,তার ওপর কোন দণ্ডবিধি নির্ধারিত নেই বরং এ কাজটি এমন যে, সরকার তার বিরুদ্ধে অবস্থা ও প্রয়োজন অনুপাতে যে কোন শিক্ষনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এর সমর্থনে ইমান শাফেয়ীর একটি বক্তব্যও পাওয়া যায়।[৯৩]

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তির তার নিজের স্ত্রীর সাথেও লূত জাতির কুকর্ম করা চূড়ান্তভাবে হারাম। আবু দাউদে নবী (স) এর এ উক্তি উদ্বৃত হয়েছে- (যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশে যৌন কার্য করে সে অভিশপ্ত।) ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমদে নবী (স)- এর এ বানী উদ্বৃত হয়েছে- (যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশে যৌন সংগমে লিপ্ত হয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।) ইমাম তিরমিযী তাঁর আর একটি নির্দেশ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে-

“যে ব্যক্তি ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে অথবা নিজের স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশে যৌন কার্য করে বা কোন গণকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে , সে মুহাম্মাদের (স) প্রতি অবতীর্ণ বিধান অস্বীকার করে” ।[৯৪]

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ -

“কিন্তু তার সম্প্রদায়ের জওয়াব এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে- এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা বড়ই পবিত্রার ধ্বজাধারী হয়েছে।”[৯৫]

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ -

“আর লূতকে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাকে এমন জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম যার অধিবাসীরা বদ কাজে লিপ্ত ছিল-আসলে তারা ছিল বড়ই দুরাচারী পাপিষ্ঠ জাতি। ”[৯৬]

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ -

“তারা বললো, আমাদের একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের দিকে পাঠানো হয়েছে। ”[৯৭]

এ ধরনের সংক্ষিপ্তইঙ্গিত থেকেপরিষ্কার বুঝা যায় যে,লূতেরসম্প্রদায়েরঅপরাধের পেয়ালাতখন কানায়কানায় ভরে উঠেছিল। যার ফলে হযরত ইবরাহীমের (আ) মত সজাগ ও অভিজ্ঞ লোকের সামনে তার নামউচ্চারণকরার আদৌ প্রয়োজনইহয়নি। কাজেই শুধুমাত্র“ একটিঅপরাধী সম্প্রদায়”বলাই যথেষ্ট বিবেচিতহয়েছে।

---

৯৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ৭৬৭)

৯৪. আত-তিরমিযী, আবু ঈসা, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, (আল-ইমাম), সুনানে তিরমিযী, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০

৯৫. আল-কুর'আন, ৭ঃ ৮২

৯৬. আল-কুর'আন, ২১ঃ ৭৪

৯৭. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ - إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ -
"শুধুমাত্র লূতের পরিবারবর্গ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের সবাইকে আমরা বাঁচিয়ে নেবো।" "তার স্ত্রী ছাড়া, যার জন্য (আল্লাহ বলেনঃ) আমি স্থির করেছি, সে পেছনে অবস্থানকারীদের সাথে থাকবে। " [৯৮]

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ - قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ - قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ -
প্রেরিতরা যখন লূতের পরিবারের কাছে পৌঁছুলো। তখন সে বললো, আপনারা অপরিচিত মনে হচ্ছে। তারা জবাব দিল, না, বরং আমরা তাই এনেছি যার আসার ব্যাপারে এরা সন্দেহ করছিলো।[৯৯]

এখানে বক্তব্যসংক্ষেপ করা হয়েছে। সূরা হূদে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করাহয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,তাদের আগমনে হযতর লূত (আ) অত্যন্তভীত- সন্ত্রস্ত হয়েপড়েন। তাঁর মন ভীষণভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাদেরকে দেখার সাথে সাথেইতিনিমনে মনে বলতে থাকেন আজ বড় কঠিন সময় এসেছে। তাঁর এ ভয়ের কারণ হিসেবেকুর'আনের বর্ণনাথেকেযে ইঙ্গিতএবং হাদীস থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্যপাওয়া যায় তাহচ্ছেএই যে, এ ফেরেশতারাঅত্যন্ত সুশ্রীকিশোরদের আকৃতি ধরে হযরত লূতের কাছে এসেছিলেন। এদিকে হযরত লূত (আ) তাঁর সম্প্রদায়েরলোকদেরচারিত্রিক দুষ্কৃতিসম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি আগত মেহমানদেরকে ফিরিয়েদিতেপারছিলেন না আবারনিজের সম্প্রদায়েরবদমায়েশদের হাত থেকে তাদেরকেরক্ষা করাও তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। তাই তিনিবড়ই পেরেশান হয়েপড়েছিলেন।[১০০]

وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ -
"আমরা তোমাকে যথার্থই বলছি, আমরা সত্য সহকারে তোমার কাছে এসেছি। "[১০১]

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ -
"কাজেই এখন তুমি কিছু রাত থাকতে নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে বের হয়ে যাও এবং তুমি তাদের পেছনে পেছনে চলো। তোমাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়। ব্যাস, সোজা চলে যাও যেদিকে যাবার জন্য তোমাদের হুকুম দেয়া হচ্ছে। "[১০২]

নিজের পরিবারবর্গের পেছনে পেছনেএ জন্য চলো যেন তাদের কেউ থেকে যেতে না পারে। এর মানে এ নয় যে, পেছন ফিরে তাকালেই তোমরা পাথর হয়েযাবে, যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে। বরংএর মানে হচ্ছে, পেছনের আওয়াজ শোর গোল শুনেতামাশ দেখার জন্য থেমেযেয়ো না। এটা তামাশ দেখার সময় নয় এবং অপরাধী জাতিরধ্বংসক্রিয়াদেখে অশ্রুপাতকরার সময়ও নয়। এক মুহূর্তযদি তোমরাআযাব প্রাপ্ত জাতিরএলাকায় থেমেযাওতাহলে ধ্বংস- বৃষ্টিরকিছুটাতোমাদের ওপরও বর্ষিত হতে পারে এবং তাতে তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারো।[১০৩]

---

৯৮. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৫৯-৬০
৯৯. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৬১-৬৩
১০০. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ৭৩২
১০১. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৬৪
১০২. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৬৫
১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৩

Dhaka University Institutional Repository

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ -وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ -

"আর তাকে আমি এ ফায়সালা পৌঁছিয়ে দিলাম যে, সকাল হতে হতেই এদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হবে। ইত্যবসরে নগরবাসীরা মহা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে লূতের বাড়ি চড়াও হলো।"[১০৪]

قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ - وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ

"লূত বললো, ভাইয়েরা আমার! এরা হচ্ছে আমার মেহমান, আমাকে বে-ইজ্জত করো না। আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে লাঞ্ছিত করো না।"[১০৫]

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ - قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ-

"তারা বললো, আমরা না তোমাকে বারবার মানা করেছি, সারা দুনিয়ার ঠিকেদারী নিয়ো না? লূত লাচার হয়ে বললো, যদি তোমাদের একান্তই কিছু করতেই হয় তাহলে এই যে আমার মেয়েরা রয়েছে।"[১০৬]

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ - فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ -

"তোমার জীবনের কসম হে নবী! সে সময় তারা যেন একটি নেশায় বিভোর হয়ে মাতালের মতো আচরণ করে চলছিল। অবশেষে প্রভাত হতেই একটি বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো।"[১০৭]

(فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ) -

"এবং আমি সেই জনপদটি ওলট পালট করে রেখে দিলাম আর তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম।"[১০৮]

এ পোড়া মাটিরপাথর বৃষ্টি হতে পারে উলকাপাত ধরনের কিছু। আবারআগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে তা মৃত্তিকাগর্ভথেকে বের হয়ে তাদের ওপর চতুরদিক থেকে বৃষ্টির মত বর্ষিতহয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া একটি মারাত্মক ধরনের ঘূর্ণিঝড়ওতাদের ওপর এ পাথর বৃষ্টি করতে পারে।

(وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ)

"সেই এলাকাটি (যেখানে এটা ঘটেছিল) লোক চলাচলের পথের পাশে অবস্থিত।"[১০৯]

হেজায থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিসর যাবার পথে এই ধবংসপ্রাপ্ত এলাকটি পড়ে। সাধারণত বাণিজ্য যাত্রীদল এ ধ্বংসের নিদর্শনগুলো দেখে থাকে। আজো সমগ্র এলাকা জুড়ে এ ধবংসাবশেষগুলো ছড়িয়ে আছে। এ এলাকাটির অবস্থান লূত সাগরের পূর্বে ও দক্ষিণে। বিশেষ করে এর দক্ষিণ অংশ সম্পর্কে ভূগোলবিদগণের বর্ণনা হচ্ছে, এ এলাকাটি এত বেশী বিধ্বস্ত যার নজীর দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যায় না।[১১০]

---

১০৪. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৬৬-৬৭

১০৫. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৬৮-৬৯

১০৬. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৭০-৭১

১০৭. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৭২-৭৩

১০৮. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৭৪

১০৯. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৭৬

১১০. মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ৮৩২

Dhaka University Institutional Repository

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ -

তারা বললো, "হে লূত! যদি তুমি এসব কথা থেকে বিরত না হও, তাহলে আমাদের জনপদগুলো থেকে যেসব লোককে বের করে দেয়া হয়েছে তুমিও নির্ঘাত তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।"[১১১]

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ -

আর যখন আমার প্রেরিতগণ ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছলো, তারা তাকে বললো, "আমরা এ জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেবো, এর অধিবাসীরা বড়ই জালেম হয়ে গেছে।"[১১২]

"এ জনপদ" বলে লূত জাতির সমগ্র এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) এ সময় ফিলিস্তিনের জাবরুন (বর্তমান আল খলীল) শহরে থাকতেন। এ শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে মরুসাগরে (Dead Sea) অংশ রয়েছে। সেখানে পূর্বে বাস করতো লূত জাতির লোকেরা এবং বর্তমানে এ সমগ্র এলাকা রয়েছে সাগরের পানির তলায়। এ এলাকাটি নিম্নভূমির দিকে অবস্থিত এবং জাবরুনের উঁচু উঁচু পর্বতগুলো থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। তাই ফেরেশতারা সেদিকে ইঙ্গিত করে হযরত ইবরাহীমকে বলেন, "আমরা এ জনপদটি ধ্বংস করে দেবো।"

এই সুস্পষ্ট নিদর্শনটি হচ্ছে মরুসাগর। একে লূত সাগরও বলা হয়। কুর'আন মাজীদেও বিভিন্ন স্থানে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এই জালেম জাতিটির ওপর তার কৃতকর্মের বদৌলতে যে আযাব নাযিল হয়েছিল তার একটি চিহ্ন আজো প্রকাশ্য রাজপথে বর্তমান রয়েছে। তোমরা সিরিয়ার দিকে নিজেদের বাণিজ্য সফরে যাবার সময় দিনরাত এ চিহ্নটি দেখে থাকো। বর্তমান যুগে একথাটি প্রায় নিশ্চয়তা সহকারেই স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে যে, মরুসাগরের দক্ষিণ অংশটি একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পনজনিত ভূমিধ্বংসের মাধ্যমে অস্তিত্বলাভ করেছে এবং এ ধ্বংস যাওয়া অংশেই অবস্থিত ছিল লূত জাতির কেন্দ্রীয় নগরী সাদোম (sodom)। এ অংশে পানির মধ্যে কিছু ডুবন্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষও দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে অত্যাধুনিক ডুবুরী সরঞ্জামের সহায়তায় কিছু লোকের নীচে নেমে ঐসব ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তুএখনো এ প্রচেষ্টাগুলোর ফলাফল জানা যায়নি।[১১৩]

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

"আমরা এ জনপদের লোকদের ওপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করতে যাচ্ছি তারা যে পাপাচার করে আসছে তার কারণে।"[১১৪]

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"আর আমি সে জনপদের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি তাদের জন্য যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে।"[১১৫]

---

১১১. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ১৬৭
১১২. আল-কুর'আন, ২৯ঃ ৩১
১১৩. ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল-বুলদান*, দারুল-কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত তা, বি, পৃ. ১৮৮
১১৪. আল-কুর'আন, ২৯ঃ ৩৪
১১৫. আল-কুর'আন, ২৯ঃ ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ -

"আর যখন আমার ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌঁছে গেলো ৮৫ তখন তাদের আগমনে সে খুব ঘাবড়ে গেলো এবং তার ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলো। সে বলতে লাগলো, আজ বড় বিপদের দিন।"[১১৬]

এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ কুর'আন মজীদের দেয়া হয়েছে তার বক্তব্যের অন্তরনিহিত তাৎপর্য থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ফেরেশতারা সুন্দর ছেলেদের ছদ্মবেশে হযরত লূতের গৃহে এসেছিলেন। তারাযে ফেরেশতা একথা হযরত লূত জানতেন না। এ কারণে এ মেহমানদের আগমনে তিনি খুব বেশী মানসিক উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন এবং তাঁর মনও সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজের সম্প্রদায়কে জানতেন। তারা কেমন ব্যভিচারী এবং কী পর্যায়ের নির্লজ্জ হয়ে গেছে তা তাঁর জানা ছিল।[১১৭]

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ -
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ -

(এ মেহমানদের আসার সাথে সাথেই) তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্দ্বিধায় তার ঘরের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আগে থেকেই তারা এমনি ধরনের কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললোঃ "ভাইয়েরা! এই যে, এখানে আমার মেয়েরা আছে, এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতর। আল্লাহর ভয়-ডর কিছু করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো লোক নেই?"[১১৮]

হতে পারে হযরত লূত সমগ্র সম্প্রদায়ের মেয়েদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ নবী তার সম্প্রদায়ের জন্য বাপের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। আর সম্প্রদায়ের মেয়েরা তাঁর দৃষ্টিতে নিজের মেয়ের মতো হয়ে থাকে। আবার এও হতে পারে যে, তাঁর ইঙ্গিতছিল তাঁর নিজের মেয়েদের প্রতি। তবে ব্যাপার যাই হোক না কেন উভয় অবস্থাতেই একথা ধারণা করার কোন কারণই নেই যে, হযরত লূত তাদেরকে যিনা করার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। "এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতর"--একথাই যাবতীয় ভুল অর্থের অবকাশ খতম করে দিয়েছে। হযরত লূতের বক্তব্যের পরিষ্কার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ যে জায়েয পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সেই পদ্ধতিতেই নিজেদের যৌন কামনা পূর্ণ করো এবং এ জন্য মেয়েদের অভাব নেই।[১১৯]

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ -

তারা জবাব দিলঃ "তুমি তো জানোই, তোমার মেয়েদের দিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই৮৮ এবং আমরা কি চাই তাও তুমি জানো।"[১২০]

এ বাক্যটি তাদের মানসিক অবস্থার পূর্ণচিত্র এঁকে দেয়। বুঝা যায় লাম্পট্যের ক্ষেত্রে তারা কত নিচে নেমে গিয়েছিল। তারা স্বভাব-প্রকৃতি ও পবিত্রতার পথ পরিহার করে একটি পূতিগন্ধময় প্রকৃতি বিরোধী পথে চলতে শুরু করেছিল, ব্যাপার শুধুমাত্র এতটুকুই ছিল না বরং অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল যে, এখন শুধুমাত্র এ একটি নোংরা পথের প্রতিই ছিল তাদের সমস্ত ঝোঁক-প্রবণতা, আকর্ষণ ও অনুরাগ।

---

১১৬. আল-কুর'আন, ১১: ৭৭
১১৭. ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল-বুলদান*, দারুল-কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত তা, বি, পৃ. ১৮৯)
১১৮. আল-কুর'আন, ১১: ৭৮
১১৯. ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল-বুলদান*, দারুল-কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত তা, বি, পৃ. ১৯০)
১২০. আল-কুর'আন, ১১: ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

তাদের প্রবৃত্তি এখন শুধুমাত্র এ নোংরামিরই অনুসন্ধান করে ফিরছিল। প্রকৃতি ও পবিত্রতার পথ তো আমাদের জন্য তৈরীই হয়নি একথা বলতে তারা কোন লজ্জা অনুভব করতো না। এটা হচ্ছে নৈতিক অধঃপতন ও চারিত্রিক বিকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়। এর চেয়ে বেশী নিম্নগামিতার কথা কল্পনাই করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তি নিছক নফস ও প্রবৃত্তির দুর্বলতার কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, এ সত্ত্বেও হালালকে কাংখিত এবং হারামকে পরিত্যাজ্য মনে করে, তার বিষয়টি খুবই হালকা। এমন ব্যক্তি কখনো সংশোধিত হয়ে যেতে পারে। আর সংশোধিত হয়েনা গেলেও তার সম্পর্কে বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, সে একজন বিকৃত চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তির সমস্ত আগ্রহ হারামের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় এবং সে মনে করতে থাকে হালাল তার জন্য তৈরীই হয়নি তখন তাকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করা যেতে পারে না। সে আসলে একটি নোংরা কীট। মুলমূত্র ও দুর্গন্ধের মধ্যেই সে প্রতিপালিত হয় এবং পাক-পবিত্রতার সাথে তার প্রকৃতিগত কোন সম্পর্কেই নেই। এ ধরনের কীট যদি কোন পরিচ্ছন্নতা প্রিয় মানুষের ঘরে জন্ম নেয় তাহলে প্রথম সুযোগেই সে ফিনাইল ঢেলে দিয়ে তার অস্তিত্ব থেকে নিজের গৃহকে মুক্ত করে নেয়। তাহলে আল্লাহ তার যমীনে এ ধরনের নোংরা কীটদের সামবেশকে কতদিন বরদাশত করতে পারতেন।[১২১]

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ -

লূত বললোঃ "হায়! যদি আমার এতটা শক্তি থাকতো যা দিয়ে আমি তোমাদের সোজা করে দিতে পারতাম অথবা কোন শক্তিশালী আশ্রয় থাকতো সেখানে আশ্রয় নিতে পারতাম।"[১২২]

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ -

তখন ফেরেশতারা তাকে বললোঃ "হে লূত! আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি কিছুটা রাত থাকতে তোমার পরিবার পরিজন নিয়ে বের হয়ে যাও। আর সাবধান। তোমাদের কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী ছাড়া (সে সাথে যাবে না) কারণ তার ওপরও তাই ঘটবে যা ঐ সব লোকের ঘটবে। তাদের ধ্বংসের জন্য প্রভাতকাল নির্দিষ্ট রয়েছে।- প্রভাত হবার আর কতটুকুই বা দেরী আছে!"[১২৩]

এর মানে হচ্ছে, এখন তোমাদের কিভাবে তাড়াতাড়ি এ এলাকা থেকে বের হয়ে যেতে পারো সে চিন্তা করা উচিত। পেছনে শোরগোল ও বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে তোমরা যেন পথে থেমে না যাও এবং আযাবের জন্য যে এলাকা নির্ধারিত হয়েছে আযাবের সময় এসে যাবার পরও তোমাদের কেউ যেন সেখানে অবস্থান না করে।[১২৪]

এটি তৃতীয় মর্মন্তুদ শিক্ষাণীয় ঘটনা। এ সূরায় লোকদেরকে একথা শিক্ষা দেবার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন বুযগের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং কোন বুযগের সুপারিশ তোমাদের নিজেদের গোনাহের পরিণতি থেকে বাঁচাতে পারে না।

---

১২১. ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল-বুলদান*, দারুল-কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত তা, বি, পৃ. ১৯১
১২২. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৮০
১২৩. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৮১
১২৪. ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল-বুলদান*, দারুল-কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত তা, বি, পৃ. ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ)
"অতঃপর যখন (সত্যিই) আমার (আযাবের নির্ধারিত) হুকুম এলো, তখন আমি সেই জনপদগুলো উল্টিয়ে দিলাম, এবং তার ওপর ক্রমাগত পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম।"[১২৫]

সম্ভবত একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতের আকারে এ আযাব এসেছিল। ভূমিকম্প জনবসতিটিকে ওলট-পালট করে দিয়েছিল এবং অগ্নুৎপাতের ফলে তার ওপর হয়েছিল ব্যাপক হারে পাথর বৃষ্টি। "পাকা মাটির পাথর" বলতে সম্ভবত এমন মাটি বুঝানো হয়েছে যা আগ্নেয়গিরির আওতাধীন এলাকার ভূগর্ভস্থ উত্তাপ ও লাভার প্রভাবে পাথরে পরিণত হয়। আজ পর্যন্ত লূত সাগরের দক্ষিণ ও পূর্ব এলাকায় এ পাথর বর্ষণের চিহ্ন সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে দেখা যা।[১২৬]

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ -
"যার মধ্য থেকে প্রত্যেকটি পাথর তোমার রবের কাছে চিহ্নিত ছিল। আর জালেমদের থেকে এ শাস্তি মোটেই দূরে নয়।"[১২৭]

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি পাথরকে কি ধ্বংসাত্মক কাজ করতে হবে এবং কোন পাথরটি কোন অপরাধীর ওপর পড়বে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল। আজ যারা জুলুমের পথে চলছে তারাও যেন এ আযাবকে নিজেদের থেকে দূরে না মনে করে লূতের সম্প্রদায়ের ওপর যদি আযাব আসতে পেরে থাকে তাহলে তাদের ওপরও আসতে পারে। লূতের সম্প্রদায় আল্লাহর আযাব ঠেকাতে পারেনি, এরাওপারবে না।[১২৮]

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ -
"তোমরা কি গোটা দুনিয়ার মধ্যে পুরুষদের কাছে যাও।"[১২৯]
এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে তোমরা শুধুমাত্র পুরুষদেরকে বাছাই করে নিয়েছো নিজেদের যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য, অথচ দুনিয়ায় বিপুল সংখ্যক মেয়ে রয়েছে। দুই. সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র তোমরাই যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্য পুরুষদের কাছে যাও। নয়তো মানব জাতির মধ্যে এমন দল দ্বিতীয়টি নেই। বরং পশুদের মধ্যেও কেউ এ কাজ করে না। সূরা আ'রাফ ও সূরা আনকাবুতে এ দ্বিতীয় অর্থটিকে আরো সুস্পষ্ট করে এভাবে তুলে ধরা হয়েছেঃ

اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين -
"তোমরা কি এমন নির্লজ্জতার কাজ কর, যা দুনিয়ার সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমাদের আগে কেউ করেনি?"[১৩০]

---

১২৫. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৮২
১২৬. ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল-বুলদান*, দারুল-কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত তা, বি, পৃ. ১৯৫
১২৭. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৮৩
১২৮. ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল-বুলদান*, দারুল-কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত তা, বি, পৃ. ১৯৮
১২৯ . আল-কুর'আন, ২৬ঃ ১৬৫
১৩০. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ১৬৫

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ -

Dhaka University Institutional Repository

"এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা পরিহার করে থাকো? বরং তোমরা তো সীমা-ই অতিক্রম করে গেছো।"[১৩১]

এরও দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. এ ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য আল্লাহ্ যে স্ত্রী জাতির সৃষ্টি করেছিলেন তাদেরকে বাদ দিয়ে তোমরা অস্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ পুরুষদেরকে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছো। দুই. আল্লাহ্ এ স্ত্রীদের মধ্যে ক্ষুধা পরিতৃপ্তির যে স্বাভাবিক পথ রেখেছিলেন তা বাদ দিয়ে তোমরা অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করছো। এই দ্বিতীয় অর্থটি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ জালেমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকেও প্রকৃতি বিরোধী পথে ব্যবহার করতো। হতে পারে পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এ কাজ করেছে। তোমাদের কেবলমাত্র এ একটিই অপরাধ নয়। তোমাদের জীবনের সমস্ত রীতিই সীমাতিরিক্ত ভাবে বিগড়ে গেছে। কুর'আন মজীদের অন্যান্য স্থানে তাদের এ সাধারণ অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون -

"তোমাদের অবস্থা কি এমন হয়ে গেছে যে, চোখে দেখে অশ্লীল কাজ করছো?"[১৩২]

أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر -

"তোমরা কি এমনই বিকৃত হয়ে গেছো যে, পুরুষদের সাথে সঙ্গম করছো, রাজপথে দস্যুতা করছো এবং নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে খারাপ কাজ করছো?"[১৩৩]

قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين -

তারা বললো, "হে লূত! যদি তুমি এসব কথা থেকে বিরত না হও, তাহলে আমাদের জনপদগুলো থেকে যেসব লোককে বের করে দেয়া হয়েছে তুমিও নির্ঘাত তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।"[১৩৪]

তুমি জানো এর আগে যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে অথবা আমাদের কাজের প্রতিবাদ করেছে কিংবা আমাদের ইচ্ছা বিরোধী কাজ করেছে তাকেই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এখন যদি তুমি এসব কথা বলতে থাকো, তাহলে তোমার পরিণামও অনুরূপই হবে। সূরা আ'রাফ ও সূরা নামলে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত লূতকে (আ) এ নোটিশ দেবার আগে এ পাপাচারী জাতির লোকেরা নিজেদের মধ্যে ফয়সালা করে নিয়েছিল-

اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون -

"লূত ও তাঁর পরিবারের লোকদের এবং সাথীদেরকে জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা বড়ই পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। এ 'নেককারদের'কে বাইরের পথ দেখিয়ে দাও।"[১৩৫]

الا عجوزا فى الغبرين -

"এক বৃদ্ধ ছাড়া, যে পেছনে অবস্থানকারীদের দলভূক্ত ছিল।"[১৩৬]

---

১৩১. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ১৬৬
১৩২. আল-কুর'আন, ৫৪ আয়াত
১৩৩. আল-কুর'আন, ২৯ আয়াত
১৩৪. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ১৬৭
১৩৫. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ১৬৮
১৩৬. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

এখানে লূতের (আ) স্ত্রীর কথা বলা হচ্ছে। সূরা তাহরীমে নূহ (আ) ও লূতের (আ) স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا
فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ -

আল্লাহ কাফেরদের ব্যাপারে নূহ এবং লুতের স্ত্রীদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তারা আমার দুই নেক্‌কার বান্দার স্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা তাদের স্বামীর সাথে খেয়ানত ২৪ করেছিল। তারা আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোন কাজেই আসতে পারেনি। দু'জনকেই বলে দেয়া হয়েছে : যাও, আগুনে প্রবেশকারীদের সাথে তুমিও প্রবেশ কর।[১৩৭]

এখানে খেয়ানতের অর্থ এ নয় যে, তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। এখানে খেয়ানতের অর্থ হচ্ছে তার হযরত নূহ (আ) ও লূতের (আ) সাথে ঈমানের পথে চলেনি, বরং তাদের বিরুদ্ধে দ্বীন ইসলামের শত্রুদের সহযোগিতা করে এসেছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচারী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এ দু'জন মহিলার খেয়ানত ছিল দ্বীনের ব্যাপারে। তারা হযরত নূহ (আ) ও লূতের (আ) দ্বীন গ্রহণ করেনি। হযরত নূহের (আ) স্ত্রী তার কওমের জালেমদের কাছে ঈমান গ্রহণকারী সম্পর্কে খবর পৌছাত এবং হযরত লূতের (আ) স্ত্রী তার স্বামীর কাছে আগত লোকদের খবর তার কওমের দুশ্চরিত্র লোকদের কাছে পৌছে দিত।[১৩৮]

তারা উভয়ই ছিল ঈমান শূন্য এবং নিজেদের সৎ স্বামীদের সাথে সহযোগিতা করার পরিবর্তে তারা তাদের কাফের জাতির সহযোগী হয়। এজন্য আল্লাহ যখন লূতের জাতির উপর আযাব নাযিল করার ফায়সালা করলেন এবং লূতকে নিজের পরিবার পরিজনদের নিয়ে এ এলাকা ত্যাগ করার হুকুম দিলেন তখন সাথে সাথে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে না নেবার হুকুমও দিলেন-

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ
مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ -

তখন ফেরেশতারা তাকে বললোঃ "হে লূত! আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি কিছুটা রাত থাকতে তোমার পরিবার পরিজন নিয়ে বের হয়ে যাও। আর সাবধান। তোমাদের কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী ছাড়া (সে সাথে যাবে না) কারণ তার ওপরও তাই ঘটবে যা ঐ সব লোকের ঘটবে। তাদের ধ্বংসের জন্য প্রভাতকাল নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রভাত হবার আর কতটুকুই বা দেরী আছে!"[১৩৯]

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ -

এবং তাদের ওপর বর্ষণ করলাম একটি বৃষ্টিধারা, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের ওপর বর্ষিত এ বৃষ্টি ছিল বড়ই নিকৃষ্ট।[১৪০]

---

১৩৭. আল-কুর'আন,৬৬ : ১০
১৩৮. আত-তাবারী, আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, (আল-ইমাম), জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন, বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮/১৯৮০, খ. ২, পৃ. ৪৫
১৩৯. আল-কুর'আন,১১ঃ ৮১
১৪০. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

এ বৃষ্টি বলতে এখানে পানির বৃষ্টি নয় বরং পাথর বৃষ্টির কথা বুঝানো হয়েছে। কুর'আন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ আযাবের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত লূত যখন রাতের শেষ প্রহরে নিজের সন্তান-পরিজনদের নিয়ে বের হয়ে গেলেন তখন ভোরের আলো ফুটতেই সহসা একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো-

(فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ) একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প তাদের জনপদকে ওলট-পালট করে দিয়ে গেলো। (فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا) একটি ভয়ংকর আগ্নেগিরির আগ্নোৎপাতের মাধ্যমে তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করা হলোঃ (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ) এবং একটি ঝড়ো হাওয়ার মাধ্যমেও তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করা হয়েছেঃ (انّا ارسلنا عليهم حصبًا)

বাইবেলের বর্ণনাসমূহ, প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন রচনাবলী, আধুনিক ভূমিস্তর গবেষণা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ থেকে এ আযাবের বিস্তারিত বিবরণের ওপর যে আলোকপাত হয় তার সংক্ষিপ্ত সার নিচে বর্ণনা করছি-

মরু সাগরের (dead sea) দক্ষিণ ও পশ্চিমে যে এলাকাটি বর্তমানে একেবারেই বিরান ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে বিপুল সংখ্যক পুরাতন জনপদের ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো প্রমাণ করে যে, এটি এক সময় ছিল অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। আজ সেখানে শত শত ধ্বংস প্রাপ্ত পল্লীর চিহ্ন পাওয়া যায়। অথচ বর্তমানে এ এলাকাটিট আর তেমন শস্য শ্যামল নয়। ফলে এ পরিমাণ জনবসতি লালন করার ক্ষমতা তার নেই। প্রত্নত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণের ধারণা, খ্রীস্টপূর্ব ২৩০০ থেকে খ্রীস্টপূর্ব ১৯০০ সাল পর্যন্ত এটি ছিল বিপুল জনবসতি ও প্রাচুর্যপূর্ণ এলাকা। আর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আমল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অনুমান, সেটি ছিল খ্রীস্টপূর্ব দু'হাজার সালের কাছাকাছি সময়। এদিক দিয়ে প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ্য একথা সমর্থন করে যে, এ এলাকাটি হযরত হযরত ইব্রাহীম ও তাঁর ভাতিজা হযরত লূতের সময় ধ্বংস হয়েছিল।

বাইবেলে যে এলাকাটিকে বলা হয়েছে 'সিদ্দিমের উপত্যকা' সেটিই ছিল এখানকার সবচেয়ে জনবহুল ও শস্য-শ্যামল এলাকা। এ এলাকাটি সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছেঃ যর্দ্দনের সমস্ত অঞ্চল সোয়র পর্যন্ত সর্বত্র সজল, সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায়, মিসর দেশের ন্যায়, কেননা, তৎকালে সদাপ্রভু সদোম ও ঘমোরা বিনষ্ট করেন নাই।"[১৪১]

বর্তমান কালের গবেষকদের অধিকাংশের মত হচ্ছে, সে উপত্যকাটি বর্তমানে মরুসাগরের বুকে জলমগ্ন আছে। বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এ মত গঠন করা হয়েছে। প্রাচীনকালে মরুসাগর দক্ষিণ দিকে আজকের মতো এতোটা বিস্তৃতি ছিল না। ট্রান্স জর্দানের বর্তমান শহর 'আল করক'-এর সামনে পশ্চিম দিকে এ হ্রদের মধ্যে 'আল লিসান' নামক একটি ব-দ্বীপ দেখা যায়। প্রাচীন কালে এখানেই ছিল পানির শেষ প্রান্ত। এর নিম্নাঞ্চলে বর্তমানে পানি ছড়িয়ে গেছে (সংশ্লিষ্ট নকশায় পার্শ্বরেখা দিয়ে একে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি)। পূর্বে এটি উর্বর শস্য শ্যামল এলাকা হিসেবে জনবসতিপূর্ণ ছিল। এটিই ছিল সিদ্দিম উপত্যকা এবং এখানেই ছিল লূতের জাতির সাদোম, ঘমোরা, অদমা, সবোয়ীম ও সুগার-এর মতো বড় বড় শহরগুলো। খ্রীস্টপূর্ব দু'হাজার বছরের কাছাকাছি এক সময় একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে এ উপত্যকাটি ফেটে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে যায় এবং মরুসাগরের পানি একে নিমজ্জিত করে ফেলে।

১৪১. (প্রাগুক্ত, আদিপুস্তক ১৩:১০)

Dhaka University Institutional Repository

আজো এটি হ্রদের সবচেয়ে অগভীর অংশ। কিন্তু বাইজানটাইন শাসকদের যুগে এ অংশটি এতো বেশী অগভীর ছিল যে, লোকেরা আল লিসান থেকে পশ্চিম তীর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে পানি পার হয়ে যেতো। তখনো দক্ষিণ তীরের লাগোয়া এলাকায় পানির মধ্যে ডুবন্ত বনাঞ্চল পরিষ্কার দেখা যেতো। বরং পানির মধ্যে কিছু দালান কোঠা ডুবে আছে বলে সন্দেহ করা হতো।

বাইবেল ও পুরাতন গ্রীক ও ল্যাটিন রচনাবলী থেকে জানা যায়, এ এলাকায় বিভিন্ন স্থানে নাফাত (পেট্রোল) ও স্ফুল্টের কূয়া ছিল। অনেক জায়গায় ভূগর্ভ থেকে অগ্নিউদ্দীপক গ্যাসও বের হতো। এখনো সেখানে ভূগর্ভে পেট্রোল ও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ভূ-স্তর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করা হয়েছে, ভূমিকম্পের প্রচণ্ড ঝাকুনীর সাথে পেট্রোল, গ্যাস ও স্ফলট ভূ-গর্ভ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠে এবং সমগ্র এলাকা ভস্মীভূত হয়ে যায়। বাইবেলের বর্ণনা মতে, এ ধ্বংসের খবর পেয়ে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম হিব্রোন থেকে এ উপত্যকার অবস্থা দেখতে আসেন। তখন মাটির মধ্য থেকে কামারের ভাটির ধোঁয়ার মতো ধোঁয়া উঠছিল।[১৪২]

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ -

"এর উত্তরে তার কওম শুধু এ কথাই বলল ঃ লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও । তারা তো খুব পবিত্র মানুষ হতে চায়।"[১৪৩]

ভৌগোলিক অবস্থান

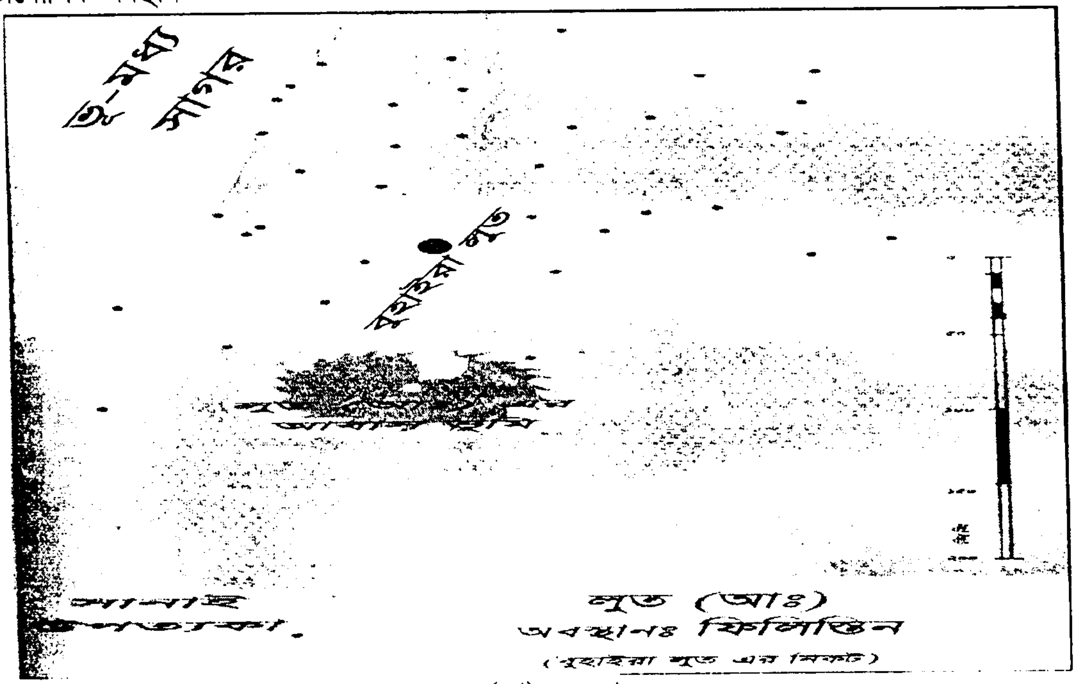

লুত (আ)- এর শহর

১৪২. প্রাগুক্ত, আদিপুস্তক ১৯ : ২৮

১৪৩. আল-কুর'আন, ২৭ঃ ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

কেবল এতটুকু ইংগিতেই যথেষ্ট যে, একথাগুলো একজন ভদ্রলোকের মুখ থেকে এমন সময় বের হয়েছে যখন তিনি একবারেই লাচার হয়ে গিয়েছিলেন এবং বদমায়েশরা তাঁর কোন ফরিয়াদ ও আবেদন নিবেদনে কান না দিয়ে তার মেহমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। এ সুযোগে একটি কথা পরিস্কার করে দেয়া প্রয়োজন। সূরা হূদে ঘটনাটি যে ধারাবহিকতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, বদমায়েশদের এ হামলার সময় পর্যন্তও হযরত লূত (আ) একথা জানাতেন না যে, তাঁর মেহমানরা আসলে আল্লাহর ফেরেশতা । তখনো পর্যন্ত তিনি মনে করছিলেন, এ ছেলে কয়টি মুসাফির এবং এরা তাঁর বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে । বদমায়েশদের দল যখনই মেহমানদের অবস্থান স্থলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং হযরত লূত (আ) অস্থির হয়ে বলে উঠলেন (হায়, যদি আমার তোমাদের মোকবিলা করার শক্তি থাকতো অথবা আমার সাহায্য - সহযোগিতা গ্রহণ করার মতো কোন সহায় থাকতো!) তখনই মেহমানরা নিজেদের ফেরেশতা হবার কথা প্রকাশ করলো। এরপর ফেরেশতারা তাঁকে বললো, এখন আপনি নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যান এবং এদের সাথে বোঝাপড়া করার জন্য আমাদের ছেড়ে দেন ।

ঘটনাবলীর এ ধারাবহিকতা সামনে রাখার পর কোন সংকটপূর্ণ অবস্থায় একেবারে লাচার হয়ে হযরত লূত (আ) একথা বলেছিলেন তা পুরোপুরি অনুমান করা যেতে পারে। ঘটনাগুলো যে ধারাবহিকতায় সংঘটিত হয়েছিল এ সূরায় সেগুলো বর্ণনা করার সময় যেহেতু সেই ধারাবহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা হয়নি বরং যে বিশেষ দিকটি শ্রোতাদের মনে বদ্ধমূল করার জন্য এ কাহিনীটি এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটিকে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করাই এখানে কাম্য। তাই একজন সাধারণ পাঠক এ ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে যে, ফেরেশতারা শুরুতেই হযরত লূতের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল এবং এখন নিজের মেহমানদের ইজ্জত-আব্রু বাঁচাবার জন্য তাঁর এ সমস্ত ফরিয়াদ ও আবেদন নিবেদন নিছক নাটুকেপনা ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৪৪]

এ থেকে এ জাতির ব্যভিচারবৃত্তি কোন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তা অনুমান করা যেতে পারে । জনপদের এক ব্যক্তির বাড়িতে কয়েকজন সুশ্রী অতিথি এসেছেন । ব্যাস , আর যায় কোথায় অমনি তার বাড়িতে বিপুল সংখ্যক দুর্বৃত্ত চড়াও হয় এবং তা অতিথিদের কাছে প্রকাশ্যে দাবী জানাতে থাকে যে তার অতিথিদেরকে দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দিতে হবে , যাতে তারা তাদের সাথে ব্যভিচার করতে পারে । তাদের সারা জনপদে তাদের এসব কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত কেউ ছিল না । তাদের জাতির নৈতিক চেতনাও খতম হয়ে গিয়েছিল । ফলে লোকেরা প্রকাশ্যে এ ধরনের বাড়াবাড়ি করতে লজ্জাবোধ করতো না । হযরত লূতের (আ) মত পবিত্রাত্মা ও নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের গৃহে যখন বদমায়েশদের এমন নির্লজ্জ হামলা হতে পারে তখন এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এসব জনবসতিতে সাধারণ মানুষদের সাথে কোন ধরনের ব্যবহার করা হতো ।

তালমূদে এ জাতির যে অবস্থা লিখিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরছি । এ থেকে এ জাতিটি নৈতিক অধোপতনের কোন প্রান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল তার কিছুটা বিস্তারিত সংবাদ জানা যাবে । তুলমূদে বলা হয়েছে : একবার আইলাম এলাকার একজন মুসাফির এ জাতিটির এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল।

---

১৪৪. আত-তাবারী, আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, (আল-ইমাম), জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন, বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮/১৯৮০, খ. ২, পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

পথে রাত হয়ে গেল । ফলে তাকে বাধ্য হয়ে তাদের সামুদ নগরীতে অবস্থান করতে হলো । তার সাথে ছিল তার নিজের পাথেয় । কারোর কাছে সে অতিথি হবার আবেদন জানালো না । সে একটি গাছের নীচে বসে পড়লো কিন্তু একজন সামুদবাসী পীড়াপীড়ি করে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। রাত্রে তাকে নিজের কাছে রাখলো এবং প্রভাত হবার আগেই তার গাধাটি তার জীন ও বাণিজ্যিক মালপত্রসহ লোপাট করে দিল। বিদেশী লোকটি শোরগোল করলো। কিন্তু কেউ তার ফরিয়াদ শুনলো না। বরং জনবসতির লোকেরা তার অন্যান্য মালপত্রও লুট করে নিয়ে তাকে বাইরে বের করে দিল।

একবার হযরত সারা হযরত লূতের পরিবারের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য নিজে গোলাম ইলিয়াযিরকে সাদুমে পাঠালেন। ইলিয়াযির নগরীতে প্রবেশ করে দেখলেন, একজন সাদুমী একজন বিদেশীকে মারছে। ইলিয়াযির সাদুমীকে বললো, তোমার লজ্জা হয় না তুমি একজন অসহায় মুসাফিরের সাথে এ ব্যবহার করছো? কিন্তু জবাবে সর্বসমক্ষে ইলিয়াযিরের মাথা ফাটিয়ে দেয়া হলো ।

একবার এক গরীব লোক কোথাও থেকে তাদের শহরে এলো । কেউ তাকে খাবার দাবারের জন্য কিছু দিল না । সে ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে এক জায়গায় মাটিতে পড়েছিল । এ অবস্থায় হযরত লূতের (আ) মেয়ে তাকে দেখতে পেলেন । তিনি তার কাছে খাবার পৌঁছে দিলেন । এ জন্য হযরত লূত (আ) ও তাঁর মেয়েকে কঠোরভঅবে নিন্দা করা হলো এবং তাদেরকে এই বলে হুমকি দেয়া হলো যে, এ ধরনের কাজ করতে থাকলে তোমরা আমাদের জনবসতিতে থাকতে পারবে না ।

এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণনা করার পর তালমূদ রচয়িতা লিখছেন, নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এ লোকেরা ছিল বড়ই জালেম , ধোঁকাবাজ এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে অসৎ । কোন মুসাফির তাদের এলাকা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারতো না । তাদের লোকালয় থেকে কোন গরীব ব্যক্তি এক টুকরো রুটি সংগ্রহ করতে পারতো না । বহুবার এমন দেখা গেছে বাইরের কোন লোক তাদের এলাকায় প্রবেশ করে অনাহারে মারা গেছে এবং তারা তার গায়ের পোশাক খুলে নিয়ে গিয়ে তার লাশকে উলংগ অবস্থায় দাফন করে দিয়েছে । বাইরের ব্যবসায়ীরা দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে পৌঁছে গেলে সর্বসমক্ষে তাদের মালামাল লুট করে নেয়া হতো এবং তাদের ফরিয়াদের জবাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতো । নিজেদের উপত্যকাকে তারা একটি উদ্যান বানিয়ে রেখেছিল । মাইলের পর মাইল ব্যাপী ছিল এ উদ্যান । একমাত্র লূত আলাইহিস সালাম ছাড়া তাদের এসব কাজের প্রতিবাদ করার কেউ ছিল না । এ সমগ্র কাহিনীকে সংক্ষেপ করে কুর'আন মজীদে শুধুমাত্র দু'টি বাক্য প্রকাশ করা হয়েছে । বলা হয়েছে-

وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ -

"তারা আগে থেকেই অনেক খারাপ কাজ করে আসছিল ।"[১৪৫]

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ -

"তোমরা পুরুষদের দ্বারা যৌন কামনা পূর্ণ করো, মুসাফিরদের মালপত্র লুটপাট করো এবং নিজেদের মজলিসমূহের প্রকাশ্যে দুষ্কর্ম করো।"[১৪৬, ১৪৭]

---

১৪৫. আল-কুর'আন,১১: ৭৮

১৪৬. আল-কুর'আন, ২৯: ২৯

১৪৭. আত-তাবারী, আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, (আল-ইমাম), জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন, বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮/১৯৮০, খ. ২, পৃ. ৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ -

"অতপর তারা তাকে তার মেহমানদের হিফাজত করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলো। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের চোখ অন্ধ করে দিলাম। এখন তোমরা আমার আযাব ও সাবধানবাণীর স্বাদ আস্বাদন করো।"[১৪৮]

ঘটনার সার সংক্ষেপ হলো, আল্লাহ তা'আলা এ জাতির ওপর আযাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কয়েকজন ফেরেশতাকে অত্যন্ত সুদর্শন বালকের আকৃতিতে হযরত লূতের বাড়ীতে মেহমান হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন। কওমের লোকজন তাঁর কাছে এত সুশ্রী মেহমান আসতে দেখে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে চড়াও হলো এবং তাঁর কাছে দাবী করলো যে, তিনি যেন তাঁর মেহমানের সাথে কুকর্ম করার জন্য তাদের হাতে তুলে দেন। হযরত লূত এ জঘন্য আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের কাছে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি ও অনুরোধ - উপরোধ করলেন।

কিন্তু তারা তা মানলো না এবং ঘরে প্রবেশ করে জোর পূর্বক মেহমানদের বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। এ পর্যায়ে হঠাৎ তারা অন্ধ হয়ে গেল। এ সময় ফেরেশতারা হযরত লূতকে বললেন, তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকজন ভোর হওয়ার পূর্বেই যেন এ জনপদের বাইরে চলে যান। তারা জনপদের বাইরে চলে যাওয়া মাত্র ঐ জাতির ওপর ভয়ানক আযাব নেমে আসে। বাইবেলেও ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলের ভাষা হচ্ছেঃ তখন তাহারা লোটের উপরে ভারী চড়াও হইয়া কবাট ভাংগিতে গেল। তখন সেই দুই ব্যক্তি হস্ত বাড়িয়ে লোটকে গৃহের মধ্যে আপনাদের নিকটে টেনে নিয়ে কবাট বন্ধ করলেন; এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ও মহান সকল লোককে অন্ধতায় আহত করিলেন। তাতে তারা দ্বার খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত হল।[১৪৯]

---

১৪৮. আল-কুর'আন, ৫৪:৩৭

১৪৯. প্রাগুক্ত, আদিপুস্তক ১৯: ৯-১১

Dhaka University Institutional Repository

ইনত্বাকিয়া শহর

আসহাবে ক্বারইয়া বা গ্রামবাসী অথবা আসহাবে ইয়াসীন বলতে বর্তমান ভূমধ্যসাগরের পাদদেশ ইনত্বাকিয়া শহরকে বুঝানো হয়েছে। মিশরের আলেকজান্ডরিয়া শহরের নিকটবর্তী। খৃষ্টপূর্ব ৩০৮ সনে এখানে আলমাকদুনী রাজত্ব কায়েম করেন।[১৫০]

ইনত্বাকিয়া শহর সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ

"তাদেরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই জনপদের লোকদের কাহিনী শোনাও যখন সেখানে রসূলগণ এসেছিল।"[১৫১]

প্রাচীন কুর'আন ব্যাখ্যাদাতাগণ সাধারণভাবে এ মত পোষণ করেছেন যে, এ জনপদটি হচ্ছে সিরিয়ার ইন্তাকিয়া শহর। আর এখানে যে রসূলদের কথা বলা হয়েছে তাদেরকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এ প্রসংগে যে বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তাতে একথাও বলা হয়েছে যে, সে সময় ইন্তাখিশ ছিল এ এলাকার বাদশাহ। কিন্তু এ পুরো কাহিনীটিই ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, ইকরামাহ, কাবুল আহবার, ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখ মনীষীগণ খৃষ্টানদের অনিভুরযোগ্য বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছেন এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইন্তাকিয়ায় সালুতী পরিবারের (Seleucid dynasty) ১৩ জন বাদশাহ এনটিউ কাস (Antiocas) নামে রাজ্য শাসন করেছিল। এ নামের শেষ শাসকের শাসন এবং সে সাথে গোটা পরিবারের শাসনকালও খৃস্টপূর্ব ৬৫ সালে শেষ হয়ে গিয়েছিল। হযতর ঈসা আলাইহিস সালামের যুগে ইন্তাকিয়াসহ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সমগ্র এলাকা রোমানদের শাসনাধীনে ছিল। তাছাড়া হযতর ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেই তাঁর সহচরদেরকে ইসলাম প্রচারের জন্য ইন্তাকিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, খৃস্টানদের কোন নিভুরযোগ্য বর্ণনা থেকে এ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বাইবেলের 'প্রেরিতদের কার্য' অধ্যায় থেকে জানা যায়, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার কয়েক বছর পর খৃস্টান ধর্মপ্রচারকগণ প্রথমবার সেখানে পৌছেছিলেন। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যাদেরকে আল্লাহ রাসুল বানিয়ে পাঠাননি এবং আল্লাহর রসূল যাদেরকে নিযুক্ত করেননি তারা যদি নিজস্ব উদ্যোগে ধর্মপ্রচারে বের হন, তাহলে কোন ধরনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহর রসূল গণ্য করা যেতে পারে না। তাছাড়া বাইবেলের বর্ণনা মতে ইন্তাকিয়া হচ্ছে প্রথম শহর যেখানকার অইসরাঈলিরা বিপুল সংখ্যায় ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং ঈসায়ী গীর্জা অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী হয়েছিল। অথচ কুর'আন এখানে যে জনপদটির কথা বলছে সেটি এমন একটি জনপদ ছিল যার অধিবাসীরা রসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাবের শিকার হয়েছিল। ইন্তাকিয়া যে এমন ধরনের ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল যাকে রিসালাত অস্বীকার করার কারণে আগত আযাব গণ্য করা যেতে পারে, তার কোন প্রমাণ ইতিহাসে নেই।

---

১৫০. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি. পৃ. ১৫২

১৫১. আল-কুর'আন, ৩৬ঃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository

এসব কারণে জনবসতি বলে এখানে ইন্তাকিয়া বুঝানো হয়েছে একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কুর'আন বা হাদীসে এ জনবসতিটিকে চিহ্নিত করা হয়নি। এমনকি এ রসূলগণ কারা ছিলেন এবং কোন যুগে এদেরকে পাঠানো হয়েছিল, কোন নিভুরযোগ্য সূত্রে একথাও জানা যায়নি। কুর'আন মজীদ যে উদ্দেশ্যে এ কাহিনী এখানে বর্ণনা করছে তা বুঝার জন্য জনপদের ও রসূলদের নাম জানার কোন প্রয়োজন নেই। কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশদেরকে একথা জানানো যে, তোমরা হঠকারিতা ও সত্য অস্বীকার করার সে একই নীতির ওপর চলছো যার ওপর চলছিল এ জনপদের লোকেরা এবং তারা যে পরিণাম ভোগ করেছিল সে একই পরিণামের সম্মুখীন হবার জন্য তোমরা প্রস্তুতি নিচ্ছো।[১৫২]

(وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ)

"ইতিমধ্যে নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! রসূলদের কথা মেনে নাও।"[১৫৩]

পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থান

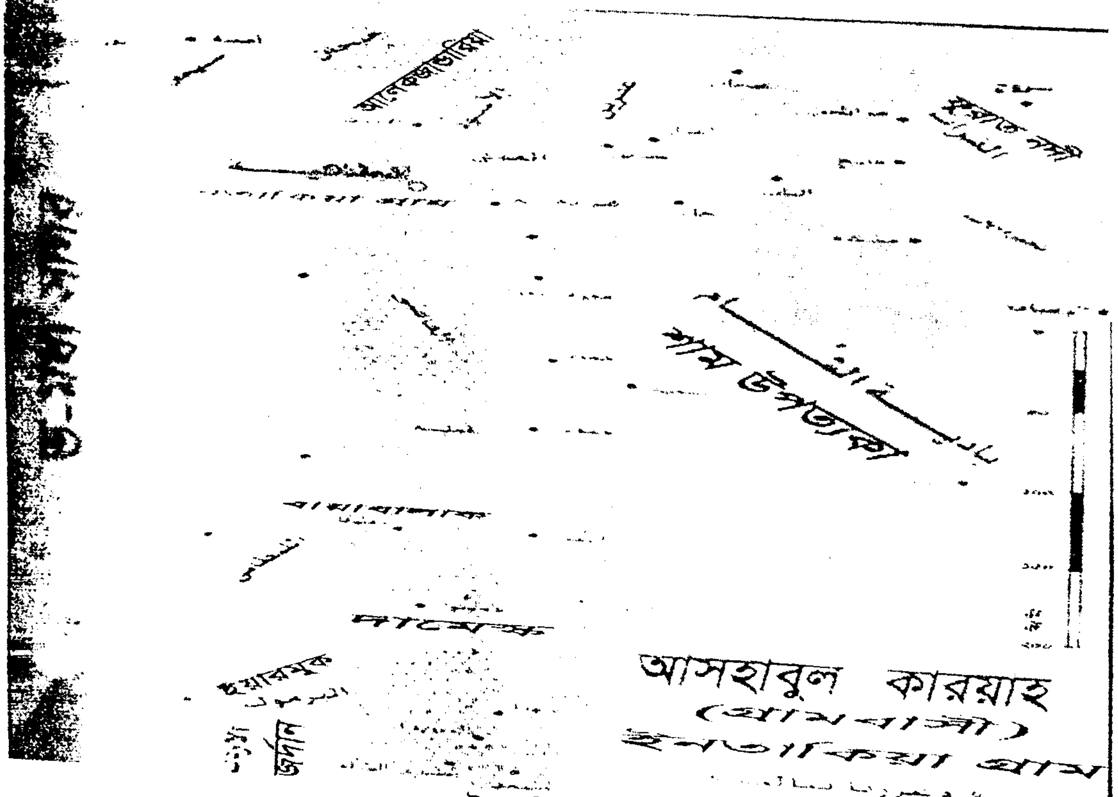

ইনতাকিয়া শহর

আসহাবে ক্বারইয়াহ্ ও কুর'আন মাজীদ

কুর'আন মজীদের সূরা ইয়াসীনে একটি অতি সংক্ষিপ্ত ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ হতে আরম্ভ করে فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে। সূরাটির সাথে সম্পর্ক হিসাবে তাকে "আসহাবে ইয়াসীনের ঘটনা" এবং আয়াতগুলির বর্ণনাপদ্ধতি অনুসারে আসহাবে ক্বারইয়াহ্র ঘটনা বলা হয়।

১৫২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ১১২৯

১৫৩. আল-কুর'আন, ৩৬ঃ ২০

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

কুর'আন মাজীদ এই সম্বন্ধে শুধু এতটুকু বলেছে যে, অতীতকালে কোন এক জনপদে কুফর ও শির্ক্ এবং দুষ্টামি ও অপকর্ম দূর করার এবং হেদায়েতের সবক প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দু'জন পয়গম্বরকে আদেশ করলেন। তাঁরা বস্তীবাসীদিগকে সত্যের শিক্ষা প্রদান করলেন এবং ছিরাতুল মুস্তাকীমের প্রতি আহ্বান করলেন। কিন্তু বস্তীবাসীরা তাঁদের উভয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। তখন আমি তৃতীয় একজন হেদায়েতকারী তাঁদের সঙ্গে যোগ করে দিলাম এবং তাঁরা তিনজন মিলিত হয়ে হেদায়েতকারীর একটি দল হয়ে গেল। সেই তিনজন হেদায়েতকারী তাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করল যে, নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হতে তোমাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত। কিন্তু তারা মানল না; বরং তাদের নিয়ে বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিল যে, তোমরাও মানুষ আমরাও মানুষ, তবে তোমাদের মধ্যে এমন কোন্ বিচিত্র রয়েছে, যার দরুন তোমাদিগকে পয়গম্বর করে দেয়া হয়েছে। এই সমস্ত তোমাদের মিথ্যা কথা এবং তোমাদের ষড়যন্ত্র। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাক্ষী আছেন যে, আমরা মিথ্যাবাদী নহি। তিনি বিশেষভাবে জ্ঞাত এবং প্রত্যক্ষকারী, তিনি বেশ অবগত আছেন। কিন্তু তোমরা তবুও মানছ না, আমাদের কার্য এর চেয়ে অধিক কিছুই নহে যে, তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম পৌছাইয়া দেই এবং তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করি।

বস্তীবাসীরা বলিল, আমরা তো তোমাদিগকে অশুভ মনে করিতেছি, তোমরা অযথা আমাদের এখানে আসিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছ, তোমরা এই কার্য হতে বিরত না হলে আমরা তোমাদের তিনজনকেই হত্যা করে ফেলব। কিম্বা কঠিন দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিপতিত করে দিব। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করে অশুভ পরিণতি তো তোমরা নিজেদের উপর আনয়ন করেছ। এর চেয়ে অধিক অশুভ লক্ষণ আর কি হতে পারে যে, তোমরা উপদেশ এবং হিত কামনাকেও কবূল করছ না, বরং আরও অধিক সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছ ? উক্ত জনপদের শেষপ্রান্তে একজন নেককার লোক বাস করতেন। তিনি যখন শুনতে পেলেন যে, বস্তীবাসীরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত পয়গম্বরদিগকে অবিশ্বাস করছে, তখন তিনি দ্রুত তথায় পৌছলেন- যেখানে এরূপ কথাবার্তা বলেছিল। তিনি বলতে লাগলেন, হে আমার কাওম ! আলাহ্ তা'আলার প্রেরিত রাসূলদের কথা মান্য কর। এই পবিত্র লোদের অনুসরণ করা হতে বিমুখ কেন হচ্ছ ? যাঁরা এই সত্যের খেদমতের বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিক পর্যন্ত দাবী করেন না এবং তাঁরা আল্লাহওয়ালা ও হেদায়েতপ্রাপ্ত লোক। বল তো, আমি কেন সেই এক আল্লাহ্ তা'আলারই এবাদত করব না, যিনি আমাকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন ? আর মৃত্যুর পরে আমাকে এবং তোমাদের সকলকে তাঁহারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তোমরা যে, এই সম্মানিত মহাপুরুষদিগকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছ, তবে আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করছি যে, আমার পক্ষে কি এক আল্লাহ আ'আলাকে ছেড়ে মিথ্যা মা'বুদসমূহকে আমার আল্লাহ্ বলে মেনে নেয়া উচিত ? যাদের এই ক্ষমতাও নাই যে, যদি সেই এক আল্লহ যিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং অতিশয় অনুগ্রহশীল, আমার কোন ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা করেন, সেই মিথ্যা ও বাতিল মা'বুদের সুপারিশও কার্যকরী হবে না এবং তারা আমাকে সেই ক্ষতি হতেও রক্ষা করতে পারবে না। যদি আমি এরূপ করি এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে আমি কঠিন গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাব। অতএব, কান খুলে শোন (কর্ণকে উন্মুক্ত করে শ্রবণ কর যে,) তোমরা এই পবিত্র মহাপুরুষদের কথা মান্য কর। আমি তো সেই মহান সত্তার উপর ঈমান আনয়ন করেছি, যিনি আমার ও তোমাদের পরওয়ারদিগার। কাওমের লোকেরা নিজেদের মিথ্যাচরণ এবং সেই পবিত্র রাসূলদের সত্যায়ন সম্বন্ধে উক্ত নেককার ব্যক্তির হেদায়েতপূর্ণ কথাবার্তা শুনে ভীষণভাবে চটে গেল এভং তাঁকে শহীদ করে ফেলল।[১৫৪]

১৫৪. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৩খ, পৃ. ২০২, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাদায়েন শহর

মাদ্‌ইয়ানের (মাদায়েন) মূল এলাকাটি হিজাযের উত্তর পশ্চিমে এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। তবে সাইনা (সিনাহ্‌) উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলেরও এর কিছুটা অংশ বিস্তৃত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা ছিল একটি বিরাট ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। প্রাচীন যুগে যে বাণিজ্যিক সড়কটি লোহিত সাগরের উপকূল ধরে ইয়ামান থেকে মক্কা ও ইয়াম্বু হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দ্বিতীয় যে বাণিজ্যিক সড়কটি ইরাক থেকে মিসরের দিকে চলে যেতো তাদের ঠিক সন্ধিস্থলে এ জাতির জনপদগুলো অবস্থিত ছিল । এ কারণে আরবের ছোট বড় সবাই মাদ্‌ইয়ানী জাতি সম্পর্কে জানতো এবং এ জাতিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরও সারা আরবে এর খ্যাতি অপরিবর্তিত থাকে।কারণ আরববাসীদের বাণিজ্যিক কাফেলা মিসর ও ইরাক যাবার পথে দিন রাত এর ধ্বংসাবশেষের ভেতর দিয়েই চলাচল করতো।

মাদ্‌ইয়ানবাসীদের সম্পর্কে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা ভালভাবে জেনে নিতে হবে। সেটি হচ্ছে, এ মাদ্‌ইয়ানের অধিবাসীরা হযরত ইবরাহীমের পুত্র মিদিয়ান এর সাথে বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।মিদিয়ান ছিলেন হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় স্ত্রীর কাতুরা এর গর্ভজাত সন্তান। প্রাচীন যুগের নিয়ম অনুযায়ী যারা কোন খ্যাতিমান পুরুষের সাথে সম্পর্কিত থাকতো তাদেরকে কালক্রমে ঐ ব্যক্তির সন্তান গণ্য করে অমুকের বংশধর বলা হতো। এ নিয়ম অনুযায়ী আরবের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ বনী ইসমাঈল হিসেবে পরিচিত লাভ করে। অন্যদিকে ইয়াকূবের (অন্য নাম ইসরাঈল) সন্তানদের হাতে ইসলাম গ্রহণকারীদের সবাই বনী ইসরাঈল নামে অভিহিত হয়। অনুরূপ ভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র মিদিয়ানের প্রভাবিত মাদ্‌ইয়ানের অধিবাসীগণ বনী মিদিয়ান নামে পরিচিত হয় এবং তাদের দেশের নামই হয়ে যায় মাদ্‌ইয়ান বা মিদিয়ান। এ ঐতিহাসিক তথ্যটি জানার পর এ ক্ষেত্রে ধারণা করার আর কোন কারণই থাকে না যে, এ জাতিটি সর্বপ্রথম হযরত শোআইব আলাইহিস সালামের মধ্যমেই সত্য দীন তথা ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিল। আবির্ভাবকালে এদের অবস্থা ছিল একটি বিকৃত মুসলিম মিল্লাতের মত, যেমন মূসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাবকালে ছিল বনী ইসরাঈলের অবস্থা। হযরত ইবরাহীমের পরে ছয় সাত শো বছর পর্যন্ত এরা মুশরিক ও চরিত্রহীন জাতিদের মধ্যে বাসবাস করতে করতে শিরক ও নানা রকমের দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এদের ঈমানের দাবী ও সে জন্যে অহংকার করার মনোবৃত্তি অপরিবর্তিত ছিল।[১৫৫]

মাদায়েন সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

(إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ) -

"স্মরণ করো, যখন তোমার বোন চলছিল, তারপর গিয়ে বললো, আমি কি তোমাদের তার সন্ধান দেবো যে এ শিশুকে ভালোভাবে লালন করবে? এভাবে আমি তোমাকে আবার তোমার মায়ের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি, যাতে তার চোখ শীতল থাকে এবং সে দুশ্চিন্তগ্রস্থ না হয়। এবং (এটাও স্মরণ করো) তুমি একজনকে হত্যা করে ফেলেছিলে, আমি তোমাকে এ ফাঁদ থেকে বের করেছি এবং তোমাকে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এসেছি, আর তুমি মাদ্‌য়ানবাসীদের মধ্যে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলে। তারপর এখন তুমি এখন তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছো। হে মূসা! "[১৫৬]

১৫৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ৭৫৫)

১৫৬. আল-কুর'আন, ২০ঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ -

"তাদের সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌঁছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে ; নূহের আ'দের ও সামুদের সম্প্রদায় এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ানবাসীদের ? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছিল ? তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী পরিষ্কার নির্দেশ নিয়ে। বস্তুতঃ আল্লাহ তো এমন ছিলেন না যে, তাদের উপর জুলম করতেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করতো।"[১৫৭]

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ-

"আর আমি মাদ্ইয়ানের অধিবাসীদের কাছে তাদের ভাই শুয়ায়েবকে প্রেরণ করেছিলাম । সে বলেছিল ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর । তিনি ছাড়া তোমাাদের কোন মা'বুদ নেই । তোমাদের কাছে এসে গেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ । সুতরাং তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরূপে করবে এবং লোকদের তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দেবে না, এবং দুনিয়ায় শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না । এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা মু'মিন হও।"[১৫৮]

وَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ -

তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল, পরস্পরকে বললোঃ "যদি তোমরা শোআইবের আনুগত্য মেনে নাও, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।"[১৫৯]

এ ছোট বাক্যটির ওপর ভাসা ভাসা দৃষ্টি বুলিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এটি থমকে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার একটি স্থান। মাদ্ইয়ানের সরদাররা ও নেতারা আসলে যে কথা বলছিল এবং নিজের জাতিকেও বিশ্বাস করাতে চাইছিল তা এই যে, শোআইব, যে সততা ও ঈমানদারীর দাওয়াত দিচ্ছেন এবং মানুষকে নৈতিকতা, ও বিশ্বস্ততার যেসব স্বতন্ত্র মূলনীতির অনুসারী করতে চাচ্ছেন, সেগুলো মেনে নিলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। আমরা যদি পূর্ণ সততার সাথে ব্যবসা করতে থাকি এবং কোন প্রকার প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে ঈমানদারীর সাথে পন্য বেচাকেনা করতে থাকি তাহলে আমাদের ব্যবসা কেমন করে চলবে? আমরা দুনিয়ার দুটি সবচেয়ে বড় বানিজ্যিক সড়কের সন্ধিস্থলে বাস করি এবং মিসর ও ইরাকের মতো দুটি বিশাল সুসভ্য ও উন্নত রাষ্ট্রের সীমান্তে আমাদের জনপদ গড়ে উঠেছে।

এমতাবস্থায় আমরা যদি বাণিজ্যিক কাফেলার মালপত্র ছিনতাই করা বন্ধ করে দিয়ে শান্তিপ্রিয় হয়ে যাই তাহলে বর্তমান ভৌগলিক অবস্থানের কারণে আমরা এতদিন যে অর্থনৈতিক ও রাজনীতেক সুযোগ সুবিধা লাভ করে আসছিলাম তা একদম বন্ধ হয়ে যাবেএবং আশেপাশে বিভিন্ন জাতির ওপর আমাদের যে প্রতাপ ও আধিপত্য কায়েম আছে তাও খতম হয়ে যাবে। এ ব্যাপারটি কেবল শোআইব সম্প্রাদায়ের প্রধানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রত্যেক যুগের পথভ্রষ্ট লোকেরা সত্য, ন্যায়, সততা ও বিশ্বস্ততার নীতি অবলম্বন করার মধ্যে এমনি ধরেনর বিপদের আশংকা করেছে প্রত্যেক যুগের নৈরাজ্যবাদীরা একথাই চিন্তা করেছে যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাজনীতি এবং অন্যান্য পার্থিব বিষয়াবলী মিথ্যা, বেঈমানী ও দুর্নীতি ছাড়া চলতে পারে না।

---

১৫৭. আল-কুর'আন, ৯ঃ ৭০

১৫৮. আল-কুর'আন, ৭ঃ ৮৫

১৫৯. আল-কুর'আন, ৭ঃ ৯০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক জায়গায় সত্যের দাওয়াতের মোকাবিলায় যেসব বড় বড় অজুহাত পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে,যদি দুনিয়ার প্রচলিত পথ থেকে সরে গিয়ে এ দাওয়াতের অনুসরণ করা হয় তাহলে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।[১৬০]

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ -

"কিন্তু সহসা একটি প্রলয়ংকারী বিপদ তাদেরকে পাকড়াও করে এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্য মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। "[১৬১]

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ -

"যারা শোআইবকে মিথ্যা বলেছিল তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যেন সেই সব গৃহে কোনদিন তার বসবাসই করতো না। শোআইবকে যারা মিথ্যা বলেছিল অবশেষে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। " [১৬২]

মাদইয়ানের এ ধ্বংসলীলা দীর্ঘকাল পর্যন্ত আশেপাশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। তাই দেখা যায়, দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ যবুরের এক স্থানে বলা হয়েছেঃ হে খোদা!অমুক অমুক জাতি তোমার বিরুদ্ধে অংগীকারাবদ্ধ হয়েছে, কাজেই তুমি তাদের সাথে ঠিক তেমনি ব্যবহার করো, যেমন মিদিয়ানের সাথে করেছিল।[১৬৩]

ইয়াসঈয়াহ নবী এক স্থানে বনী ইসরাঈলকে সান্তনা দিতে গিয়ে বলেন, আশূরীয়দেরকে ভয় করো না যদিও তারা তোমাদের জন্যে মিসরীয়দের মতই জালেম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেশী দেরী হবে না, বাহিনীগণের প্রভু তাদের ওপর নিজের দণ্ড বর্ষণ করবেন, এবং তাদের সেই একই পরিণতি হবে যেমব মিদিয়ানের হয়েছিল।[১৬৪]

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ -

আর শোআইব একথা বলতে বলতে তাদের জনপদ থেকে বের হয়ে যায়-"হে আমাদর জাতির লোকেরা! আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছে এবং তোমাদের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছি। এখন আমি এমন জাতির জন্য দুঃখ করবো কেন, যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করে?"[১৬৫]

এখানে যতগুলো কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সবগুলোতে আসলে একজনের ঘটনা বর্ণনা করে তার মধ্যে অন্যজনের চেহারা দেখানো রীতি অবলম্বন করা হয়েছে।এখানকার প্রত্যেকটি কাহিনী সে সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর জাতির মধ্যে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছিল তার সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রত্যেকটি কাহিনী ও ঘটনার এক পক্ষে একজন নবী আছেন। তাঁর শিক্ষা, দাওয়াত ,উপদেশ,ও কল্যাণ কামিতা ও তাঁর সমস্ত কথাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুরূপ । আর প্রত্যেকটি কাহিনীটির দ্বিতীয় পক্ষে আছে সত্য,প্রত্যাখানকারী , গোষ্ঠি ,সম্প্রদায় ও জাতি।

---

১৬০. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ৭৫৬

১৬১. আল-কুর'আন, ৭ঃ ৯১

১৬২. আল-কুর'আন, ৭ঃ ৯২

১৬৩. প্রাগুক্ত, ৮৩:৫-৯

১৬৪. প্রাগুক্ত, যিশাইয় ১০: ২২-২৬

১৬৫. আল-কুর'আন, ৭ঃ ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

তাদের আকীদাগত বিভ্রান্তি, নৈতিক চরিত্রহীনতা, মূর্খতা, জনিত হঠকারিতা, তাদের গোত্র প্রধানদের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা এবং সত্য অস্বীকারকারী লোকদের নিজেদের গোমরাহী ব্যাপারে একগুয়েমী ইত্যাদি সবকিছুই ঠিক তেমনি যেমন কুরাইশদের মধ্যে পাওয়া যেতো। আবার প্রত্যেকটি কাহিনীতে সত্য অস্বীকারকারী জাতিগুলোর যে পরিণাম দেখানো হয়েছে তার মাধ্যমে আসলে কুরাইশদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে,যদি তোমরা আল্লাহর পাঠানো নবীদের কথা না মানো এবং চরিত্র সংশোধনের যে সুযোগ তোমাদের দেয়া হচ্ছে অন্ধ জিদ ও গোয়ার্তুমীর বশবর্তী হয়ে তা হেলায় হারিয়ে বসো, তাহলে চিরদিন গোমরাহী ও ফিতনা -ফাসাদের ক্ষেত্রে জিদ ধরে বিভিন্ন জাতি যেমন পতন ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে, তোমরাও তেমনি ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।[১৬৬]

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

"আর আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইবকে নবী করে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন- হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং শেষ দিবসকে ভয় কর, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না।"[১৬৭]

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ -

"যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সৎপথ দেখাবেন।"[১৬৮]

হযরত মূসার মিসর থেকে বের হয়ে মাদয়ানের দিকে যাবার ব্যাপারে বাইবেলের বর্ণনা কোরআনের সাথে মিলে যায়। কিন্তু তালমুদের এ প্রসংগে এক ভিত্তি হীন কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। সেটা এই যে, হযরত মূসা মিসর থেকে হাবসায় পালিয়ে যান এবং সেখানে গিয়ে বাদশাহর পারিষদে পরিনত হয়। তারপর বাদশহর মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁকেই নিজেদের বাদশহের সিংহাসনে বসায় এবং বাদশহর বিধবা স্ত্রীর সাথে তার বিবাহ দেন। ৪০ বছর তিনি সেখানে রাজত্ব করেন।

কিন্তু এ সুদীর্ঘ সময় কালে তিনি কখনো নিজের হাবশী স্ত্রীর নিকটবর্তী হননী। ৪০ বছর অতিক্রান্ত হবার পর ঐ ভদ্র মহিলা হাবশার জনগনের কাছে এ মর্মে অভিযাগ করেন যে, ৪০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত এ ব্যাক্তি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক রক্ষা করেননি এবং হাবসার দেবতাদের পূজা করেনি। এ কথায় রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাকে পদচ্যূত করে বিপুল পরিমান ধন-সম্পদ দিয়ে সসম্মানে বিদায় করে দেয়। তখন তিনি হাবশা ত্যাগ করে মাদয়ানে পৌছে যান এবং সেখানে সামনের যে সব ঘঠনার কথা বলা হয়েছে সেগুলো ঘটে। তখন তার বয়স ছিল ৬৭ বছর।

এ কাহিনীটি যে ভিত্তিহীন এর একটি সুস্পষ্ট প্রমান হচ্ছে যে, এতে এ কথাও বলা হয়েছে যে একসময় আসিরীয়ায়দের বিদ্রহ দমন করার জন্য হযরত মূসা ও তাঁর পূর্ববতি বাদশহরাও সামরিক অভিযান চালান।

---

১৬৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ৭৫১

১৬৭. আল-কুর'আন, ২৯ঃ ৩৬

১৬৮. আল-কুর'আন, ২৮ঃ ২২

Dhaka University Institutional Repository

সামান্যতম ইতিহাস-ভূগোল জ্ঞান যার আছ সে এ পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে একটু নজর দিলেই দেখতে পাবে যে, আসিরীয়ার উপর হাবশার শাসন বা হাবশি সেনা দলের আক্রমনের ব্যাপারটি কেবলমাত্র তখনই ঘটতে পারতো যখন মিশর, ফিলিস্তীন ও সিরিয়া তার দখলে থাকত অথবা সমগ্র আরব দেশ তার কর্তৃত্বাধীন হত কিংবা হাবশার নৌবাহিনী এতই শক্তিশালী হত যে, তা ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপ মহাসাগর অতিক্রম করে ইরাক দখল করতে সক্ষম হতো। দেশগুলোয় কখনো হাবশিদের কতৃর্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অথবা তাদের নৌশক্তি কখনো এতো শক্তির অধিকারী ছিল এ ধরনের কোন কথা ইতিহাসে নেই। এ থেকে বুঝা যায় যে, নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের জ্ঞান কতটা অপরিপক্ক ছিল এবং কোরআন তাদের ভুলগুলো সংশোধন করে কেমন সুস্পষ্ট আকারে সঠিক ঘটনাবলী পেশ করেছেন। কিন্তু ইহুদী খৃষ্টান প্রাচ্যবিদগণ একথা বলতে লজ্জা অনুভব করেন না যে, কোরআন এসব কাহিনী বনী ইসরাঈল থেকে সংগ্রহ করেছে।[১৬৯]

এমন পথ যার সাহায্যে সহজে মাদয়ানে পৌঁছে যাবো। উল্লেখ্য, সে সময় মাদয়ান ছিল ফেরাউনের রাজ্য-সীমার বাইরে। সমগ্র সিনাই উপদ্বীপে মিসরের কর্তৃত্ব ছিল না। বরং তার কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিম ও দক্ষিণ এলাকা পর্যন্ত। আকাবা উপসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম তীরে ছিল বনী মাদয়ানের বসতি এবং এ এলাকা ছিল মিসরীয় প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এ কারণে মূসা মিসর থেকে বের হয়েই মাদয়ানের পথ ধরেছিলেন। কারণ এটাই ছিল নিকটতম জনবসতিপূর্ণ স্বাধীন এলাকা। কিন্তু সেখানে যেতে হলে তাঁকে অবশ্যই মিসর অধিকৃত এলাকা দিয়েই এবং মিশরীয় পুলিশ ও সেনা-চৌকিগুলোর নজর এড়িয়ে যেতে হতো। তাই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আমাকে এমন পথে নিয়ে যাও যেপথ দিয়ে আমি সহি-সালামতে মাদয়ান পৌঁছে যেতে পারি।[১৭০]

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ -

"যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের কাছে পৌঁছলেন, তখন কূপের একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে । তিনি বললেন- তোমাদের কি ব্যাপার ? তারা বললআমরা আমাদের জন্তুদের পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্র রাখাররা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা পিতা খুবই বৃদ্ধ।"[১৭১]

এ স্থানটি, যেখানে মূসা পৌঁছেছিলেন, এটি আকাবা উপসাগরের পশ্চিম তীরে মানকা থেকে কয়েক মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। বর্তমানে এ জায়গাটিকে আল বিদ্'আ বলা হয়। সেখানে একটি ছোট মতো শহর গড়ে উঠেছে। আমি ২০০৪ সালে তাবুক যাওয়ার পথে এ জায়গাটি দেখেছি। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে জানিয়েছে, বাপ-দাদাদের আমল থেকে আমরা শুনে আসছি মাদয়ান এখানেই অবস্থিত ছিল। এর সন্নিকটে সামান্য দূরে একটি স্থানকে বর্তমানে "মাগায়েরে শু'আইব" বা "মাগারাতে শু'আইব" বলা হয়। সেখানে সামূদী প্যাটান্রে কিছু ইমারত রয়েছে। আর এর প্রায় এক মাইল দু'মাইল দূরে কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এর মধ্যে আমরা দেখেছি দু'টি অন্ধকূপ।

---

১৬৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ১০১১

১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১০

১৭১. আল-কুর'আন, ২৮ঃ ২৩

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় লোকেরা আমাদের জানিয়েছে, নিশ্চিতভাবে আমরা কিছু বলতে পারি না তবে আমাদের এখানে একথাই প্রচলিত যে, এ দু'টি কূয়ার মধ্য থেকে একটি কূয়ায় মূসা তাঁর ছাগলের পানি পান করিয়েছেন। এ এলাকার অধিবাসীরা এ স্থানেই মূসার ঐ কূয়াটি চিহ্নিত করে থাকে। এ থেকে জানা যায়, এ বর্ণনাটি শত শত বছর থেকে সেখানকার লোকদের মুখে মুখে বংশানুক্রমে চলে আসছে এবং এটি ভিত্তিতে দৃঢ়তার সাথে বলা যেতে পারে, কুর'আন মজীদে যে স্থানটির কথা বলা হয়েছে এটা সেই স্থান।[১৭২]

লূত (আ) এর মেয়েরা বলল, আমরা মেয়ে মানুষ। এ রাখালদের সাথে টক্কর দিয়ে ও সংঘর্ষ বাধিয়ে নিজেদের জানোয়ারগুলোকে আগে পানি পান করাবার সামর্থ্য আমাদের নেই। অন্যদিকে আমাদের পিতাও এতবেশি বয়ো:বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, তিনি নিজে আর কষ্টের কাজ করতে পারেন না। আমাদের পরিবারে আর দ্বিতীয় কোন পুরুষ নেই। তাই আমরা মেয়েরাই এ কাজ করতে বের হয়েছি। সব রাখালদের তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে নিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। মেয়ে দু'টি শুধুমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে এ বক্তব্য উপস্থাপন করে। এ থেকে একদিকে তাদের লজ্জাশীলতার প্রকাশ ঘটে। অর্থ্যাৎ একজন পর পুরুষের সাথে তারা বেশি কথাও বলতে চাচ্ছিল না। আবার এটাও পছন্দ করছিল না যে, এ ভিন দেশী অপরিচিত লোকটি তাদের ঘটনা সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ করুক এবং মনে মনে ভাবুক যে, এরা কেমন লোক যাদের পুরুষরা ঘরে বসে রয়েছে আর ঘরের মেয়েদেরকে এ কাজ করার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এ মেয়েদের বাপের ব্যাপারে আমদের এখানে এ কথা প্রচার হয়ে গেছে যে, তিনি ছিলেন হযরত শু'আইব আলাইহিস সালাম। কিন্তু কুর'আন মজীদে ইশারা ইঙ্গিতে কোথাও এমন কথা বলা হয়নি যা থেকে বুঝা যেতে পারে তিনি শু'আইব আলাইহিস সালাম ছিলেন। অথচ শু'আইব আলাইহিস সালাম কুর'আন মজীদে একটি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। এ মেয়েদের পিতা যদি তিনিই হতেন তাহলে এখানে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়ার কোন কারনই ছিল না। নিঃসন্দেহে কোন কোন হাদীসে তাঁর নাম স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর উভয়ে এ ব্যাপারে একমত যে, এগুলোর কোনটিরও সনদ তথা বর্ণনাসূত্র নির্ভুল নয়। তাই ইবনে আব্বাস, ইবনে বসরী, আবু উবাইদাহ ও সাঈদ ইবনে জুবাইরের ন্যায় বড় বড় তফসীরকারক বনী ইসরাইলের বর্ণনার উপর নিভ্র্র করে তালমূদ ইত্যাদি গ্রণে্থ এ মণীষীর যে নাম উল্লেখিত হয়েছে সেটিই বলেছেন। অন্যথায় বলা নিষ্প্রয়োজন, যদি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত শুআইবের নাম স্পষ্ট করে বলা হতো তাহলে তাঁরা কখনো অন্য নাম উল্লেখ করতেন না।

বাইবেলের এক জায়গায় এ মনীষীর নাম বলা হয়েছে রূয়েল এবং অন্য জায়গায় বলা হয়েছে যির্থো। এবং বলা হয়েছে তিনি মাদয়ানের যাজক ছিলেন।[১৭৩] তালমূতদীয় সাহিত্যে রূয়েল, যিথ্রো ও হুবাব তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম বলা হয়েছে। আধুনিক ইহুদী আলেমগণের মতে যিথ্রো ছিল 'হিজ এক্সেলেন্সী' এর সমার্থক একটি উপাধি এবং আসল নাম ছিল রূয়েল বা হুবাব। অনুরূপভাবে কাহেন বা যাজক (Kohen Midian) শব্দটির ব্যাখ্যার ব্যাপারেও ইহুদী আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একে পুরোহিত (Priest) বা এর সমার্থক হিসেবে নিয়েছেন আবার কেউ রাইস বা আমীর (Prince) অর্থে নিয়েছেন।

---

১৭২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ১০১১

১৭৩. প্রাগুক্ত, যাত্রা পুস্তক ২: ১৬-১৮, ৩:১ এবং ১৮:৫

Dhaka University Institutional Repository

তালমূদে তাঁর যে জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসার জন্মের পূর্বে ফেরাউনের কাছে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। ফেরাউন তাঁর জ্ঞান ও বিচক্ষণতার প্রতি আস্থা রাখতো। কিন্তু যখন বণী ইসরাইলের উপর জুলুম শোষণ চালাবার জন্য মিশরের রাজ পরিষদে পরামর্শ হতে লাগলো এবং তাদের সন্ত ানদের জন্মের পর পরই হত্যা করার সিদ্ধান্ত হলো তখন তিনি ফেরাউনকে এ অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য অনেক চেষ্টা চালান। তাকে এ জুলুমের অশুভ পরিণামের ভয় দেখালেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, এদের অস্তিত্ব যদি আপনার কাছে এতই অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে এদেরকে মিশর থেকে বের করে এদের পিতৃ পুরুষের দেশ কেনানের দিকে পাঠিয়ে দিন। তাঁর এ ভূমিকায় ফেরাউন তাঁর প্রতি অসন্তষ্ট হয়ে তাঁকে অপদস্থ করে নিজের দরবার থেকে বের করে দিয়েছিল। এ সময় থেকে তিনি নিজের দেশ মাদ্য়ানে চলে এসে সেখানেই অবস্থান করছিলেন।

তাঁর ধর্ম সম্পর্কে অনুমান করা হয়, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মত তিনিও ইবরাহীমী দীনের অনুসারী ছিলেন। কেননা, যেভাবে হযরত মুসা ছিলেন ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)- এর আউলাদ ঠিক তেমনি তিনিও ছিলেন মাদ্য়ান ইবনে ইবরাহীমের বংশধর। এ সম্পর্কের কারনেই সম্ভবত তিনি ফেরাউনকে নবী ইসরাইলের উপর জুলুম-নির্যাতন-নিপীড়ণ করতে নিষেধ করেন এবং তার বিরাগভাজন হন। কুর'আন ব্যাখ্যাদাতা নিশাপুরী হযরত হাসান বাসরীর বরাত দিয়ে লিখেছেন: "তিনি একজন মুসলমান ছিলেন। হযরত শু'আইবের দীন তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।" তালমূদে বলা হয়েছে, তিনি মাদ্য়ানবসীদের মূর্তিপূজাকে প্রকাশ্যে নির্বুদ্ধিতা বলে সমালোচনা করতেন। তাই মাদয়ানবাসীরা তাঁর বিরোধী হয়ে গিয়েছিল।[১৭৪]

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ -

"আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়েবকে প্ররণ করেছি। তিনি বললেন- হে আমার কওম, আল্লাহর বন্দেগী কর তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নাই। আর পরিমাণে ও ওজনে কম দিও না, আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায়ই দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যে দিনটি পরিবেষ্টনকারী।"[১৭৫]

(كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ) -

"যেন তারা কখনও সেখানে বসবাস করেনি। জেনে রেখ, ধ্বংশই ছিল মাদ্ইয়ানবাসীদের পরিণাম, যেমন সামূদ জাতির পরিণাম ছিল ধ্বংশ।"[১৭৬]

---

১৭৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ১০১২

১৭৫. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৯৫

১৭৬. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থান

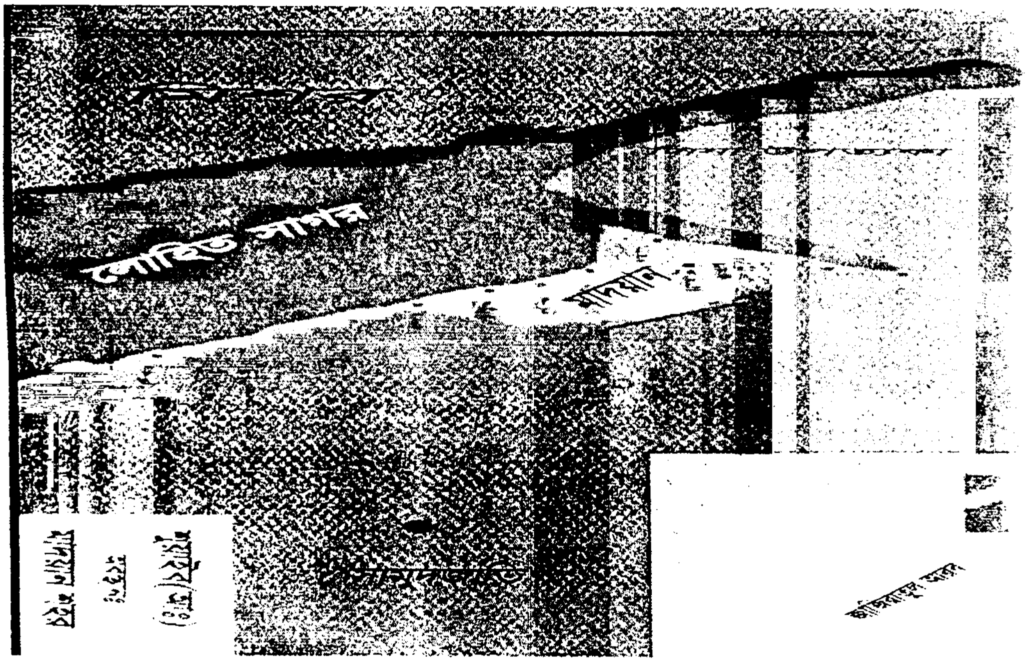

মাদায়েন শহর

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

এ আযাবের কোন বিস্তারিত বিবরণ কুর'আন মজীদে বা কোন সহীহ্ হাদীসে উল্লেখিত হয়নি। শব্দের বাহ্যিক অর্থ থেকে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, তারা যেহেতু আসমানী আযাব চেয়েছিল তাই আল্লাহ্ তাদের ওপর পাঠিয়ে দিলেন একটি মেঘমালা। এ মেঘমালাটি আযাবের বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে না দেয়া পর্যন্ত ছাতার মত তাদের ওপর ছেয়ে রইলো। কুর'আন থেকে একথা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, মাদ্য়ানবাসীদের আযাবের ধরণ আইকাবাসীদের আযাব থেকে আলাদা ছিল। যেমন এখানে বলা হয়েছে এরা ছাতার দিনের আযাবে ধ্বংস হয়েছিল। আর তাদের ওপর আযাব এসেছিল একটি বিস্ফোরণ ও ভূমিকম্পের মাধ্যমে। তাই উভয় সম্প্রদায়কে মিলিয়ে একটি কাহিনী বানিয়ে দেবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। কোন কোন তাফসীরকার "ছাতার দিনের আযাব"-এর কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাদের এসব তথ্যের উৎস আমাদের জানা নেই। ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন- "আলেমদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই ছাতার দিনের আযাব কি ছিল সে সম্পর্কে তোমাকে কোন তথ্য জানাবে, তা সঠিক বলে মেনে নিয়ো না।"[১৭৭]

---

১৭৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

মূসা (আ.) ও মাদ্‌ইয়ান ভূমি

হযরত শু'আইব (আ.)-এর ঘটনাবলীতে মাদ্‌ইয়ান সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখা হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) যখন মিসর হতে বের হতে ইচ্ছা করলেন, তখন মাদ্‌ইয়ান দেশকেই মনোনীত করলেন, মাদ্‌ইয়ানের লোকালয়টি মিসর হতে অষ্টম মঞ্জিলে অবস্থিত ছিল। খুব সম্ভব এই মনোনয়টি এই জন্য করা হয়েছে যে, মাদ্‌ইয়ানবাসীদের এই গোত্রটি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকটবর্তী আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিল। কেননা মূসা (আ.) ছিলেন হযরত ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর আর মাদইয়ানের এই গোত্রটি হল হযরত ইসহাক (আ.)-এর ভ্রাতা মাদ্‌ইয়ান ইব্‌নে ইব্রাহীমের বংশ হতে উদ্ভুত। হযরম মূসা (আ.) যেহেতু ফেরআউনের ভয়ে পলায়ন করেছিলেন; সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোন সাথীও ছিল না, পথপ্রদর্শকও ছিল না এবং কোন পাথেয়ও ছিল না আর দ্রুত চলার জন্য নগ্নপদ ছিলেন। তাবারী হযরত সাঈদ ইব্‌নে জুবাইর (রা.) হতে রেওয়ায়ত করে লিখছেন, এই পূর্ণ সফরে মূসা (আ.)-এর খাদ্য গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নগ্নপদ হওয়া হেতু এই দীর্ঘ সফরে তাঁহার পায়ের তলার চামড়া পর্যন্ত খুলে গিয়েছিল, এই অস্থির ও পেরেশান অবস্থায় হযরত মূসা (আ.) মাদ্‌ইয়ানের ভূখণ্ডে প্রবেশ করলেন।[১৭৮]

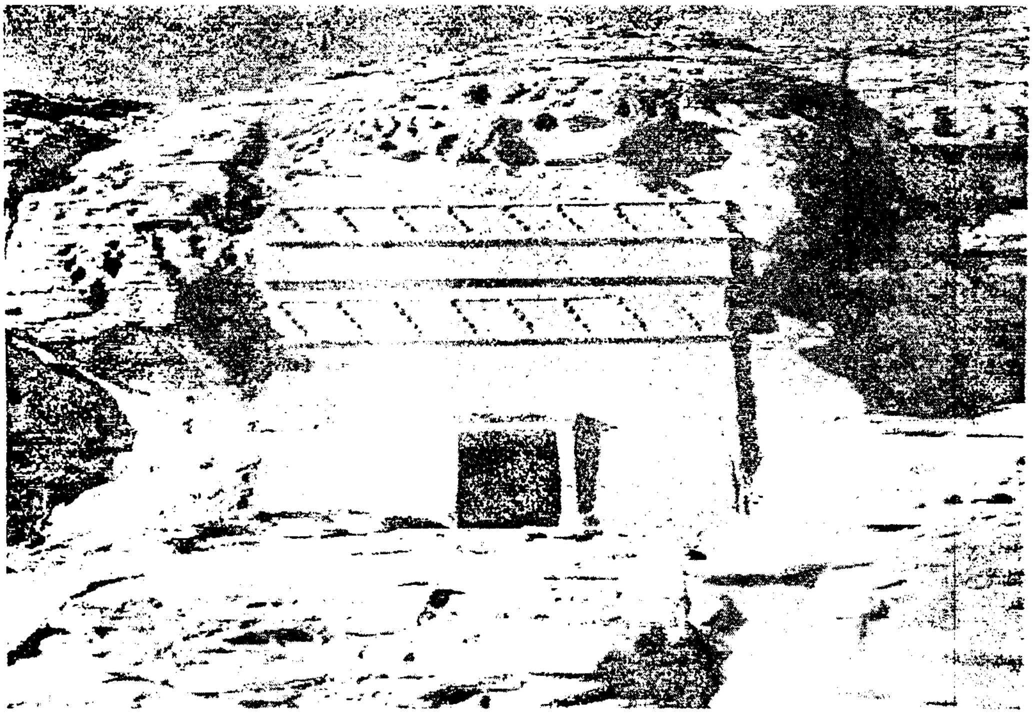

মাদায়েনে সালেহ (আ)

মাদ্‌ইয়ান বা আহছাবে আইকাহ্

এই গোত্রটি কোন্ স্থানে বসতি করত? এ সম্বন্ধে আবদুল ওয়াহাব নাজ্জার বলেন, তারা মূলকে হেজাযে শামের সাথে সংমিলিত এমন এক স্থানে বসতি করত যার পরিধি আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমির পরিধির বরাবর অবস্থিত। আবার কেউ কেউ বলেন, শামের সাথে মিলিত 'মাআন' নামক ভূখণ্ডে বসবাস করত।

১৭৮. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ২৪, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আন মজীদ এই গোত্রের বাসভূমি সম্বন্ধে দুইটি কথা জানিয়ে দিয়েছে-

১। তারা ইমামে মুবিনের উপর বসবাস করত। যেমন কুর'আন মজীদে উল্লেখ আছে অর্থাৎ "কাওমে লূত ও কাওমে মাদ্ইয়ান উভয় কাওমই এক বিরাট রাজ সড়কের পার্শ্বে বসতি করত।" আরব দেশের ভূগোলে যে রাজ সড়কটি হেজাযের ব্যবসায়ী কফেলাগুলিকে শাম, ফেলেস্তীন, ইয়ামান বরং মিসর পর্যন্ত লইয়া এবং লোহিত সাগরের পূর্ব তীর দিয়া চলে যেত। কুর'আন মজীদ সেই সড়কটিকে 'ইমামে মুবীন, অর্থাৎ মুক্ত ও পরিষ্কার রাজ সড়ক বলছে। কেননা, গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল উভয় মৌসুমেই কোরাইশ সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী কফেলাগুলির জন্য এই বিখ্যাত ও বিরাট বাণিজ্য পথ ছিল। যার পরম্পরা স্থলভাগের সীমার সহিত জল ভাগের সীমা রেখাকেও সংযুক্ত করে দেয়। তারা 'আছহাবে আইকাহ্' (ঝোপ ঝাড়ের অধিবাসী) বলেও অভিহিত হত। আরবী ভাষায় 'আইকাহ্' সবুজ বরণ ঝোপ ঝাড়কে বলা হয় সবুজ ও সতেজ বৃক্ষলতার প্রাচুর্যের দরুন বন-জঙ্গলে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঝোপের আকৃতি ধারণ করে।

এই দুইটি কথা জানিয়া লওয়ার পর মাদ্ইয়ানের গোত্রের বসতির সন্ধান সহজেই জানা যেতে পারে। তা হল মাদ্ইয়ানের গোত্রটি লোহিত সাগরের পূর্ব তীরে এবং আরব দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এমন জায়গায় বসবাস করিত যা শামদেশের সাথে সংযুক্ত হেজাযের শেষাংশ বলা যেতে পারে। আর হেজাযবাসীর শাম, ফেলেস্তীন বরং মিসর পর্যন্ত যাতায়াতকালে 'আছহাবে মাদ্ইয়ানের' বস্তির ভগ্নাবশেষগুলি পথে পড়ত যা তাবুকের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল।

তফসীরকারগণ এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত পোষণ করেন, 'আছহাবে মাদ্ইয়ান' এবং আছহাবে আইকাহ্' একই গোত্রের দুইটি নাম? নাকি তারা দুইটি পৃথক পৃথক গোত্র? কারও মতে তারা দুইটি পৃথক পৃথক গোত্র। মাদ্ইয়ান ছিল একটি সভ্য ও শহরী গোত্র। আর আছহাবে আইকাহ্ ছিল গ্রাম্য এবং যাযাবর গোত্র যাহারা বনে জঙ্গলে বসতি করত। এ কারণে তাহাদিগকে 'আছহাবে আইকাহ্' অর্থাৎ বন-জঙ্গলের অধিবাসী বলা হয়েছে। এই মতাবলম্বী তফসীরকারদের মতে আয়াতে দ্বিবচনের সর্বনামটি লক্ষ্যস্থলে এই দুইটি গোত্র অর্থাৎ মাদ্ইয়ান এবং আছহাবে আইকাই উদ্দেশ্য; মাদ্ইয়ান এবং কাওমে লূত নহে। আর অন্যান্য তফসীরকারগণ গোত্র দুইটিকে একই গোত্র সাবস্ত করে বলেন যে, জলবায়ুর পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা এবং নদী নালার প্রাচুর্য এই স্থানটিকে এতই সরস ও মনোমুগ্ধকর করে দিয়েছিল এবং এখানে ফল, মেওয়া ও সুগন্ধিযুক্ত ফুলের এত বাগ-বাগিচা ছিল যে, যদি কেউ বস্তির বাহির দাঁড়িয়ে তার দৃশ্য অবলোকন করত, তবে তার বোধ হত তা যেন অতি সুন্দর ও সরস ঘন বৃক্ষরাজির একটি ঝোপ, এই কারণেই কোরআন মজীদ তাকে আইকাহ্ বলে পরিচয় দিয়েছে।

এই তফসীরকারগণের মধ্যে হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এর ধারণা এই যে, এই বস্তুতি 'আইকাহ্' নামে এটি বৃক্ষ ছিল। গোত্রের লোকেরা যেহেতু উক্ত বৃক্ষের পূজা করত; এই সম্পর্কের কারণের মাদ্ইয়ান গোত্রকেই আছহাবে আইকাহ্ বলা হয়েছে। এতদ্ভিন্ন এই সম্বন্ধটি যেহেতু বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না; বরং ধর্ম সংক্রান্ত সম্বন্ধ ছিল সুতরাং যেসমস্ত আয়াতে তাদেরকে এই উপাধির সাথে উল্লেখ করা হয়েছে সে সমস্ত আয়াতে হযরত শুআইব (আ)-কে অর্থাৎ, তাদের ভাই কিম্বা এই জাতীয় কোন বংশগত সম্পর্কের সাথে উল্লেখ করা হয় নাই। অবশ্য যে সমস্ত আয়াতে শুআইব (আ)-এর কাওমকে 'মাদ্ইয়ান' বলা হয়েছে। তাতে হযরত শুআইব (আ) কেও বংশগত সম্পকের সাথে অর্থাৎ তাদের ভাই বলা হয়েছে। যাহোক, প্রবল মত ইহাই যে, মাদ্ইয়ান এবং আছহাবে আইকাহ্ একই গোত্র।যাদেরকে পৈত্রিক সম্পর্কের কারণে মাদ্ইয়ান বলা হয়েছে এবং বসত ভূমির স্বাভাবিক এবং ভৌগলিক অবস্থান হিসাবে 'আছহাবে আইকাহ্' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[১৭৯, ১৮০]

১৭৯. (হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৩৪৫, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

১৮০. ইবনে কাসীর, 'ইমামুদ্দীন, আবুল ফিদা ইসমাঈল', (আল্লামা), তাফসীরুল কুর'আননিল আযীম, বৈরূত : দারুল কলম, তা:বি:

Dhaka University Institutional Repository

দাউদ (আ)-এর রাজ্য

দাউদ (আ)- এর রাজ্য সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ -

"অবশেষে আল্লাহর হুকুমে তারা কাফেরদের পরাজিত করলো । আর দাউদ জালুতকে হত্যা করলো এবং আল্লাহ তাকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন আর এই সাথে যা যা তিনি চাইলেন তাকে শিখিয়ে দিলেন । এভাবে আল্লাহ যদি মানুষদের একটি দলের সাহায্যে আর একটি দলকে দমন না করতে থাকতেন , তাহলে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হতো। কিন্তু দুনিয়াবাসীদের ওপর আল্লাহর অপার করুণা (যে, তিনি এভাবে বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করতেন)। "[১৮১]

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ
الْمُبِينُ

"(অন্যদিকে) আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করলাম এবং তারা বললো, সেই আল্লাহর শোকর যিনি তাঁর বহু মু'মিন বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। "[১৮২]

পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থান

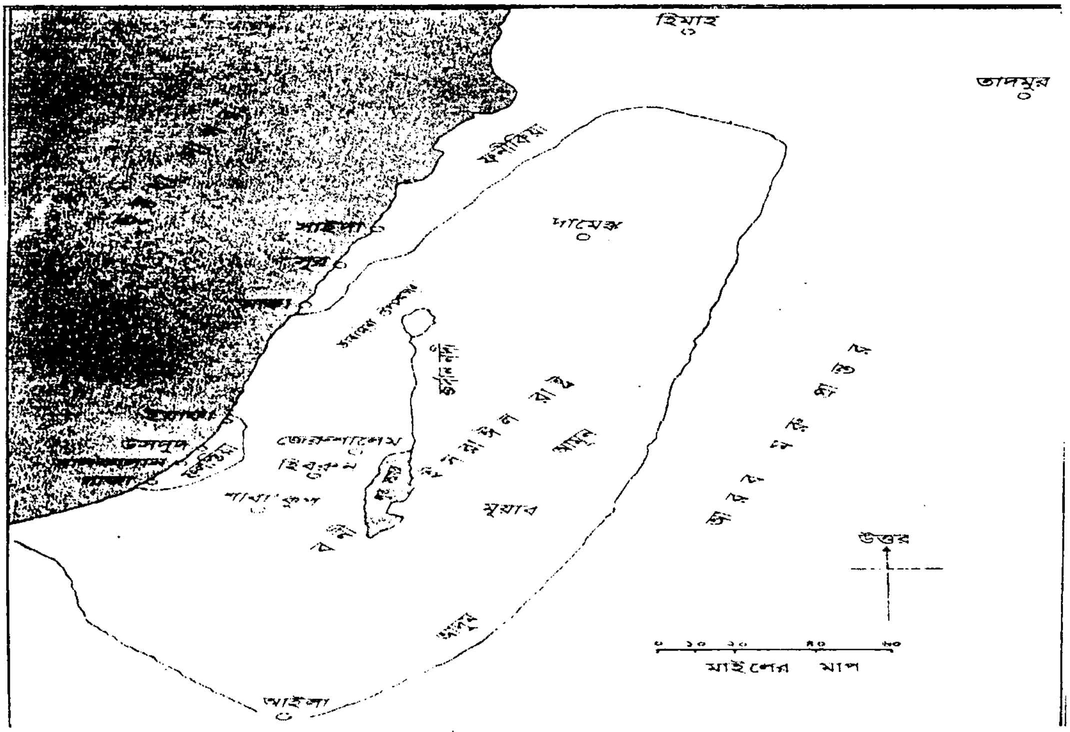

দাউদ (আ) এর রাজ্য

১৮১. আল-কুর'আন, ২ঃ ২৫১
১৮২. আল-কুর'আন, ২৭ঃ ১৬

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

উত্তরাধিকার বলতে ধন ও সম্পদ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার বুঝানো হয়নি। বরং নবুওয়াত ও খিলাফতের ক্ষেত্রে দাউদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সম্পদ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার বলতে যদি ধরে নেয়াও যায় তা স্থানান্তরিত হয়, তাহলে তা এককভাবে হযরত সুলাইমানের দিকেই স্থানান্তরিত হতে পারতো না। কারণ হযরত দাউদের অন্য সন্তানরাও ছিল। তাই এ আয়াত দ্বারা নবী (সা) এর নিম্নোক্ত হাদীস দুটিকে খণ্ডন করা যায় না- ال ثرون ام انكرت ةقدص "আমাদের নবীদের উত্তরাধিকার বন্টন করা হয় না, যা কিছু আমরা পরিত্যাগ করে যাই তা হয় সাদকা।"[১৮৩] এবং

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ مَنْ يَرِثُكَ إِذَا مِتَّ قَالَ وَلَدِي وَأَهْلِي قَالَتْ فَمَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ -

"নবীর কোন উত্তরাধিকারী হয় না। যা কিছু তিনি ত্যাগ করে যান তা মুসলমানদের গরীব ও মিসকীনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়।"[১৮৪]

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত দাউদের (আ) সবচেয়ে ছোট ছেলে। তাঁর আসল ইবরানী নাম ছিল সোলোমোন। এটি ছিল "সলীম" শব্দের সমার্থক। খৃস্ট পূর্ব ৯৬৫ অব্দে তিনি হযরত দাউদেও স্থলাভিষিক্ত হন এবং খৃঃ পূর্ব ৯২৬ পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর রাজ্যসীমা সম্পর্কে আমাদের মুফাসসিরগণ অতি বর্ণনের আশ্রয় নিয়েছেন অনেক বেশী। তারা তাঁকে দুনিয়ার অনেক বিরাট অংশের শাসক হিসাবে দেখিয়েছেন। অথচ তাঁর রাজ্য কেবলমাত্র বর্তমান ফিলিস্তিন ও জর্ডান রাষ্ট্র সমন্বিত ছিল এবং সিরিয়ার একটি অংশ এর অর্ন্তভূক্ত ছিল।

দাউদ (আ) এ সময় ছিলেন একজন কম বয়েসী যুবক। ঘটনাক্রমে তালুতের সেনাবাহিনীতে তিনি এমন এক সময় পৌছে ছিলেন যখন ফিলিস্তিনী সেনাদলের জবরদস্ত পাহলোয়ান জালুত (জুলিয়েট) বনী ইসরাঈলী সেনাদলকে প্রত্যক্ষ মুকাবিলায় আসার জন্য আহবান জানাচ্ছিল এবং ইসরাঈলীদের মধ্য থেকে একজনও তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল না। এ অবস্থা দেখে দাউদ (আ) নির্ভয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং জালুতকে হত্যা করলেন। এ ঘটনায় তিনি হয়ে উঠলেন ইসরাঈলীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় । তালুত নিজের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দিলেন। অবশেষে তিনিই হলেন ইসরাঈলীদের শাসক।[১৮৫]

---

১৮৩. বুখারী, খুমুস প্রদান করা ফরয অধ্যায়
১৮৪. মুসনাদে আহমদ, আবু বকর সিদ্দিক বর্ণিত ৬০ নং হাদীস
১৮৫. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি. পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

•

হযরত দাউদের সহিত বনী ইসরাঈলদের ক্রমবর্ধমান প্রীতি ও বন্ধুত্বের ফলে তালুতের জীবদ্দশায়ই মতান্তরে তাঁহার মৃত্যুর পরে শাসনক্ষমতা হযরত দাউদ (আ)-এর হাতে আসিয়া যায়। আর ইতিমধ্যে তাঁহার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার আর একটি মহাপুরস্কার এই হইল যে, তাঁহাকে নুবওত এবং রেসালতের সম্মানেও ভূষিত করা হয়। হযরত দাউদ (আ)-এর পূর্বে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে এই ধারা প্রচলিত ছিল যে, শাসনকার্য সংশ্লিষ্ট ছিল এক খানদানের সহিত আর নবুওত ও রেসালতের গুরুভার ছিল অন্য খানদানের উপর। ইয়াহুদার খানদানে নবুওত চলিয়া আসিতেছিল; আর ইউসুফ (আ)-এর খান্দানে ছিল শাসনক্ষমতা ও রাজত্ব। দাউদ (আ) প্রথম ব্যক্তি, যাঁহার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর ছিলেন এবং রাজসিংহাসনের অধিকারীও ছিলেন। কোরআন মজীদ হযরত দাউদ (আ)-এর এই সম্মানের উল্লেখ নিম্নরূপে করিয়াছে।

وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ -

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে রাজত্বও দান করিয়াছেন এবং হেকমত (অর্থাৎ নবুওয়াত)-ও আর তাঁহাকে নিজের মরযী অনুসারে যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন–শিখিয়েছেন।"[১৮৬]

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ -

"হে দাউদ! নিঃসন্দেহ, তোমাকে ভূ-পৃষ্ঠে আমার প্রতিনিধি বানাইয়াছি।"[১৮৭]

وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا -

"আর আমি প্রত্যেককে (দাউদ ও সুলাইমানকে) রাজত্ব দান করিয়াছি এবং জ্ঞান দান করিয়াছি।"[১৮৮]

আম্বিয়া ও রাসূলদের মধ্য হইতে হযরত আদম (আ) ব্যতীত শুধু হযরত দাউদ (আ)- ই এমন পয়গম্বর, যাঁকে কোরআন মজীদ খলীফা অভিধায় আখ্যায়িত করেছে। এত বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের পর হযরত দাউদ (আ)- এর এই বৈশিষ্ট্যের দুইটি হেকমত মনে আসছে। একটি সম্মুখের দিকে যথাস্থানে আসবে। অপর হেক্‌মতটি এই যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যখন বহু শতাব্দীর প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে হযরত দাউদ (আ)- এর মধ্যে নবুওতের ও রেসালতের সহিত শাসনক্ষমতা এবং রাজত্বও একত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অতএব, তাঁহাকে এমন একটি উপাধিতে ভূষিত করা জরুরী ছিল যা স্পষ্টরূপে আল্লাহ তা'আলার এল্‌ম ও কুদরত গুণের পূর্ণ প্রকাশকারী হয়। বলাবাহুল্য, ইহার জন্য সনাতন শরীঅতের পরিভাষায় 'খলীফা' শব্দের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কোন শব্দ হতে পারে না। মোটকথা, হযরত দাউদ (আ) বনী ইসরাঈলদের হেদায়তের কাজও করতেন এবং তাঁদের সামাজিক বা সামগ্রিক জীবনের তত্ত্বাবধানও করতেন।[১৮৯]

---

১৮৬. আল-কুর'আন, ২ঃ ২৫১
১৮৭. আল-কুর'আন, ৩৮ঃ ২৬
১৮৮. আল-কুর'আন, ২১ঃ ৭৯
১৮৯. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ২৭১, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

সাবা শহর (বিলকিসের সিংহাসন)

সাবা একটি শহরের নাম। বন্যার পানি একত্রিত হয়ে সাবা শহরে জমা থাকত। দূরদুরান্তের মানুষ সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করত।[১৯০]

সাবা শহর সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ -

সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের বাসভবনে ছিল এক নিদর্শন- দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, আরেকটি বামদিকে। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযক খাও এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (কতো) পবিত্র এ শহর ও (কতো) ক্ষমাশীল তোমাদের পালনকর্তা।[১৯১]

এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা বুঝতে হলে প্রথম রুকুর বিষয়বস্তু সামনে রাখতে হবে। সেখানে বলা হয়েছে- আরবের কাফেররা আখেরাতের আগমনকে বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী মনে করত এবং যে রসূল এ আকীদা পেশ করতেন তার ব্যাপারে প্রকাশ্যে বলত যে এ ধরনের অদ্ভুত কথা যে ব্যক্তি বলে সে পাগল হতে পারে অথবা জেনে বুঝে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ্ প্রথমে কয়েকটি বুদ্ধি বৃত্তিক যুক্তি পেশ করেন। ধরাপৃষ্ঠে মানব জাতির নিজের জীবন বৃত্তান্তই কর্মফল নিধানের সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছে- একথাটি অনুধাবন করানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। নিজের ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করলে মানুষ নিজেই একথা জানতে পারে যে, এ দুনিয়া এমন কোন নৈরাজ্যময় জগত নয় যার সমগ্র কারখানাটি নিজের ইচ্ছামত খামখেয়লীভাবে চলে। বরং এমন এক আল্লাহ এখানে শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করছেন যিনি সবকিছু শুনেন এবং দেখেন। তিনি কৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বনকারীদের সাথে এক ধরনের ব্যবহার করেন এবং অকৃতজ্ঞ ও নিয়ামত অস্বীকারকারীদের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার করেন। যে আল্লাহ্ রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ ধরনের নিয়মের অধীন। তার রাজ্যে পুণ্য ও পাপের পরিণাম কখন এক হতে পারে না। যদি কেউ শিক্ষা নিতে চায় তাহলে এ ইতিহাস থেকেই এ শিক্ষা নিতে পারে। তার ইনসাফ ও ন্যায় নীতির অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, এমন একটি সময় আসতেই হবে যখন সকাজের পূর্ণ প্রতিদান এবং অসৎকাজের পুরোপুরি বদলা দেয়া হবে।[১৯২]

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ -

আমি সেখানে এক মহিলাকে সে জাতির শাসকরূপে দেখেছি। তাকে সব রকম সাজ সরঞ্জাম দান করা হয়েছে এবং তার সিংহাসন খুবই জমকালো।[১৯৩]

---

১৯০. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি. পৃ. ১৬৯

১৯১. আল-কুর'আন, ৩৪ঃ ১৫

১৯২. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৩৪৬, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

১৯৩. আল-কুর'আন, ২৭ঃ ২৩

Dhaka University Institutional Repository

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ -

সুলাইমান বললো, "হে সভাসদগণ! তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে আসার আগে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে? "[১৯৪]

মাঝখানের ঘটনা উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সাবার রাণীর দূত তার উপঢৌকন ফেরত নিয়ে দেমে পৌঁছে গেল এবং যা কিছু মে শুনেছিল ও দেখেছিল সব আনুপূর্বিক বর্ণনা করলো। রাণী তার কাছ থেকে হযরত সুলাইমান (আ) সম্পর্কে যা শুনলেন তা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি নিজেই বাইতুল মাকদিসে যাবেন। কাজেই তিনি রাজকীয় জৌলুশ ও সাজ-সরঞ্জাম সহকারে ফিলিস্তিনের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং হযরত সুলাইমানের দরবারে খবর পাঠালেন এই বলেঃ আপনার দাওয়াত আপনার মুখে শুনার এবং সরাসরি আপনার সাথে আলোচনা করার জন্য আমি নিজেই আসছি। এসব বিস্তারিত ঘটনা বাদ দিয়ে এখন শুধুমাত্র রাণী যখন বাইতুল মাকদিসের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তার মাত্র এক-দু'দিনের পথ বাকি ছিল তখনকার ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।[১৯৫]

পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থান

সাবা কাহতানি সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ একটি শাখা গোত্র। আরব ঐতিহাসিক গণ তার এরূপ বর্ণনা করে থাকেন। সাবা ইবনে ইয়াসজাব ইবনে ইয়ারাব ইবনে ক্বাহতান। অবশ্য তাওরাতে বলা হয়েছে "সাবা ক্বাহতানের পুত্র" আর ইয়াকতান (ক্বাহতান) হতে আমলুদাদ, সালাফ, হাসার, মাদাদ, আরেক, হাদওয়ারাম, আওজাল, ওয়াকলা আউবাল, আলিমায়েল, সাবা, খাজার মাউথ, আউক্বির, হাবিলা, ইয়ারেজ, ইরার এবং ইউবাব জন্ম গ্রহণ করেন। এরা সকলেই বনি ইয়াকতান ছিল এবং তাদের আবাসভূমি মিশা হতে সেফার যাবার পথে ইউরোপের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৯৭]
যুবায়ের ইবনে বাকার বলেন, আরবী ভাষায় ক্বাহতান এবং হিব্রু ভাষায় সুরইয়ানি ভাষায় তাকে ইয়াকত্বান ও ইয়াকত্বন বলে। নতুন ঐতিহাসিক গণ তাওরাতের বর্ণনাকে সঠিক বলে মনে করেন। সুতরাং ক্বাহতানের আওলাদ সম্পর্কে যে বিবরণ তাওরাত প্রদান করেছে তা ইতিহাসের উক্তিসমূহ এবং শিলা লিপিসমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল। নতুন ঐতিহাসিকগণের এ তথ্য বিশ্লেষণ ব্যতিত এমনিও এরূপ ব্যাপারে তাওরাতের বর্ণনা অন্যান্য ঐতিহাসিক রেওয়াতসমূহের মোকাবেলায় অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

মোট কথা সাবা তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী ক্বাহতানের পুত্র ছিল এবং আরবদের বর্ণনা অনুযায়ী ক্বাহতানের পৌত্র ছিল। আর ইয়ারাব তাওরাতের বর্ণনাতে সাবার ভাই এবং আরবদের বর্ণনাতে ক্বাহতানের পুত্র ছিল। বংশ পরিচয় এবং ইতিহাস শাস্ত্রবিদগণ এ কথা একমত যে, ক্বাহতান সাম ইবনে নূহ্ (আ) এর বংশধরদের একটি শাখা । অবশ্য ক্বাহতান আরবের আরেবার মধ্য হতে নাকি আরবের মুস্তারেবা অর্থাৎ ইসমাইল (আ) সন্তানদের মধ্য হতে। আর আদনানী ও ক্বাহতানী বংশ পরম্পরা কি একই ? অথবা আদনানীরা কি আওলাদে ইসমাইল (আ) এবং ক্বাহতানীরা এই বংশনাক্রম হতে পৃথক প্রাচীন বংশ পরম্পরা এ বিষয়ে তাদের মতানক্য রয়েছে।[১৯৮]

---

১৯৪. আল-কুর'আন, ২৭ঃ ৩৮

১৯৫. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৩৪৮, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

১৯৭. প্রাগুক্ত, পয়দায়েশ, অধ্যায়-১১, ২৬-৩০ আয়াত

১৯৮. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৪খ, পৃ. ৩৯, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

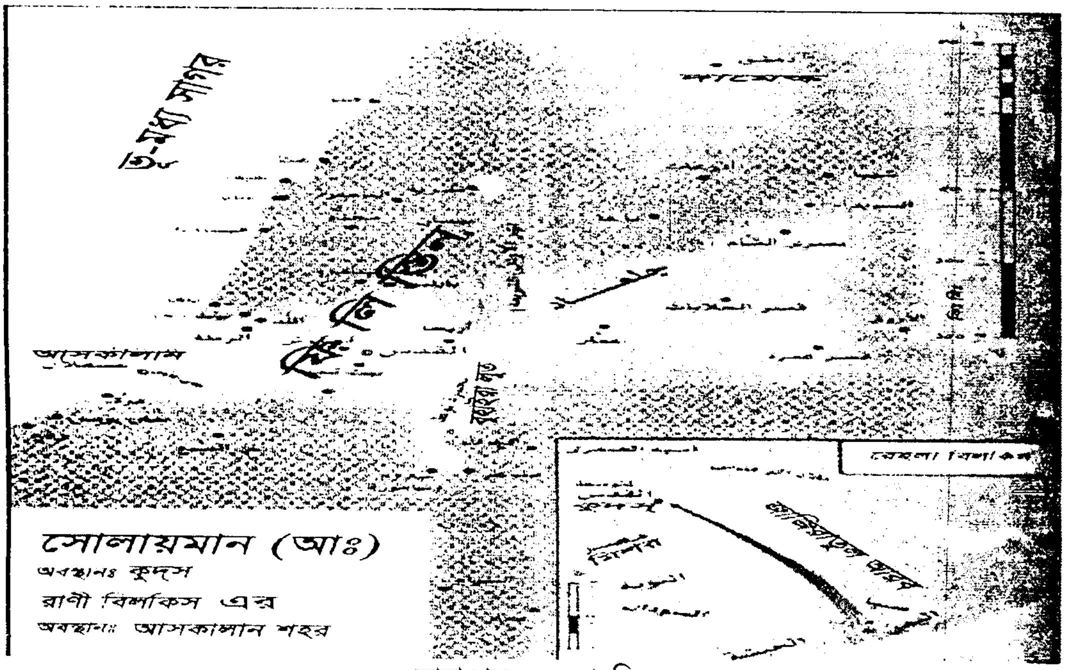

সাবা শহর এর মানচিত্র

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

অর্থাৎ সেই সিংহাসনটি যে সম্পর্কে হুদ্‌হুদ পাখি বলেছিল যে, "তাঁর সিংহাসনটি বড়ই জমকালো।" কোন কোন মুফাস্‌সির রাণীর আগমনের পূর্বে তাঁর সিংহাসন উঠিয়ে নিয়ে আসার কারণ হিসেবে এরূপ অদ্ভুত উক্তি করেছেন যে, হযরত সুলাইমান এটি দখল করে নিতে চাচ্ছিলেন এবং তিনি আশংকা করেছিলেন, রাণী যদি ইসলাম গ্রহণ করে বসেন, তাহলে তাঁর সম্পদ তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি ছাড়া দখল করা হারাম হয়ে যাবে। তাই তিনি তাঁর আসার আগেই সাত তাড়াতাড়ি তাঁর সিংহাসনটি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। আস্‌তাগফিরুল্লাহ্ একজন নবীর নিয়ত সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা বড়ই বিস্মকর মনে হয়। একথা মনে করা হয় না কেন যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে রাণী ও তার সভাসদদেরকে একটি মু'জিজাও দেখাতে চাচ্ছিলেন? এভাবে তারা জানতে পারতো, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীদেরকে কেমন সব অস্বাভাবিক শক্তি দান করেন এবং এভাবে তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারতো যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যথার্থই আল্লাহর নবী। কোন কোন আধুনিক তাফসীরকার এর চেয়েও মারাত্মক অশালীন ও অনাকাংখিত কথা বলেছেন। তারা আয়াতের তরজমা এভাবে করেছেনঃ "তোমাদের মধ্য থেকে কে আমাকে রাণীর জন্য একটি সিংহাসন এনে দেবে"? অথচ! কুর'আন أي يأتيني بعرش لها নয় বরং بعرشها বলছে। এর অর্থ হচ্ছে, "তার সিংহাসন, তার জন্য একটি সিংহাসন নয়। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যেহেতু রাণীরই সিংহাসন ইয়ামন থেকে উঠিয়ে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন এবং তাও আবার রাণীর এসে পড়ার আগেভাগেই, শুধুমাত্র এ কারণে এ ধরণের মনগড়া কথা তৈরি করা হয়েছে আর যে কোনভাবে কুর'আনের বর্ণনাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।[১৯৯]

১৯৯. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৩৫০, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

মাকারেবে সাবা ও মুলকে সাবা

সাবার প্রথম স্থরে এবং প্রথম যুগে শাসকদেরকে ইতিহাসে মাকারেবে সাবা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই শব্দটি মাকা অর্থ ধর্মীয় এবং রেব অর্থ মালিক। শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। এতে মনে হয় সাবার প্রথম যুগ ধর্মীয় নেতা। অর্থাৎ কাহিন শাসকদের শাসনাধীনে আরম্ভ হয়। এই বাদশাহদের রাজধানী সারওয়া ছিল। এই সারওয়া মায়ারিব ও সানার মধ্যবর্তী জায়গায় ছিল। এর ভগ্নাবশেষ অধ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। মুলকে সাবার রাজধানী মায়ারিফ ছিল। তাদের বাদশা এর প্রসিদ্ধ দুর্গ সালহীনে বাস করত। জাহেলী যুগের কবি ইবনে আলকামা মুসলমান ঐতিহাসিক গণের পূর্বে এ দুটি রাজত্বকালকে পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ করে বলেছেন "সারওয়া ও মায়ারিবের বাদশাহদের পরে এখন আর কে কালের কড়াল গ্রাস হতে সুরক্ষিত থাকতে পারে।"? এই কবি সালহীন দূর্গের উল্লেখ করে বলেছেন "আর সালহীন দূর্গের রাজমহল যাকে জমানার ঘটনাবলী বিলীন করে দিয়েছে ।[২০০]

রাজত্বের বিস্তৃতি

সাবার রাজত্ব দক্ষিণ আরব ইয়ামেনের পূর্বাংশ হতে শুরু হয়। এর রাজধানী প্রথমে সারওয়া ছিল অথবা মায়ারিব হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এই রাজত্ব উন্নত হয়ে রাজ্য জয় করার সাথে সাথে বাণিজ্যিক উপায়েও অত্যধিক সফলতা অর্জন করল। সুতরাং এর রাজত্বের পরিধি বিস্তৃত হয়ে বিস্তৃততর হতে লাগল এবং উত্তর আরব হতে আফ্রিকা পর্যন্ত এর সীমানাসমূহ দেখা যেতে লাগল। যেমন- হাফসা রাজ্যের উজনিয়াজিলা এর অধিকৃত অঞ্চলসমূহের মধ্যে ছিল এবং সাবা রাজ্যের তরফ হতে মাগাফের উপাধি ধারণ করে জনৈক সাবায়ি তথায় শাসন কার্য পরিচালনা করত।

ইয়ামেন হতে হেযাযের পথে শাম পর্যন্ত যেই প্রাচীন বাণিজ্যিক শহর ছিল এবং কোরআন মাজিদ সূরা কুরাইশ এর মধ্যে (رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ) বলে যার উল্লেখ করেছে। অন্য এক স্থানে যাকে 'ইমামুম্মুবিন' বলেছেন। তাও সাবায়ি দের অধীনে অধিকারে এসে গিয়েছিল এবং সাম,ফিলিস্তিন ও মাদেয়ানের উপকণ্ঠেও তাদের অধিকৃত বহু অঞ্চল ছিল। এরূপে খৃষ্টপূর্ব প্রায় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত মাঈনবাসীদের উপর জয় লাভের পর সাবার রাজত্ব আরবের আজিমুশশান সুশৃঙ্খল রাজত্ব ছিল।[২০১, ২০২]

---

২০০. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৪খ, পৃ. ৫১, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

২০১. বোস্তামে রচিত দায়রাতুন মায়ারিফ (সাবা) মোজামুল বুলদান, ইয়ামেন

২০২. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৪খ, পৃ. ৫২, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

আইকা

আইকা সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ أُولَئِكَ الأَحْزَابُ -

"সামুদ, লুতের সম্প্রদায় এবং আইকার লোকেরা। এরাই ছিল বহুবাহিনী।"[২০৩]

كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ المُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ - إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ -
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ - وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ -

"আইকাবাসীরা রাসূলদের অস্বীকার করেছিল, যখন শোয়াইব তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি সতর্ক হবে না ? আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল, অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না । আমার বিনিময় তো রাব্বুল আলামীনের কাছে আছে ।"[২০৪]

وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ - فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ -

"আর আয়কা'বাসীরাও ছিল অবশ্যই জালিম । সুতরাং আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। আর উভয় কওমের জনপদ প্রকাশ্য পথের পার্শ্বে অবস্থিত।"[২০৫]

হযরত শো'আয়েবের (আ) সম্প্রদায়ের লোক । এ সম্প্রদায়টির নাম ছিল বনী মাদইয়ান । তাদের এলাকার কেন্দ্রীয় শহরেরও নাম ছিল মাদইয়ান এবং সমগ্র এলাকটিকেও মাদইয়ান বলা হতো । আর " আইকা" ছিল তাবুকের প্রাচীন নাম । এ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ঘন জংগল । বর্তমানে একটি পাহাড়ী ঝরণার নাম আইকা । এটি জাবালে নূরে উৎপন্ন হয়ে আফাল উপত্যকায় এসে পড়ছে ।[২০৬]

পরিচিতি

মাদইয়ান ও আইকা নামকরণ

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এক স্ত্রী কাতুরার গর্ভজাত সন্তান মাদইয়ানের নাম পরবর্তীকালেণ বিভিন্নভাবে ব্যাপক আলোচিত হয়। মাদইয়ানের বংশধররাই আসহাবে মাদইয়ান নামে পরিচিতি লাভ করে এবং তাদের বসবাস স্থলের নামও মাদইয়ান হয়। সুতরাং মাদইয়ান যুগপৎ এক মানব বংশের নাম এবং তাদের বসবাস্থলেরও নাম। কুর'আনের বর্ণনানুযায়ী লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় ও মাদইয়ান সম্প্রদায় প্রধান সড়কের পাশে বসবাস করত। আরব বাণিজ্য কাফেলার গমনাগমনের যে সড়কটি সিরিয়া, ফিলিস্তীন, ইয়ামন ও মিশরে প্রবেশ করে সুয়েজ খালের পূর্ব তীর ঘেঁষে চলে গেছে, সেটিকেই শুরআনে ইমামে মুবীন বা প্রধান সড়ক বলা হয়েছে। আর এ সড়কের পাশে বসবাসকারীদেরকে আসহাবে আইকা বলা হয়েছে।

---

২০৩. আল-কুর'আন, ৩৮ঃ ১৩
২০৪. আল-কুর'আন, ২৬ ঃ ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০
২০৫. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৭৮, ৭৯
২০৬. ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল-বুলদান*, দারুল-কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত তা, বি, পৃ. ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

আইকা শব্দের অর্থ ঘন বৃক্ষরাজি ও তরুলতায় ঘেরা বন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কুর'আনে যেস্থানকে ইমামে মুবীন বলা হয়েছে সেস্থান ঘণবৃক্ষরাজি ও তরুলতায় আচ্ছাদিত ছিল। সুতরাং মাদইয়ান সম্প্রদায়ের আরেক নাম আইকা সম্প্রদায়ও বটে। উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, মাদইয়ান সম্প্রদায় সুয়েজ খালের পূর্ব দিকে আরব সীমানার উত্তর-পশ্চিম সিরিয়া সংলগ্ন স্থানে বসবাস করত। জায়গাটি পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর মাআনের কাছেই অবস্থিত।[২০৭]

ভৌগোলিক অবস্থান

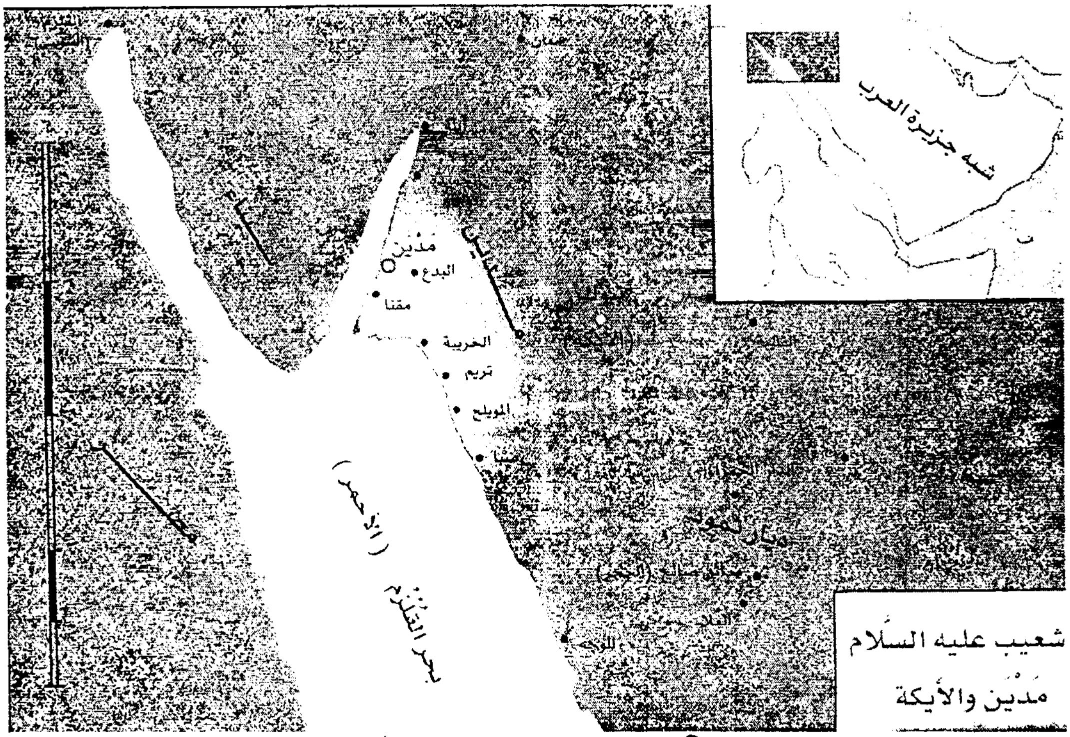

আইকা ও মাদায়েন শহরের মানচিত্র

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

আইকাবাসীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে সূরা আল হিজরের ৭৮-৮৪ আয়াতে করা হয়েছে। এখানে করা হচ্ছে তার বিস্তারিত আলোচনা। মাদ্য়ান ও আইকাবাসীরা দু'টি আলাদা জাতি অথবা একটি জাতির পৃথক নাম, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। একদল মনে করেন, তারা দুটি পৃথক জাতি। এজন্য তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে, সূরা আ'রাফে হযরত শো'আইবকে মাদ্য়ানবাসীদের ভাই বলা হয়েছেঃ (امٰاخ عيبش ىلاو نيدم) আর এখানে আইকাবাসীদের উল্লেখ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বলা হয়েছে اذ قال مهل بيعش (যখন শু'আইব তাদেরকে বললো)।

২০৭. আবু নায়ীম, মাওলানা, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ১৯৯৯, পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

এখানে তাদের ভাই (أَخُوهُمْ) শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাসসির উভয়কে একই জাতি গণ্য করেছেন। কারণ, সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে মাদ্‌য়ানবাসীদের যেসব রোগ ও গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে এখানে আইকাবাসীদের যেসব রোগ ও গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে ।হযরত শো'আইবের দাওয়াত ও উপদেশও একই এবং শেষে তাদের পরিণতির মধ্যেও কোন ফারাক নেই।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়, এ দু'টি উক্তি মূলতঃ সঠিক। সন্দেহাতীতভাবে মাদ্‌য়ানবাসী ও আইকাবাসীরা দু'টি আলাদা গোত্র। কিন্তু মূলত তারা একই বংশধারার দু'টি পৃথক শাখা। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী বা দাসী কাতুরার গর্ভজাত সন্তানরা আরব ও ইসরাঈলী ইতিহাসে বনী কাতুরা নামে পরিচিত। এদের একটি গোত্র সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করে। মাদ্‌য়ান ইবনে ইব্রাহীমের বংশোদ্ভূত হবার ফলে তাদেরকে মাদ্‌য়ানী বা মাদ্‌য়ানবাসী বলা হয়। এদের বসতি উত্তর হেজায থেকে ফিলিস্তীনের দক্ষিণ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সিনাই বদ্বীপের শেষ কিনারা পর্যন্ত লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের পশ্চিম উপকূল এলাকায় বিস্তৃত হয়। এর কেন্দ্রস্থল ছিল মাদ্‌য়ান শহর। আবুল ফিদার মতে এটি আকাবা উপসাগরের উপকূলে আইলা (বর্তমান আকাবা) থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। বনী কাতুরার অন্যান্য গোত্রের মধ্যে বনী দীদান (dedanties) তুলনামূলকভাবে বেশী পরিচিত। উত্তর আরবে তাইমা, তাবুক ও আলা'উলার মাঝামাঝি স্থানে তারা বসতি গড়ে। তাদের কেন্দ্রীয় স্থান ছিল তাবুক। প্রাচীনকালে একে আইকা বলা হতো। মু'জামুল বুলদানগ্রন্থে ইয়াকূত আইকা শব্দের আলোচনায় বলেছেন, এটি তাবুকের পুরাতন নাম এবং তাবুকবাসীদের মধ্যে একথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, এ স্থানটিই এক সময় আইকা নামে পরিচিত ছিল।[২০৮]

মাদ্‌য়ানবাসী ও আইকাবাসীদের জন্য একজন রসূল পাঠাবার কারণ সম্ভবত এছিল যে, তারা একই বংশধারার সাথে সম্পর্কিত ছিল, একই ভাষায় কথা বলতো এবং তাদের এলাকাও পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ছিল। বরং বিচিত্র নয়; কোন কোন এলাকায় তাদের বসতি একই সংগে গড়ে উঠেছিল এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়ে সমাজে তারা মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বনী কাতুরার এ দু'শাখার লোকদের পেশাও ছিল ব্যবসা। তাদের মধ্যে একই ধরণের ব্যবসায়িক অসততা এবং ধর্মীয় ও চারিত্রিক দোষ পাওয়া যেত। বাইবেলের প্রথম দিকের পুস্তকগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় এ আলোচনা পাওয়া যায় যে, এরা বা'লে ফুগূরের পূজা করতো। বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হয়ে এদের এলাকায় আসে তখন তাদের মধ্যেও এরা শিরক ও ব্যভিচারের রোগ ছড়িয়ে দেয়।[২০৯] তাছাড়া দু'টি বড় বড় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের ওপর এদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এপথ দু'টি ইয়ামন থেকে সিরিয়া এবং পারস্য উপসাগর থেকে মিসরের দিকে চলে গিয়েছিল। এ দু'টি রাজপথের ধারে বসতি হবার কারণে এদের লুটতরাজ ও রাহাজানির কারবার ছিল খুবই রমরমা। অন্যসব জাতির বাণিজ্য কাফেলাকে বিপুল পরিমাণ কর না দিয়ে তারা এ এলাকা অতিক্রম করতে দিতো না। নিজেরা আন্তর্জাতিক পথ দখল করে রাখার ফলে পথের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে রেখেছিল। কুর'আন মজীতে তাদের এ অবস্থানকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- "এ জাতি দু'টি (লূতের জাতি ও আইকাবাসী) প্রকাশ্য রাজপথের ওপর বসবাস করতো।"

---

২০৮. ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল-বুলদান*, দারুল-কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত তা, বি, পৃ. ১৭১
২০৯. গণনা পুস্তক ২৫:১-৫ এবং ৩১:১৬-১৭

এদের রাহাজানির কথা সূরা আ'রাফে এভাবে বলা হয়েছেঃ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ "আর প্রত্যেক পথের ওপর লোকদেরকে ভয় দেখাবার জন্য বসে যেয়ো না।" এ সমস্ত কারণে আল্লাহ্ এ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একই নবী পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে একই ধরণের শিক্ষা দিয়েছিলেন।[২১০]

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ -

"তোমরা পাহাড় কেটে তার মধ্যে সগর্বে ইমারত নির্মাণ করছো।"[২১১]

আদ জাতির সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা উঁচু উঁচু স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ করত। ঠিক তেমনি সামূদ জাতির সভ্যতা তার চেয়ে যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টের জন্য প্রাচীনকালের জাতিসমূহের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তা ছিল এই যে, তারা পাহাড় কেটে তার মধ্যে ইমারত নির্মাণ করতো। তাই সূরা আল ফজরে যেভাবে আদকে 'যাতুল ইমাদ' (ذات العماد) বলে অর্থাৎ স্তম্ভের অধিকারী পদবী দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি সামূদ জাতির বর্ণনা একথার মাধ্যমে করা হয়েছেঃ

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ -

"এমন সব লোক যার উপত্যাকায় পাহাড় কেটেছে।"[২১২]

এ ছাড়া কুর'আনে একথাও বলা হয়েচে যে, তারা নিজেদের দেশের সমতল ভূমিতে বড় বড় প্রাসাদ নির্মান করতো-

تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا -[২১৩]

এসব গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল? فَرِهِينَ শব্দের মাধ্যমে কুর'আন-এর ওপর আলোকপাত করে। অর্থাৎ এসব কিছু ছিল তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব, সম্পদ, শক্তি ও প্রযুক্তির নৈপুন্যের প্রদর্শনী। কোন যথার্থ প্রয়োজনের তাগিদ এর পেছনে কার্যকর ছিল না। একটি বিকৃত ও ভ্রষ্ট সভ্যতার ধরণ এমনিই হয়ে থাকে। একদিকে সমাজের গরীব লোকেরা মাথা গোঁজারও ঠাঁই পায় না আর অন্যদিকে ধনী নেতৃস্থানীয় লোকেরা থাকার জন্য যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করে ফেলে তখন প্রয়োজন ছাড়াই নিছক লোক দেখাবার জন্য স্মৃতিস্তম্ভসমূহ নির্মাণ করতে থাকে।

সামূদ জাতির এ ইমারতগুলোর কিছু সংখ্যক এখনো টিকে আছে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি নিজে এগুলো দেখেছি। পাশের পৃষ্ঠায় এগুলোর কিছু ছবি দেয়া হলো। এ জায়গাটি মদীনা তাইয়্যেবা ও তাবুকের মধ্যবর্তী হিজাযের বিখ্যাত আল'উলা নামক স্থান, (যাকে নবীর জামানায় 'ওয়াদিউল কুরা' বলা হতো) থেকে কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা আজও এ জায়গাকে 'আল হিজর' ও 'মাদ্‌য়ানে সালেহ' নামে স্মরণ করে থাকে। এ এলাকায় 'আল উলা' এখনো একটি শস্য শ্যামল উপত্যকা। এখানে রয়েছে বিপুল সংখ্যক পানির নহর ও বাগিচা। কিন্তু আজ হিজরের আশেপাশে বড়ই নির্জন ও ভীতিকর পরিবেশ বিরাজমান। লোকবসতি নামমাত্র। সবুজের উপস্থিতি ক্ষীণ। কূয়া আছে কয়েকটি। এরই মধ্যে একটি কূয়ার ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের মধ্যে একথা প্রচলিত আছে যে, হযরত সালেহ (আ)-এর উটনী সেখান থেকে পানি পান করতো। বর্তমানে এটি তুর্কী আমলের একটি বিরান ক্ষুদ্র সামরিক চৌকির মধ্যে অবস্থিত।

---

২১০. ইবনে কাসীর, 'ইমামুদ্দীন, আবুল ফিদা ইসমাঈল', (আল্লামা), তাফসীরুল কুর'আননিল আযীম, বৈরূত : দারুল কলম, তা:বি:, খ. ৩, পৃ. ৭১

২১১. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ১৪৯

২১২. আল-কুর'আন, ৮৯: ৯

২১৩. আল-কুর'আন, ৭: ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

কূয়াটি একবারেই শুকনা। এ এলাকায় প্রবেশ করে আল উলা'র কাছাকাছি পৌঁছুতেই আমরা সর্বত্র এমনসব পাহাড় দেখলাম যা একেবারেই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পরিষ্কার মনে হচ্ছিল, কোন ভয়াবহ ভূমিকম্প এগুলোকে নীচে থেকে উপর পর্যন্ত ঝাঁকানি দিয়ে ফালি ফালি করে দিয়ে গেছে। (এ পাহাড়গুলোরও কিছু ছবি পাশের পাতাগুলোয় দেয়া হয়েছে)। এ ধরণের পাহাড় আমরা দেখতে দেখতে গিয়েছি পূবের দিকে আল'উলা থেকে খায়বার যাবার সময় প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে জর্ডানে রাজ্যের সীমানার মধ্যে ৩০থেকে ৪০ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত। এর অর্থ দাঁড়ায়, তিন চারশো মাইল দীর্ঘ ও একশো মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট একটি এলাকা ভূমিকম্পে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আল হিজরে আমরা সামূদ জাতির যেসব ইমারত দেখেছিলাম ঠিক একই ধরণের কতিপয় ইমারত আমরা পেলাম আকাবা উপসাগরের কিনারে মাদ্‌য়ানে এবং জর্ডান রাজ্যের পেট্টা (PETRA) নামক স্থানেও। বিশেষ করে পেট্টায় সামূদী প্যাটান্রের ইমারত এবং নিবতীদের তৈরী করা অট্টালিকা পাশাপাশি দেখা গেছে। এগুলোর কারুকাজ ও নির্মাণ পদ্ধতিতে এত সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক নজর দেখার সাথে সাথেই বুঝতে পারবে এগুলো এক যুগেরও নয় এবং একই জাতির স্থাপত্যের নিদর্শনও নয়। এগুলোরও আলাদা আলাদা ছবি আমি পাশের পৃষ্ঠায় দিয়েছি। ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ডটি (Daughty) কুর'আনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আল হিজরের ইমারত সম্পর্কে দাবী করেছেন, এগুলো সামূদের নির্মিত নয় বরং নিবতীদের তৈরী ইমারত। কিন্তু উভয় জাতির স্থাপত্য পদ্ধতির মধ্যে বিস্তর ও সুস্পষ্ট ফারাক দেখা যায়। ফলে কেবলমাত্র একজন অন্ধই এগুলোকে একই জাতির নির্মিত বলে দাবী করতে পারে। আমার অনুমান, পাহাড় কেটে তার মধ্যে গৃহ নির্মাণ কৌশল সামূদই উদ্ভাবন করে এবং এর হাজার হাজার বছর পরে নিবতীরা খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে একে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়ে দেয়। অতঃপর ইলোরায় (পেট্টার প্রায় সাতশো বছর পরে নির্মিত গৃহা) এ শিল্পটির চরমউৎকর্ষ সাধিত হয়।[২১৪]

মাদ্‌ইয়ান বা আসহাবে আইকাহ্ ঃ

এই গোত্রটি কোন্ স্থানে বসতি করিত? এ সম্বন্ধে আবদুল ওয়াহাব নাজ্জার বলেন, ইহারা মূলকে হেজাযে শামের সহিত সংমিলিত এমন এক স্থানে বসতি করিত যাহার পরিধি আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমির পরিধির বরাবর অবস্থিত। আবার কেহ কেহ বলেন, শামের সহিত মিলিত 'মাআন' নামক ভূখণ্ডে বসবাস করত।

কোরআন মজীদ এই গোত্রের বাসভূমি সম্বন্ধে দুইটি কথা জানাইয়া দিয়াছে

১। তাহারা ইমামে মুবিনের উপর বসবাস করিত। যেমন কুর'আন মজীদে উল্লেখ আছে অর্থাৎ, "কাওমে লূত ও কাওমে মাদ্‌ইয়ান উভয় কাওমই এক বিরাট রাজ সড়কের পার্শ্বে বসতি করিত।" আরব দেশের ভূগোলে যেই রাজ সড়কটি হেজাযের ব্যবসায়ী কফেলাগুলিকে শাম, ফেলেস্তীন, ইয়ামান বরং মিসর পর্যন্ত লইয়া এবং লোহিত সাগরের পূর্ব তীর দিয়া চলিয়া যাইত। কোরআন মজীদ সেই সড়কটিকে 'ইমামে মুবীন, অর্থাৎ মুক্ত ও পরিষ্কার রাজ সড়ক বলিতেছে। কেননা, গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল উভয় মৌসুমেই কোরাইশ সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী কফেলাগুলির জন্য এই বিখ্যাত ও বিরাট বাণিজ্য পথ ছিল। যাহার পরস্পরা স্থলভাগের সীমার সহিত জল ভাগের সীমা রেখাকেও সংযুক্ত করিয়া দেয়। তাহারা 'আসহাবে আইকাহ্' (ঝোপ ঝাড়ের অধিবাসী) বলিয়াও অভিহিত হইত। আরবী ভাষায় 'আইকাহ্' সবুজ বরণ ঝোপ ঝাড়কে বলা হয় সবুজ ও সতেজ বৃক্ষলতার প্রাচুর্যের দরুন বন-জঙ্গলে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঝোপের আকৃতি ধারণ করে।

---

২১৪. (ইবনে কাসীর, 'ইমামুদ্দীন, আবুল ফিদা ইসমাঈল', (আল্লাম্মা), তাফসীরুল কুর'আননিল আযীম, বৈরূত : দারুল কলম, তা:বি:, খ. ৩, পৃ. ৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

এই দুইটি কথা জানিয়া লওয়ার পর মাদ্ইয়ানের গোত্রের বসতির সন্ধান সহজেই জানা যাইতে পারে। তাহা হইল মাদ্ইয়ানের গোত্রটি লোহিত সাগরের পূর্ব তীরে এবং আরব দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এমন জায়গায় বসবাস করিত যাহা শামদেশের সহিত সংযুক্ত হেজাযের শেষাংশ বলা যাইতে পারে। আর হেজাযবাসীর শাম, ফেলেস্তীন বরং মিসর পর্যন্ত যাতায়াতকালে 'আছহাবে মাদ্ইয়ানের' বস্তির ভগ্নাবশেষগুলি পথে পড়িত যাহা তাবুকের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল।

তফসীরকারগণ এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত পোষণ করেন, 'আসহাবে মাদ্ইয়ান' এবং আছহাবে আইকাহ্' একই গোত্রের দুইটি নাম? নাকি ইহারা দুইটি পৃথক পৃথক গোত্র? কাহারও মতে ইহারা দুইটি পৃথক পৃথক গোত্র। মাদ্ইয়ান ছিল একটি সভ্য ও শহরী গোত্র। আর আছহাবে আইকাহ্ ছিল গ্রাম্য এবং যাযাবর গোত্র যাহারা বনে জঙ্গলে বসতি করিত। এই কারণে তাহাদিগকে 'আসহাবে আইকাহ্' অর্থাৎ বন-জঙ্গলের অধিবাসী বলা হইয়াছে। এই মতাবলম্বী তফসীরকারদের মতে আয়াতে দ্বিবচনের সর্বনামটি লক্ষ্যস্থলে এই দুইটি গোত্র অর্থাৎ মাদ্ইয়ান এবং আছহাবে আইকাই উদ্দেশ্য; মাদ্ইয়ান এবং কাওমে লূত নহে।

আর অন্যান্য তফসীরকারগণ গোত্র দুইটিকে একই গোত্র সাবস্ত করিয়া বলেন যে, জলবায়ুর পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা এবং নদী নালার প্রাচুর্য এই স্থানটিকে এতই সরস ও মনোমুগ্ধকর করিয়া দিয়াছিল এবং এখানে ফল, মেওয়া ও সুগন্ধিযুক্ত ফুলের এত বাগ-বাগিচা ছিল যে, যদি কেহ বস্তির বাহির দাঁড়াইয়া উহার দৃশ্য অবলোকন করিত, তবে তাহার বোধ হইত ইহা যেন অতি সুন্দর ও সরস ঘন বৃক্ষরাজির একটি ঝোপ, এই কারণেই কোরআন মজীদ ইহাকে আইকাহ্ বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।

এই তফসীরকারগণের মধ্যে হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এর ধারণা এই যে, এই বস্তুতি 'আইকাহ্' নামে এটি বৃক্ষ ছিল। গোত্রের লোকেরা যেহেতু উক্ত বৃক্ষের পূজা করিত; এই সম্পর্কের কারণের মাদ্ইয়ান গোত্রকেই আছহাবে আইকাহ্ বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই সম্বন্ধটি যেহেতু বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল না; বরং ধর্ম সংক্রান্ত সম্বন্ধ ছিল সুতরাং যেসমস্ত আয়াতে তাহাদিগকে এই উপাধির সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে সে সমস্ত আয়াতে হযরত শুআইব (আ.)-কে অর্থাৎ তাহাদের ভাই কিম্বা এই জাতীয় কোন বংশগত সম্পর্কের সহিত উল্লেখ করা হয় নাই। অবশ্য যে সমস্ত আয়াতে শুআইব (আ.)-এর কাওমকে 'মাদ্ইয়ান' বলা হইয়াছে। তাতে হযরত শুআইবকেও বংশগত সম্পকের সহিত অর্থাৎ, তাহাদের ভাই বলা হইয়াছে। যাহোক, প্রবল মত ইহাই যে, মাদ্ইয়ান এবং আছহাবে আইকাহ্ একই গোত্র। যাহাদিগকে পৈত্রিক সম্পর্কের কারণে মাদ্ইয়ান বলা হইয়াছে এবং বসত ভূমির স্বাভাবিক এবং ভৌগলিক অবস্থান হিসাবে 'আছহাবে আইকাহ্' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।[২১৫]

---

২১৫. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৩৪৫, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

হিজর

হিজর সালেহ (আ) এর জাতির বাসস্থান। শ্যামদেশের একটি শহর।

হিজর সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

(وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ)
"সে শহরে ছিল ন'জন দল নায়ক যারা দেশের বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং কোন গঠনমূলক কাজ করত না।"[২১৬]

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ -
হিজ্‌রবাসীরাও রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।[২১৭]

পরিচিতি

সামুদ গোত্রের বসবাসের স্থান

সামুদ গোত্র হিজর এলাকায় বসবাস করত, তাই কুর'আনে তাদের আসহাবে হিজর বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন-

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ -
"হিজ্‌রবাসীরাও রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।"[২১৮]

কুর'আনের উল্লিখিত আয়াতে হিজর বলা হয়েছে। এখন স্বভাবতই এ এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। হেজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ওয়াদিয়ে কোরা নামক স্থান পর্যন্ত যে বিশাল বিস্তৃত প্রান্তর, তাই ছিল সামুদ গোত্রের বসবাসের স্থান। বর্তমানে এ এলাকা 'ফাজলুন নাকা' নামে পরিচিত। আদ সম্প্রদায় দক্ষিণ আরবে বসবাস করত। তাদের আল্লাহদ্রোহী কাফেররা আযাবে ধ্বংস হবার পর আযাব থেকে পরিত্রাণপ্রাপ্তরা উত্তর আরবের হেজর এলাকায় এসে বসবাস করতে থাকে। এ এলাকাটি আধুনিক সিরিয়া সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। এ এলাকায় এখনও সামুদ গোত্রের লোকদের ঘরবাড়ী দালানকোঠার ধ্বংসাবশেষ পাপাচার এবং আল্লাহদ্রোহিতায় তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি সাক্ষী হয়ে আছে।[২১৯]

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

এটি ছিল সামুদ জাতির কেন্দ্রীয় শহর । মদীনার উত্তর পশ্চিমে বর্তমান আল'উলা শহরের কয়েক মাইল দূরে এ শহরটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় । মদীনা থেকে তাবুক যাবার সময় প্রধান সড়কের ওপরই এ জায়গাটি পড়ে । এ উপত্যকাটির মধ্য দিয়ে কাফেলা এগিয়ে যায় । কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী কেউ এখানে অবস্থান করে না । হিজরী আট শতকে পর্যটক ইবনে বতুতা হজ্জে যাবার পথে এখানে এসে পৌঁছেন ।

---

২১৬. আল-কুর'আন, ২৭ঃ ৪৮
২১৭. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৮০
২১৮. আল-কুর'আন, ১৫ঃ ৮০
২১৯. আবু নায়ীম, মাওলানা, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি লেখেন : " এখানে লাল রংয়ের পাহাড়গুলোতে সামুদ জাতির ইরামতগুলো রয়েছে । এগুলো তারা পাহাড় কেটে কেটে তার মধ্যে নির্মাণ করেছিল । এ গৃহগুলোর কারুকাজ এখনো এমন উজ্জ্বল ও তরতাজা আছে যেন মনে হয় আজই এগুলো খোদাই করা হয়েছে । পচাগলা মানুষের হাড় এখনো এখানকার ঘরগুলো মধ্যে পাওয়া যায় ।[২২০]

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"আর সামূদের কাছে পাঠাই তাদের ভাই সালেহকে। সে বলেঃ হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। আল্লাহর এ উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। কাজেই তাকে আল্লাহর জমিতে চরে খাবার জন্যে ছেড়ে দাও। কোন অসদুদ্দেশ্যে এর গায়ে হাত দিয়ো না। অন্যথায় একটি যন্ত্রনাদায়ক আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে। "[২২১]

এটি আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় জাতি। আদের পরে এরাই সবচেয়ে বেশী খ্যাতি ও পরিচিত অর্জন করে। কুর'আন নাযিলের পূর্বে এদের কাহিনী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। জাহেলী যুগের কবিতা, ও খুতবা সাহিত্যে এর ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। আসিরিয়ার শিলালিপি, গ্রীস, ইসকানদারীয়া ও রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভুগোলবিগণও এর উল্লেখ করেছেন। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের কিছুকাল পুর্বে ও এ জাতির কিছু কিছু লোক বেঁচেছিল। রোমীয় ঐতিহাসিকগণের মতে, এরা রোমীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে এদের শত্রু নিবতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

উত্তর পশ্চিম আরবের যে এলাকটি আজো 'আল হিজর' নামে খ্যাত সেখানেই ছিল এদের আবাস। আজকের সউদী আরবের অন্তর্গত মদীনা ও তাবুকের মাঝখানে হিজায রেলওয়ের একটি ষ্টেশন রয়েছে, তার নাম মাদায়েনে সালেহ।এটিই ছিল সামুদ জাতির কেন্দ্রীয় স্থান। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল হিজর।সামূদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যেসব বিপুলায়তন ইমারত নির্মাণ করেছিল এখনো হাজার হাজার একর এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। এ নিঝুম পুরীটি দেখে আন্দাজ করা যায় যে এক সময়ে এ নগরীর জনসংখ্যা চার পাঁচ লাখের কম ছিল না। কুর'আন নাযিল হওয়ার সময়কালে হেজাযের ব্যবসায়ী কাফেলা এ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতো। তাবুক যুদ্ধের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ এলাকা অতিক্রম করছিলেন তখন তিনি মুসলমানদেরকে এ শিক্ষানীয় নিদর্শনগুলো দেখান এবং এমন শিক্ষা দান করেন যা এ ধরনের ধ্বংসাবশেষে থেকে একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।এ জায়গায় তিনি একটি কুয়ার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলেন, এ কুয়াটি থেকে হযরত সালেহের উটনী পানি পান করতো। তিনি মুসলমানদেরকে একমাত্র এ কুয়াটি থেকে পানি পান করতে বলেন এবং অন্য সমস্ত কুয়া থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেন। একটি গিরিপথ দেখিয়ে তিনি বলেন, এ গিরিপথ দিয়ে হযরত সালেহের উটনীটি পানি পান করতে আসতো।তাই সেই স্থানটি আজো ফাজ্জুন নাকাহ বা উটনীর পথ নামে খ্যাত হয়ে আছে। তাদের ধ্বংসস্তুপগুলোর মধ্যে যেসব মুসলমান ঘোরাফেরা করছিল তাদেরকে একত্র করে তিনি একটি ভাষণ দেন। এ ভাষণে সামুদ জাতির ভয়াবহ পরিণাম তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, এটি এমন একটি জাতির এলাকা যাদের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিল।

২২০. আবু নায়ীম, মাওলানা, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ১৯৯৯, পৃ. ৫৯
২২১. আল-কুর'আন, ৭: ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই এ স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করে চলে যাও। এটা ভ্রমনের জায়গা নয় বরং কান্নার জায়গা।[২২২]

আয়াতটির আপাত বক্তব্য দৃষ্টি পরিস্কার অনুভূত হয় যে, পূর্বের বাক্যটিতে আল্লাহর যে সুস্পষ্ট প্রমাণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা এ পরবর্তী বাক্যটিতে নিদর্শন, হিসেবে উল্লেখিত উটনীটিই বুঝানো হয়েছে। সূরা শুআরার ৮ রুকূতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, সামুদ জাতির লোকেরা নিজেরাই হযরত সালেহের কাছে এমন একটি নিদর্শনের দাবী করেছিল যা তাঁর আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্তির দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এরি জবাবে হযরত সালেহ উটনীটি হাজির করেন। এ থেকে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমানিত হয় যে, উটনীর আবির্ভাব হয়েছিল মুজিযা হিসেবে এবং কোন কোন নবী তাঁদের নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দাবীর জবাবে যেসব মুজিযা পেশ করেছিলেন এটি ছিল সেই ধরনেরই একটি মুজিযা।তাছাড়া হযরত সালেহ এই উটনীটি হাজির করার পর যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাও এর অলৌকিক জন্মের প্রমাণ। তিনি নবুওয়াত অস্বীকারকারীদেরকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, এখন এ উটনীটির প্রাণের সাথে তোমাদের জীবন জড়িত হয়ে গেছে। উটনীটি স্বাধীনভাবে তোমাদের ক্ষেতে চরে বেড়াবে।একদিন সে একাই পানি পান করবে এবং অন্যদিন সমগ্রজাতির যত পশু আছে সবাই পানি পান করবে।

আর যদি তোমরা তার গায়ে কোনভাবে হাত উঠাও তাহলে অকস্মাত তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে। বলা বাহুল্য যে জিনিসটির অস্বাভাবিকতা লোকেরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল একমাত্র সেই জিনিসটি সম্পর্কেই এভাবে কথা বলা সম্ভব।উপরন্তু এ কথাও প্রনিধানযোগ্য যে, দীর্ঘদিন ধরে সামুদ জাতির লোকেরা তার স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানো এবং একদিন তার একাকী পানি পান করা অন্যদিন সমগ্র জাতির সমস্ত পশুদের পানি পান করার বিষয়টি অনিচ্ছা সত্বেও বরদাশত করে এসেছে। অবশেষে অনেক শলা-পরামর্শ ও ষড়যন্ত্রের পর তারা তাকে হত্যা করে। অথচ তাদের হযরত সালেহকে ভয় করার কিছুই ছিল না। কারণ তাঁর কোন ক্ষমতা বা প্রতাপ ছিল না। এ অকাট্য ও জ্বলন্ত সত্য দ্বারা আরো প্রমাণিত হচ্ছে যে, তারা এ উটনীর ভয়ে ভীত -সন্ত্রস্ত ছিল। তারা জানতো, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন শক্তি আছে, তারই জোরে সে তাদের মধ্যে দোর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে বেড়ায়। উটনীটি কেমন ছিল এবং কিভাবে জন্ম লাভ করলো,তার কোন বর্ণনা কুর'আন দেয়নি। কোন নিভুরযোগ্য সহীহ, হাদীসেও এর বিস্তারিত কোন বিবরণ নেই । তাই এ উটনীটির জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে যেসব বর্ণনা মুফাসসিরগণ উদ্ধৃত করেছেন তা মেনে নেয়া অপরিহার্য নয়। কিন্তু এর জন্ম যে, কোন না কোনভাবে মুজিযা ও অলৌকিক ঘটনার পর্যায়ভুক্ত তা অবশ্যি কুর'আন থেকে প্রমাণিত।[২২৩]

ছামূদ জাতির আবাস

আল-মাসউদী বলেন, শাম (সিরিয়া) ও হিজাযের মধ্যবর্তী স্থান হইতে কৃষ্ণ সাগর উপকূলবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত স্থান ছামূদ ইবন আবিরের অধিকৃত ছিল। তাদের গৃহাদি ছিল ফাদলুন-নাকা নামক স্থানে। গৃহগুলির চিহ্ন পাহাড়ে খোদাইকৃত অবস্থায় এখনও বিদ্যমান রয়েছে; সিরিয়া হতে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলে পথিমধ্যে ওয়াদিল কুরার নিকটবর্তী স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন অট্টালিকা পরিলক্ষিত হয় ।

---

২২২. আবু নায়ীম, মাওলানা, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ১৯৯৯, পৃ. ৬১
২২৩. আবু নায়ীম, মাওলানা, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

ইবন জারীর তাবারী (র) ইবনে ইসহাক সূত্রে বলেন, ছামূদ সম্প্রদানের গৃহাদি ছিল হিজরের মরুভূমি অঞ্চলে। এই মরুময় স্থানটির নাম হইল ওয়াদিল কুরা। উহা হিজায ও শামের মধ্যবর্তী স্থানে আঠার মাইল বিস্তৃত।[২২৪] আল্লাহ কুরতুবী বলেন, কাতাদা বলেছেন, ছামূদ সম্প্রদায়ের আবাসভূমি ছিল মক্কা ও ও তাবূকের মধ্যবর্তী স্থানে।[২২৫] মাওলানা আবু আলা মাওদূদী তার তাফহীমুল কুর'আন গ্রন্থে বলেন, ছামূদ সম্প্রদায়ের আবাস ছিল উত্তর-পশ্চিম আরবের হিজর নাম এলাকায়। বর্তমানে মদীনা তায়্যিবা ও তাবূকের মধ্যস্থিত হিজায রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে ইহা অবস্থিত। এখানেই ছামূদের কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন কালে ইহাকে আল-হিজর বলা হইত। এই নীরব নগরীটি দেখে মনে হয় কোন সময়ই এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা চার হইতে পাঁচ লক্ষের কম ছিল না।

কুর'আন্‌র করীম অবতরণকালে হিজাযের বাণিজ্যিক কাফেলা এই স্থান দিয়া যাতায়াত করত। তিনি আরও বলেন, ওয়াদিল কুরার আধুনিক নাম হইল আলা-উলা। এই প্রসিদ্ধ স্থান হতে কয়েক মাইল দূরে মদীনা তায়্যিবা ও তাবূকের মধ্যবর্তী স্থানে উত্তর দিকে ছামূদ জাতির আবাস ছিল। এখনও সেখানকার অধিবাসিগণ এই স্থানটিকে আল-হিজর বা মাদাইন সালিহ বলিয়া স্মরণ করে । ডঃ জাওয়াদ আলী নুওয়ায়রী রচিত 'নিহায়াতুল আরাব' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়া তিনি বলে, কবি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদ জাতিকে ধ্বংস করবার পর ছামূদ জাতি উহাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। আদ গোত্রের আবাসভূমি আবাদ করে তারা সেখানে বসবাস করতে লাগল। ছামূদরা ছিল দশাধিক গোত্রে বিভক্ত।[২২৬]

আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার বলেন, আমার কোন এক সঙ্গী ছামূদ জাতির আবাস ভূমিতে ভ্রমণ করে তাদের রাজকীয় প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, প্রাসাদটি বিশাল আকৃতির। ইহা খোদাইকৃত প্রস্তর নির্মিত।[২২৭]

হাদরামাওতবাসীরা দাবি করে যে, ছামূদ জাতির আবাস ও গৃহাদি আদ জাতির শিল্পকর্মেরই ফসল হয়েছে। তাদের এই দাবি এই কথার পরিপন্থী নয় যে, ছামূদ সম্প্রদায় স্থাপত্য শিল্পে খুবই পারদর্শী ছিল এবং প্রাসাদসমূহ তাদের নিজেদেরই নির্মিত। এইজন্য যে, প্রথম আদ জাতি ও দ্বিতীয় আদ জাতি প্রকৃতপক্ষে সম্প্রদায়ভূক্ত। সালিহ (আ) কর্তৃক স্বীয় উম্মতকে নিম্নোক্ত আহবান ইহার সমর্থক-

"স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ।"[২২৮, ২২৯]

---

২২৪. তাবারী, তাফসীর, প্রাগুক্ত, ৮খ., ১৫৯
২২৫. কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১০খ., ৪৬
২২৬. ডঃ জাওয়াদ আলী, আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আরাব কাবলাল ইসলাম, পাদটীকা, ১খ., পৃ. ৩২৪
২২৭. আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল-আম্বিয়া, দারুল-ফিকর, বৈরূত তা. বি. পৃ. ৫৮;)
২২৮. ৭ ঃ ৭৪
২২৯. হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুর'আন , করাচী, ১৪০০ হি., ১খ., ১২৪; আবদুল ওয়াহবাহ, আন-নাজজার, কাসাসুল আম্বিয়া, বৈরূত তা. বি., পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

আদ জাতির সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল, তারা উচু উচু স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারত নির্মান করতো। ঠিক তেমনি সামুদ জাতির সভ্যতা তার চেয়ে যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টের জন্য প্রাচীনকালের জাতিসমূহের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তা ছিল এই যে, তারা পাহাড় কেটে তার মধ্যে ইমারত নির্মাণ করতো। তাই সূরা আল ফজরে যেভাবে আদকে 'যাতুল ইমাদ' (ذات العماد) বলে অর্থাৎ স্তম্ভের অধিকারী পদবী দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি সামুদ জাতির বর্ণনা একথার মাধ্যমে করা হয়েছে-

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ -

"এমন সব লোক যার উপত্যাকায় পাহাড় কেটেছে।"[২৩০]

এ ছাড়া কুর'আনে একথাও বলা হয়েছে যে, তারা নিজেদের দেশের সমতল ভূমিতে বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করতো-

- سُهُولِهَا مِن تَتَّخِذُونَ قُصُورًا

এসব গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল? فرهين শব্দের মাধ্যমে কুর'আন-এর ওপর আলোকপাত করে। অর্থাৎ এসব কিছু ছিল তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব, সম্পদ, শক্তি ও প্রযুক্তির নৈপুন্যের প্রদর্শনী। কোন যথার্থ প্রয়োজনের তাগিদ এর পেছনে কার্যকর ছিল না। একটি বিকৃত ও ভ্রষ্ট সভ্যতার ধরণ এমনিই হয়ে থাকে। একদিকে সমাজের গরীব লোকেরা মাথা গোঁজারও ঠাঁই পায় না আর অন্যদিকে ধনী নেতৃস্থানীয় লোকেরা থাকার জন্য যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করে ফেলে তখন প্রয়োজন ছাড়াই নিছক লোক দেখাবার জন্য স্মৃতিস্তম্ভসমূহ নির্মাণ করতে থাকে।

সামুদ জাতির এ ইমারতগুলোর কিছু সংখ্যক এখনো টিকে আছে। এ জায়গাটি মদীনা তাইয়্যেবা ও তাবুকের মধ্যবর্তী হিজাযের বিখ্যাত আল'উলা নামক স্থান, (যাকে নবীর জামানায় 'ওয়াদিউল কুরা' বলা হতো) থেকে কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা আজও এ জায়গাকে 'আল হিজর' ও 'মাদ্য়ানে সালেহ' নামে স্মরণ করে থাকে। এ এলাকায় 'আল উলা' এখনো একটি শস্য শ্যামল উপত্যকা। এখানে রয়েছে বিপুল সংখ্যক পানির নহর ও বাগিচা। কিন্তু আজ হিজরের আশেপাশে বড়ই নির্জন ও ভীতিকর পরিবেশ বিরাজমান। লোকবসতি নামমাত্র। সবুজের উপস্থিতি ক্ষীণ। কূয়া আছে কয়েকটি। এরই মধ্যে একটি কূয়ার ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের মধ্যে একথা প্রচলিত আছে যে, হযরত সালেহ (আ)-এর উটনী সেখান থেকে পানি পান করতো। বর্তমানে এটি তুর্কী আমলের একটি বিরান ক্ষুদ্র সামরিক চৌকির মধ্যে অবস্থিত। কূয়াটি একবারেই শুকনা। (এর ছবিও পাশের পাতায় দেখানো হয়েছে)। এ এলাকায় প্রবেশ করে আল উলা'র কাছাকাছি পৌঁছুতেই আমরা সর্বত্র এমনসব পাহাড় দেখলাম যা একেবারেই ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পরিষ্কার মনে হচ্ছিল, কোন ভয়াবহ ভূমিকম্প এগুলোকে নীচে থেকে উপর পর্যন্ত ঝাঁকানি দিয়ে ফালি ফালি করে দিয়ে গেছে। (এ পাহাড়গুলোরও কিছু ছবি পাশের পাতাগুলোয় দেয়া হয়েছে)। এ ধরণের পাহাড় আমরা দেখতে দেখতে গিয়েছি পূর্বের দিকে আল'উলা থেকে খায়বার যাবার সময় প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে জর্ডানে রাজ্যের সীমানার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত। এর অর্থ দাঁড়ায়, তিন চারশো মাইল দীর্ঘ ও একশো মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট একটি এলাকা ভূমিকম্পে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আল হিজরে আমরা সামুদ জাতির যেসব ইমারত দেখেছিলাম ঠিক একই ধরণের কতিপয় ইমারত আমরা পেলাম আকাবা উপসাগরের কিনারে মাদ্য়ানে এবং জর্ডান রাজ্যের পেট্রা (PETRA) নামক স্থানেও।

---

২৩০. আল-কুর'আন, ৮৯ঃ ০৯

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে পেট্টায় সামূদী প্যাটান্ত্রে ইমারত এবং নিবতীদের তৈরী করা অট্টালিকা পাশাপাশি দেখা গেছে। এগুলোর কারুকাজ ও নির্মাণ পদ্ধতিতে এত সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক নজর দেখার সাথে সাথেই বুঝতে পারবে এগুলো এক যুগেরও নয় এবং একই জাতির স্থাপত্যের নিদর্শনও নয়। এগুলোরও আলাদা আলাদা ছবি আমি পাশের পৃষ্ঠায় দিয়েছি। ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ডটি (Daughty) কুর'আনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আল হিজরের ইমারত সম্পর্কে দাবী করেছেন, এগুলো সামূদের নির্মিত নয় বরং নিবতীদের তৈরী ইমারত। কিন্তু উভয় জাতির স্থাপত্য পদ্ধতির মধ্যে বিস্তর ও সুস্পষ্ট ফারাক দেখা যায়। ফলে কেবলমাত্র একজন অন্ধই এগুলোকে একই জাতির নির্মিত বলে দাবী করতে পারে। আমার অনুমান, পাহাড় কেটে তার মধ্যে গৃহ নির্মাণ কৌশল সামূদই উদ্ভাবন করে এবং এর হাজার হাজার বছর পরে নিবতীরা খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে একে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়ে দেয়। অতপর ইলোরায় (পেট্টার প্রায় সাতশো বছর পরে নির্মিত গূহা) এ শিল্পটির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।[২৩১]

---

২৩১. আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল-আম্বিয়া, দারুল-ফিকর, বৈরূত তা. বি. পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

মারইয়াম (আ) ও হযরত ঈসা (আ)- এর আশ্রয়স্থল

মারইয়াম (আ) ও হযরত ঈসা (আ)- এর আশ্রয়স্থল সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

(وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ) -

"আমি মারইয়ামের পুত্রকে ও তাঁর মাতাকে করেছিলাম বড় নিদর্শন এবং আমি তাদের উভয়কে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক সুউচ্চ প্রস্রবণ বিশিষ্ট নিরাপদ ভূমিতে।"[২৩২]

বিভিন্ন জন এ থেকে বিভিন্ন স্থানের কথা মনে করেছেন। কেউ বলেন, এ স্থানটি ছিল দামেশ্ক। কেউ বলেন, আররম্লাহ। কেউ বলেন, বাইতুল মাক্দিস আবার কেউ বলেন মিশর। খৃষ্টীয় বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মা রইয়াম ঈসার জন্মের পর তাঁর হেফাজতের জন্য দু'বার স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রথমবার বাদশাহ হিরোডিয়াসের আমলে তিনি তাকে মিসরে নিয়ে যান এবং বাদশাহর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তারপর আর্খিলাউসের শাসনামলে তাঁকে গালীলের নাসেরাহ শহরে আশ্রয় নিতে হয়।[২৩৩] এখন কুর'আন কোন্ স্থানটির প্রতি ইংগিত করছে তা নিশ্চয়তা সহকারে বলা কঠিন। আভিধানিক অর্থে "রাবওয়াহ" এমন সুউচ্চ ভূমিকে বলা হয় যা সমতল এবং আশপাশের এলাকা থেকে উঁচু। অন্যদিক "যা-তি কারার" (ذَاتِ قَرَارٍ) মানে হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী পাওয়া যায় এবং অবস্থানকারী সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করতে পারে। আর "মাঈন" (مَعِينٍ)মানে হচ্ছে বহমান পানি বা নির্ঝরিণী।[২৩৪]

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا) -

"আর এ কিতাবে বর্ণনা করুন মারইয়ামের কথা, যখন সে নিজ পরিবারের লোকদের থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একটি নির্জন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিল।"[২৩৫]

فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا - فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا - وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا -

অবশেষে প্রসব - বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল ঃ হায়! এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম এবং মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম! পরক্ষণে ফেরেশতা তার নিম্নদিক থেকে তাকে ডেকে বলল- আপনি চিন্তিত হবেন না, আপনার রব আপনার নিম্ন দিকে একটি ঝরনা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর আপনি ঐ খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দিন তাতে আপনার কাছে টাটকা পাকা খেজুর ঝরে পড়বে।[২৩৬]

---

২৩২. আল-কুর'আন, ২৩ঃ ৫০

২৩৩. মথি ২: ১৩ থেকে ২৩

২৩৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ৯১৭

২৩৫. আল-কুর'আন, ১৯ঃ ১৬

২৩৬. আল-কুর'আন, ১৯ঃ ২৩ - ২৫

Dhaka University Institutional Repository

- (فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا)

"মারয়াম এ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করলো এবং এ গর্ভসহ একটি দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো।"[২৩৭]

দূরবর্তী স্থান মানে বাইতুল লাহ্ম। ই'তিকাফ থেকে উঠে সেখানে যাওয়া হযরত মারয়ামের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। বনী ইসরাঈলের পবিত্রতম ঘরানা হারুন গোত্রের মেয়ে, যিনি আবার বাইতুল মাকদিসে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য উৎসর্গিত হয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ গর্ভধারণ করলেন। এ অবস্থায় যদি তিনি নিজের ই'তিকাফের জায়গায় বসে থাকতেন এবং লোকেরা তাঁর গর্ভধারণের কথা জানতে পারতো, তাহলে শুধুমাত্র পরিবরের লোকেরাই নয়, সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরাও তাঁর জীবন ধারণ কঠিন করে দিতো। তাই তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবার পর নীরবে নিজের ইতিকাফ কক্ষত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে পড়লেন। যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের তিরস্কার, নিন্দাবাদ ও ব্যাপক দুর্ণাম থেকে রক্ষা পান। হযরত ঈসা (আ)- এর জন্ম যে পিতা ছাড়াই হয়েছিল এ ঘটনাটি নিজেই তার একটি বিরাট প্রমাণ। যদি তিনি বিবাহিতা হতেন এবং স্বামীর ঔরসে তাঁর সন্তান জন্মলাভের ব্যাপার হতো তাহলে তো সন্তান প্রসবের জন্য তাঁর শ্বশুরালয়ে বা পিতৃগৃহে না গিয়ে একাকী একটি দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার কোন কারণই ছিল না।[২৩৮]

---

২৩৭. আল-কুর'আন, ১৯ঃ ২২

২৩৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩ হি., পৃ. ৮৩২

Dhaka University Institutional Repository

ফিলিস্তিনের বুহায়রা লূত নামক স্থান

'আদনাল আরদি' অর্থ নিকটতম বা নীচু ভূমি। পবিত্র কুরআনে 'আদনাল আরদি' বলতে বর্তমান ফিলিস্তিনের 'বুহায়রা লূত' নিকটবর্তী "গোর" নামক স্থানকে বুঝানো হয়েছে। কেননা সাগর সামন্তরাল হতে উক্ত এলাকা ৩৯২ মিটার নীচু।[২৩৯]

ফিলিস্তিনের বুহায়রা লূত সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

(غُلِبَتِ الرُّوْمُ) (فِيْۤ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ)

"রোমানরা নিকটবর্তী দেশে পরাজিত হয়েছে এবং নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয় লাভ করবে।"[২৪০]

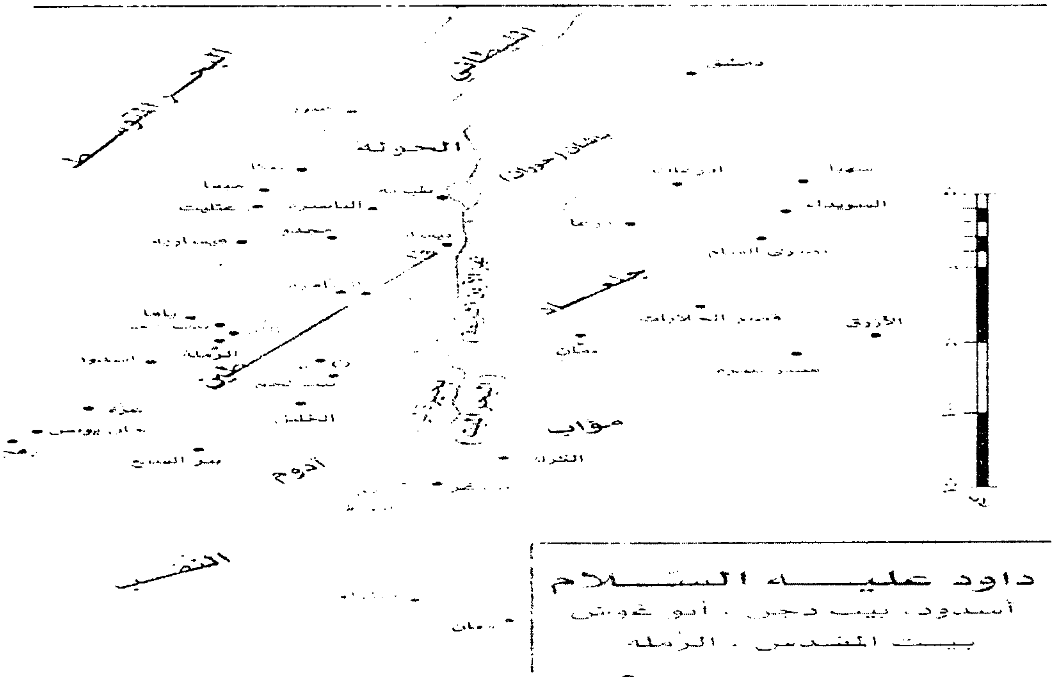

'বুহায়রা লূত' এর মানচিত্র

২৩৯. তাফসীরে মুনির ২১/৪২
২৪০. আল-কুর'আন, ৩০ঃ ২-৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন মসজিদ

পবিত্র কুর'আনে উল্লেখিত জনপদসমূহের মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত মসজিদের কথা উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেশ করছি।

আল-মাসজিদুল হারাম

পবিত্র কুর'আনে কা'বা শরীফকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- প্রাচীন ঘর, পবিত্র ঘর, ঘর, হাজ্জের ঘর, বাইতুল হারাম এবং আল-মাসজিদুল হারাম ।

আল-মাসজিদুল হারাম সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

ঘর

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ -

"আর স্মরণ করো তখনকার কথা যখন আমি এই গৃহকে (কা'বা) লোকদের জন্য কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল গণ্য করেছিলাম এবং ইবরাহীম যেখানে ইবাদাত করার জন্য দাঁড়ায় সে স্থানটিকে স্থায়ীভাবে নামাযের স্থানে পরিণত করার হুকুম দিয়েছিলাম। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকীদ করে বলেছিলাম, আমার এই গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূ'-সিজদাকারীদের জন্য পাক-পবিত্র রাখো।"[১]

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

"স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত নির্মাণ করছিল তখন তারা দোয়া করেছিল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এ প্রয়াস কবুল কর! নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।"[২]

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ -

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া হল আল্লাহর নিদর্শনসমুহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে কেউ কা'বাঘরের হজ্জ বা উমরা পালন করে তার পক্ষে এ দু'টির মধ্যে প্রদক্ষিণ করাতে কোন পাপ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফুর্তভাবে কোন নেক কাজ করলে আল্লাহ তার পুরস্কার দেবেন, তিনি সর্বজ্ঞ।"[৩]

---

১. আল-কুর'আন, ২ঃ ১২৫
২. আল-কুর'আন, ২ঃ ১২৭
৩. আল-কুর'আন, ২ঃ ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)
"যখন আমি ইবরাহীমকে কাবাগৃহের স্হান নির্ধারণ করে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কোন কিছু শরীক কর না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাওয়াফকারীদের জন্য, নামাযে দণ্ডায়মান লোকদের জন্য, রুকুকারী ও সিজদাকারীদের জন্য।"[৪]

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ -
"নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম যে ঘর মানুষের জন্য স্হাপিত হয়েছিল তা তো সে ঘর যা মক্কায় অবস্হিত, যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত।"[৫]

ইহুদীদের আপত্তি ছিল এই- মুসলমানেরা বাইতুল মাকদিসকে বাদ দিয়ে কাবাকে কিবলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে কেন? অথচ এ বাইতুল মাকদিসই ছিল পূর্ববর্তী নবীদের কিবলাহ। সূরা বাকারায় এ আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইহুদীরা এরপর ও নিজেদের আপত্তির ওপর জোর দিয়ে আসছিল। তাই এখানে আবার এর জবাব দেয়া হয়েছে। বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে বাইবেল নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হযরত মূসা (আ) সাড়ে চারশো বছর পর হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এটি নির্মাণ করেছিলেন।[৬]

আর হযরত সুলাইমান (আ)- এর আমলেই এটি তাওহীদবাদীদের কিবলা গণ্য হয়।[৭] বিপরীত পক্ষে সমগ্র আরববাসীর একযোগে সুদীর্ঘকালীন ধারাবাহিক বর্ণনায় একথা প্রমাণিত যে, কাবা নির্মাণ করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)। তিনি হযরত মূসা (আ)- এর আট-নয়শ বছর আগে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কাজেই কাবার অগ্রবর্তী অবস্থান ও নির্মাণ সন্দেহাতীতভাবে সত্য।

(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ)
"কাজেই তাদের এই ঘরের রবের ইবাদাত করা উচিত।"[৮]

(وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ)
"বায়তুল্লাহর কাছে তারা কি নামায পড়ে! তারা তো শুধু সিটি দেয় ও তালি বজায়। কাজেই তোমরা যে সত্য অস্বীকার করে আসছিলে তার প্রতিদানে এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।"[৯]

আরববসীদের মনে ভুল ধারণা প্রচ্ছন্ন ছিল এবং সাধারণ আরববাসীরা যার ফলে প্রতারিত হচ্ছিল এখানে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। তারা মনে করতো, কুরাইশরা যেহেতু বাইতুল্লাহর খাদেম ও মুতাওয়াল্লী এবং সেখানে ইবাদত করে তাই তাদের ওপর রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ। এ ধারণাটি প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র উত্তরাধিকার সুত্রে খাদেম ও মুতাওয়াল্লির দায়িত্ব লাভ করলে কোন ব্যক্তি বা দল কোন ইবাদত গৃহের বৈধ খাদেম ও মুতাওয়াল্লী হতে পারে না। একমাত্র যারা মুত্তাকী আল্লাহকে ভয় করে তারাই ইবাদত গৃহের বৈধ মুতাওয়াল্লী হতে পারে।

---

৪. আল-কুর'আন, ২২ঃ ২৬
৫. আল-কুর'আন, ৩ঃ ৯৬
৬. প্রাগুক্ত, ১-রাজাবলী, ৬:১
৭. প্রাগুক্ত, ১-রাজাবলী, ৮:২৯-৩০
৮. আল-কুর'আন, ১০৬ঃ ৩
৯. আল-কুর'আন, ৮ঃ ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

আর এদের অবস্থা হচ্ছে, যে গৃহটিকে শুধুমাত্র এবং নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে নির্ধারিত করা হয়েছিল সেখানে এরা এমন এক দল লোককে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে যারা নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদতকারী। এভাবে এরা মুতাওয়াল্লী ও খাদেমের দায়িত্ব পালন করার পরিবর্তেএ ইবাদত গৃহের মালিক হয়ে বসেছে। এখন এরা যার ওপর নারায হবে তাকে এ ইবাদত গৃহে আসতে দেবে না। এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে এরা নিজেদেরকে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করছে। এ ধরণের পদক্ষেপ ও কার্যকলাপ এদের মুত্তাকী না হবার এবং আল্লাহকে ভয় না করার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর এরা বাইতুল্লাহে এসে যে ইবাদত করে তাতে না আছে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, না আছে আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠা এবং আল্লাহকে স্মরণ করার প্রবণতা। তারা একটা অর্থহীন হৈচৈ, শোরগোল ও ক্রীড়া-কৌতুক চালিয়ে যাচ্ছে। একে এরা নাম দিয়েছে ইবাদত। আল্লাহর গৃহের এ ধরনের নাম সর্বস্ব খিদমত এবং এ ধরনের মিথ্যা ইবাদতের ভিত্তিতে এরা কেমন করে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হয়ে গেলো। এ ধরনের কার্যকলাপ এদেরকে কেমন করে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ রাখতে পারে?[১০]

হাজ্জের ঘর

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ -

"এতে রয়েছে অনেক প্রকাশ্য নিদর্শন, 'মাকামে ইব্রাহীম' তার অন্যতম। যে কেউ এ ঘরে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে তার উপর আল্যহর জন্য এ ঘরের হজ্জ করা ফরয যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে। কিন্ত কেউ কুফরী করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ সারাজাহান থেকে বেনিয়াজ -অমুখাপেক্ষী।"[১১]

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ -

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া হল আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং যে কেউ কা'বাঘরের হজ্জ বা উমরা পালন করে তার পক্ষে এ দু'টির মধ্যে প্রদক্ষিণ করাতে কোন পাপ নেই । আর কেউ স্বতঃস্ফুর্তভাবে কোন নেক কাজ করলে আল্লাহ তার পুরস্কার দেবেন, তিনি সর্বজ্ঞ। "[১২]

আল-মাসজিদুল হারাম

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ -

বার বার আকাশের দিকে আপনার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি। কাজেই এমন কেবলার দিকে আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদ-উল-হারাম এর দিকে মুখ ফিরান। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেদিকে মুখ কর। আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এটাই তাদের পালনকর্তার প্রেরিত সত্য। আল্লাহ সে সম্বন্ধে বেখবর নন যা তারা করে।[১৩]

---

১০. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি. পৃ. ৪৫

১১. আল-কুর'আন, ৩ঃ ৯৭

১২. আল-কুর'আন, ২ঃ ১৫৮

১৩. আল-কুর'আন, ২ঃ ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, তোমার মুখ মসজিদ-উল-হারাম এর দিকে ফেরাও। নিশ্চয়ই এটা হল তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে অবধারিত সত্য। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ বেখবর নন।"[১৪]

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"এবং যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, তোমার মুখ মসজিদ-উল-হারাম দিকে ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেদিকেই মুখ ফেরাবে, যাতে মানুষের কোন অবকাশ না থাকে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করার, তাদের মধ্যে যারা জালিম তাদের কথা আলাদা । অতএব তাদের ভয় কর না , কেবল আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি আমার অনুগ্রহ পূর্ণরূপে তোমাদের দান করতে পারি এবং তোমরা সৎপথে পরিচালিত হতে পারে।"[১৫]

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ -

"আর তাদের এমন কি আছে যে জন্য আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন না, অথচ তারা মসজিদ-উল-হারাম যেতে বাধা প্রদান করে ? আর তারা সে মসজিদের তত্ত্বাবধায়কও নয়। তার তত্ত্বাবধায়ক তো মোত্তাকীরা ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্ত তাদের অধিকাংশই তা জানে না।"[১৬]

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ -

"কেমন করে আল্লাহর কাছে ও তাঁর রাসূলের কাছে মুশরিকদের চুক্তি কার্যকর থাকবে ? তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদ-উল-হারাম এর কাছে অঙ্গীকারা বদ্ধ হয়েছে, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মোত্তাকীদের ভাল বাসেন।"[১৭]

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ -

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদ-উল-হারাম এর রক্ষণাবেক্ষণকে ঐ ব্যক্তির আমলের সমান সাব্যস্ত করে নিয়েছ, যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি আর জেহাদ করেছে আল্লাহর পথে ? এরা আল্লাহর কাছে সমান নয়। আর আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন না জালিম কওমকে।"[১৮]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -

হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র । সতুরাং তারা যেন এ বছরের পর মসজিদ-উল-হারাম এর কাছে না আসে। তবে যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তাহলে আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা । (সুরা তওবা- ৯ঃ ২৮)

---

১৪. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৪৯

১৫. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৫০

১৬. আল-কুর'আন,৮ঃ ৩৪

১৭. আল-কুর'আন, ৯ঃ ৭

১৮. আল-কুর'আন, ৯ঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ
وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ
لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا -

"এরাই তো সেসব লোক যারা কুফরী করেছে, তোমাদেরকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা দিয়েছে এবং কুরবানীর উটসমূহকে কুরবানী গাহে পৌঁঠতে দেয়নি। যদি (মক্কায়) এমন নারী পুরুষ না থাকতো যাদেরকে তোমরা চিন না অজান্তে তাদেরকে পদদলিত করে ফেলবে এবং তাদের কারণে তোমরা বদনাম কুড়াবে এমন আশংকা না থাকতো (তাহলে যুদ্ধ থামানো হতো না । তা বন্ধ করা হয়েছে এ কারণে) যে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা যেন তাঁর রহমতের মধ্যে স্থান দেন। সেসব মু'মিন যদি আলাদা হয়ে যেতো তাহলে (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যারা কাফের ছিল আমি অবশ্যই তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতাম।"[১৯]

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ
لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا -

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন- যা ছিল সরাসরি হক। ইনশাআল্লাহ্ তোমরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। নিজেদের মাথা মুণ্ডন করবে, চুল কাটাবে এবং তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। তোমরা যা জানতে না তিনি তা জানতেন। তাই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করার পূর্বে তিনি তোমাদেরকে এ আসন্ন বিজয় দান করেছেন।"[২০]

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ -

"তাদের সাথে যেখানেই তোমাদের মোকাবিলা হয় তোমরা যুদ্ধ করো এবং তাদের উৎখাত করো সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে উৎখাত করেছে । কারণ হত্যা যদিও খারাপ, ফিতনা তার চেয়েও বেশী খারাপ । আর মসজিদে হারামের কাছে যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তোমরাও যুদ্ধ করো না । কিন্তু যদি তারা সেখানে যুদ্ধ করতে সংকোচবোধ না করে, তাহলে তোমরাও নিসংকোচে তাদেরকে হত্যা করো । কারণ এটাই এই ধরনের কাফেরদের যোগ্য শাস্তি ।"[২১]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ
إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

"লোকেরা তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে । বলে দাও- ঐ মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত খারাপ কাজ । কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা, আল্লাহর সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথ আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের জন্য বন্ধ করে দেয়া এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তার চাইতেও বেশী খারাপ কাজ । আর ফিত্না হত্যাকান্ডের চাইতেও গুরুতর অপরাধ । তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেই যাবে, এমন কি তাদের ক্ষমতায় কুলোলে তারা তোমাদেরকে এই দীন থেকেও ফিরিয়ে নিয়ে যাবে

১৯. আল-কুর'আন, ৪৮ঃ ২৫
২০. আল-কুর'আন, ৪৮ঃ ২৭
২১. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

(আর একথা খুব ভালোভাবেই জেনে রাখো), তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এই দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে উভয় স্থানে তার সমস্ত কর্মকান্ড ব্যর্থ হয়ে যাবে । এই ধরনের সমস্ত লোকই জাহান্নামের বাসিন্দা এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।"[২২]

এ বিষয়টি একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। নবী (স) দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখ্লা' নাম স্থানে আটজনের একটি বাহিনী পাঠান। কুরাইশদের গতিবিধি ও তাদের সংকল্প সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেন। যুদ্ধ করার কোন অনুমতি তাদেরকে দেননি। কিন্তু পথে তারা কুরাইশদের একটি ছোট বাণিজ্যিক কাফেলার মুখোমুখি হয়। কাফেলার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তারা একজনকে হত্যা করে এবং বাদবাকি সবাইকে গ্রেফতার করে অর্থ ও পণ্য সম্ভারসহ তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসে। তাদের এ পদক্ষেপটি এমন এক সময় গৃহীত হয় যখন রজব শেষ হয়ে শাবান মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ আক্রমণটি রজব মাসে (অর্থাৎ হারাম মাসে) সংঘটিত হয়েছিল কি না বা ব্যাপারটি সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

কিন্তু কুরাইশরাও পর্দান্তরালে তাদের সাথে যোগসাজশকারী ইহুদী ও মদীনার মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্দে প্রচারণা চালাবার জন্য এ ঘটনাটির কথা চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়াতে থাকে। তারা কঠিন আপত্তি জানিয়ে অপ্রচার করতে থাকে হাঁ, এরা বড়ই আল্লাওয়ালা হয়েছে। অথচ হারাম মাসেও রক্তপাত করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ আয়াতে তাদের এ আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। জবাব আর নির্যাস হচ্ছেঃ হারাম মাসে লড়াই করা নিসন্দেহে বড়ই গর্হিত কাজ। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা তাদের জন্য শোভা পায় না, যারা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কারণে তেরো বছর ধরে তাদের অসংখ্য ভাইয়ের ওপর যুলুম নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। তাদেরকে এমনভাবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করেছে যে, তারা স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারপর এখানেই তারা ক্ষান্ত হয়নি।

তাদের ঐ ভাইদের মসজিদে হারামে যাবার পথও বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ মসজিদে হারাম কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। গত দু'হাজার বছর থেকে কোন দিন কাউকে এ ঘরের যিয়ারতে বাধা দেয়া হয়নি। কাজেই এ ধরনের কলংকিত চরিত্রের অধিকারী জালেমরা কোন্ মুখে সামান্য একটি সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে এত বড় হৈচৈ করে বেড়াচ্ছে এবং আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করে চলছে? অথচ এ সংঘর্ষে নবীর অনুমতি ছাড়াই সবকিছু ঘটেছে। এ ঘটনাটিকে বড় জোর এভাবে বলা যেতে পারে, একট ইসলামী জামায়াতের কয়েকজন লোক একটি দায়িত্বহীন কাজ করে বসেছে।

এ প্রসংগে একথা মনে রাখা দরকার যে, এ তথ্য সংগ্রহাক বাহিনীটি বন্দী ও গনীমাতের মাল নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হবার সাথে সাথেই তিনি বলেন, আমি তো তোমাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেইনি। তাছাড়া তারা যে গনীমাতের মাল এনেছিল তা থেকে তিন বাইতুল মালের অংশ নিতেও অস্বীকৃতি জানান। তাদের এ লুণ্ঠন অবৈধ ছিল, এটি তারই প্রমাণ। সাধারণ মুসলমানরাও এ পদক্ষেপের কারণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট নিজেদের লোকদেরকে কাঠোরভাবে তিরস্কার করে। মদীনার একটি লোকও তাদের এ কাজের প্রশংসা করেনি।[২৩]

---

২২. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২১৭)

২৩. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী, *আত-তাফসীরুল-মাজহারী*, মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান: তা. বি., খ. ৩, পৃ. ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

বাইতুল হারাম

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ -

"ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা হালাল মনে কর না আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে, আর না পবিত্র মাসসমূহকে, আর না কোরবানীর জন্য হরমে প্রেরিত পশুকে, আর না সেসব পশু যার গলায় চিহ্ন পরান হয়েছে, আর না ঐ সব লোকেকে যারা বায়তুল হারামের দিকে যাচ্ছে স্বীয় রবের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় । তোমরা যখন ইহরাম মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। মাসজিদে হারামে তোমাদের প্রবেশে বাধা দেয়ার দরুন কোন কওমের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের কখনও সীমা লংঘনে প্ররোচিত না করে । তোমরা একে অন্যকে নেক কাজে এবং তাকওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে, কিন্তু পাপ কাজে ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য করবে না । আল্লাহকে ভয় কর । নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।"[২৪]

(جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) -

"আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন মহাসম্মানিত ঘর কা'বাকে, সম্মানিত মাসকে, কোরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুকে এবং গলায় মালা পরিহিত পশুকে। এর কারণ এই যে, তোমরা যেন জানতে পার যে, অবশ্যই আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে জমিনে, আর আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ ।"[২৫]

আরবে কাবা ঘরের মর্যাদা কেবলমাত্র একটি ইবাদতগৃহ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না বরং নিজের কেন্দ্রীয় অবস্থান ও পবিত্রতম ভাবমূর্তির কারণে এরই ওপর সারা দেশের অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক জীবনধারায় নির্ভরশীল ছিল । হজ্জ ও উমরাহর জন্য সারাদেশ কাবা ঘরের দিকে ধাবিত হতো । হজ্জ উপলক্ষে এ সম্মিলনের কারণে বিশৃংখল ও বিক্ষিপ্ত আরবদের মধ্যে একটি ঐক্য সূত্র সৃষ্টি হতো । বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের লোকেরা নিজেদের মধ্যে তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতো । কাব্য সম্মেলন ও কবিতা প্রতিযোগিতার ফলে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হতো । বাণিজ্যিক লেনদেনের ফলে সারাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ হতো । হারাম মাসগুলোর কারণে আরবরা বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় লাভ করতো শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য । এ সময় তাদের কাফেলা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে চলাফেরা করতো । কুরবানীর পশু ও বিচিত্র বর্ণের ঝলমলে মালা জড়ানো পশু দলের উপস্থিতিও তাদের এ চলাফেরায় বিরাট সাহায্য যোগাতো। কারণ মানত ও নযরানার আলামত হিসেবে যেসব পশুর গলায় ঝলমলে মালা শোভা পেতো তাদের দেখে ভক্তিতে আরবদের মাথা নত হয়ে আসতো । এ সময় কোন লুটেরা আরব গোত্র তাদের ওপর আক্রমণ চালাবার দুঃসাহস করতো না।[২৬]

---

২৪. আল-কুর'আন, ৫ঃ ২

২৫. আল-কুর'আন, ৫ঃ ৯৭

২৬. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী, *আত-তাফসীরুল-মাজহারী*, মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তানঃ তা. বি., খ. ২, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র ঘর

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

"হে আমাদের রব ! আমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে কতককে চাষাবাদহীন অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে আবাদ করেছি । হে আমাদের রব ! যেন তারা নামায কায়েম করে । সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং ফলাদি দিয়ে তাদের রুযীর ব্যবস্হা করুন, যাতে তারা শোকর করে ।"[২৭]

প্রাচীন ঘর

(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)

"তারপর তারা যেন দূর করে ফেলে নিজেদের শরীরের অপরিচ্ছন্নতা এবং নিজেদের মানত পূর্ণ করে ও প্রাচীন কাবাগৃহের তাওয়াফ করে।"[২৮]

(لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ)

"এসব চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিভিন্ন রকম উপকার রয়েছে ; অতঃপর এগুলোর কোরবানীর স্থান প্রাচীন করা গৃহের কাছে।"[২৯]

পরিচিতি

কাবা, কাবাঘর, কাবা শরীফ (আরবি: الكعبة al-Kabah; আ-ধ্ব-ব: ['k□'b□]) , আরও যে নামে পরিচিত al-Ka□batu l-Mušarrafah (الكعبة المشرفة), al-Baytu l-□Atīq (البيت العتيق "The Primordial House"), অথবা al-Baytu l-□arām (البيت الحرام "The Sacred House"), একটি বড় ঘন আকৃতির ইমারত, যা সৌদি আরবের মক্কা শহরের মসজিদ আল হারেম মসজিদের মধ্যখানে অবস্থিত। আসলে মসজিদটি কাবাকে ঘিরেই তৈরি করা হয়েছে।[৩০]

অবস্থান এবং বাস্তবিক কাঠামো

কাবা একটি বড় পাথরের কাজ করা কাঠামো যার আকৃতি প্রায় একটি ঘন এর মত। কাবা শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ মুকা'আব অর্থ ঘন থেকে। এটি কাছের মাক্কাহ পাহাড়ের গ্রানাইট দ্বারা তৈরি যা দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ২৫ সেঃমিঃ (১০ ইঞ্চি) মার্বেল পাথরের ভিত্তির উপর যা বাইরের দিকে ৩০সেঃমিঃ (১ ফুট) বাড়িয়ে আছে।[৩১] কাঠামোতে জায়গার পরিমাণ প্রায় ১৩.১০ মিঃ (৪৩ ফুট) উচ্চতা, পাশাপাশি ১১.০৩ মিঃ ঢ ১২.৬২ মি.।[৩২]

---

২৭. আল-কুর'আন, ১৪ঃ ৩৭

২৮. আল-কুর'আন, ২২ঃ ২৯

২৯. আল-কুর'আন, ২২ঃ ৩৩

৩০. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি. পৃ. ৪৬

৩১. Wensinck, A. J; Ka`ba. Encyclopaedia of Islam IV p. 317

৩২. Andrew Peterson, *Dictionary of Islamic Architecture*. প্রকাশক: Routledge, London : 1996) (G.R Hawting, *Ka`ba. Encyclopaedia of the Qur'an* PP. 76

Dhaka University Institutional Repository

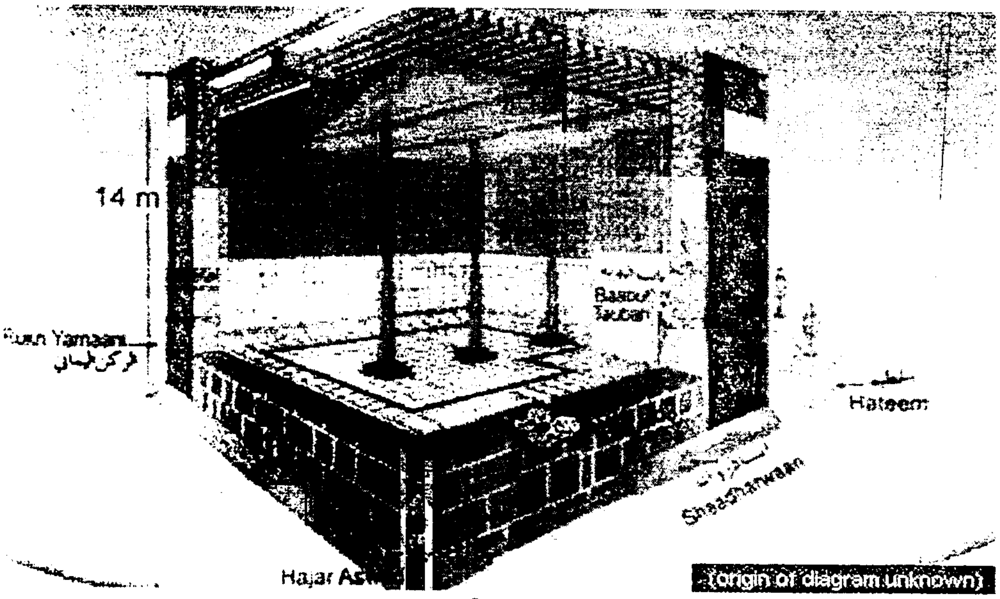

কা'বা ঘরের ভিতরের অংশ

চারটি কোন কম্পাসের প্রায় চার বিন্দু বরাবর মুখ করা। কাবার পূর্ব কোনা হচ্ছে রুকন-আল- আসওয়াদ" (কাল পাথর অথবা "আল-হাজারুল-আসওয়াদ"), একটি উল্কাপিন্ডের অবশেষ; উত্তর কোনা হল "রুকন-আল-ইরাকী" (ইরাকী কোণ); পশ্চিমে রয়েছে "রুকন-আল-সামী" (পূর্ব-ভূমধ্য সাগরীয় কোণ) এবং দক্ষিণে "রুকন-আল-ইয়ামানী" ('ইয়েমেনী কোণ')।[৩৩]

কাবা কালো সিল্কের উপরে স্বর্ণ-খচিত ক্যালিগ্রাফি করা কাপড়ের গিলাফে আবৃত থাকে। কাপড়টি কিসওয়াহ্ নামে পরিচিত; যা প্রতিবছর পরিবর্তন করা হয়।[৩৪]

কালেমা সাহাদাত এ কাপড়ের মধ্যে সুতা দিয়ে লিখার কাঠামো তৈরি করা হয়। এর দুই তৃতীয়াংশ কুর'আনের বাণী স্বর্ণ দিয়ে এম্রোয়ডারি করা হয়।[৩৫]

---

৩৩. A. J Wensinck, Ka'ba. *Encyclopaedia of Islam,* IV PP. 317

৩৪. 'House of God' Kaaba gets new cloth প্রকাশক: The Age Company Ltd.। ২০০৩। সংগৃহীত হয়েছে: ২০০৬-০৮-১৭

৩৫. The Kiswa, Kaaba Covering, প্রকাশক: Al-Islaah Publications, সংগৃহীত হয়েছে: ২০০৬-০৮-১৭

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র

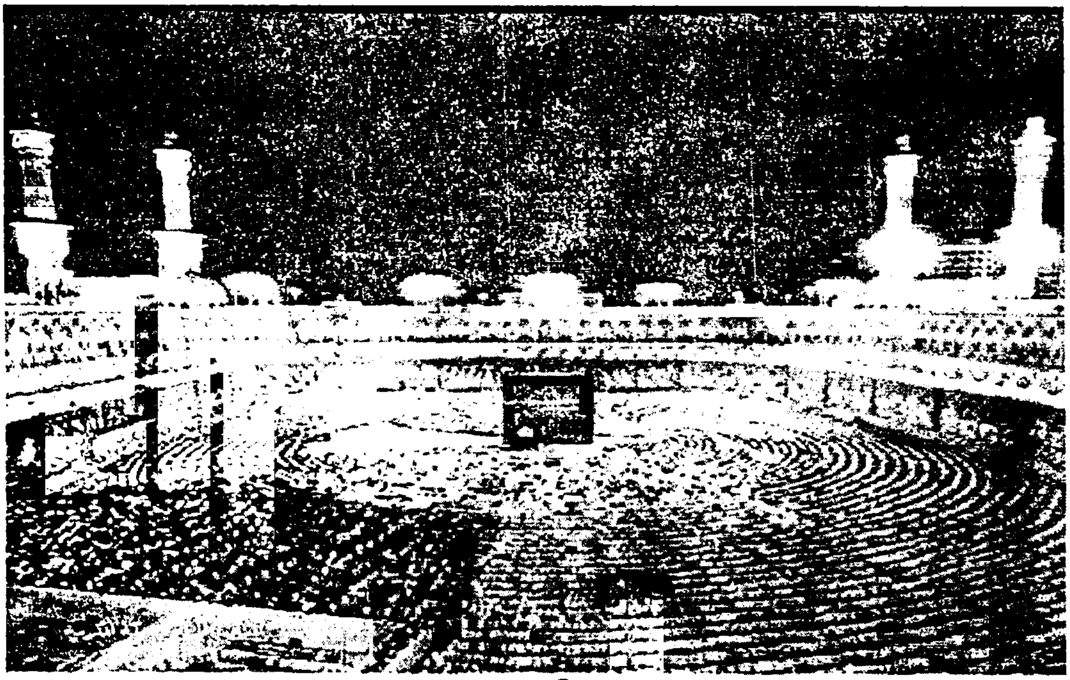

কাবা শরীফ

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

কিব্লাহ্ পরিবর্তন সম্পর্কিত এটি ছিল মূল নির্দেশ। এ নির্দেশটি ২য় হিজরীর রজব বা শাবান মাসে নাযিল হয়। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, নবী (স) একটি দাওয়াত উপলক্ষে বিশর ইবনে বারাআ ইবনে মা'রুর-এর গৃহে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেখানে নামাযে লোকদের ইমামতি করতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুই রাকাত পড়া হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় রাকাতে হঠাৎ অহীর মাধ্যমে এ আয়াতটি নাযিল হলো। সংগে সংগে তিনি ও তাঁর সংগে জামায়াতে শামিল সমস্ত লোক বাইতুল মাকদিসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন। এরপর মদীনায় ও মদীনার আশেপাশে এ নির্দেশটি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া হলো ।

বারাআ ইবনে আযিব বলেন, এক জায়গায় ঘোষকের কথা লোকদের কানে এমন অবস্থায় পৌছলো যখন তারা রুকূ' করছিল । নির্দেশ শোনার সাথে সাথে সবাই সেই অবস্থাতেই কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। আনাস ইবনে মালিক বলেন, এ খবরটি বনী সালমায় পৌছালো পরের দিন ফজরের নামাযের সময়। লোকেরা এক রাকায়াত নামায শেষ করেছিল এমন সময় তাদের কানে আওয়াজ পৌছলোঃ "সাবধান, কিব্লাহ্ বদলে গেছে। এখন কা'বার দিকে কিব্লাহ্ নির্দিষ্ট হয়েছে।" একথা শোনার সাথে সাথই সমগ্র জামায়াত কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। উল্লেখ করা যেতে পারে, বাইতুল মাকদিস মদীনা থেকে সোজা উত্তর দিকে। আর কা'বা হচ্ছে দক্ষিণ দিকে। আর নামাযের মধ্যে কিব্লাহ্ পরিবর্তন করার জন্য ইমামকে অবশ্যি মুকতাদিদের পেছন থেকে সামনের দিকে আসতে হয়েছে। অন্যদিকে মুকতাদিদের কেবলমাত্র দিক পরিবর্তন করতে হয়নি বরং তাদেরও কিছু কিছু চলাফেরা করে লাইন ঠিকঠাক করতে হয়েছে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়াতে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনাও এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আর আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'আমরা তোমাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি' এবং 'সেই কিব্লাহ দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি যাকে তুমি পছন্দ করো' এ থেকে পরিস্কার জানা যায়, কিব্লাহ পরিবর্তনের নির্দেশ আসার আগে থেকেই নবী (স) এ প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন, বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে বাইতুল মাকদিসের কেন্দ্রিয় মর্যাদা লাভেরও অবসান ঘটেছে। এখন আসল ইবরাহীমী কেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাবার সময় এসে গেছে ।

'মসজিদে হারাম' অর্থ সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন মসজিদ। এর অর্থ হচ্ছে, এমন ইবাদত গৃহ যার মধ্যস্থলে কা'বাগৃহ অবস্থিত ।

কা'বার দিকে মুখ করার অর্থ এ নয় যে , দুনিয়ার যে কোন জায়গা থেকে সোজা নাক বরাবর কা'বার দিকে ফিরে দাঁড়াতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক জায়গায় সবসময় এটা করা কঠিন । তাই কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সোজা কা'বা বরাবর মুখ করে দাঁড়াবার নির্দেশ দেয়া হয়নি । কুর'আনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যথাসম্ভব কা'বার নির্ভুল দিকনির্দেশ করার জন্য অনুসন্ধান আমাদের অবশ্যি চালাতে হবে। কিন্তু একেবারেই যথার্থ ও নির্ভুল দিক জেনে নেয়ার দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পণ করা হয়নি । সম্ভাব্য সকল উপায়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যে দিকটিতে কা'বার অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশী নিশ্চিত হতে পারি সেদিকে ফিরে নামায পড়াই নিসন্দেহে সঠিক পদ্ধতি । যদি কোথাও কিব্লার দিকনির্দেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে অথবা এমন অবস্থায় থাকা হয় যার ফলে কিব্লার দিকে মুখ করে থাকা সম্ভব না হয় (যেমন নৌকা বা রেলগাড়ীতে ভ্রমণ কালে) তাহলে এ অবস্থায় যে দিকটার কিব্লাহ হওয়া সম্পর্কে ধারণা হয় অথবা যেদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা সম্ভব হয়, সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়া যেতে পারে ।তবে, হাঁ , নামাযের মধ্যেই যদি কিব্লার সঠিক দিকনির্দেশনা জানা যায় অথবা সঠিক দিকে নামায পড়া সম্ভব হয়, তাহলে নামায পড়া অবস্থায়ই সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়া উচিত।[৩৬]

কিব্লাহ সম্পর্কে এর যত প্রকার বিতর্ক ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে, যুক্তির মাধ্যমে এদেরকে নিশ্চিত করে এর মীমাংসা করা সম্ভব নয়। কারণ এরা বিদ্বেষ পোষণ ও হঠধর্মিতায় লিপ্ত। কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে এদেরকে এদের কিব্লাহ থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। নিজেদের দল প্রীতি ও গোত্রীয় বিদ্বেষের কারণে এরা এই কিব্লার সাথে সংযুক্ত রয়েছে। আর তোমরা এদের কিব্লাহ গ্রহণ করেও এই ঝগড়ার মীমাংসা করতে পারবে না। কারণ এদের কিব্লাহ একটি নয়। এদের সমস্ত দল একমত এয় কোন একটি কিব্লাহ গ্রহণ করেনি, যেটি গ্রহণ করে নিলে সব ঝগড়া চুকে যেতে পারে। এদের বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কিব্লাহ। একটি দলের কিব্লাহ গ্রহণ করে কেবলমাত্র তাদেরকেই সন্তুষ্ট করা যেতে পারে। অন্যদের সাথে ঝগড়া তখনো থেকে যাবে। আর সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে, নবী হিসেবে লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে থাকা এবং দেয়া নেয়ার নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে আপোষ করা তোমাদের দায়িত্ব নয়। তোমাদের কাজ হচ্ছে , আমি তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছি , সবকিছু থেকে বেপরোয়া হয়ে একমাত্র তারই ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। তা থেকে সরে গিয়ে কাউকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হলে নিজের নবুওয়াতের মর্যাদার প্রতি জুলুম করা হবে এবং দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে তোমাকে আমি যে নিয়ামত দান করেছি তার প্রতি হবে অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ।[৩৭]

---

৩৬. আল-কুরতুবী, *আল-জামি লিআহকামিল-কুর'আন* , দারু ইহ্য়াইত-তুরাছ আল আরাবী, বৈরূত : তা. বি., পৃ. ১৭৬

৩৭. আল-কুরতুবী, *আল-জামি লিআহকামিল-কুর'আন* , দারু ইহ্য়াইত-তুরাছ আল আরাবী, বৈরূত : তা. বি., পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

এটি আরবের একটি প্রচলিত প্রবাদ। যে জিনিসটিকে মানুষ নিশ্চিতভাবে জানে এবং যে সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ থাকে না তাকে এভাবে বলা হয়ে থাকে যথা: সে এ জিনিসটিকে এমনভাবে চেনে যেমন চেনে নিজের সন্তানদেরকে। অর্থাৎ নিজের ছেলে- মেয়েদেরকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে যেমন তার মধ্যে কোন প্রকার জড়তা ও সংশয়ের অবকাশ থাকে না, ঠিক তেমনি সব রকম সন্দেহের উর্ধে উঠে নিশ্চতভাবেই সে এই জিনিসটিকে জানে ও চেনে । ইহুদি ও খৃস্টান আলেমরা ভালোভাবেই এ সত্যটি জানতো যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা নির্মাণ করেছিলেন এবং বিপরীত পক্ষে এর ১৩ শত বছর পরে হযরত সুলাইমান (আ) এর হাতে বাইতুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং তাঁর আমলে এটি কিব্‌লাহ হিসেবে গণ্য হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাপারে তাদের মধ্যে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ ছিল না ।[৩৮]

ইবরাহীম (আ)-এর পুনঃ আগমন ও বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ

পূর্বে বর্ণিত আগমনের বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হবার পর ইবরাহীম (আ) পুনরায় (মক্কায়) আগমন করলেন। ইসমাঈল তখন যমযমের নিকটেই এটি গাছের নীচে তীর ঠিক করেছিলেন। পিতাকে দেখে তিনি তার নিকট গেলেন এবং দীর্ঘদিন পর সাক্ষাত হলে পিতা পুত্রের সহিতও পুত্র পিতার সহিত যেমন করে তেমনই করলেন (অর্থাৎ উভয়ে উভয়কে জড়িয়ে ধরলেন এবং কোলাকুলি করলেন)। অতঃপর তিনি বললেন, ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে যেই নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করুন। ইবরাহীম (আ) বললেন, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? তিনি বললেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব'। এক বর্ণনামতে ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে উক্ত কাজে সাহায্য করতে। ইসমাঈল উত্তর দিয়েছিলেন, তা হলে অবশ্যই আমি তা করব (তাবারী, তারীখ, ১খ, ১৩৩)। ইবরাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ আমাকে ঐখানে একটি গৃহ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি ইশারায় পার্শ্ববর্তী একটি উঁচু টিলা দেখায়ে দিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এই সময়ে তারা উভয়ে মিলে বায়তুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করলেন। ইসমাঈল (আ) পাথর এনে দিচ্ছিলেন, আর ইবরাহীম (আ) তা দ্বারা ভিত তৈরি করেছিলেন। এভাবে ভিত উঁচু হয়ে গেলে ইসমাঈল এই পাথরটি (মাকামে ইবরাহীম) নিয়ে আসলেন। অতঃপর উহা তাঁর জন্য রাখলেন। ইবরাহীম (আ) উহার উপর দাঁড়াইয়া বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করেছিলেন। আর ইসমাঈল পাথর এনে দিচ্ছিলেন ।[৩৯]

কা'বা গৃহের সংস্কার

তখন কা'বা গৃহের শুধু চারটি দেয়াল বিদ্যমান ছিল। তার ওপর কোনো ছাদ ছিল না।দেয়ালগুলোও বড়জোর মানুষের দৈর্ঘ্য সমান উঁচু ছিল।পরন্ত গৃহটি ছিল খুব নীচু জায়গায়। শহরের সমস্ত পানি গড়িয়ে সেদিকে যেতো।ফলে পানি প্রতিরোধ করার জন্যে বাঁধ দেয়া হতো। কিন্তু পানির চাপে বাঁধ বারবার ভেঙ্গে যেতো এবং গৃহ প্রাঙ্গনে পানি জমে উঠতো। এভাবে গৃহটি দিন দিন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল। তাই গৃহটি ভেঙ্গে ফেলে একটি নতুন মজবুত গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হল। সমগ্র কুরাইশ খান্দান মিলিতভাবে নির্মাণ কাজ শুরু করলো । কেউ যাতে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হয় , সেজন্য বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা গৃহের বিভিন্ন অংশ ভাগ করে নিলো।কিন্তু কা'বা গৃহের দেয়ালে যখন 'হাজরে আসওয়াদ' স্থাপনের সময় এলো তখন বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে গেলো প্রত্যেক গোত্রই দাবি করছিল যে, এ খেদমতটি শুধু তারাই আঞ্জাম দেবার অধিকারী অবস্থা এতদূর গড়ালো যে, অনেকের তলোয়ার পর্যন্ত কোষমুক্ত হলো।

---

৩৮. আল-কুরতুবী, *আল-জামি লিআহকামিল-কুর'আন* , দারু ইহয়াইত-তুরাছ আল আরাবী, বৈরূত : তা. বি., পৃ. ১৮১

৩৯. সীরাত বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ: ৩৬৮, ইফাবা, সম্পাদনা পরিষদ, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

চারদিন পর্যন্ত এই ঝগড়া চলতে থাকলো। পঞ্চম দিন আবু উমিয়া বিন মুগিরা নামক এক প্রবীণ ব্যক্তি প্রস্তাব করেন যে,আগামীকাল প্রত্যুষে যে ব্যক্তি এখানে সবার আগে হাজির হবে,এর মিমাংসার জন্যে তাকেই মধ্যস্থ নিয়োগ করা হবে। সে যা সিদ্ধান্ত করবে, তাই পালন করা হবে। সবাই এ প্রস্তাব মেনে নিলো।

পরদিন আল্লাহর কুদরতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির ওপর সবার নজর পড়লো, তিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মাদ (স)। ফয়সালা অনুযায়ী তিনি হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করতে ইচ্ছুক প্রতিটি খান্দান কে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বললেন্ ।অতঃপর একটি চাদর বিছিয়ে তিনি নিজ হাতে পাথরটিকে তার ওপর রাখলেন এবং বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিগণকে চাদরের প্রান্ত ধরে পাথরটিকে ওপরে তুলতে বললেন। চাদরটি তার নির্দিষ্ট স্থান বরাবর পৌছলে হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। এভাবে তিনি একটি সংঘষের্র সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দিলেন। এ সংঘর্ষে কতো খুন-খারাবী হতো, কে জানে!

এবার কা'বার যে নয়া গৃহ নির্মিত হলো,তার ওপর যথারীতি ছাদও দেয়া হলো;কিন্তু পুরো ভূমির গৃহ নির্মাণের উপযোগী উপকরণ না থাকায় এক দিকের ভূমি কিছুটা বাইরে ছেড়ে দিয়ে নয়া ভিত্তি গড়ে তোলা হলো। এই অংশটিকেই এখন 'হিত্তিম' বলা হয়।[৪০]

৪০. আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, (অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), নাকিব পাবলিকেশন, ঢাকা: সর্বশেষ ২০০৬,

Dhaka University Institutional Repository

আল-মসজিদুল-আকসা

আল-মসজিদুল-আকসা সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ -

"তিনি পবিত্র মহিমাময়, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চতুষ্পার্শ্বে আমি বরকতময় করেছি- যাতে আমি তাকে দেখাই আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন ; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।"[৪১]

এ ঘটনাটিই আমাদের পরিভাষায় "মি'রাজ" বা "ইসরা" নামে পরিচিতি লাভ করেছে। অধিকাংশ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা অনুসারে এ ঘটনাটি হিজরাতের এক বছর আগে সংঘটিত হয়। হাদীস ও সীরাতের বইগুলোতে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিপুল সংখ্যক সাহাবী এ ঘটনা বর্ণনায় সামিল হয়েছে। এঁদের সংখ্যা ২৫ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এঁদের মধ্য থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) , হযরত মালিক ইবনে সা'সা (রা), হযরত আবু যার গিফারী (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) । এঁরা ছাড়াও হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবুদল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামন (রা), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এবং আরো বিভিন্ন সাহাবী থেকেও এ ঘটনার অংশ বিশেষ বর্ণিত হয়েছে।

কুর'আন মজীদ এখানে নবী (স)- এর শুধুমাত্র মসজিদে হারাম (অর্থাৎ বায়তুল্লাহ তথা কাবা শরীফ) থেকে মসজিদে আকসা (অর্থাৎ বায়তুল মাকদিস) পর্যন্ত যাওয়ার কথা বর্ণনা করছে। এ সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করছে। এ সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলছে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে তাঁর নিজের কিছু নিশানী দেখাতে চাচ্ছিলেন। কুর'আনে এর বেশী কিছু বিস্তারিত বলা হয়নি। হাদীসে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তা সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে রাতে জিব্রীল আলাইহিস সালাম তাঁকে উঠিয়ে বুরাকের পিঠে চড়িয়ে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখানে তিনি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের সাথে নামায পড়েন। তারপর জিবরাঈল (আ) তাঁকে উর্ধ জগতের নিয়ে চলেন এবং সেখানে আকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বিপুল মর্যাদাশালী নবীর সাথে তাঁর সাক্ষ্যাত হয়।

অবশেষে উচ্চতার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে তিনি নিজের রবের সামনে হাযির হন। এ উপস্থিতির সময় অন্যান্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছাড়াও তাঁকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার সংক্রান্ত আদেশ জানানো হয়। এরপর তিনি আবার বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে আসেন। সেখান থেকে মসজিদে হারামে ফিরে আসেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত বিপুল সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়। তাছাড়া বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, পরের দিন যখন তিনি লোকদের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করেন তখন মক্কার কাফেররা তাঁকে ব্যাপকভাবে বিদ্রূপ করতে থাকে এবং মুসলমানদের মধ্যে কারো কারো ঈমানের ভিত নড়ে ওঠে।হাদীসের এ বাড়তি বিস্তারিত বিবরণ কুর'আনের বিরোধী নয়, বরং তার বর্ণনার সম্প্রসারিত রূপ। আর একথা সুস্পষ্ট যে, সম্প্রসারিত রূপকে কুর'আনের বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না।

---

৪১. আল-কুর'আন, ১৭ঃ ১

Dhaka University Institutional Repository

তবুও যদি কোন ব্যক্তি হাদীসে উল্লেখিত এ বিস্তারিত বিবরণের কোন অংশ না মানে তাহলে তাকে কাফের বলা যেতে পারে না। তবে কুরআন যে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে তা অস্বীকার করা অবশ্যই কুফরী। এ সফরের ধরনটা কেমন ছিল? এটা কি স্বপ্নযোগে হয়েছিল, না জাগ্রত অবস্থায়? আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সশরীরে মি'রাজ সফর করেছিলেন? কুর'আন মজীদের শব্দাবলীই এসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। বলা হয়েছে (আরবী- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى) শব্দগুলো দিয়ে বর্ণনা শুরু করার একথা প্রমাণ করে যে, এটি প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রমধর্মী একটি অতি বড় ধরনের অসাধারণ তথা অলৌকিক ঘটনা ছিল, যা মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতায় সংঘটিত হয়।

একথা সুস্পষ্ট যে, স্বপ্নের মধ্যে কোন ব্যক্তির এ ধরনের কোন জিনিস দেখে নেয়া অথবা কাশফ হিসেবে দেখা কোন ক্ষেত্রে এমন গুরুত্ব রাখে না, যা বলার জন্য এ ধরনের ভূমিকা ফাঁদতে হবে যে, সকল প্রকার দুর্বলতা ও ত্রুটিমুক্ত হচ্ছে সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে এ স্বপ্ন দেখিয়েছেন অথবা কাশফের মাধ্যমে এসব দেখিয়েছেন। তারপর "এক রাতে নিজের বান্দাকে নিয়ে যান" এ শব্দাবলীও দৈহিক সফরের কথাই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। স্বপযোগে সফর বা কাশফের মধ্যে সফরের জন্য নিয়ে যাওয়া শব্দাবলী কোনক্রমেই উপযোগী হতে পারে না। সুতরাং আমাদের এ কথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে, এটি নিছক একটি রূহানী তথা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল না। বরং এটি ছিল পুরোদস্তুর একটি দৈহিক সফর এবং চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ। আল্লাহ নিজেই তাঁর নবীকে এ সফর ও পর্যবেক্ষণ করান।

এখন যদি এক রাতে উড়োজাহাজ ছাড়া মক্কা থেকে বায়তুল মাকদিস যাওয়া আল্লাহর ক্ষমতার সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে হাদীসে যেসব বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সেগুলোকেই বা কেমন করে অসম্ভব বলে প্রত্যাখ্যান করা যায়? সম্ভব ও অসমম্ভবের বিতর্ক তো একমাত্র তখনই উঠতে পারে যখন কোন সৃষ্টির নিজের ক্ষমতায় কোন অসাধারণ কাজ করার ব্যাপার আলোচিত হয়। কিন্তু যখন আল্লাহর কথা আলোচনা হয়, আল্লাহ অমুক কাজ করেছেন, তখন সম্ভাব্যতার প্রশ্ন একমাত্র সে-ই উঠাতে পারে যে, আল্লাহকে সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করে না। এ ছাড়াও অন্যান্য যেসব বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে এসেছে সেগুলোর বিরুদ্ধে হাদীস অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র দু'টি আপত্তিই কিছুটা গুরুত্বসম্পন্ন।

এক. এর আগেই আল্লাহর একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। অন্যথায় বান্দার সফর করে একটি বিশেষ স্থানে গিয়ে তাঁর সামনে হাযির হবার কি প্রয়োজন ছিল?

দুই. নবী (স)- কে কেমন করে বেহেশত ও দোযখ এবং অন্যান্য কিছু লোকের শাস্তিলাভের দৃশ্য দেখিয়ে দেয়া হলো? অথচ এখনো বান্দাদের স্থান ও মর্যাদার কোন ফায়সালাই হয়নি। শাস্তি ও পুরস্কারের ফায়সালা তো হবে কিয়ামতের পর কিন্তু কিছু লোকের শাস্তি এখনই দেয়া হয়ে গেলো, এ আবার কেমন কথা?

কিন্তু এ দু'টি আপত্তিই আসলে স্বল্প চিন্তার ফল। প্রথম আপত্তিটি ভুল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, স্রষ্টার সত্তা নিসন্দেহে অসীমতার গুণাবলী সম্পন্ন, কিন্তু সৃষ্টির সাথে আচরণ করার সময় তিনি নিজের কোন দুর্বলতার কারণে বরং সৃষ্টির দুর্বলতার জন্য সীমাবদ্ধতার আশ্রয় নেন। যেমন সৃষ্টির সাথে কথা বলার সময় তিনি কথা বলার এমন সীমাবদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেন যা একজন মানুষ শুনতে ও বুঝতে পারে। অথচ তাঁর কথা মূলতই অসীমতার গুণ সম্পন্ন। অনুরূপভাবে যখন তিনি নিজের বান্দাকে নিজের রাজ্যের বিশাল মহিমান্বিত নিশানীসমূহ দেখাতে চান তখন বান্দাকে নিয়ে যান এবং যেখানে যে জিনিসটি দেখবার দরকার সেখানেই সেটি দেখিয়ে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ বান্দা সমগ্র সৃষ্টিলোককে একই সময় ঠিক তেমনিভাবে দেখতে পারে না যেমনিভাবে আল্লাহ্ দেখতে পারেন। কোন জিনিস দেখার জন্য আল্লাহকে কোথাও যাওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু বান্দাকে যেতে হয়। স্রষ্টার সামনে হাযির হওয়ার ব্যাপারটিও এ একই পর্যায়ের। অর্থাৎ স্রষ্টা নিজস্বভাবে কোথাও সমাসীন নন। কিন্তু তাঁর সাথে দেখা করার জন্য বান্দা নিজেই একটি জায়গায় মুখাপেক্ষী। সেখানে তার জন্য স্রষ্টার জ্যোতির ঝলকসমূহ কেন্দ্রীভূত করতে হয়। নয়তো সীমবদ্ধ বান্দার জন্য তাঁর অসীম সত্তার সাক্ষ্যাত লাভ সম্ভব নয়।

আর দ্বিতীয় আপত্তিটির ভ্রান্তিও সুস্পষ্ট। কারণ মি'রাজের সময় নবী (স)- কে এমন অনেক জিনিস দেখানো হয়েছিল। যার অনেকগুলোই ছিল আসল সত্যের প্রতীকী রূপ। যেমন একটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়ের প্রতীকী রূপ ছিল এই যে, একটি ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মধ্য থেকে একটি মোটা সোটা ষাঁড় বের হলো এবং তারপর আর তার মধ্যে ফিরে যেতে পারলো না। অথবা যিনাকারীদের প্রতীকী রূপ ছিল, তাদের কাছে উন্নত মানের তাজা গোশত থাকা সত্বেও তারা তা বাদ দিয়ে পচা গোশত খাচ্ছে। অনুরূপভাবে খারাপ কাজের যেসব শাস্তি তাঁকে দেখানো হয়েছে সেখানেও পরকালীন শাস্তিকে রূপকভাবে তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

মি'রাজের ব্যাপারে যে আসল কথাটি বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে নবীদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে মহান আল্লাহ তাঁদের পদ মর্যদানুসারে পৃথিবী ও আকশের অদৃশ্য রাজত্ব দেখিয়ে দিয়েছেন এবং মাঝখান থেকে বস্তুগত অন্তরালে হটিয়ে দিয়ে চর্মচক্ষু দিয়ে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়েছেন যেগুলোর ওপর ঈমান বিল গায়েব আনার জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে তাঁদের মর্যাদা একজন দার্শনিকের মর্যাদা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। দার্শনিক যা কিছু বলেন, আন্দাজ- অনুমান থেকে বলেন। তিনি নিজে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জানলে কখনো নিজের কোন মতের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন না। কিন্তু নবীগণ যাকিছু বলেন, সরাসরি জ্ঞান ও চাক্ষুস দর্শনের ভিত্তিতে বলেন। কাজেই তাঁরা জনগণের সামনে এ মর্মে দিতে পারেন যে, তাঁরা এসব কথা জানেন এবং এসব কিছু তাঁদের স্বচক্ষে দেখা জ্বলজ্যান্ত সত্য।[৪২]

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا
رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

"অবশেষে তার রব কন্যা সন্তানটিকে সন্তুষ্টি সহকারে কবুল করে নিলেন, তাকে খুব ভালো মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে বানিয়ে দিলেন তার অভিভাবক। যাকারিয়া যখনই তার কাছে মিহরাবে যেতো, তার কাছে কিছু না কিছু পানাহার সামগ্রী পেতো। জিজ্ঞেস করতো- "মারয়াম এগুলো তোমরা কাছে কোথা থেকে এলো?" সে জবাব দিতোঃ আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে চান, বেহিসেব দান করেন।"[৪৩]

এখান থেকে সেই সময়ের আলোচনা শুরু হয়েছে যখন হযরত মারায়াম প্রাপ্ত বয়স্কা হলেন, তাঁকে বাইতুল মাকদিসের ইবাদাতগাহে (হাইকেল) পৌঁছিয়ে দেয়া হলো এবং সেখানে তিন দিন-রাত আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়ে গেলেন। শিক্ষা ও অনুশীলন দানের জন্য তাকে হযরত যাকারিয়ার অভিভাবকত্বে সোপর্দ করা হয়েছিল। আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে সম্ভবত হযরত যাকারিয়া ছিলেন তার খালু।

---

৪২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৫৮২

৪৩. আল-কুর'আন, ৩ঃ ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

তিনি হাইকেলের অন্যতম পুরোহিত ছিলন। এখানে সেই যাকারিয়া নবীর কথা বলা হয়নি। যাকে হত্যা করার ঘটনা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখিত হয়েছে।[৪৪]

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا
وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ -

যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। তখন এর জবাবে তাকে ফেরেশতাগণ বললো- "আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দান করেছেন। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরমানের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে আসবে। তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সততার গুণাবলী থাকবে। সে পরিপূর্ণ সংযমী হবে, নবুওয়াতের অধিকারী হবে এবং সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে।"[৪৫]

(فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا)

"কাজেই সে মিহরাব থেকে বের হয়ে নিজের সম্প্রদায়ের সামনে এলো এবং ইশারায় তাদেরকে সাঁঝে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দিল। "[৪৬]

লুক লিখিত সুসমাচারে এই ঘটনার যে বিস্তারিত বিরবণ দেয়া হয়েছে তা আমরা এখানে উদ্ধৃত করেছি। এভাবে পাঠকের সামনে কুর'আনের পাশাপাশি খৃষ্টীয় বর্ণনাও রাখা যাবে এবং মাঝে মাঝে বন্ধনীর মধ্যে থাকছে আমাদের বক্তব্য-

"যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে (দেখুন তাফহীমুল কুর'আন, বনী ইসরাঈল, ৯ টীকা) অবিয়ের পালার মধ্যে সখরীয় (যাকারিয়া) নামক একজন যাজক ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী হারোণ বংশীয়া, তাঁহার নাম ইলীশাবেৎ (Elizabeth)তাঁহারা দুইজন ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে চলতেন। তাঁদের সন্তান ছিল না, কেননা, ইলীশাবেত বন্ধ্যা ছিলেন এবং দুই জনেরই অধিক বয়স হয়েছিল। একদা যখন সখরীয় (যাকারিয়া) নিজ পালার অনুক্রমে ঈশ্বরের সাক্ষাতের যাজকীয় কার্য করিতেছিলেন, তখন যাজকীয় কার্য্যের প্রথানুসারে গুলিবাঁট ক্রমে তাঁহাকে প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধূপ জ্বালাইতে হইল। সেই ধূপদাহের সময়ে সমস্ত লোক বাহিরে থাকিয়া প্রার্থনা করেতেছিল। তখন প্রভুর এক দূত ধূপবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। দেখিয়া সখরিয় (যাকারিয়া) ত্রাসযুক্ত হইলেন, ভয় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দূত তাঁহাকে বলিলেন, সখরিয়, ভয় করিওনা কেননা, তোমার বিনীত গ্রাহ্য হইয়াছে, (বাইবেলের কোথাও হযরত সখরিয়ার (যাকারিয়ার) দোয়ার উল্লেখ নেই। তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করিবেন, ও তুমি তাহার নাম যোহন (অর্থাৎ ইয়াহইয়া) রাখিবে। আর তোমার আনন্দ ও উল্লাস হইবে এবং তাহার জন্মে অনেকে আনন্দিত হইবে। কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান ইইবে, (এ বিষয়টি ব্যক্ত করার জন্য সূরা আলে ইমরানে (سَيِّدًا)শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) এবং দ্রাক্ষারস কি সূরা কিছুই পান করিবে না। (تَقِيًّا) আর সে মাতার গর্ভে হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ইইবে; (وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا)। এবং ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে অনেককেই তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরাইবে। সে তাহার সম্মুখে এলিয়ের (ইলিয়াস আলাইহিস সালাম) আত্মায় ও পরাক্রমে গমন করিবে, যেন পিতৃগণের হৃদয় সন্তানদের প্রতি ও অনাজ্ঞাবহদিগকে ধার্মিকদের বিজ্ঞতায় চলিবার জন্য ফিরাইতে পারে, প্রভুর নিমিত্ত সুসজ্জিত এক প্রজামণ্ডলী প্রস্তুত করিতে পারে।

---

৪৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ১৭১

৪৫. আল-কুর'আন, ৩ঃ ৩৯

৪৬. আল-কুর'আন, ১৯ঃ ১১

Dhaka University Institutional Repository

"তখন সখরিয়া (যাকারিয়া) দূতকে কহিলেন, কিসে ইহা জানিব? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীরও অধিক বয়স হইয়াছে। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি গাব্রিয়েল (জিব্রীল), ঈশ্বের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি, তোমার সহিত কথা কহিবার ও তোমাকে এ সকল বিষয়ের সুসমাচার দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। আর দেখ, এই সকল যেদিন ঘটিবে, সেই দিন পর্যন্ত নীরব থাকিবে, কথা কহিতে পারিবে না; যেহেতুক আমার এই যে সকল বাক্য যথাসময়ে সফল হইবে, ইহাতে তুমি বিশ্বাস করিলে না। (এ বর্ণনাটি কুর'আন থেকে ভিন্নতর। কুর'আন একে নিদর্শন গণ্য করে এবং লুকের বর্ণনা একে বলে শাস্তি। তাছাড়া কুর'আন কেবলমাত্র তিন দিন কথা না বলার কথা বলে এবং লুক বলেন, সেই থেকে হযরত ইয়াহইয়ার জন্ম হওয়া পর্যন্ত হযরত যাকারিয়া নীরব থাকেন।) আর লোক সকল সখরিয়ের অপেক্ষা করিতেছিল;এবং মন্দিরের মধ্যে তাহার বিলম্ব হওয়াতে তাহারা আশ্চার্য জ্ঞান করিতে লাগিল। পরে তিনি বাহিরে আসিয়া তাহাদের কাছে কথা কহিতে পারিলেন না; তখন তাহারা বুঝিল যে, মন্দিরের মধ্যে তিনি কোন দর্শন পাইয়াছেন; আর তিনি তাহাদের নিকটে নানা সংকেত করিতে থাকিলেন, এবং বোবা হইয়া রহিলেন"।[৪৭]

পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থান

মসজিদে আকসা জেরুজালেমে অবস্থিত। খৃষ্টপূর্ব ৭০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত।

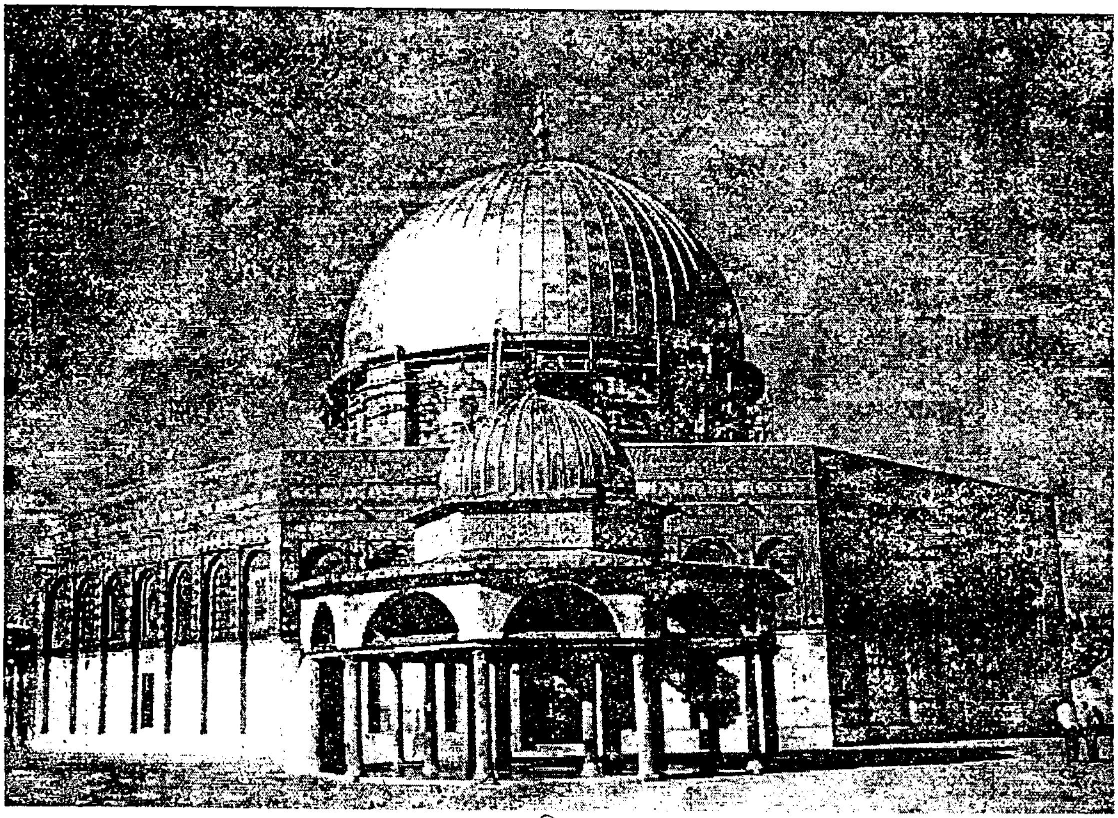

আল-মাসজিদুল আকসা

৪৭. প্রাগুক্ত, লুক- ১:৫-২২

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا -

"দেখো, তোমরা ভালো কাজ করে থাকলে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ভাল ছিল আর খারাপ কাজ করে থাকলে তোমাদের নিজেদেরই জন্য তা খারাপ প্রমাণিত হবে। তারপর যখন পরবর্তী প্রতিশ্রুতির সময় এসেছে তখন আমি অন্য শত্রুদেরকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং (বায়তুল মাকদিসের) মসজিদে এমনভাবে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার শত্রুরা ঢুকে পড়েছিল আর যে জিনিসের ওপরই তাদের হাত পড়ে তাকে ধ্বংস করে রেখে দেয়।"[৪৮]

আল-মাসজিদুল আকসা নির্মাণ

বায়তুল মাকদিস-এ অবস্থিত আল-মাসজিদুল আকসাও সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেন। বায়তুল্লাহ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর তিনি উহা নির্মাণ করেন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ -

আবূ যারর (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, আল-মাসজিদুল হারাম। আমি বললাম, ইহার পর? তিনি বললেন, আল-মাসজিদুল আকসা। আমি বললাম, এতদোভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বৎসর।[৪৯, ৫০]

সোলায়মান (আ) কর্তৃক বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণ

আল্লাহ জ্বীন জাতিকে এমন একটি সৃষ্ট জীব পয়দা করেছেন যারা জটিল হতে জটিল এবং কঠিন হতে কঠিন কাজ সমাধা করতে পারে। হযরত সোলায়মান (আ) ইচ্ছা করলেন মসজিদের চতুর্দিকে একটি বিরাট শহর স্থাপন করবেন এবং মসজিদটিকেও সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ করবেন। তার অভিলাস ছিল মসজিদ ও শহরটিকে অধিক মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মাণ করবেন। এবং এর জন্য দূরদুরন্ত থেকে মূল্যবান পাথর আনিয়ে নিবেন। কিন্তু তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমীত উপকরণসমূহ সোলায়মান (আ) এর বাসনা পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এ কাজ শুধু জ্বীন জাতি সম্পন্ন করতে পারত। জ্বিন জাতী দ্বারাই এ কাজ করিয়ে নিলেন। জ্বিনেরা দূরদুরন্ত থেকে সুন্দর ও বড় বড় পাথর সংগ্রহ করে আনত। এবং বায়তুল মোকাদ্দাসে ব্যবহার করত।

সাধারণত তাই প্রসিদ্ধ যে, মসজিদে আকসা ও বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ হযরত সোলায়মান (আ) এর কালেই হয়েছিল কিন্তু তা ঠিক নয়। কিন্তু বোখারি ও মুসলিম শরিফের হাদিসে উল্লেখ আছে যে,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ -

---

৪৮. স আল-কুর'আন, ১৭ঃ ৭

৪৯. আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল- আম্বিয়া/ বাদউল-খালক, হাদীছ নং ৩১১৫

Dhaka University Institutional Repository

৫০. সীরাত বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ: ৩৭৪, ইফাবা, সম্পাদনা পরিষদ, ২০০৩

“একবার হযরত আবু জার গিফারী (রা) রাসুল (স) কে জিজ্ঞাস করলেন দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি রসুল স বললেন মসজিদে হারাম। হযরত আবু জার গিফারী (রা) পুনরায় জিজ্ঞান করলে এরপর কোন মসজিদ অস্তিত্বের জগতে এসেছে রাসুল (স) বললেন মসজিদে আকসা। হযরত আবু জার গিফারী (রা) তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করলেন এ দু মসজিদের নির্মাণকালের সময় কিপরিমাণ। এ দুটির মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান।”[৫১] অথচ সোলায়মান (আ) এর এবং মসজিদের হারামের নির্মাতা হযরত ইব্রাহিম (আ) এর মধ্যে এক হাজার বছরের চেয়েও বেশি সময়ের ব্যবধান। সুতরাং হাদিসের অর্থ এই যে, যেভাবে হযরত ইব্রাহিম (আ) মসজিদের হারামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন আর তা মক্কা শহরটি আবাদ হওয়ার কারণ হয়েছিল। সে রূপেই ইয়াকুব (আ) বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিনে এবং তার ফলে তা বায়তুল মোকাদ্দাস শহরটি আবাদ হয়েছিল। এর দীর্ঘকাল পরে সোলায়মান আ এর আদেশে মসজিদটি ও তথাকার শহরটি নতুনভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছিল। এবং জ্বীনদেরকে বসীভূত করে কাজে লাগানোর কারণে অনুপম ও বিরাট এমারত নির্মিত হয়েছিল। যা অদ্যাবধি দর্শকের বিস্ময়ের কারণ যে, দৈত্যাকার প্রস্তরসমূহ কোথা হতে আনয়ন করা হয়েছে এবং কীরূপে আনয়ন করা হয়েছে। আর এই প্রকাণ্ড ও গুরুভার প্রস্তরসমূহ উত্তোলনের জন্য কেমন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছিল যার সাহায্যে ওগুলোকে এত উপরে উঠিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। জ্বিন জাতি সোলায়মান (আ) এর জন্য বায়তুল মোকাদ্দাস ছাড়াও আরো বহু এমারত নির্মাণকরাহয়েছিল।

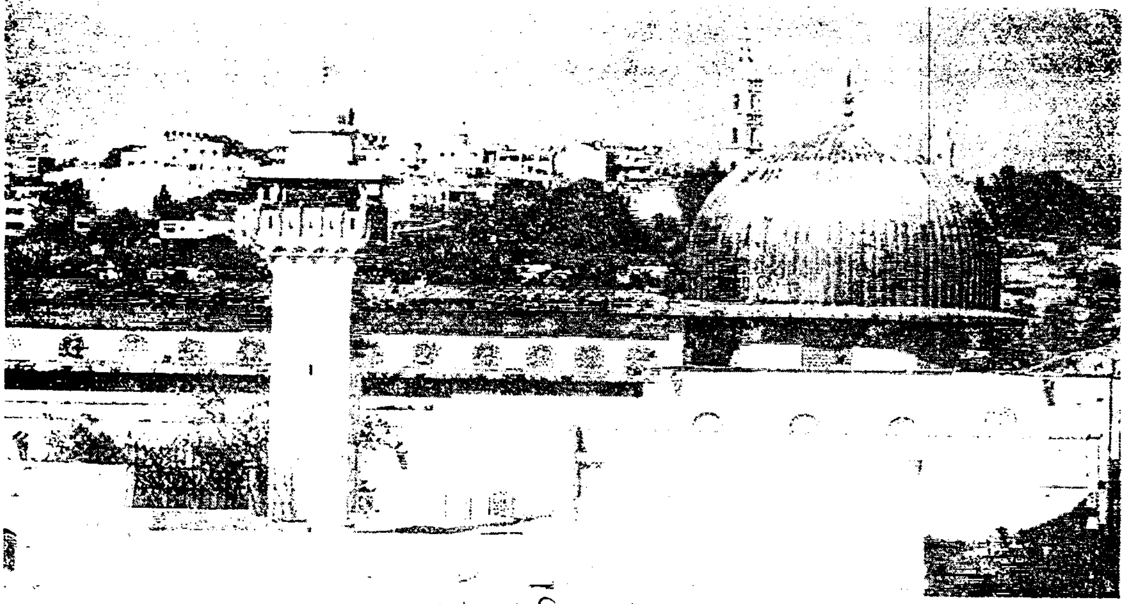

আল-মাসজিদুল আকসা

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ -

“এবং অধীন করেছি শয়তানের কতককে, যারা তাঁর (সুলাইমান আ.) জন্য ডুবুরীর কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রন করে রাখতাম।”[৫২, ৫৩]

৫১. আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল- আম্বিয়া/ বাদউল-খালক, হাদীছ নং ৩১১৫

৫২. আল-কুর’আন, ২১: ৮২

৫৩. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর’আন, বাংলা অনু., ৩খ, পৃ. ১১, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদে কূবা

ইসলামের ইতিহাসে মহানবী (স) কর্তৃক সর্বপ্রথম যে মসজিদ স্থাপিত হয় তাকে 'তাক্বওয়ার মসজিদ' তথা মসজিদে কূবা বলা হয়। এ মসজিদখানা মদীনা শহরের সন্নিকটে।

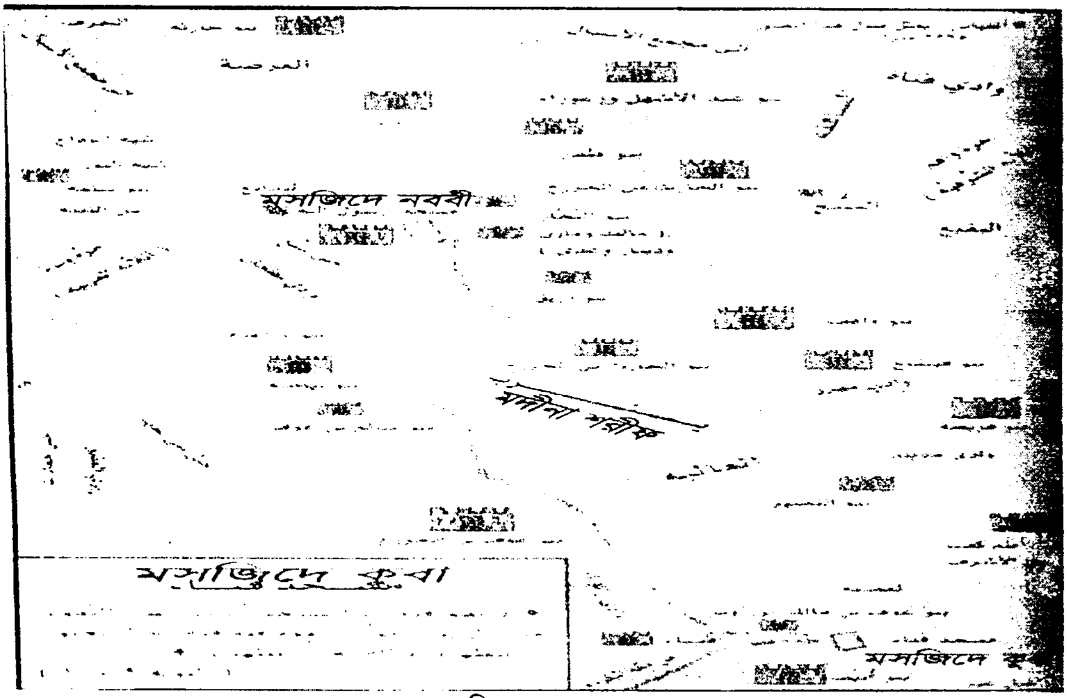

মসজিদে কূবার স্থান

মাসজিদে কূবা সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ -

"তুমি কখনো সেই ঘরে দাঁড়াবে না। যে মসজিদে প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তেতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই মসজিদটি দাঁড়ানোরই (ইবাদতের জন্য) তোমার পক্ষে অধিকতর সমীচীন। সেখানে এমন লোক আছে যারা পাক-পবিত্র থাকা পছন্দ করে এবং আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।"[৫৪]

---

৫৪. আল-কুর'আন, ৯ঃ ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

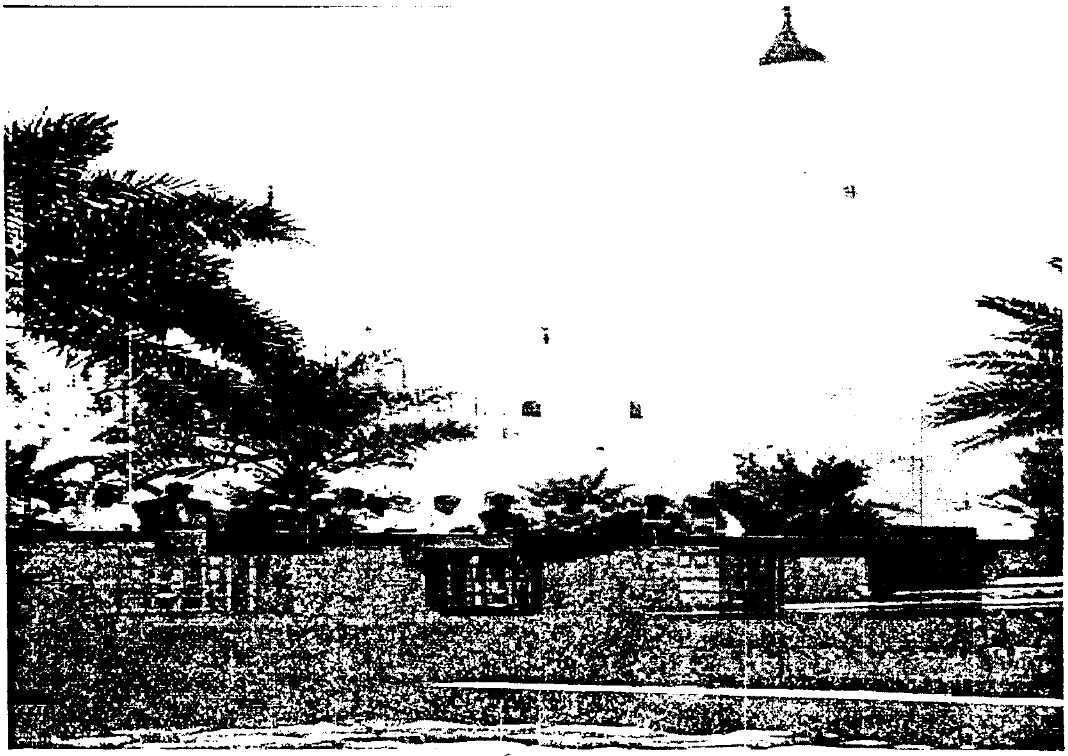

মসজিদে কুবা

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

নবী (স) মদীনায় আগমনের আগে খাযরাজ গোত্রে আবু আমের নামে এক ব্যক্তি ছিল। জাহেলী যুগে সে খৃষ্টান রাহেবের (সাধু) মর্যাদা লাভ করেছিল। তাকে আহলে কিতাবদের আলেমদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ্য করা হতো।অন্যদিকে সাধুগিরির কারণে পণ্ডিত সুলভ মর্যাদার পাশাপাশি তার দরবেশীর প্রভাবও মদীনা ও আশেপাশের এলাকার অশিক্ষিত আরব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। নবী (স) যখন মদীনায় পৌছলেন তখন সেখানে বিরাজ করছিল আবু আমেরের ধর্মীয় ও আধ্যত্মিক কতৃত্বের রমরমা অবস্থা। কিন্তু এ জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও দরবেশী তার মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যকে চেনার মতো ক্ষমতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে উল্টো তার জন্য একটি বিরাট অন্তরাল সৃষ্টি করলো।

আর এ অন্তরাল সৃষ্টির ফলে রসূলের আগমণের পর সে নিজে ঈমানের নিয়ামত থেকে শুধু বঞ্চিতই রইল না। বরং রসূলকে নিজের ধর্মীয় পৌরহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বি এবং নিজের দরবেশী ও সাধু বৃত্তিক কর্মকাণ্ডের শত্রু মনে করে তার ও তার সমুদয় কার্যক্রমের বিরোধিতায় নেমে পড়লো। প্রথম দুবছর তার আশা ছিল কুরাইশী কাফেরদের শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা চরমভাবে পরাজিত হলো। এ অবস্থায় সে আর নীরব থাকতে পারলো না। সেই বছরই সে মদীনা থেকে বের হয়ে পড়লো। সে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসল
চক্রান্ত ও যোগসাজশে ওহোদ যুদ্ধ বাধে, তাদের ম
ওহোদের যুদ্ধের ময়দানে সে অনেকগুলো গর্ত খুঁড়েছিল
হয়েছিলেন। তারপর আহযাব যুদ্ধের সময় চারদিকে থে
তাকে আক্রমণে উস্কে দেয়ার ব্যাপারেও তার অগ্রনী ভুমি
মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোতেই

Dhaka University Institutional Repository

সক্রিয় সহয়ক ছিল। শেষ পর্যন্ত আরবের কোন শক্তি ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখে দিতে পারবে বলে তার আর আশা রইল না। কাজেই সে আরব দেশ ত্যাগ করে রোমে চলে যায় এবং আরব থেকে যে "বিপদ" মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে সে কাইসাকে (সীজার)অবহিত করে। এ সময়ই মদীনায় খবর পৌছে যে, কাইসার আরব আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এরই প্রতিবিধান করার জন্য নবী (স) কে তাবুক অভিযান করতে হয়।

ঈসায়ী রাহেব আবু আমেরের এ ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় তার সাথে শরীক ছিল মদীনার মুনাফিক গোষ্ঠির একটি দল। আবু আমেরকে তার ধর্মীয় প্রভাব ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে রোমের কাইসার ও উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টান আরব রাজ্যগুলোর সামরিক সাহায্য লাভ করতেও এ মুনাঠিকরা তাকে পরামর্শ দেয় ও মদদ যোগায়। যখন সে রুমের পথে রওয়ানা হচ্ছিল তখন তার ও এ মুনাফিকদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো। এ চুক্তি অনুযায়ী স্থির হলো, যে মদীনায় তারা নিজেদের একটি পৃথক মসজিদ তৈরী করে নেবে। এভাবে সাধারণ মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে মুনাফিক মুসলমানদের এমন একটি স্বতন্ত্র জোট গড়ে উঠবে যা ধর্মীয় আলখেল্লায় আবৃত থাকবে। তার প্রতি সহজে কোন প্রকার সন্দেহ করা যাবে না। সেখানে শুধু যে, মুনাফিকরাই সংঘটিত হবে এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারনের জন্য পরামর্শ করবে তা নয়।বরং আবু আমেরের কাছ থেকে যেসব এজেন্ট খবর ও নির্দেশ নিয়ে আসবে তারাও সন্দেহের উর্ধে থেকে নিরীহ ফকীর ও মুসাফিরের বেশে এ মসজিদে অবস্থান করতে থাকবে। এ ন্যাক্করজনক ষড়যন্ত্রটির ভিত্তিতেই এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং এরি কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে।

মদীনায় এ সময় দুটি মসজিদ ছিল। একটি মসজিদে কুবা। এটি ছিল নগর উপকণ্ঠে। অন্যটি ছিল মসজিদে নববী। শহরের অভ্যন্তরে ছিল এর অবস্থান। এ দুটি মসজিদ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় একটি মসজিদ নির্মাণ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আর এটা কোন যুক্তিহীন ধর্মীয় আবেগের যুগ ছিল না যে, প্রয়োজন থাকুক ব না থাকুক মসজিদ নামে নিছক একটি ইমারত তৈরী করে দিলেই তখন নেকীর কাজ বলে মনে করা হবে।বরং একটি নতুন মসজিদ তৈরী করার অর্থই ছিল মুসলমানদের জামায়াতের মধ্যে অনর্থক বিভেদ সৃষ্টি করা। একটি সত্যনিষ্ঠা ইসলামী ব্যবস্থা কোনক্রমেই এটা বরদাশত করতে পারে না। তাই তারা নিজেদের পৃথক মসজিত তৈরী কারার আগে তার প্রয়োজনের বৈধতা, প্রমাণ করতে বাধ্য ছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা নবী (স) এর সামনে এ নতুন নির্মাণ কাজের প্রয়োজন পেশ করে। এ প্রসঙ্গে তারা বলে, বৃষ্টি বাদলের জন্য এবং শীতের রাতে সাধারণ লোকদের বিশেষ করে উল্লেখিত দুটি মসজিদ থেকে দুরে অবস্থানকারী বৃদ্ধ, দুর্বল ও অক্ষম লোকদের প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে হাজিরা দেয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আমরা শুধুমাত্র নামাযীদের সুবিধার্থে এ নতুন মসজিদটি নির্মাণ করতে চাই।

মুখেএ পবিত্র ও কল্যাণমূসক বাসনার কথা উচ্চারণ করে যখন এ "দ্বিরার", (ক্ষতিকর) মসজিদটির নির্মাণ কাজ শেষ হলো তখন এ দুর্বৃত্তরা নবী (স) এর দরবারে হাযির হলো এবং সেখানে একবার নামায পরিয়ে মসজিদটির উদ্বোধন করার জন্য তার কাছে আবেদন জানালো। কিন্তু আমি এখন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি এবং শীঘ্রই আমাকে একটি বড় অভিযানে বের হতে হবে, সেখান থেকে ফিরে এসে দেখা যাবে, একথা বলে তিনি তাদের আবেদন এড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাবুক রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং তার রওয়ানা হওয়ার পর এ মুনাফিকরা এ মসজিদে নিজেদের জোট গড়ে তূলতে এবং ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলো।

এমন কি তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, ওদিকে রোমানদের হাতে মুসলমানদের মুলোৎপাটনের সাথে সাথেই এদিকে এরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মাথায় রাজ মূকূট পরিয়ে দেবে। কিন্তু তবুকের যা ঘটলো তাতে তাদের সে আশার গুড়ে বালি পড়লো।

Dhaka University Institutional Repository

ফেরার পথে নবী (স) যখন মদীনার নিকটবর্তী "যী আওয়ান" নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন এ আয়াত নাযিল হলো। তিনি তখনই কয়েকজন লোককে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন, তার মদীনায় পৌঁছার আগেই যেন তারা দ্বিরার মসজিদটি ভেংগে ধুলিস্মাত করে দেয়।[৫৫]

কুবায় মসজিদ নির্মাণ

কুবায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (স) এখানে একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু হলে তিনিও মুসলমানদের সাথে একযোগে কাজ করেন। নিজে ভারী পাথর মাথায় বহন করে আনতেন। ভক্ত মুসলমানগণ তাঁকে পরিশ্রম হতে বিরত রাখতে চাইলেও তিনি বিরত হতেন না।[৫৬]

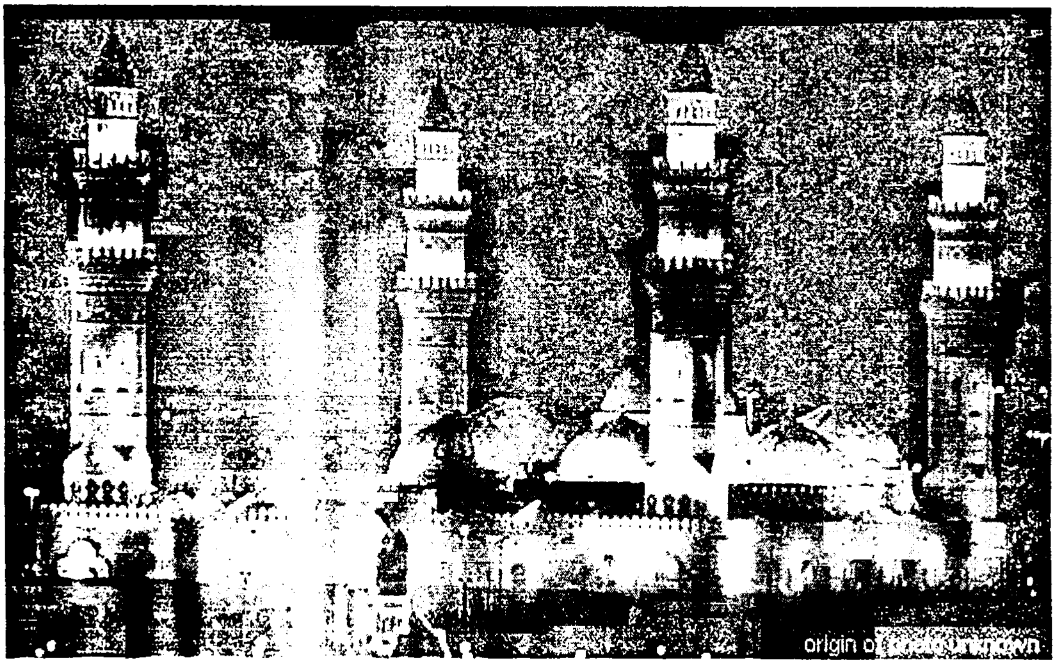

মসজিদে কুবা

নগর অভিমুখে যাত্রা ও ইসলামে প্রথম জুমআ

চৌদ্দ দিন পর্যন্ত শহরতলীর কোন পল্লীতে অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ (স) নগর অভিমুখে রওয়ানা করেন। তাঁর মাতৃকুল বনী নাজ্জারকে পূর্বেই তাঁর শহরে গমনের সংবাদ জানানো হয়। এ সংবাদে শহরবাসীর বিশেষত বনী নাজ্জারের আনন্দ উৎসাহের অবধি রইল না। বীর জাতির প্রথানুসারে তারা সকলে তরবারি ঝুলিয়ে রাসূলে আকরাম (স) কে অভ্যর্থনা জানাতে বের হয়। রাসূলে আকরাম (স) যেদিন মদীনা নগর অভিমুখে যাত্রা করেন, এ দিনটি ছিল শুক্রবার। তাঁর সাথে আরও বহু লোক আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে চলেছেন কিছু দূর যেতেই বনী সালেম গোত্রের মহল্লা। এখানে পৌঁছতেই জুমআর নামাযের সময় হয়ে যায়। তিনি এখানে জুমআর নামায আদায় করেন। ইসলামে এটাই প্রথম জুমআ।[৫৭]

---

৫৫. আবু নায়ীম, মাওলানা, কাসাসুল আম্বিয়া, ২খ, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ১৯৯৯, পৃ. ২১৩

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন পাহাড়, গুহা, দূর্গ ও উপত্যকা

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন পাহাড়, গুহা, দূর্গ ও উপত্যকা

সাওর পাহাড়

সাওর পাহাড় পবিত্র কুর'আনের আয়াত

إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ
لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى
وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

যদি তোমরা রাসূলকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন কাফেররা তাকে বহিস্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি স্বীয় সঙ্গীকে বলেছিলেন ঃ বিষণ্ন হবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। তারপর আল্লাহ্ স্বীয় প্রশান্তির তাঁর উপর নাযিল করলেন এবং তাঁকে শক্তিদান করলেন এমন সেনাবাহিনী দিয়ে যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। বস্তুত আল্লাহ্ কাফেরদের কথা নিচু করে দিলেন এবং আল্লাহ্র বাণীই সর্বোপরি সমুন্নত। আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

পরিচিতি

জাবালে সওর আরবী :(جبل ثور)। এটি সৌদী আরবের একটি বিখ্যাত পাহাড়। এটি মক্কার দক্ষিণে মিসফালাহ জেলায় অবস্থিত। মহানবী (স) ও আবু বকর (রা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পথে এই পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।[২]

সওর পাহাড় এর চিত্র

---

১. আল-কুর'আন, ৯ঃ ৪০

২. Celebrating Makkah al-Mukarramah as a capital of Islamic culture for 2005

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

মক্কার কাফেররা যখন নবী (সা) কে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল, এটা সে সময়ের কথা। যে রাতে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সে রাতেই তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেছিলেন। ইতিপূর্বে দুজন চারজন করে যেতে যেতে মুসলমানদের বেশীর ভাগ মদীনায় পৌছে গিয়েছিল। মক্কায় কেবলমাত্র তারাই থেকে গিয়েছিল যারা ছিল একেবারেই অসহায় অথবা যাদের ঈমানের মধ্যে মোনাফেকীর মিশ্রণ ছিল এবং তাদের ওপর কোন প্রকারে ভরসা করা যেতে পারতো না। এ অবস্থায় যখন তিনি জানতে পারলেন,তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তখন তিনি শুধুমাত্র একজন সাথী হযরত আবু বকর (রা) কে সংগে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়লেন। নিশ্চয়ই তার পেছনে ধাওয়া করা হবে, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি মদিনার পথ ছেড়ে (যা ছিল উত্তরের দিকে) দক্ষিণের পথ অবলম্বন করলেন।এখানে তিন দিন সাওর নামক পর্বত গুহায় আত্মগোপন করে থাকলেন। তাঁর রক্ত পিপাসু দুশমনেরা তাঁকে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মক্কার আশপাশের উপত্যকগুলোর কোন জায়গা খুঁজতে তারা বাকী রাখেনি। এভাবে তাদের কয়েকজন খুঁজতে খুঁজতে যে গিরি গুহায় তিনি লুকিয়েছিলেন তার মুখে পৌছে গেলো। হযরত আবু বরক (রা) ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, দুশমনদের একজন যদি একটু ভিতরে ঢুকে উকি দেয়, তাহলে তাদের দেখে ফেলবে ।কিন্তু নবী (সা)একটুও বিচলিত না হয়ে হযরত আবু বকর (সা) কে এ বলে সান্তনা দিলেন, "চিন্তিত হয়ো না, মন খারাপ করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন" ।[৩]

---

৩. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, (অনু. খাদিজা আক্তার রেজায়ী), আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ঢাকা : চতুর্থ প্রকাশ- ২০০০, পৃ. ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

সিনাই পর্বত (তুর পর্বত)

তুর পর্বত সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)-

আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর-কে তোমাদের উপর তুলে ধরে বলেছিলাম ঃ আমি তোমাদের যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রেখ, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।[৪]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ -

তারপর সেই অংগীকারের কথাটাও একবার স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের থেকে নিয়েছিলাম তূর পাহাড়কে তোমাদের ওপর উঠিয়ে রেখে। আমি জোর দিয়েছিলাম, যে পথনির্দেশ আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, দৃঢ়ভাবে তা মেনে চলো এবং মন দিয়ে শুনো। তোমাদের পূর্বসূরীরা বলেছিল, আমরা শুনেছি কিন্তু মানবো না। তাদের বাতিলপ্রিয়তা ও অন্যায় প্রবণতার কারণে তাদের হৃদয় প্রদেশে বাছুরই অবস্থান গেড়ে বসেছি। যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে এ কেমন ঈমান, যা তোমাদেরকে এহেন খারাপ কাজের নির্দেশ দেয়?[৫]

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا -

এবং তূর পাহাড় তাদের ওপর উঠিয়ে তাদের থেকে (এই ফরমানে আনুগত্যের) অংগীকার নিয়েছি। আমি তাদেরকে হুকুম দিয়েছি, সিজ্‌দানত হয়ে দরজার মধ্যে প্রবেশ করো। আমি তাদেরকে বলেছি, শনিবারর বিধান লংঘন করো না এবং এর সপক্ষে তাদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছি।[৬]

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ -

---

৪. আল-কুর'আন, ২ঃ ৬৩
৫. আল-কুর'আন, ২ঃ ৯৩
৬. আল-কুর'আন, ৪ঃ ১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

অতপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন তখন সে আকূল আবেদন জানালো, হে প্রভু! আমাকে দর্শনের শক্তি দাও, আমি তোমাকে দেখবো।তিনি বললেনঃ তুমি আমাকে দেখতেপারো না। হাঁ সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও । সেটি যদি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাহলে অবশ্যি তুমি আমাকে দেখতে পাবে। কাজেই তার রব যখন পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে মূসা বললোঃ পাক-পবিত্র তোমার সত্তা। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম মুমিন।[৭]

فلمَّا قضَى مُوسَىالأجَلَ وَسَارَ بأهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّور نارًا قالَ لِأهْلِهِ امْكُثُوا إنِّي آنَسْتُ نَارًا لعَلِّي
آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّار لعَلَّكُمْ تَصْطَلونَ -

অতঃপর মূসা যখন তার মেয়াদকাল পুর্ণ করলেন এবং স্বপরিবারে (মিশরাভিমুখে) যাত্রা করলেন, তখন তিনি তুর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেলেন । তিনি তার পরিবার বর্গকে বললেন ঃ তোমরা অপেৰা কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ সেখান থেকে আমি তোমাদের জন্য কোন খবর নিয়ে আসতে পারব, অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড আনতে পারব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার ।[৮]

فلمَّا أتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الوَادِي الأيْمَن فِي البُقعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أن يَا مُوسَى إنِّي أنَا اللَّهُ رَبُّ
العَالمِينَ

যখন মূসা উক্ত আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন উপত্যকার ডান দিক থেকে সেই পবিত্র স্হানটির একটি বৃক্ষ থেকে ডেকে বলা হল- হে মুসা ! আমিই আল্লাহ্ জগতসমূহের পালনকর্তা ।[৯]

(وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا)

আর আমি তাকে ডেকেছিলাম তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে এবং অন্তরঙ্গ আলাপের উদ্দেশ্যে আমি তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম ।[১০]

(يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى)

হে বনী ইসরাঈল ! আমি তো তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম তোমাদের শত্রুর কবল থেকে এবং আমি তোমাদেরকে তুর পাহাড়ের ডান পার্শ্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আর তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিল ।[১১]

(وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ)

এবং (সে পানির সাহায্যে) সৃষ্টি করি এক প্রকার বৃক্ষ যা তুরে সাইনায়ে জন্মায় এবং এতে উৎপন্ন হয় তৈল ও ব্যঞ্জন ভক্ষণকারীদের জন্য ।[১২]

---

৭. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১৪৩
৮. আল-কুর'আন, ২৮ঃ ২৯
৯. আল-কুর'আন, ২৮ঃ ৩০
১০. আল-কুর'আন, ১৯ঃ ৫২
১১. আল-কুর'আন, ২০ঃ ৮০
১২. আল-কুর'আন, ২৩ঃ ২০

Dhaka University Institutional Repository

এখানে জয়তুনের কথা বলা হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের আশপাশের এলাকার উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এ গাছগুলো দেড় হাজার দু'হাজার বছর বাঁচে। এমনকি ফিলিস্তিনের কোন কোন গাছের দৈর্ঘ্য, স্থূলতা ও বিস্তার দেখে অনুমান করা হয় যে, সেগুলো হযরত ঈসা (আ) এর যুগ থেকে এখনো চলে আসছে। সিনাই পাহাড়ের সাথে একে সম্পর্কিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, সিনাই পাহাড় এলাকার সবচেয়ে পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য স্থানই এর আসল স্বদেশ ভূমি।

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ -

আর যখন আমি মূসাকে নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি (তুর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে ছিলেন না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না ।[১৩]

পশ্চিম প্রান্ত বলতে সিনাই উপদ্বীপের যে পাহাড়ে মূসাকে শরীয়াতের বিধান দেয়া হয়েছিল সেই পাহাড় বুঝানো হয়েছে। এ এলাকাটি হেজাযের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ -

বরং আমি অনেক মানবগোষ্টি সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে (তারপর আপনাকে পাঠিয়েছি) আর আপনি তো মাদইয়ান বাসীদের মধ্যে অবস্হানকারী ছিলেন না, যাতে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন । কিন্তু আমিই রাসূল প্রেরণকারী ।[১৪]

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ -

আর আমি যখন মূসাকে আহবান করেছিলাম, তখনও আপনি তুর পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন না । বস্তুত এটা আপনার রবের তরফ থেকে রহমতস্বরুপ, যাতে আপনি এমন এক কওমকে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে ।[১৫]

এ তিনটি কথাই পেশ করা হয়েছে মুহাম্মদ (সঃ) এর নবুওয়াতের সপক্ষে প্রমান হিসেবে। যখন এ কথাগুলো পেশ করা হয়েছিল তখন মক্কার সমস্ত সরদার ও সাধারন কাফেররা কোন প্রকারে তাঁকে অ-নবী এবং নাউযুবিল্লাহ নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার প্রমান করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ইয়াহুদী উলামা ও খৃষ্টান 'রাহিব' তথা সংসারত্যাগী-যোগী সন্ন্যাসীরাও হেজাযের জনপদগুলোতে উপস্থিত ছিল। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামও কোন মহাশূন্য থেকে এসে কোরআন শুনিয়ে যেতেন না। বরং তিনি ছিলেন সেই মক্কারই বাসিন্দা। তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও তাঁর জনপদ ও গোত্রের লোকদের কাছে গোপন ছিল না।

---

১৩. আল-কুর'আন, ২৮ঃ ৪৪
১৪. আল-কুর'আন, ২৮ঃ ৪৫
১৫. আল-কুর'আন, ২৮ঃ ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

এ কারনেই যখন এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের আকারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমানস্বরূপ এ তিনটি কথা বলা হলো তখন মক্কা, হেজায এবং সারা আরবের কোন এক ব্যক্তিও উঠে এমন বেহুদা কথা বলেনি যা আজকের পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদরা বলছেন। যদিও মিথ্যা তৈরি করার ব্যাপারে তারা এদের চেয়ে কম যেতো না তবুও যে ডাহা মিথ্যা এক মুহুর্তের জন্যও চলতে পারে না তা তারা বলতো কেমন করে। তারা কেমন করে বলতো, হে মুহাম্মদ, তুমি অমুক অমুক ইহুদী আলেম ও খৃষ্টান রাহেবের কাছ থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে এনেছো! কারন সারাদেশে এ উদ্দেশ্যে তারা কোন একজনেরও নাম নিতে পারত না। তারা কারো নাম নেবার সাথে সাথেই প্রমান হয়ে যেত যে, নবী (সঃ) তার কাছ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করেননি। তারা কেমন করে বলতো, হে মুহাম্মদ! বিগত ইতিহাস এবং সাহিত্য ও যাবতীয় বিদ্যার গ্রন্থরাজি সম্বলিত একটি লাইব্রেরী তোমার আছে! সেই গ্রন্থরাজির সহায়তায় তুমি এসব বক্তৃতা দিচ্ছো। কারন লাইব্রেরী তো দূরের কথা, মুহাম্মদ (স) এর আশে পাশে কোথাও থেকে তারা এসব তথ্য সম্বলিত একটি কাগজের টুকরোও বের করতে সক্ষম ছিল না।

মক্কার প্রতিটি শিশুও জানতো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম লেখাপড়া জানা লোক নন। আবার কেউ একথাও বলতে পারত না যে, তিনি কিছু অনুবাদক নিযুক্ত করে রেখেছেন, তারা হিব্রু, সুরিয়ানী ও গ্রীক গ্রন্থরাজি থেকে তরজমা করে তাঁকে দেয়। তারপর তাদের সবচেয়ে বড় বেহায়া লোকটিও এ দাবী করার সাহস করতো না যে, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের বাণিজ্য সফরে গিয়ে আপনি এ তথ্যাবলী সংগ্রহ করে এনেছিলেন। কারন এ সফরে তিনি একা ছিলেন না। মক্কারই বাণিজ্যিক কাফেলা প্রত্যেক সফরে তাঁর সাথে থাকতো। যদি তখন কেউ এ ধরনের দাবী করতো তাহলে শত শত জীবিত সাক্ষী এ সাক্ষ্য দিতো যে, সেখানে তিনি কারো কাছ থেকে কোন পাঠ নেননি। আর তাঁর ইন্তিকালের পর তো দু'বছরের মধ্যেই রোমানদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

যদি মিথ্যামিথ্যাই সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে কোন খৃষ্টান রাহেব বা ইহুদী রব্বির সাথে নবী (সঃ) কোন আলাপ আলোচনা করে থেকে থাকতেন তাহলে রোমান সরকার তিলকে তাল করে দিত এবং এ প্রপাগন্ডা করতে একটু পিছপাও হতো না যে, মুহাম্মদ (সঃ) (নাউযুবিল্লাহ) সবকিছু এখান থেকে শিখে গেছেন এবং এখান থেকে মক্কায় গিয়ে নবী সেজে বসেছেন। মোটকথা যে যুগে কুর'আনের এ চ্যালেঞ্জ কুরাইশদের কাফের ও মুশরিকদের জন্য মৃত্যুর বারতা ঘোষণা করত এবং তাকে মিথ্যা বলার প্রয়োজন বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদদের তুলনায় তাদের জন্য ছিল অনেক বেশি, সে যুগে কোন ব্যক্তিও কোথাও থেকে এমন কোন উপাদান সংগ্রহ করে আনতে পারেনি যা থেকে একথা প্রমাণ হতে পারতো যে, মুহাম্মদ (স)- এর কাছে ওহী ছাড়া এ তথ্যগুলো সংগ্রহ করার দ্বিতীয় এমন কোন মাধ্যম আছে যার উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ কথাও জেনে রাখা উচিত, কুর'আন এই চ্যালেঞ্জ শুধু এখানেই দেয়নি বরং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাহিনী প্রসঙ্গে দিয়েছে। হযরত যাকারিয়া ও হযরত মারয়ামের কাহিনী বর্ণনা করে বলেছেঃ

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ -

"এ হচ্ছে অদৃশ্য খবরের অন্তরভূক্ত, যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে দিচ্ছি। তুমি তাদের আশেপাশে কোথাও ছিলে না যখন তারা মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বকে গ্রহণ করবে একথা জানার জন্য তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল। তুমি তখনও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা ঝগড়া করছিল।[১৬]

---

১৬. আল-কুর'আন, ০৩ঃ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইউসুফের (আ) কাহিনী বর্ণনা করার পর বলা হচ্ছে-

ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ -

"এ হচ্ছে গায়েবের খবরের অন্তরভূক্ত, যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে দিচ্ছি। তুমি তাদের (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইদের) আশেপাশে কোথাও উপস্থিত ছিলে না। যখন তারা নিজেদের করনীয় সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেছিল এবং যখন তারা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল।"[১৭]

অনুরূপভাবে হযরত নূহের বিস্তারিত কাহিনী বর্ননা করে বলা হয়েছেঃ

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ -

"এ কথাগুলো গায়েবের খবরের অন্তরভূক্ত, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়েছি। তোমার ও তোমার জাতির ইতিপূর্বে এর কোন জ্ঞান ছিল না।"[১৮]

এ জিনিসটির বার বার পুনরাবৃত্তি থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কুর'আন মজীদ যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব এবং মুহাম্মদ (স) যে আল্লাহর রসূল তার একটি প্রধান যুক্তি এই ছিল যে, শত শত হাজার হাজার বছর আগে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা আসছে একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে। ওহী ছাড়া সেগুলো জানার কোন উপায় তাঁর করায়ত্ব নেই। যেসব গুরুত্বপূর্ণ কারনের ভিত্তিতে নবী (স) এর সমকালীন লোকেরা বিশ্বাস করতে চলেছিল যে, যথার্থই তিনি আল্লাহর নবী এবং তাঁর কাছে আল্লাহর ওহী আসে এ জিনিসটি ছিল তাঁর অন্যতম। এখন যেকোন ব্যক্তি নিজেই ধারনা করতে পারে, ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীদের জন্য সে যুগে এ চ্যালেঞ্জের প্রতিবাদ করা কতটা গুরুত্ববহ হয়ে থাকতে পারে এবং তারা এর বিরুদ্ধে প্রমান সংগ্রহ করার জন্য কিভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া এটাও অনুমান করা যেতে পারে যে, যদি এ চ্যালেঞ্জের মধ্যে সামান্যতমও কোন দুর্বলতা থাকত তাহলে তাকে মিথ্যা প্রমান করার জন্য সাক্ষ-প্রমান সংগ্রহ করা সমকালীন লোকদের জন্য কঠিন হতো না।

এ সফরে মূসার তূর পাহাড়ের দিকে যাওয়া দেখে অনুমান করা যায় তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে সম্ভবত মিসরের দিকে যেতে চাচ্ছিলেন। কারণ মাদয়ান থেকে মিসরের দিকে যে পথটি গেছে তূর পাহাড় তার উপর অবস্থিত। সম্ভবত মূসা মনে করে থাকবেন, দশটি বছর চলে গেছে, যে ফেরাউনের শাসনামলে তিনি মিসর থেকে বের হয়েছিলেন সে মারা গেছে, এখন যদি আমি নীরবে সেখানে চলে যাই এবং নিজের পরিবারের লোকজনদের সাথে অবস্থান করতে থাকি তাহলে হয়তো আমার কথা কেউ জানতেই পারবে না।[১৯]

---

১৭. আল-কুর'আন, ১২ঃ ১০২

১৮. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৪৯

১৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৭১১)

(وَطُورِ سِينِينَ)

এবং সিনাই প্রান্তরে অবস্থিত তুরের।[২০]

(وَالطُّورِ)

কসম তুর পাহাড়ের।[২১]

পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থান

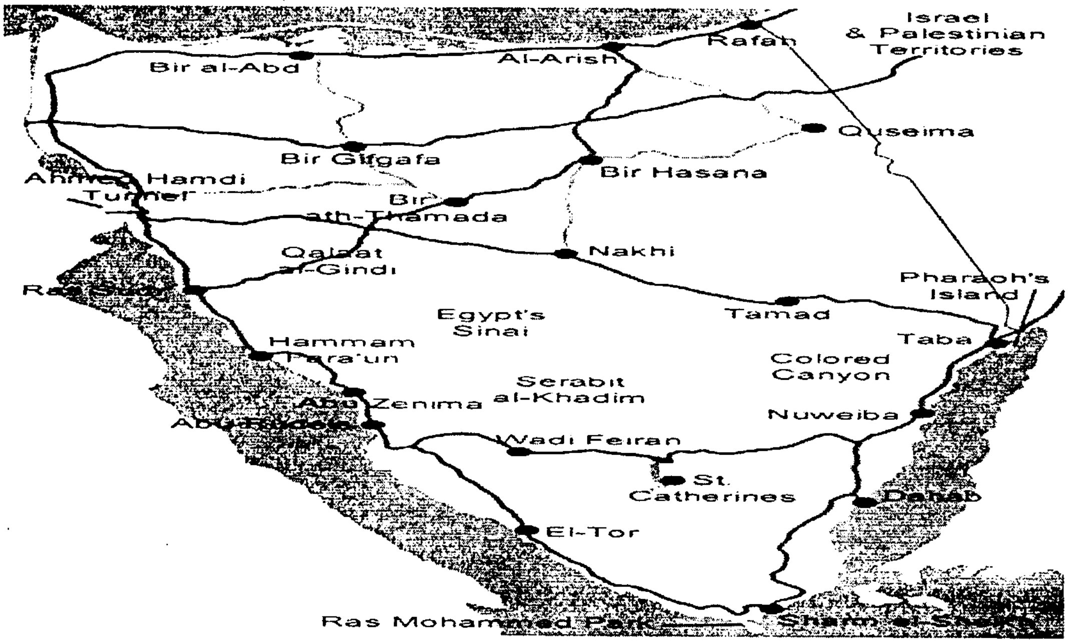

তুর পাহাড়ের অবস্থান

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী
তুর পাহাড়ের উপর মূসা (আ.)-এর ই'তেকাফ

হযরত মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা ছিল যে, বনী ইসরাঈলরা মিসরীয় শাসনের গোলামী হইতে যখন স্বাধীন হইয়া যাইবে, তখন তোমাকে শরীঅত প্রদান করে হবে। এখন সেই সময়টুকু এসে পড়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ পাকের ওহীর ইঙ্গিতে তুর পাহাড়ে গিয়ে উপনীত হলেন এবং তথায় আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত করার জন্য এ'তেকাফ করলেন, এই এ'তেকাফের মুদ্দত ছিল (৩০ দিন) এক মাস। কিন্তু তিনি পরে আরও দশ দিন বাড়াইয়া ৪০ দিনের চিল্লা পূর্ণ করিলেন।

---

২০. আল-কুর'আন, ৯৫ঃ ২
২১. আল-কুর'আন, ৫২ঃ ১

Dhaka University Institutional Repository

দাইলামী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে একটি রেওয়ায়ত উদ্ধৃত করেছেন, এর সারমর্ম এই – হযরত মূসা (আ)-এর এক মাসের এ'তেকাফ শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি আল্লাহ্ পাকের সাথে বাক্যালাপের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু তিনি একাধারে এক মাসকাল রোযার অবস্থায়ই অতিবাহিত করেছিলেন, সুতরাং মুখে দুর্গন্ধ অনুভব করেছিলেন। অতএব, তিনি এই অবস্থায় মহান আল্লাহ্র সাথে কথোপকথন করতে পছন্দ করলেন না। অতএব, তিনি সুগন্ধিযুক্ত একখণ্ড মাংস চিবালেন এবং খেলেন। তৎক্ষনাৎ আল্লাহ্ পাকের ওহী তাঁহাকে সতর্ক করল ঃ "মূসা! তুমি কথা বলার পূর্বে রোযা কেন ভাঙ্গিয়া ফেললে?" হযরত মূসা (আ) তার কারণ বর্ণনা করলেন, তখন আদেশ হল, "মূসা! এই মুদ্দতকে দশ দিন বাড়িয়ে চল্লিশ করে দাও। তুমি কি জান না যে, আমার এখানে একজন রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ মেশ্কের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" এরূপে চল্লিশ দিন (চিল্লা) পূর্ণ হল।

কিন্তু কুর'আন মজীদ শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছে যে, এই মুদ্দতটি প্রথমে ত্রিশ দিন ছিল। অতঃপর ১০ দিন বাড়াইয়া চল্লিশ করা হল, কারণ বর্ণনা করা হয় নাই। (রূহানী রিয়াযতের জন্য সূফিয়ায়ে কেরামের চিল্লা পালন করার নিয়ম খুব সম্ভব এই ঘটনা হইতেই নেয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতা বলে, কোন কাজে আল্লাহর সাহায্যে দৃঢ়তা লাভের জন্য সাধারণতঃ এই চিল্লা পালন করা খুবই হিতকর।)
এই ঘটনাটুকু কুর'আন মজীদ এরূপে বর্ণনা করেছে-

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً -

"আর আমি মূসার সহিত ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করেছিলাম। (অর্থাৎ, পূর্ণ একমাস তূর পাহাড়ে এ'তেকাফ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত করতে থাক। অতঃপর তোমাকে শরীঅত প্রদান করা হইবে। মূসা (আ) এই মুদ্দত পূর্ণ করিলেন) অতঃপর আমি তার উপর আরও দশ রাত্রি বৃদ্ধি করে তাকে (উক্ত মুদ্দতকে) পূর্ণ (চিল্লা) করে দিলাম, এই রূপে তাঁর পরওয়াদিগারের দরবারে হাযির থাকার নির্দিষ্ট মেয়াদ চল্লিশ রাত্রির পূর্ণ মেয়াদ হয়ে গেল।"[২২]

হযরত মূসা (আ) যখন 'তূর' পাহাড়ের 'চিল্লা' পালনের জন্য গমন করলেন, তখন তিনি (স্বীয় ভ্রাতা) হযরত হারূন (আ)-কে নিজের স্থলবর্তী করে গেলেন, যেন তিনি বনী ইসরাঈলকে সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং প্রত্যেক ব্যাপারে তাহাদের দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই বিষয়টি কুর'আন মজীদ এরূপে ব্যক্ত করেছে -

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ -

"আর মূসা (আ) স্বীয় ভ্রাতা হারূনকে বললেন, তুমি আমার অনুপস্থিতির কালে আমার কাওমের মধ্যে আমার প্রতিনিধি (স্থলবর্তী)-রূপে থাকবে এবং তাদের সংশোধনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পন্থায় অনুসরণ করিও না।"[২৩], [২৪]

---

২২. আল-কুর'আন, ৭: ১৪২
২৩. আল-কুর'আন, ৭ ঃ ১৭
২৪. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ১৩৩, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

বনী ইসরাঈল ও তূর পাহাড়

যাহোক, সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যখন পুনরায় জীবিত হয়ে কাওমের নিকট ফিরে আসল, তখন তারা কাওমের নিকট পূর্ণ ঘটনা তুলে ধরল এবং বলল, মূসা (আ) যা বলছেন তা সত্য। আর এতে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রাসূল।

এখন সুস্থ প্রকৃতির চাহিদা তো এই ছিল যে, এ সমস্ত শ্রবণ করে তাদের আল্লাহ্ তা'আলার শোকরগুযারী করা এবং তাঁর অনুগ্রহ এবং দানের প্রাচুর্যের প্রতি লক্ষ্য করে তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের স্বীকৃতির সহিত অবনত মস্তকে তাঁহার যাবতীয় নির্দেশ মানিয়া লওয়া। কিন্তু তার পরিবর্তে এই হল যে, তারা তাদের বক্রগতিই বহাল রাখল এবং তাদের নেতৃবৃন্দের সত্যায়ন সত্ত্বেও তাওরাতকে কবুল করতে বিরোধিতামূলক ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ করতে আরম্ভ করে দিল এবং হযরত মূসা (আ)-এর কথার প্রতি কর্ণপাত করল না।

হযরত মূসা (আ) তা দেখে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে রুজু করে কাওমের বিপথে চলার অভিযোগ পেশ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হতে আদেশ হল, এসমস্ত নাফরমানের জন্য আমি তোমাকে আরও একটি মু'জেযা প্রদান করছি। তা এই- যে তূর পাহাড়ের উপর তুমি আমার সাথে কথোপকথন করে থাক এবং যে পাহাড়ের উপর তোমার কাওমের মনোনীত নেতৃবৃন্দ হতে সরিয়া যেয়ে শামিয়ানার মত বনী ইসরাঈলের মাথার উপর আচ্ছন্ন হয়ে থাকে এবং অবস্থার ঘোষণা করে যে, মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার যথার্থ পয়গম্বর। তাওরাত নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার সত্য কিতাব। যদি এই উভয় বস্তু সত্য ও সততার প্রকাশ ক্ষেত্র না হত, তবে এই বিরাট মহান নিদর্শন তোমরা দেখতে পেতে না, যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টিরহস্যগত ফয়সালা হওয়া মাত্র তূর পর্বত তাহাদের মাথার উপর এসে শামিয়ানার মত দৃষ্টিগোচর হতে লাগল এবং অবস্থার ভাষার বলতে লাগল ঃ হে বনী ইসরাঈল! যদি তোমাদের বিবেক ও বুদ্ধি বলিতে কিছু অবশিষ্ট থাকে এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য করার জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তবে সত্য শ্রবণকারী কর্ণের দ্বারা শুন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন হয়ে তোমাদিগকে বিশ্বাস দেয়াচ্ছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মূসা (আ) আমার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক কয়েকবার আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথনের সম্মান লাভ করেছেন এবং তোমাদের সৎপথ ও হেদায়ত লাভের বিধান (তাওরাত)-ও আমারই পিঠের উপর তাঁকে প্রদান করা হয়েছে।

আর হে গাফলত ও অবাধ্যতার মদে মত্ত মানুষের দল! আমার অবস্থিতি, যা তোমাদের জন্য বিস্ময়কর হচ্ছে, তা এই বিষয়ের সাক্ষ্য যে, যখন মানুষের বক্ষের মধ্যস্থলে অন্তরের কোমলতা কঠোরতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখন তা একটি প্রস্তর খণ্ড; বরং তার চেয়েও অধিক কঠিন হয়ে যায় এবং হেদায়ত ও নছীহত তার ভিতরে কোন দিক হতেই প্রবেশ করতে পারে না। দেখ, আমি প্রস্তরখণ্ডসমূহের সমষ্টি পাহাড়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে কেমনভাবে দাসত্ব প্রদর্শন করছি। কিন্তু তোমার আমিত্বের অহংকারে কোন অবস্থাতেই 'না'কে 'হ্যাঁ' দ্বার বদল করতে প্রস্তুত নও। কুর'আন মজীদ এই সত্যই ব্যক্ত করেছে :

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً -

"অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল। অতএব, তাই হয়ে গেল যেমন প্রস্তর কিম্বা তার চেয়েও অধিক কঠিন।"[২৫,২৬]

---

২৫. আল-কুর'আন, ২; ৭৪

২৬. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ১৬০, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

সাফা-মারওয়া পাহাড়

সাফা-মারওয়া পাহাড় সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ -

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া হল আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং যে কেউ কা'বাঘরের হজ্জ বা উমরা পালন করে তার পৱে এ দু'টির মধ্যে প্রদৰিণ করাতে কোন পাপ নেই । আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন নেক কাজ করলে আল্লাহ্ তার পুরস্কার দেবেন, তিনি সর্বজ্ঞ।[২৭]

পরিচিতি

সাফা ও মারওয়া মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড় । আল্লাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ) কে হজ্জের যে সমস্ত অনুষ্ঠান শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ' করা বা দৌড়ানো ছিল অন্যতম । পরে মক্কায় ও তার আশপাশের এলাকায় মুশরিকী জাহেলীয়াত তথা পৌত্তলিক ধর্ম ছড়িয়ে পড়লে সাফার ওপর 'আসাফ' ও মারওয়ার ওপর 'নায়েলা'র পূজাবেদী নির্মাণ করা হয় । এর চারদিকে তাওয়াফ করা হতো । তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আরববাসীদের কাছে ইসলামের আলো পৌছাবার পর মুসলমানদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, সাফা ও মারওয়ার 'সাঈ' কি হজ্জের অনুষ্ঠানাদির অন্তরভুক্ত অথবা এটা নিছক জাহেলী যুগের মুশরিকদের উদ্ভত কোন অনুষ্ঠানের অন্তরভুক্ত করে তারা কোন মুশরিকী কাজ করে যাচ্ছে কি না এ ব্যাপারে তাদের মনে দ্বিধার সঞ্চার হয় ।

তাছাড়া হযরত আয়েশা (রা) এর রেওয়ায়াত থেকেও জানা যায়, মদীনাবাসীদের মনে আগে থেকেই সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ের ব্যাপারে অপছন্দ ও বিরক্তির ভাব ছিল । কারণ তারা ছিল 'মানাত' এর ভক্ত । 'আসাফ ' ও 'নায়েলা' কে তারা মানতো না । এসব কারণে মসজিদুল হারামকে কিব্লাহ নির্ধারিত করার সময় সাফা ও মারওয়া সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করা এবং এই পাহাড় দু'টির মাঝখানে দৌড়নো হজ্জের মূল অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ বলে লোকদের জানিয়ে দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল । আর এই সংগে লোকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল যে, এই দু'টি স্থানের পবিত্রতা জাহেলী যুগের মুশরিকদের মনগড়া নয় বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে।[২৮]

ক্বাবা শরীফের অদূরে অবস্থিত দুটি টিলার নাম যথাক্রমে সাফা ও মারওয়া। এ দুটির মধ্যে দ্রুত গতিতে হেটেঁ একাদিক্রমে সাত বার যাতায়াত করতে হয়। কার্যতঃ সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত ৪ বার এবং মারওয়া ৩বার যেতে হয়। অর্থাৎ সাফায় শুরু হয়ে এই হাঁটা মারওয়ায় শেষ হয়। নিয়ত করে সাফা থেকে হাঁটা শুরু করতে হয়। মাঝামাঝি স্থানে যেখান থেকে ক্বাবা দৃষ্টিগোচর হয় সেখানে দ্রুত গতিতে চলতে হয়। হাটার সময় দোআ দরূদ পাঠ করতে হয় এবং সমাপ্তির পর হাত তুলে মোনাজাত করতে হয়।

---

২৭. আল-কুর'আন, ২ঃ ১৫৮

২৮. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ১৬৬, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক

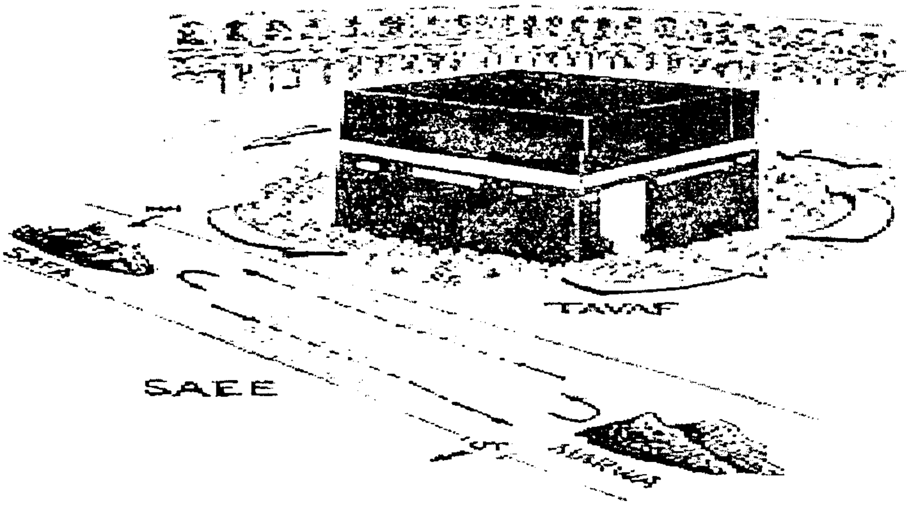

সাফা-মারওয়া পাহাড়ের দৃশ্য

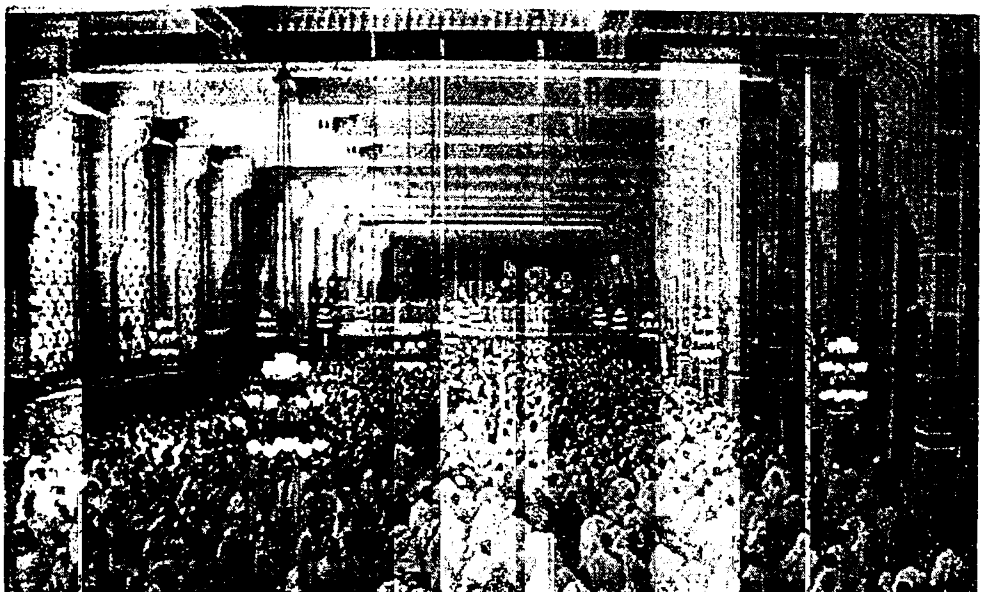

অবস্থান

সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সায়ী করার দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

জুদী পাহাড়

জুদী পাহাড় সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ
بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ -

সে বলল- অচিরেই আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ (আ) বললেন, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হয়ে গেল।[২৯]

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ
وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ -

আর নির্দেশ দেয়া হল- হে পৃথিবী ! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ ক্ষান্ত হও। পানি হ্রাস করার হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল। জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, দুরাত্মা কাফেররা নিপাত যাক।[৩০]

পরিচিতি

জুদী পাহাড়টি কুর্দিস্তান অঞ্চলে ইবনে উমর দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। বাইবেলে উল্লেখিত নৌকার অবস্থান স্থলের নাম আরারত বলা হয়েছে। এটি আর্মেনিয়ার একটি পাহাড়েরও নাম এবং একটি পাহাড় শ্রেণীর নামও। পাহাড় শ্রেণী বলতে যে আরারতের কথা বলা হয়েছে সেটি আর্মেনিয়ার উচ্চ মালভূমি থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে কুর্দিস্থান পর্যন্ত চলে গেছে। এ পাহাড় শ্রেণীর একটি পাহাড়ের নাম জুদী পাহাড়। আজো এ পাহাড়টি এ নামেই পরিচিত। প্রাচীন ইতিহাসে এটাকেই নৌকা থামার জায়গা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে বেরাসাস (BERASUS) নামে ব্যবিলনের একজন ধর্মীয় নেতা পুরাতন কুলদানী বর্ণনার ভিত্তিতে নিজের দেশের যে ইতিহাস লেখেন তাতে তিনি জুদী নামক স্থানকেই নূহের নৌকা থামার জায়গা হিসেবে উল্লেখ করেন। এরিষ্টটলের শিষ্য এবিডেনাস (ABYDENUS) ও নিজের ইতিহাস গ্রন্থে একথা সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি নিজের সময়ের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইরাকে বহু লোকের কাছে এ নৌকার অংশ বিশেষ রয়েছে। সেসব ধুয়ে তারা রোগ নিরাময়ের জন্য রোগীদের পান করায়।

---

২৯. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৪৩
৩০. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

এখানে যে প্লাবনের কথা বলা হয়েছে সেটি কি সারা পৃথিবীব্যাপী ছিল অথবা যে এলাকায় নূহের সম্প্রদায়ের অধিবাস ছিল কেবল সেই এলাকাভিত্তিক ছিল? এটি এমন একটি প্রশ্ন যার মীমাংসা আজো হয়নি। ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোর কারণে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এ প্লাবন এসেছিল সারা দুনিয়া জুড়ে।[৩১]

কিন্তু কুর'আনের কোথাও একথা বলা হয়নি। কুর'আনের ইংগিতসমূহ থেকে অবশ্যি একথা জানা যায় যে, নূহের প্লাবন থেকে যাদেরকে রক্ষা করা হয়েছিল পরবর্তী মানব বংশ তাদেরই আওলাদ।

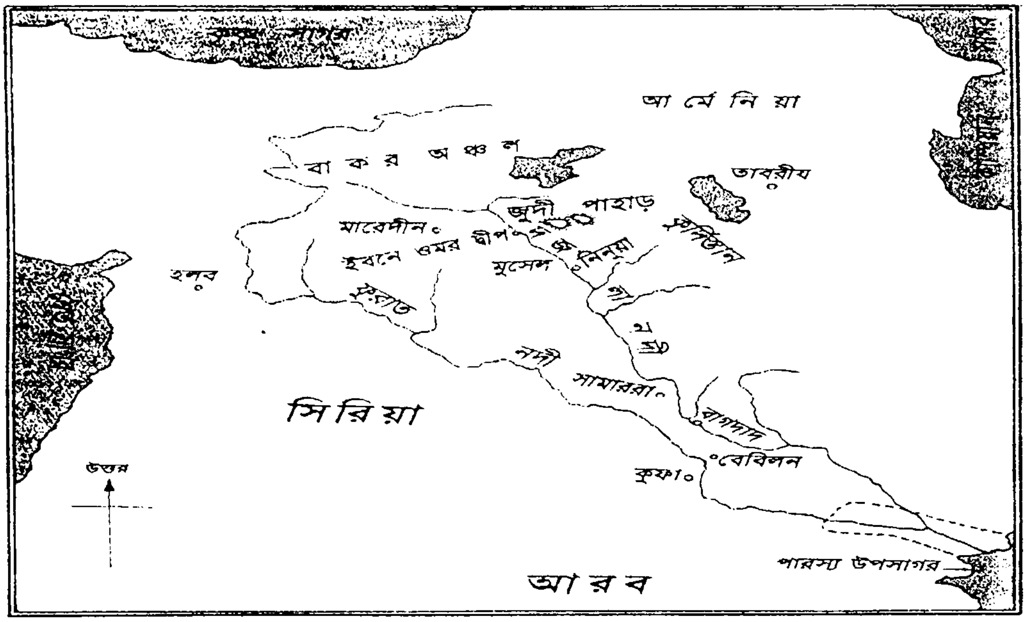

কওমে নূহ–এর এলাকা ও জুদী পাহাড়

কিন্তু এ থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, প্লাবন সারা দুনিয়া জুড়ে এসেছিল। কেননা একথা এভাবেও সত্য হতে পারে যে, সে সময় দুনিয়ার যে অংশ জুড়ে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল প্লাবন সে অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর প্লাবনের পরে মানুষের যে বংশধারার উন্মেষ ঘটেছিল তারাই ধীরে ধীরে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ মতবাদের সমর্থন দু'টি জিনিস থেকে পাওয়া যায়। এক, ঐতিহাসিক বিবরণ, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও মৃত্তিকাস্তরের ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দাজলা ও ফোরাত বিধৌত এলাকায় একটি মহাপ্লাবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সারা দুনিয়ার সমস্ত অংশ জুড়ে কোন এক সময় একটি মহাপ্লাবন হয়েছিল এমন কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুই, সারা দুনিয়ার অধিকাংশ জাতির মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে একটি মহাপ্লাবনের কাহিনী শ্রুত হয়ে আসছে। এমন কি অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও নিউগিনির মতো দূরবর্তী দেশগুলোর পুরাকালের কাহিনীতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোন এক সময় এসব জাতির পূর্বপুরুষরা পৃথিবীর একই ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিল এবং তখন সেখানেই এ মহাপ্লাবন এসেছিল। তারপর যখন তাদের বংশধররা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল তখন এ ঘটনার কাহিনীও তারা সংগে করে নিয়ে গিয়েছিল।[৩৩]

---

৩২. আদিপুস্তক ৭:১৮-২৪

৩৩. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ১৬০, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক অবস্থান

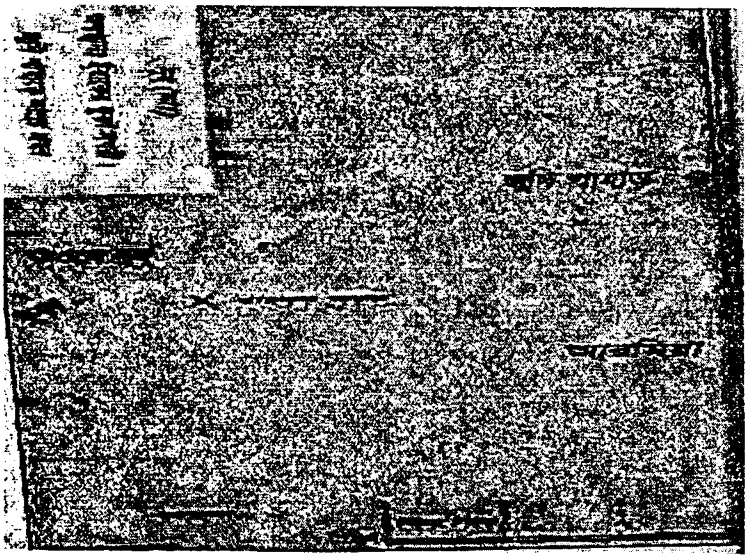

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

ফলকথা, যখন আল্লাহ্ পাকের আদেশে আযাব সমাপ্ত হইল, তখন নূহ্ (আ.) এর নৌকা জুদি পাহাড়ে যেয়ে ঠেকল।

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ
وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ -

আর নির্দেশ দেয়া হল- হে পৃথিবী ! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ ক্ষান্ত হও। পানি হ্রাস করার হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল। জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, দুরাত্মা কাফেররা নিপাত যাক।[৩৪]

তওরাত কিতাবে বলা হইয়াছে, 'জুদী' 'আরারাত' পর্বত শ্রেণীর মধ্যে অন্যতম পর্বত। আরারাত আসলে দ্বীপের নাম। অর্থাৎ ইহা সেই অঞ্চলের নাম, যাহা 'দাজলা' ও 'ফোরাত' নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী 'দিয়ারে বিকর' হইতে বাগদাদ পর্যন্ত বিস্তৃত।[৩৫]

---

৩৪. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৪৪

৩৫. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৬৪, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।)

Dhaka University Institutional Repository

জুদী পর্বতের অবস্থান

বাইবেলে উক্ত পর্বতকে "আরারাত" পর্বত বলা হয়েছে। দিজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিল নূহ (আ)-এর দাওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্রস্থল এবং পৃথক পৃথকভাবে প্রবাহিত হয়ে ইরাকে এসে মিলিত হয়েছে। অতঃপর ইহা পারস্য উপসাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে। আর্মেনিয়ার পর্বতশ্রেণী "আরারাত" অঞ্চলে অবস্থিত। এইজন্য বাইবেলে উহাকে আরারাত পর্বত বলা হয়েছে। কিন্তু কুর'আন কারীমে শুধুমাত্র নৌকা যে স্থানে গিয়া স্থির হয়েছিল অর্থা 'জুদী', তার উল্লেখ করা হয়েছে। তা দজলা নদীর পূর্ব দিকে মাওসিল-এর অন্তর্গত দিয়ার বাকর-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।[৩৬]

উহা আর্মেনিয়া পর্বতমালার সহিত মিলিত হয়েছে। কামূসূল মুহীতে বলা হয়েছে, জূদী জাযীরার একটি পর্বতের নাম যেখানে নূহ (আ)-এর নৌকা স্থির হয়েছিল। তাওরাতে একে আরারত বলা হয়েছে।[৩৭]

তাওরাতের ভাস্যকারগণের ধারণা হল ঃ জূদী সেই পর্বতশ্রেণীর নাম যা আরারাত ও জর্জিয়ার পর্বতশ্রেণীকে পরস্পরের সাথে একত্র করে দিয়েছে। তারা আরও বলেন, আলেকজাণ্ডার-এর সময়কালে গ্রীক লেখনীও এর সমর্থন করে। তদুপরি খৃস্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত এখানে একটি মসজিদ ছিল যাকে মা'বাদু'স-সাফীনা বলা হত।[৩৮,৩৯]

নোহ ও জল প্লাবনের বৃত্তান্ত

এইরূপে যখন ভূমণ্ডেল মনুষ্যধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। আর সদাপ্রভু বললেন, আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করেছি, তাকে ভূমণ্ডল হতে উচ্ছিন্ন করব; মনুষ্যের সাথে পশু, সরীসৃপ, জীব ও আকাশের পক্ষীদিগকেও উচ্ছিন্ন করব। কেননা তাদের নির্মাণ প্রযুক্ত আমার অনুশোচনা হচ্ছে। (কিন্তু) নোহ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইলেন। নোহের বংশ-বৃত্তান্ত এই ঃ নোহ তৎকালীন লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও সিদ্ধলোক ছিলেন, নোহ, শেম, হাম ও যেফৎ নামে তিন পুত্রের জন্ম দেন। তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট, পৃথিবী দৌরাত্মে পরিপূর্ণ ছিল। আর ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করলেন, আর দেখ ইহা ভ্রষ্ট হয়েছে, কেননা পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হয়েছিল। তখন ঈশ্বর নোহকে বললেন, আমি সকল প্রাণীকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, কেননা তাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্মে পরিপূর্ণ হয়েছে; আর দেখ আমি পৃথিবীর সাথে তাদেরকে বিনষ্ট করব। তুমি গোদর কাষ্ঠ দ্বারা এক জাহাজ নির্মাণ করবে ও তার ভিতরে ও বাহিরে ধুনা দিয়া লেপন করবে। এই প্রকারে তা নির্মাণ করবে।

---

৩৬. ইয়াকুত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, ২খ., ১৭৯
৩৭. আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৩৭
৩৮. হিফজুর রাহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুর'আন , ১খ., ৮৫
৩৯. সীরাত বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ: ২২৭, ইফাবা, সম্পাদনা পরিষদ, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

জাহাজ দৈর্ঘ্যে তিন শত হাত, প্রস্থে পাঁচ শত হাত ও উচ্চতায় ত্রিশ হাত হবে। আর তার ছাদের এক হাত নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করে রাখবে ও জাহাজের পার্শ্বে দ্বার রাখতেব; তার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা নির্মাণ করবে। আর দেখ আকাশের নীচে প্রাণবায়ু বিশিষ্ট যত জীব-জন্তু আছে সকলকে বিনষ্ট করণার্থে আমি পৃথিবীর উপরে জল প্লাবন আনব, পৃথিবীস্থ সকলে প্রাণ ত্যাগ করবে। কিন্তু তোমার সাথে আমি নিজস্ব নিয়ম স্থির করব; তুমি আপন পুত্রগণ, স্ত্রী ও পুত্রবধূদিগকে সংগে নিয়ে সেই জাহাজে প্রবেশ করবে। আর বংশবিশিষ্ট সমস্ত জীব-জন্তুর স্ত্রী-পুরুষ জোড়া জোড়া নিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষার্থে নিজের সাথে সেই জাহাজে প্রবেশ করাবে। সর্ব জাতীয় পক্ষী ও সর্বজাতীয় পশু ও সর্ব জাতীয় ভূচর সরীসৃপ জোড় জোড় প্রাণ রক্ষার্থে তোমার নিকটে প্রবেশ করবে। আর তোমার ও তাদের আহারার্থে তুমি সর্বপ্রকার খাদ্য সামগ্রী এনে আপনার নিকটে সঞ্চয় করবে। তাতে নোহ্ সেরূপ করলেন, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই সকল কর্ম করলেন।[৪০]

আর সদাপ্রভু নোহকে বললেন, তুমি সপরিবারে জাহাজে প্রবেশ কর, কেননা এই কালের লোকদের মধ্যে আমার সাক্ষাতে তোমাকেই ধার্মিক দেখেছি। তুমি শুচি পশুর স্ত্রী-পুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া এবং অশুচি পশুর-স্ত্রী পুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির এক এক জোড়া এবং আকাশের পক্ষীদিগেরও স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া সমস্ত ভূমণ্ডলে তাদের বংশ রক্ষার্থে নিজের সঙ্গে রাখ। কেননা সাত দিনের পর আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবা-রাত্র বৃষ্টি বর্ষায়ে আমার সৃষ্টি যাবতীয় প্রাণীকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করব। তখন নোহ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই সকল কর্ম করলেন। নোহের ছয় শত বৎসর বয়সে পৃথিবীতে জল প্লাবন হল, জল প্লাবন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নোহ ও তার পুত্রগণ ও তার স্ত্রী ও পুত্রবধুগণ জাহাজে প্রবেশ করলেন।

নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে শুচি অশুচি পশুর এবং পক্ষীর ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবের স্ত্রী-পুরুষ জোড়া জোড়া জাহাজে নোহের নিকট প্রবেশ করল। পরে সেই সাত দিন গত হলে পৃথিবীতে জল প্লাবন হল। নোহের বয়সের ছয় শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে মহা জলধির সমস্ত স্রোতধারা উথলিয়ে উঠল এবং আকাশের বাতায়ন সকল মুক্ত; তাতে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্র মহাবৃষ্টি হল। সেই দিন নোহ এবং শেম, হাফ ও যেফৎ নামে নোহের পুত্রগণ এবং তাদের সাথে নোহের স্ত্রী ও তিন পুত্রবধূ জাহাজে প্রবেশ করলেন। আর তাদের সহিত সর্ব জাতীয় বন্য পশু, সর্ব জাতীয় গ্রাম্য পশু, সর্ব জাতীয় ভূচর সরীসৃপ জীব ও সর্ব জাতীয় পক্ষী, সর্ব জাতীয় খেচর, প্রাণবায়ুবিশিষ্ট সর্ব প্রকার জীব-জন্তু জোড়া জোড়া জাহাজে নোহের নিকট প্রবেশ করল।

ফলত তার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষ প্রবেশ করল। পরে সদাপ্রভু তাহার পশ্চাৎদ্বার বন্ধ করলেন। আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে জল প্লাবন হল, তাতে পানি বৃদ্ধি পাই জাহাজ ভাসালে তা মৃত্তিকা ছেড়ে উঠল। পরে পানি প্রবল হয়ে পৃথিবীতে অতিশয় বৃদ্ধি পেল এবং জাহাজ পানির উপর ভাসতে থাকল। আর পৃথিবীতে পানি অত্যন্ত প্রবল হয়ে আকাশ মণ্ডলের অধঃস্থিত সকল মহাপর্বত নিমগ্ন হল। তার উপরে পনের হাত পানি উঠে প্রবল হল, পর্বত সকল নিমগ্ন হল। তাতে ভূচর যাবতীয় প্রাণী-পক্ষী, গ্রাম্য ও বন্য পশু, ভূচর সরীসৃপ সকল এবং মনুষ্য সকল মরল; এইরূপে ভূমণ্ডল নিবাসী সমস্ত প্রাণী-মনুষ্য, পশু সরীসৃপ জীব ও আকাশীয় পক্ষী সকল উচ্ছিন্ন হল, কেবল নোহ ও তার সঙ্গী জাহাজস্থ প্রাণীরা বাঁচল। আর পানি পৃথিবীর উপরে এক শত পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত প্রবল থাকল।[৪১]

---

৪০. Genesis 6 : 1-22; বাংলা অনু. পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক, পৃ. ৭-৮; ঈষৎ পরিবর্তনসহ
৪১. Genesis 7 : 1-24; বাংলা অনু. পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

আর ঈশ্বর নোহকে ও জাহাজে স্থিত তাহার সঙ্গী পশ্বাদি যাবতীয় প্রাণীকে স্মরণ করলেন, ঈশ্বর পৃথিবীতে বায়ু বহালেন, তাতে পানি থামল। আর জলধির স্রোতধারা ও আকাশের বাতায়ন সকল বন্ধ এবং আকাশের মহাবৃষ্টি নিবৃত্ত হল। আর পানি ক্রমশ ভূমির উপর হতে সরে গিয়া এক শত পঞ্চাশ দিনের শেষে হ্রাস পেল। পরে দশম মাস পর্যন্ত পানি ক্রমশ সরে হ্রাস পেল। ঐ দশম মাসের প্রথম দিনে পর্বতগুলোর শৃঙ্গ দেখা গেল।

আর চল্লিশ দিন গত হলে নোহ আপনার নির্মিত জাহাজের বাতায়ন খুলে একটি দাঁড় কাক ছেড়ে দিলেন; তাতে সে উড়ে ভূমির উপরস্থ পানি শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত ইতস্ততঃ গতায়াত করল। আর ভূমির উপরে পানি হ্রাস পেয়েছে কি না তা জানার জন্য তিনি নিজের নিকট হতে একটি কপোত ছেড়ে দিলেন। তাতে সমস্ত পৃথিবী পানিতে আচ্ছাদিত থাকায় কপোত পদার্পণের স্থান পেল না, তাই জাহাজে তার নিকট ফিরে আসল। তখন তিনি হাত বাড়িয়ে উহাকে ধরলেন এবং জাহাজের ভিতর আপনার নিকট রাখলেন। পরে তিনি আর সাত দিন বিলম্ব করি জাহাজ হতে সেই কপোত পুনর্বার ছেড়ে দিলেন এবং কপোতটি সন্ধ্যাকালে তার নিকট ফিরে আসল; তার চঞ্চুতে জিত বৃক্ষের একটি নবীন পত্র ছিল; এতে নোহ বুঝলেন, ভূমির উপরে পানি হ্রাস পেয়েছে। পরে তিনি আর সাত দিন বিলম্ব করে সেই কপোত ছেড়ে দিলেন। তখন সে তার নিকট আর ফিরে আসল না। (নোহের বয়সের) ছয় শত এক বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথিবীর উপরে পানি শুষ্ক হল; তাতে জাহাজের ছাদ খুলে দৃষ্টিপাত করলেন, ভূতল নির্জল। পরে দ্বিতীয় মাসের সাতাইশতম দিনে ভূমি শুষ্ক হইল।[৪২,৪৩]

উহুদ পাহাড়

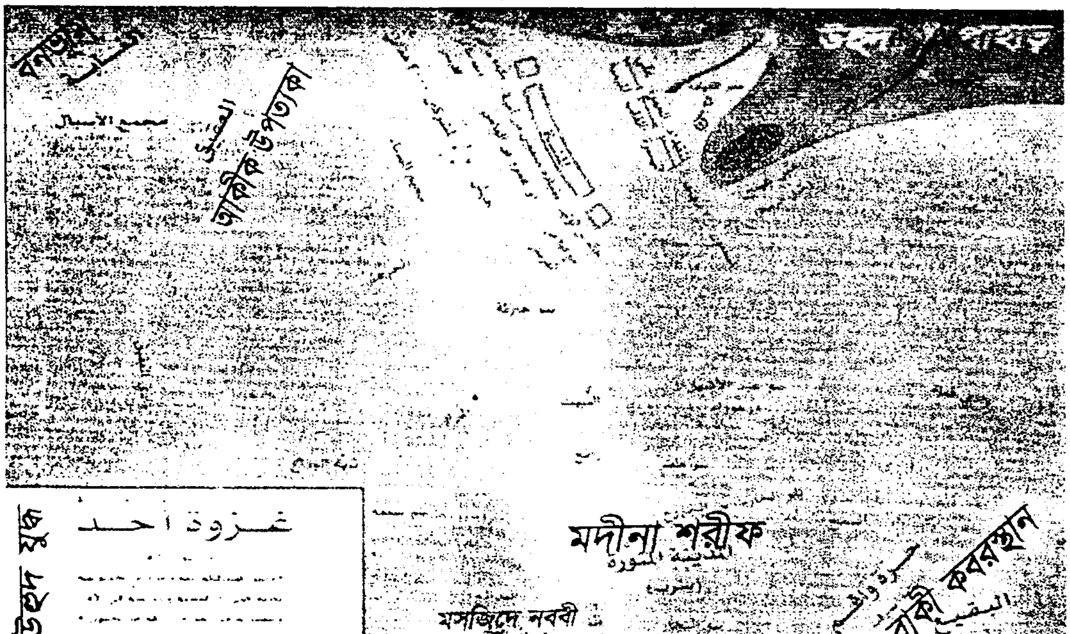

---

৪২. প্রাগুক্ত, ৪ ঃ ১-১৪, বাংলা আদিপুস্তক, পৃ-৯-১০
৪৩. সীরাত বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ: ১৯০, ইফাবা, সম্পাদনা পরিষদ, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

উহুদ পাহাড় সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

(হে নবী! মুসলমানদের সামনে সে সময়ের কথা বর্ণনা কারো) যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজের ঘর থেকে বের হয়েছিল এবং (উহুদের ময়দানে) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করেছিলে। আল্লাহ সমস্ত কথা শুনেন এবং তিনি সবকিছু ভালো করে জানেন।[৪৪]

এখান থেকে চতুর্থ ভাষণ শুরু হচ্ছে। উহুদ যুদ্ধের পর এটি নাযিল হয়। এখানে ওহোদ যুদ্ধের ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। আগের ভাষণটি শেষ করার সময় বলা হয়েছিল, "যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন কৌশল কার্যকর হতে পারবে না"। এখন যেহেতু ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণেই দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে সবরের অভাব ছিল এবং কোন কোন মুসলমানের এমন কিছু ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল যা ছিল আল্লাহভীতি বিরোধী, তাই তাদের এই দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্কবাণী সম্বলিত এ ভাষণটি উপরোক্ত ভাষনের শেষ বাক্যটির পরপরই তার সাথে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ ভাষণটির বর্ণনাভংগী বড়ই বৈশিষ্ট্যময়। উহুদ যুদ্ধের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটির ওপর পৃথক পৃথকভাবে কয়েকটি মাপাজোখা শব্দ সমন্বিত ভারসাম্যপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে শিক্ষনীয় মন্তব্য করা হয়েছে। এগুলো বুঝতে হলে সংশ্লিষ্ট ঘটণাগুলোর পটভূমি জানা একান্ত অপরিহার্য।

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের শুরুতে মক্কার কুরাইশরা প্রায় তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে। সংখ্যায় বেশী হবার পরও অস্ত্রশস্ত্রও তাদের কাছে ছিল মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী। এর ওপর ছিল তাদের বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার তীব্র আকাংখা। নবী (স) ও অভিজ্ঞ সাহাবীগণ মদীনায় অবরুদ্ধ হয়ে প্রতিরক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবার পক্ষপাতি ছিলেন: কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি এমন কতিপয় শাহাদাতের আকাংখায় অধীরভাবে প্রতীক্ষারত তরুণ সাহাবী শহরের বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করার ওপর জোর দিতে থাকেন। অবশেষে তাদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে নবী (স) বাইরে বের হবার ফায়সালা করেন। এক হাজার লোক তাঁর সাথে বের হন। কিন্তু 'শওত' নামক স্থানে পৌঁছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশো সংগী নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তার এহেন আচরণে মুসলিম সেনাদল বেশ বড় আকারের অস্থিরতা ও হতাশার সঞ্চার হয়। এমন কি বনু সাল্‌মা ও বনু হারেসার লোকরা এত বেশী হতাশ হয়ে পড়ে যে, তারাও ফিরে যাবার সংকল্প করে ফেলেছিল।

কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ী সাহাবীগণের প্রচেষ্টায় তাদের মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা দূর হয়ে যায়। এই অবশিষ্ট সাতশো সৈন্য নিয়ে নবী (স) সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং ওহোদ পর্বতের পাদদেশে (মদীনা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে) নিজের সেনাবাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যার ফলে পাহাড় থাকে তাদের পেছন দিকে এবং সামনের দিকে থাকে কুরাইশ সেনাদল। একপাশে এমন একটি গিরিপথ ছিল, যেখান থেকে আকস্মিক হামলা হবার আশংকা ছিল। সেখানে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের একটি বাহিনী মোতায়েন করেন। তাদেরকে জোর তাকীদ দিয়ে জানিয়ে দেনঃ "কাউকে আমাদের ধারে কাছে ঘেষঁতে দেবে না।

---

৪৪. আল-কুর'আন, ৩ঃ ১২১

Dhaka University Institutional Repository

কোন অবস্থায় এখান থেকে সরে যাবে না। যদি তোমরা দেখো, পাখিরা আমাদের গোশত ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে, তাহলেও তোমরা নিজেদের জায়গা থেকে সরে যাবে না"। অতপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লা ভারী থাকে। এমনকি মুশরিকদের সেনাবাহিনীতে বিশৃংখলা দেখা দেয়। তারা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু এই প্রাথমিক সাফল্যকে পূর্ণ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়ে দেবার পরিবর্তে গনীমাতের মাল আহরণ করার লোভ মুসলমানদের বশীভূত করে ফেলে। তারা শত্রু সেনাদের ধন-সম্পদ লুট করতে শুরু করে।

ওদিকে যে তীরন্দাজদেরকে পেছনে দিকের হেফাজতে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা যখন দেখতে পেলো শত্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে এবং গনীমাতের মাল লুট করা হচ্ছে তখন তারাও নিজেদের জায়গা ছেড়ে গনীমাতের মালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর তাদেরকে নবী (স) এর কড়া নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বার বার বাঁধা দিতে থাকেন। কিন্তু মাত্র কয়েকজন ছাড়া কাউকে থামানো যায় নি। কাফের সেনাদলের একটি বাহিনীর কমাণ্ডার খালেদ ইবনে অলীদ যথা সময়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি নিজের বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের পেছন দিক থেকে এক পাক ঘুরে এসে গিরিপথে প্রবেশ করে আক্রমণ করে বসেন। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর তাঁর মাত্র কয়েকজন সংগীকে নিয়ে এই আক্রমণ সামাল দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

গিরিপথের ব্যূহ ভেদ করে খালেদ তার সেনাদল দিয়ে অকস্মাৎ মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। খালেদের বাহিনীর এই আক্রমণ পলায়নের কাফের বাহিনীর মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। তারাও পেছন ফিরে মুসলমানদের ওপর একযোগে আক্রমণ করে বসে। এভাবে মুহূত্বের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা বদলে যায়। হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার মুখোমুখি হয়ে মুসলমানরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের একটি বড় অংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়নমুখী হয়। তবুও কয়েক জন সাহসী সৈন্য তখনো যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন।

এমন সময় গুজব ছড়িয়ে পড়ে, নবী (স) শহীদ হয়ে গেছেন। এ গুজবটি সাহাবায়ে কেরামের অবশিষ্ট বাহ্যিক জ্ঞানটুকুও বিলুপ্ত করে দেয়। এতক্ষণ যারা ময়দানে লড়ে যাচ্ছিলেন এবার তারাও হিম্মতহারা হয়ে বসে পড়েন। এ সময় নবী (স) এর চারপাশে ছিলেন মাত্র দশ বারো জন উৎসর্গীত প্রাণ মুজাহিদ। তিনি নিজেও আহত ছিলেন। পরিপূর্ণ পরাজয়ে আর কিছুই বাকি ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে সাহাবীগণ জানতে পারলেন, নবী (স) জীবিত আছেন। কাজেই তারা সবদিক থেকে একে একে তাঁর চারদিকে সমবেত হতে থাকে। তারা তাঁকে নিরাপদে পর্বতের ওপরে নিয়ে যান। এ সময়ের এ বিষয়টি আজো দুর্ব্বোধ্য রয়ে গেছে এবং এ প্রশ্নটির জবাব আজো খুঁজে পাওয়া যায়নি যে,কাফেররা তখন অগ্রবর্তী হয়ে ব্যাপকভাবে আক্রমণ না চালিয়ে কিসের তাড়নায় নিজেরাই মক্কায় ফিরে গিয়েছিল? মুসলমানরা এত বেশী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে পূনর্বার এক জায়গায় একত্র হয়ে যথারীতি যুদ্ধ শুরু করা কঠিন ছিল কাফেররা তাদের বিজয়কে পূর্ণতার প্রান্তসীমায় পৌছাতে উদ্যোগী হলে তাদের সাফল্য লাভ অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তারা নিজেরাই বা কেন ময়দানে ছেড়ে চলে গিয়েছিল তা আজো অজানা রয়ে গেছে।

মক্কার কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে তৃতীয় হিজরীতে মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। রাসূল (স) সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শক্রমে মদীনার বাইরে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে যেয়ে জিহাদ করার সিদ্ধান্ত দিলেন। ১০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি বের হলেন। পথিমধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নেতৃত্বে ৩০০ সৈন্য পালিয়ে গেল। যুদ্ধে মুসলমানদের সামরিক বিপর্যয় হলেও পরবর্তীতে নআল্লাহ তা'আলা বিজয় দিলেন।[৪৫]

---

৪৫. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ১৬০, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم
مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ
وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ -

আল্লাহ তোমাদের কাছে (সাহায্য ও সমর্থনদানের) যে ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন। শুরুতে তাঁর হুকুমে তোমরাই তাদেরকে হত্যা করেছিলে। কিন্তু যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পারস্পারিক মতবিরোধে লিপ্ত হলে আর যখনই আল্লাহ তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন যার ভালোবাসায় তোমরা বাঁধা ছিলে (অর্থাৎ গনীমাতের মাল), তোমরা নিজেদের নেতার হুকুম অমান্য করে বসলে, কারণ তোমাদের কিছু লোক ছিল দুনিয়ার প্রত্যাশী আর কিছু লোকের কাম্য ছিল আখেরাত, তখনই আল্লাহ কাফরদের মোকাবিলায় তোমাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তবে যথার্থই আল্লাহ এরপরও তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন ।কারণ মুমিনদের প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন।[৪৬]

ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার পথে বেশ কয়েক মনযিল দূরে চলে যাবার পর মুশরিকদের টনক নড়লো। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, এ আমরা কি করলাম! মুহাম্মাদ (স) এর শক্তি ধ্বংস করার যে সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম, তা হেলায় হারিয়ে ফেললাম? কাজেই তারা এক জায়গায় থেমে গিয়ে পরামর্শ করতে বসলো। সিদ্ধান্ত হলো, এখনি মদীনার ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ চালাতে হবে। সিদ্ধান্ত তো তারা করে ফেললো তড়িঘড়ি। কিন্তু আক্রমণ করার আর সাহস হলো না। কাজেই মক্কায় ফিরে এলো। ওদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও আশংকা ছিল, কাফেররা আবার ফিরে এসে মদীনার ওপর আক্রমণ না করে বসে। তাই ওহোদ যুদ্ধের পরদিনই তিনি মুসলমানদের একত্র করে বললেন, কাফেরদের পেছনে ধাওয়া করা উচিত। যদিও সময়টা ছিল অত্যন্ত নাজুক তবুও যারা সাচ্চা মু'মিন ছিলেন তাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। এ জায়গাটি মদীনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। এ আয়াতে এ প্রাণ উৎসর্গকারী মু'মিন দলের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।[৪৭]

ওহোদ থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে গিয়েছিল, আগামী বছর বদর প্রান্তরে আমাদের সাথে তোমাদের আবার মোকাবিলা হবে। কিন্তু নির্ধারিত সময় এগিয়ে এলে আর তার সাহসে কুলালো না। কারণ সে বছর মক্কায় দুর্ভিক্ষ চলছিল। তাই সে মান বাঁচাবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলো। গোপনে এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠিয়ে দিল। সে মদীনায় পৌঁছে মুসলমানদের মধ্যে এ খবর ছড়াতে লাগলো যে, এ বছর কুরাইশরা বিরাট প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা এত বড় সেনাবাহিনী তৈরী করছে যার মোকাবিলা করার সাধ্য আরবের কারো নেই। তার উদ্দেশ্য ছিল, এ প্রচারণায় ভীত হয়ে মুসলমানরা নিজেদের জায়গায় বসে থাকবে।

---

৪৬. আল-কুর'আন, ৩ঃ ১৫২

৪৭. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ১৬০, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

মোকাবিলা করার জন্য বাইরে আসার সাহস তাদের হবে না। ফলে যুদ্ধক্ষেত্র না আসার দায় থেকে কাফেররা মুক্ত হয়ে যাবে। আবু সুফিয়ানের এ চালবাজি মুসলমানদের এমনভাবে প্রভাবিত করলো যে, নবী সাল্লালআহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের বদরের দিকে চলার আহবান জানালেন তখন তাতে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেলো না। অবশেষে আল্লাহর রসূল ভরা মজলিসে ঘোষণা করে দিলেন, কেউ না গেলে আমি একাই যাবো। এ ঘোষনার পর পনেরোশো প্রাণ উৎসর্গকারী মুজাহিদ তাঁর সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। তাদের সাথে করে নিয়ে তিনি বদরে হাযির হলেন।

ওদিকে আবু সুফিয়ান দু'হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকলো। কিন্তু দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর সে তার সাথীদের বললো, এ বছর যুদ্ধ করার সংগত হবে না। আগামী বছর আমরা আসবো। কাজেই নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে সে ফিরে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট দিন পর্যন্ত বদর প্রান্তরে তার অপেক্ষা করলেন। এসময়ের মধ্যে তাঁর সাথীরা একটি ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে কাজ-কারবার করে প্রচুর অর্থলাভ করলেন। তারপর যখন খবর পাওয়া গেলো, কাফেররা ফিরে গেছে তখন তিনি সংগী-সাথীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন।[৪৮]

পরিচিতি

উহুদ ঃ

'উহুদ' মদীনার একটি পাহাড়ের নাম, ইহা মদীনা মুনাউওয়ারাহ্ হতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এটা সেই স্থান, যেখানে হিজরী ৩ সনের শাউয়াল মোতাবেক ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান এবং মুশরিকদের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধ হয়েছিল। এই কারণে অর্থাৎ এই স্থানের নামানুসারে এই যুদ্ধটির নাম গায্ওয়ায়ে উহুদ হয়েছে।[৫০]

---

৪৯. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ১৬০, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

৫০. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৫খ, পৃ. ২৩৫, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক অবস্থান

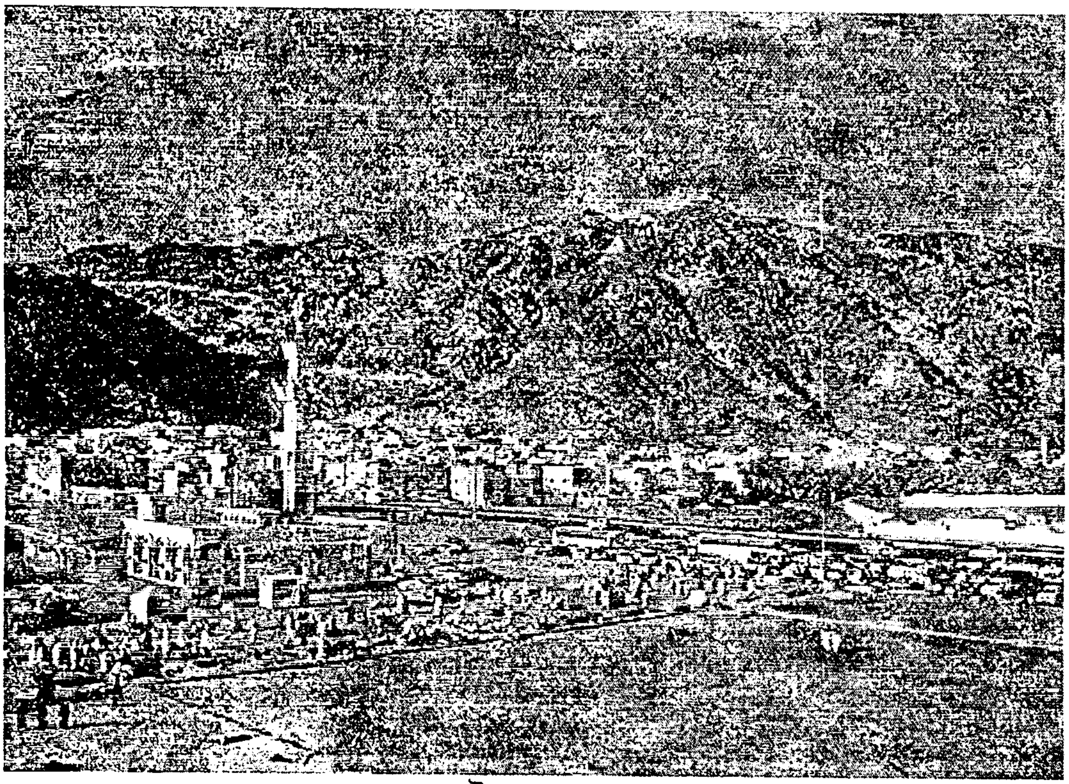

উহুদ পাহাড়

উহুদ পাহাড়ের অবস্থান

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -

স্মরণ কর, যখন তোমরা পালাবার কাজে এমনই ব্যস্ত ছিলে যে, কারোর দিকে ফিরে তাকাবার হুঁশও কারো ছিল না এবং রসূল তোমাদের পেছনে তোমাদের ডাকছিল। সে সময় তোমাদের এহেন আচরণের প্রতিফল স্বরুপ আল্লাহ তোমাদের দিলেন দুঃখের পর দুঃখ। এভাবে তোমরা ভবিষ্যতে এই শিক্ষা পাবে যে, যা কিছু তোমাদের হাত থেকে বের হয়ে যায় অথবা যে বিপদই তোমাদের ওপর নাযিল হয়, সে ব্যাপারে দুঃখিত হবে না। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে জানেন।[৫১]

৫১. আল-কুর'আন, ৩ঃ ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

যখন মুসলমানদের ওপর হঠাৎ একই সময় দু'দিক থেকে আক্রমণ হলো এবং তাদের সারিগুলো ভেঙে চারদিকে বিশৃংখলা অবস্থায় ছড়িয়ে পড়লো তখন কিছু লোক মদীনার দিকে পালাতে লাগলেন এবং কিছু ওহোদ পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও সরে গেলেন না। চারদিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ হচ্ছিল। তার চারদিকে ছিলমাত্র দশ বারোজন লোকের একটি ছোট্ট দল। এহেন সংগীণ অবস্থায়ও আল্লাহর নবী পাহাড়ের মতো নিজে অটলভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি পালায়নপর লোকদের ডেকে ডেকে বলছিলেন- "আল্লার বান্দারা, আমার দিকে এসো! আল্লাহর বান্দারা, আমার দিকে এসো"।

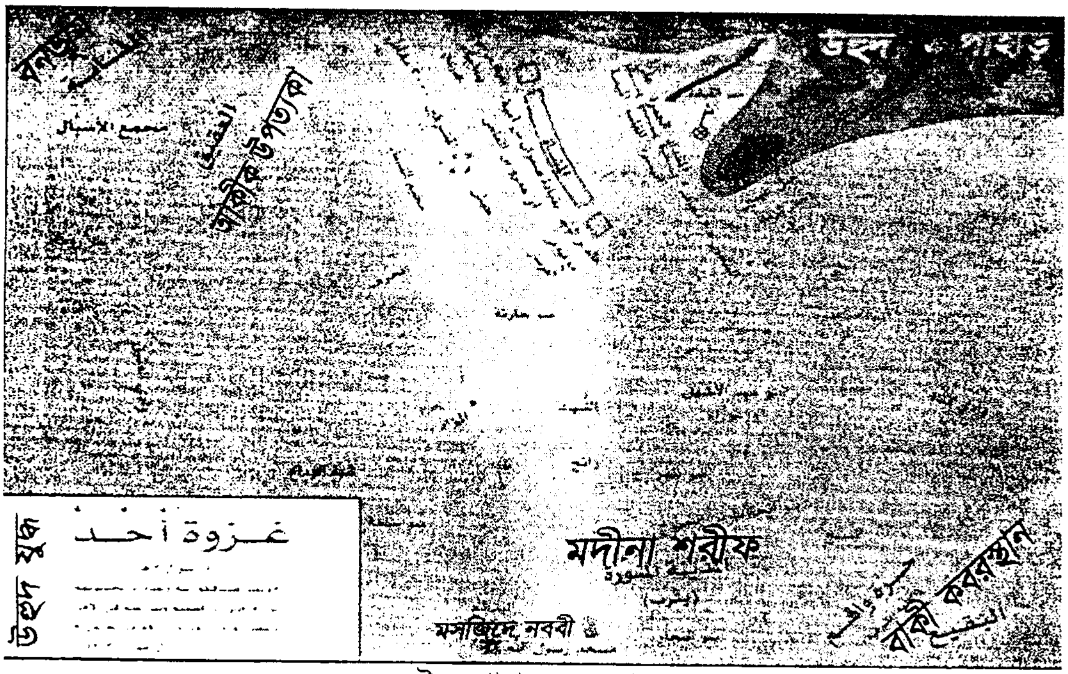

উহুদ পাহাড়ের অবস্থান

দুঃখ পরাজয়ের, দুঃখ নবী (স) এর মৃত্যু সংবাদের। দুঃখ নিজেদের বিপুল সংখ্যক নিহত ও আহতদের । দুঃখ এই চিন্তায় যে, এখন নিজেদের বাড়ি-ঘরেরও নিরাপত্তা নেই এবং এখনই মদীনার সমগ্র জনসংখ্যার চাইতেও বেশী তিন হাজার শত্রু সৈন্য পরাজিত সেনাদলকে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে শহরের গলি কুচায় ঢুকে পড়বে এবং নগরীর সবকিছু ধ্বংস ও বরবাদ করে দেব।

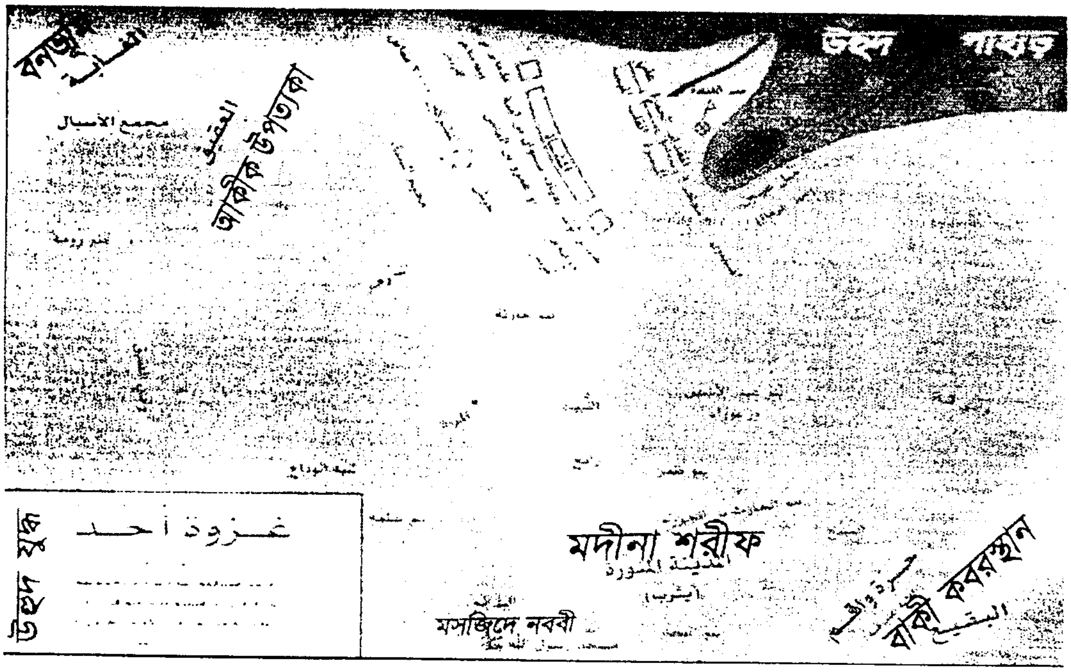

উহুদ যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করলো বটে, কিন্তু যুদ্ধের মাধ্যমে তারা যেনো ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়লো। এই প্রথম যুদ্ধেই তারা দৃঢ়তার সঙ্গে কাফিরদের মুকাবেলা করেছিল এবং কাফিরদেরকেও শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে পিছু হটতে হয়েছিল। এ ঘটনা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমগ্র আরব জনগোষ্ঠীকে প্রচণ্ড ভাবে উত্তেজিত করে দিলো। যারা এই নয়া আন্দোলনের দুশমন ছিল , তারা এ ঘটনার পর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তদুপরি মক্কার যে সব কুরাইশ সর্দার এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তাদের রক্তের বদলা নেবার জন্যে অসংখ্য চিত্ত অস্থির হয়ে উঠলো। আরবে যেকোন এক ব্যক্তির রক্তই পুরুষানুক্রমে যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। আর এখানে তো এমন অনেক ব্যক্তিই নিহত হয়েছিল ,যাদের রক্তমূল্য অসংখ্য যুদ্ধে ও আদায় হতে পারতো না। তাই চারদিকে ঝড়ের আলামত দেখা যেতে লাগলো।

ইহুদীদের যে সব গোত্র ইতঃপূর্বে মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছিলো, তারা চুক্তির কোন মর্যাদা রক্ষা করলো না। এমন কি তারা খোদা,নবুয়্যাত আখিরাত এবং কিতাবের প্রতি ঈমান পোষণের দাবি করার ফলে যেখানে মুসলমানদের সাথে অধিকতর নৈকট্য থাকা উচিত ছিলো,সেখানে মুশরিক কুরাইশদের প্রতিই তাদের সমস্ত সহানুভূতি উপচে পড়তে লাগলো। তারা খোলাখুলিভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে কুরাইশদে কে উত্তেজিত করতে শুরু করলো।বিশেষত কাব বিন আশরাফ নামক বনী নাযির গোত্রের জনৈক্য সরদার এ ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও অন্ধ শত্রুতায় লিপ্ত হলো। এ থেকে স্পষ্টত অনুমিত হলো যে, ইহুদীরা না পড়োশী হিসেবে কোন কর্তব্য পালন করবে আর না হযরত (স) এর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে।

এর ফলে মদিনার এই ক্ষুদ্র জনপদটি চারদিক দিয়েই বিপদ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লো। অভ্যন্তরীন দিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা ছিল এমনিতেই দুর্বল ,তদুপরি যুদ্ধের ফলে তাদেরকে আরো বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো।

Dhaka University Institutional Repository

পটভূমি

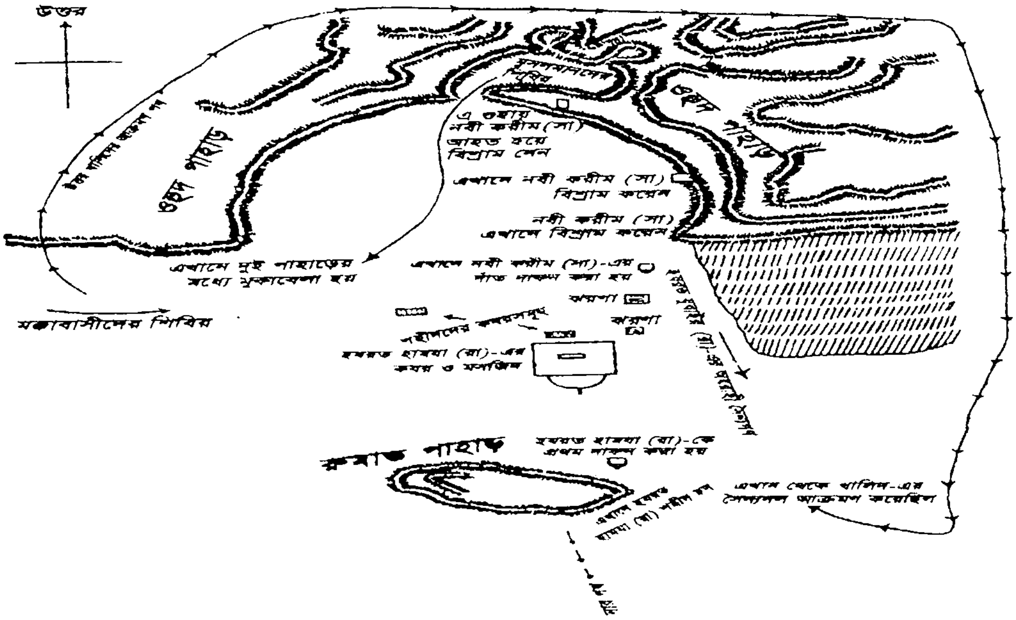

ওহুদ যুদ্ধক্ষেত্রের নক্শা

মক্কার মুশরিকদের অন্তরে এমনিতেই মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তাদের বড়ো বড়ো সর্দারগণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে ইতোমধ্যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল। প্রত্যেক গোত্রের মনেই ক্রোধ ও উত্তেজনা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছিল। এমনি অবস্থায় ইহুদীগণ কর্তৃক মক্কাবাসীকে যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করারচেষ্টা আগুনে তেল ছিটানোর কাজ করলো। ফলে বদর যুদ্ধের পর একটি বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই মদিনায় এই মর্মে খবর পৌঁছলো যে, মক্কার মুশরিকগণ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কুরাইশদের অগ্রগতি

এই প্রেক্ষাপটে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের প্রথম সপ্তাহে হযরত (স) কয়েকজন লোককে সঠিক খবর খবর সংগ্রহের জন্যে মদিনার বাইরে প্রেরণ করলেন। তারা ফিরে এসে খবর দিল যে, কুরাইশ বাহিনী মদিনার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। এমনকি তাদের ঘোড়গুলো মদিনার একটি চারণ ভূমি পর্যন্ত সাফ করে ফেলেছে। এবার নবী করীস (স) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কুরাইশ বাহিনীর মুকাবেলা কি মদিনায় বসে করা হবে , না বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে ? কোন কোন সাহাবী এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, মুকাবেলা মদিনায় বসেই করতে হবে। কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পান নি অথচ শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত এমন কতিপয় যুবক দৃঢ়তার সাথে বললেনঃ 'না, বাইরের ময়দানে গিয়েই তাদের মুকাবেলা করতে হবে।' অবশেষে তাদের এই দৃঢ়তা দেখে নবী করীম (স) মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুনাফিকদের ধোকাবাজি

কুরাইশগণ মদিনার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তাদের ছাউনি ফেললো। তার একদিন পর হযরত (স) জুমু'আর নামাজ বাদ এক হাজার সাহাবী নিয়ে মদিনা থেকে রওয়ানা করলেন। এদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক আবদুল্লাহ বিন উবাইও ছিল। এ লোকটি দৃশ্যত মুসলমান হলেও কার্যত ছিল মুনাফিক । এর প্রভাবাধীন আরো বহু মুনাফিক মুসলমানদের সঙ্গে যাত্রা করেছিল। কিছুদূর গিয়ে আবদুল্লাহ বিন উবাই তিন'শ লোক নিয়ে হঠাৎ 'যুদ্ধ হবে না' বলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এখন শুধু সাত শ সাহাবী বাকী রইলেন। এমনি নাজুক অবস্থায় মুনাফিকদের এই আচরণ ছিল গুরুতর মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের শামিল। কিন্তু যে সব মুসলমানের হৃদয় আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস এবং সত্যের পথে শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ ছিল, এ ঘটনায় তাদের ওপর কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি হলো না। তাই তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে সামনে অগ্রসর হলেন।

যুব সমাজের উদ্দীপনা

এ সময় হযরত (স) তার সঙ্গী- সাথীদের অবস্থা একবার যাচাই করে নিলেন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক তরুণদের ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এদের মধ্যে রাফে ' ও সামারাহ নামক দুটি কিশোর বালকও ছিল। কিশোরদের কে যখন সেনাবাহিনী থেকে আলাদা করে দেয়া হচ্ছিল , তখন রাফে তার পায়ের অগ্রভাগের ওপর ভর করে দাঁড়ালো। যেনো লম্বায় তাকে কিছু উঁচু দেখায় , এবং তাকে সঙ্গে নেয়া হয়। তার এই কৌশল ফলপ্রসূও প্রমাণিত হলো। কিন্তু সামারাহ সেনাবাহিনীতে থাকবার অনুমতি না পেয়ে বললোঃ 'রাফেকে যখন রেখে দেয়া হয়েছে, তখন আমাকেও থাকবার অনুমতি দেয়া উচিত। কারণ আমি তাকে কুস্তি প্রতিযোগিতায় পরাজিত করতে পারি।' তার এ দাবির যথার্থতা প্রমাণের জন্যে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হলো। অবশেষে সে রাফেকে পরাজিত করলো এবং তাকেও সেনাবাহিনীতে নিয়ে নেয়া হলো। এ একটি সামান্য ঘটনামাত্র। কিন্তু এতেই আন্দাজ করা চলে যে, মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার কতখানি অদম্য আগ্রহ ছিল।

সৈন্যদের প্রশিক্ষণ

ওহুদ পাহাড় মদীনা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত (স) এমনভাবে তার সৈন্যদের মোতায়েন করলেন যে, পাহাড় পিছন দিকে থাকলো আর কুরাইশ সৈন্যরা রইলো সামনের দিকে। পিছন দিকে পাহাড়ের মাঝ বরাবর একটি সুড়ঙ্গ পথ ছিলো এবং সে দিক থেকেও হামলার কিছুটা আশাংকা ছিলো। হযরত (স) সেখানে আবদুল্লাহ বিন জুবাইরকে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজসহ মোতায়েন করলেন। তাকে এই র্মমে নির্দেশ দিলেন যে, এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে কাউকে আসতে দেয়া যাবে না এবং তুমিও এখান থেকে কোন অবস্থায় নড়বে না। এমন কি যদি দেখো যে, পাখিরা আমাদের গোশ্‌ত ছিঁড়ে নিয়ে খাচ্ছে, তবুও তুমি নিজের স্থান ত্যাগ করবে না।

কুরাইদের সাজ-সজ্জা

এবার কুরাইশরা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ সাজ-সজ্জা করে এসেছিলো। প্রায় তিন হাজার সৈন্য ও প্রচুর সামান্তপত্র তাদের সঙ্গে ছিলো। তখনকার দিনে যে যুদ্ধে মেয়েরা যোগ দান করতো, তাতে আরবরা জীবনপণ করে লড়াই করতো। তারা মনে করতো, যুদ্ধে যদি পরাজয় হয় তো মেয়েদের বেইজ্জত হবে। এ যুদ্ধেও কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে অনেক মহিলা এসেছিল। এদের মধ্যে আপন পুত্র ও প্রিয়জন মারা গেছে, এমন অনেকেই ছিলো। এতে কেউ কেউ প্রিয়জনদের হত্যাকারীদের রক্তপান করে তবেই নিঃশ্বাস ফেলবে-এমন প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত করেছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধের সূচনা

কুরাইশরা তাদের সৈন্যদেরকে খুব ভালোমতো প্রশিক্ষণ দিয়েছিলো। যুদ্ধের সূচনা-পর্বে কুরাইশ মহিলারা দফ বাজিয়ে আবেগ ও উদ্দীপনাময় কবিতা আবৃতি করতে লাগলো। তারা যোদ্ধদেরকে বদর যুদ্ধে নিহতদের রক্তের বদলা নেবার জন্যে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় উৎসাহ যোগালো। এরপর শুরু হলো যুদ্ধ। প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের দিকেই পাল্লা ভারী রইলো এবং কুরাইশ পক্ষের বহু সৈন্য নিহত হলো।তাদের সৈন্য দের মধ্যে হতাশা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল । এদিকে সুড়ঙ্গ পথের প্রহরায় নিযুক্ত সৈন্যরা যখন দেখলো যে, মুসলমানরা মাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়েছে এবং দুশমনরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে.তখন তারাও গনীমতের মাল সংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের নেতা হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর বারবার তাদেরকে বিরত রাখতে চাইলেনএবং হযরত (সা:) এর কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন।কিন্তু কতিপয় লোক ছাড়া কেউ তার কথা শুনলো না।

পশ্চাদিক থেকে কুরাইশদের হামলা

খালিদ বিন অলীদ তখন কাফির সৈন্যদের একজন অধিনায়ক। সে এই সুবর্ণ সুযোগ কে পুরোপুরি কাজে লাগানো এবং পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে সুড়ঙ্গ -পথে মুসলমানদের ওপর হামলা করলো।হযরত আবদুল্লাহ এবং তার ক'জন সঙ্গী শেষ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ পথের প্রহরায় ছিলেন,তাদের অধিকাংশই এই হামলার মুকাবেলা করলেন।কিন্তু কাফের দের এই প্রচণ্ড হামলাকে তারা প্রতিহত করতে পারলেন না। তারা শহীদ হয়ে গেলেন। অতঃপর দুশমনরা একে একে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওদিকে যে সব পলায়নপর কাফির দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছিল , তারাও আবার ফিরে এলো।এবার দুদিক দিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা শুরু হলো।এই অভাবিত পরিস্থিতিতে মুসলমানদের মধ্যে এমন আতঙ্কের সঞ্চার হলো যে, যুদ্ধের মোড়ই সম্পূর্ণ ঘুরে গেলো। মুসলমানেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাতে লাগলো। এমনকি আতঙ্কের মধ্যেই গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, নবী করীম (সা:) শহীদ হয়ে গেছেন। এই খবরে সাহাবীদের মধ্যে বাকী উদ্যমটুকুও নষ্ট হয়ে গেলো এবং অনেকে সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেললো।

আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয়

এ সময় দশ-বারো জন সাহাবী নবী করীম (স) কে ঘিরে রেখেছিলেন। তিনি অবশ্য আহত হয়েছিলেন। সাহাবীরা তাকে একটি পাহাড়ের ওপর নিয়ে এলেন। অতঃপর অন্য মুসলমানরা ও জানতে পারলেন যে, নবী করীম (স) সুস্থ ও নিরাপদ আছেন।তাই তারা আবার দলে দলে তার কাছে একত্রিত হতে লাগলেন। কিন্তু এ সময় কি কারণে যেন কাফিরদের মনোযোগ হঠাৎ অন্যদিকে নিবদ্ধ হলো এবং নিজেদের বিজয়কে পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত না পৌঁছিয়েই তারা ময়দান ছেড়ে চলে গেল।

তারা যখন কিছুটা দূরে চলে গেল, তখন তাদের সম্ভিত ফিরে এলো। তারা পরস্পরকে বললোঃ এ আমরা কি ভুল করলাম ! মুসলমানদের সম্পূর্ণ খতম করে দেবার দুর্লভ সুযোগটিকে নষ্ট করে এমনিই চলে এলাম! এরপর তারা এক জায়গায় থেকে পরস্পর বলাবলি করলো- এবার তাহলে মদিনার ওপর আর একবার হামলা করা উচিত । কিন্তু শেষ পর্যন- আর তাদের সাহস হলো না। তারা মক্কায় ফিরে গেলো। এদিকে নবী করীম (স) চিন্তিত ছিলেন যে, শত্রুরা না জানি আবার ফিরে এসে আবার হামলা করে বসে । তাই তিনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের কে দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দিলেন। এটা ছিল অত্যন্ত নাজুক সময় । কিন্তু যারা সাচ্চা মুমিন ছিল , তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে পুনরায় জান কুরবান করার জন্যে তৈরি হয়ে গেল । নবী করীম (স) হামরা-উল-আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। এ জায়গাটি মদিনা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত । এখানে পৌঁছে জানা গেল যে, কুরাইশরা মক্কায় ফিরে গেছে। তাই তিনিও মুসলমানদের নিয়ে মদিনায় ফিরে এলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হলেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন আনসার । তাই মদিনায় ঘরে ঘরে শোকের বন্যা নেমে এলো। এ সময় হযরত (স) মুসলমানদের শোক প্রকাশের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বললেনঃ 'মাতম করা এবং ছাতি পিটিয়ে কান্না-কাটি করা মুসলমানদের পক্ষে মর্যাদা হানিকর।'

বিপর্যয়ের কারণ এবং মুসলমানদের প্রশিক্ষণ

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটে, তার পেছনে মুনাফিকদের চালবাজি ও কলা কৌশলের প্রভাব ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই সঙ্গে মুসলমানদের নিজস্ব দুর্বলতাও কম দায়ী ছিল না । অবশ্য ইসলামী আন্দোলন যে ধরণের মেজাজ তৈরি করে এবং তার কর্মীদের যে রুপ প্রশিক্ষণ দিতে ইচ্ছুক, তার জন্যে তখনও পুরোপুরি সুযোগ পাওয়া যায় নি। আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার এ ছিল দ্বিতীয় সুযোগ মাত্র । তাই এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই কিছু কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পেলো। যেমনঃ সম্পদের মোহে কর্তব্য অবহেলা করা, নেতার হুকুম অমান্য করা, দুশমনকে পুরোপুরি খতম করার আগে গনীমতের মালের দিকে মনোযোগ দেয়া ইত্যাদি। এ কারণেই যুদ্ধ শেষ হবার পর আল্লাহ তাআলা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি অত্যন্ত বিস্তৃত ভাবে পর্যালোচনা করলেন। এ পর্যালোচনা ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে যা কিছু দোষ-ত্রুটি বাকী ছিল, তার প্রতিটি দিককেই তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন এবং সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলীও প্রদান করলেন।সূরা আল ইমরানের শেষাংশে এই নির্দেশাবলীর কথা বিবৃত হয়েছে। এখানে তার কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। এ থেকে ইসলামী আন্দোলনে যুদ্ধের স্থান কোথায় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর ওপর কিভাবে আলোকপাত করতে হয়, তা আর একবার উপলব্ধি করা যাবে।

খোদা-নির্ভরতা

মুসলমানরা যখন যুদ্ধের জন্যে যাত্রা করেছিল, তখন তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজারের মতো। পক্ষান্তরে দুশমনদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। এরপরও কিছুদূর গিয়ে তিন শ' মুনাফিক আলাদা হয়ে গেল। এবার বাকী থাকলো শুধু সাত শ' মুসলমান। তদুপরি যুদ্ধের সামান্তপত্র ছিল কম এবং এক তৃতীয়াংশ সৈন্যও গেল বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে কিছু লোকের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে লাগলো । এ সময় শুধু আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার সাহায্যের ওপর ভরসাই মুসলমানদেরকে দুশমনদের মুকাবেলায় এগিয়ে নিয়ে চললো। এ উপলক্ষে হযরত (স) মুসলমানদের কে যে সান্ত্বনা প্রদান করেন, আল্লাহ তা নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেন-

إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ -

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ -

بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ -

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ -

"স্মরণ করো, যখ,তোমাদের মধ্যকার দুটি দল নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শনের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যের জন্যে বর্তমান ছিলেন। আর মুমিনদের তো আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত । এর আগে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের শোকরী থেকে তোমাদের বেঁচে থাকা উচিত। আশা করা যায়, এবার তোমরা কৃতজ্ঞ হবে। স্মরণ করো, যখন তুমি (হে নবী) মুমিনদের কে বলেছিলঃ তোমাদের জন্যে এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমরা যাতে খুশি হও এবং তোমাদের হৃদয় নিশ্চিন্ত হয়, সে জন্যেই আল্লাহ তোমাদের কাছে একথা প্রকাশ করলেন। বিজয় বা সাহায্য যা কিছুই হোক, আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। তিনি অত্যন্ত শক্তিমান, বিচক্ষণ।[৫২]

---

৫২. আল-কুর'আন, ৩ঃ ১২২-১২৬)

Dhaka University Institutional Repository

এখানে মুসলমানদের কে শেষ বারের মতো বুঝিয়ে দেয়া হলো যে, প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত শক্তির ওপর ভরসা করা মুসলমানদের কাজ নয়। তাদের শক্তির আসল উৎস হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার সাহায্যের ওপর ভরসা।

ধন-সম্পদের মোহ

ওহুদে মুসলমানদের বিপর্যয়ের আর একটি বড় কারণ হলো এই যে, মুসলমানরা যুদ্ধের ঠিক মাঝখানেই সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল এবং দুশমনকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার আগেই সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল । এমনকি , যারা সুড়ঙ্গ-পথের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল,তাদের মধ্যে পযর্ন্ত দুর্বলতা প্রকাশ পেল। এভাবে যুদ্ধের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। তাই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের হৃদয় থেকে ধনের মোহ দূরীভূত করার জন্যে আ সময়ই মোহ সৃষ্টির একটি বড় কারণকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। অর্থাৎ এ সময় সূদকে হারাম ঘোষণা করা হলো। যারা সূদী কারবার করে , তাদের হৃদয়ে ধনের মোহ এমনি বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তা আর কোন মহৎ কাজের উপযোগী থাকে না।সূদের ফলেই এক শ্রেণীর মনে লালসা, কার্পণ্য , আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ধনের মোহ সৃষ্টি হয়। আর এক শ্রেণীর মধ্যে জাগ্রত হয় হিংসা দ্বেষ ও ক্রোধ-বিক্ষোভ।

সাফল্যের চাবিকাঠি

যদি মনোবলকে সমুন্নত রাখার জন্যে কোন ক্রিয়াশীল শক্তি বর্তমান না থাকে , তাহলে পরাজয়ের পর তা হ্রাস পেতে থাকবেই । ওহুদে মুসলমানদের যে পরাজয় ঘটেছিল , তাতে কিছু লোকের মনোবল ভেঙ্গে পড়ার আশংকা ছিল। কিন্তু এ সময় মুসলমানদের কে এই বলে আশ্বাস দেয়া হলো যে,

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ -
إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ
مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ -
وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ -
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ -

"তোমাদের না নিরুৎসাহ হওয়া উচিত আর না দুঃখ প্রকাশ করা উচিত । তোমাদেরই হবে, যদি তোমরা খাঁটি মুমিন হও, ঈমানের ওপর অবিচল থাকো এবং তার দাবি সমূহ পূর্ণ করতে থাকো। তোমাদের কাজ শুধু এটুকুই ; এরপর তোমাদের সমুন্নত করা এবং দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব আল্লাহর । এরপর রইলো তোমাদের এই সাময়িক দুঃখ- ক্লেশ ও পরাজয়ের প্রশ্ন। এটা শুধু তোমাদেরই ব্যাপার নয়, তোমাদের বিরুদ্ধ দলের ওপরও এরকম দুঃখ-মুসিবত এসে থাকে । তারা যখন মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়েও নিরুৎসাহিত হয়না, তখন তোমরা কেন সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে চিন্তা-ভাবনা করো ?তোমরা তো জান্নাতের প্রত্যাশী । তোমরা কি মনে করো, এমনিই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে ? অথচ তোমাদের ভেতর কে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করেছে আর কে তার জন্যে প্রতিকূল অবস্থায়ও ধৈর্য অবলম্বন করতে ইচ্ছুক, আল্লাহ তা এখন পর্যন্ত যাচাই-ই করেননি।[৫৩]

---

৫৩. আল-কুর'আন, ৩ঃ ১৩৯-১৪২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আন্দোলন প্রাণবন্ত

পৃথিবীর যে কোন আন্দোলনেই তার প্রাণবস্ত কিংবা চালিকা-শক্তিরূপে একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব বর্তমান থাকে। কিন্তু আদর্শবাদী আন্দোলনের উন্নতি বা স্থায়িত্ব কোন ব্যক্তিত্বের ওপর নিভ্ভরশীল নয়, বরং যে নীতি ও আদশ্রের ভিত্তিতে এ আন্দোলন উথিত হয়, তার দৃঢ়তা ও সত্যতার ওপরই এর সবকিছু নিভ্ভর করে। ইসলামী আন্দোলনের জন্যে নবীদের ব্যক্তিত্ব কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও এটি একটি আদর্শবাদী আন্দোলন এবং এর উন্নতি ও স্থায়িত্ব সম্পূর্ণত ইসলামের উপস্থাপিত নীতিমালার ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে মুসলমানদের এ কথা জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন হলো যে, নবীর মহান ব্যক্তিত্ব তাদের ভেতর বর্তমান থাকলেই কেবল তারা আল্লাহর দ্বীনের ঝাণ্ডা সমুন্নত করবে এবং নবীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হলে অমনি তারা এ পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পথ অবলম্বন করবে, এরুপ ধারণা যেনো তাদের মনের কোণেও ঠাঁই পায়। ইতঃপূর্বে ওহুদের ময়দানে যখন এই মর্মে গুজব প্রচারিত হলো যে, মুহাম্মদ (স) শহীদ হয়ে গেছেন, তখন কিছু মুসলমানের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। তারা ভেবেছিল : হযরতের ছায়াই যখন চলে গেল, তখন আর যুদ্ধ করে কি হবে! এই ভুল ধারণা দূর করার জন্যেই এই সময় মুসলমানদের বুঝিয়ে দেয়া হলো-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ -

"দেখ, মুহাম্মদ (স) একজন রাসূল বৈ কিছুই নন। তার আগেও অনেক রাসূল চলে গেছেন। এখন তিনি যদি মরে যান কিংবা নিহত হন, তাহলে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করবে? মনে রেখো, যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করবে সে আল্লাহর কোনই ক্ষতি করবে না । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে জীবন যাপন করবে, তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।"[৫৪]

আরো বলা হলোঃ 'তোমরা যে দ্বীনকে বুঝে-শুনে গ্রহণ করেছো, তার ওপর অবিচল থাকার এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তোমাদের মধ্যে হামেশা নবীর উপস্থিত মাত্র ।এর ওপর অবিচল থাকলে তোমরা নিজেরাই সুফল পাবে। এ দ্বীনের আসল শক্তি হচ্ছে এর উপস্থাপিত সত্যতা। এর সমুন্নতি না তোমাদের শক্তি -সামর্থের ওপর আর না কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল।'

দুর্বলতার উৎস-১

মানুষের সমস্ত দুর্বলতার উৎস হচ্ছে মৃত্যু-ভয়। তাই এ সময় মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো যে, তোমাদের মৃত্যু-ভয়ে পলায়ন করা নিতান্তই অর্থহীন। কারণ মৃত্যুর জন্যে নির্ধারিত সময় না আসা পর্যন্ত কোন প্রাণীরই মৃত্যু হতে পারে না। অন্য কথায়, আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগে না কেউ মরতে পারে আর না তারপর এক মুহূর্তও কেউ বেঁচে থাকতে পারে। অতএব, তোমাদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই; বরং জীবনের যেটুকু অবকাশ পাওয়া গেছে, তা কি দুনিয়াদারিতে ব্যয়িত হচ্ছে না আখিরাতের কাজে ,তা-ই শুধু চিন্তা করা উচিত। কারণ যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়াদারির জন্যে তার শ্রম-মেহনত নিয়োজিত করে, তার যা কিছু প্রাপ্য তা দুনিয়ায়ই পেয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতের কল্যাণের জন্যে কাজ করে ,আল্লাহ তাকে আখিরাতেই প্রতিফল দান করবেন।কাজেই যারা আল্লাহর দ্বীন কবুল করার ,এর ওপর কায়েম থাকার এবং একে হারাম করবার চেষ্টা-সাধনার সুযোগ পেয়েছে, তাদের পক্ষে এই মহা মূল্যবান নিয়ামতটিরই কদর করা এবং এর জন্যেই নিজেদের সবকিছু নিয়োজিত করা উচিত।

---

৫৪. আল-কুর'আন, ৩: ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

এর ফলাফল অবশ্যই তাদের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হবে; আখিরাতের স্থায়ী সাফল্য তারা অর্জন করবে। আর এই নিয়ামতের যারা শোকর আদায় করবে, আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম নিয়ামত দ্বারা কৃতার্থ করবেন। তারা আপন মালিকের কাছ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত হবে।

উহুদের বিপর্যয়ের পর

আগেই বলা হয়েছে যে, আরবের দু-একটি গোত্র ছাড়া বাদবাকী সমস্ত গোত্রই এই নবোত্থিত ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী ছিলো। কারণ, এ আন্দোলন তাদের পৈত্রিক ধর্ম ও রসম-রেওয়াজের ওপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানছিলো। সেই সঙ্গে মানুষ নৈতিক দিক থেকে উন্নত হোক এবং জুয়া, ব্যভিচার, মদ্যপান, লুটতরাজ ইত্যাকার প্রচলিত দুষ্কৃতি পরিত্যাগ করুক, এ-ও ছিলো এ আন্দোলনের দাবি।

তাই বদর যুদ্ধের আগে এই নয়া আন্দোলনকে ধ্বংস করার বিষয়ে অনেক গোত্রই চিন্তা-ভাবনা করছিলো। কিন্তু বদরে কুরাইরশরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার ফলে তারা কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়লো এবং এর পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিলো। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধের পর পুনরায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। এবার আরবের বহু গোত্রই ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালো। এ ধরণের কয়েকটি গোত্রের ভূমিকা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।[৫৫]

---

৫৫. আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, (অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), নাকিব পাবলিকেশন, ঢাকা: সর্বশেষ ২০০৬,

Dhaka University Institutional Repository

দাউদ (আ)-এর পাহাড়

দাউদ (আ) এর পাহাড় সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ -

আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে- হে পর্বতমালা, তোমার দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষীসকল তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম।[৫৬]

মহান আল্লাহ হযরত দাউদ (আ)- এর প্রতি যে অসংখ্য অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বাইতুল লাহমের ইয়াহুদা গোত্রের একজন সাধারণ যুবক। ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধের জালুতের মতো এক বিশাল দেহী ভয়ংকর শত্রুকে হত্যা করে তিনি রাতারাতি বনী ইরাঈলের নয়নমণিতে পরিণত হন। এ ঘটনা থেকেই তার উত্থান শুরু হয়। এমনকি তালুতের ইন্তিকালের পরে প্রথমে তাকে 'হাবরূনে' (বর্তমান আল খালীল) ইয়াহুদিয়ার শাসনকর্তা করা হয়। এর কয়েক বছর পর সকল বনী ইসরাঈল গোত্র সর্বসম্মতভাবে তাকে নিজেদের বাদশাহ নির্বাচিত করে এবং তিনি জেরুসালেম জয় করে ইসরাঈলী রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। তারই নেতৃত্বে ইতিহাসে প্রথমবার এমন একটি আল্লাহর অনুগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যার সীমানা আকাবা উপসাগর থেকে ফোরাত নদীর পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এসব অনুগ্রহের সাথে সাথে আল্লাহ তাকে আরো দান করেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, আল্লাহভীতি, আল্লাহর বন্দেগীও তার প্রতি আনুগত্যশীলতা।[৫৭]

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ -

অবশেষে আল্লাহর হুকুমে তারা কাফেরদের পরাজিত করলো। আর দাউদ জালুতকে হত্যা করলো এবং আল্লাহ তাকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন আর এই সাথে যা যা তিনি চাইলেনতাকে শিখিয়ে দিলেন। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষদের একটি দলের সাহায্যে আর একটি দলকে দমন না করতে থাকতেন, তাহলে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হতো। কিন্তু দুনিয়াবাসীদের ওপর আল্লাহর অপার করুণা (যে, তিনি এভাবে বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করতেন)।[৫৮]

দাউদ (আ) এ সময় ছিলেন একজন কম বয়েসী যুবক। ঘটনাক্রমে তালুতের সেনাবাহিনীতে তিনি এমন এক সময় পৌছে ছিলেন যখন ফিলিস্তিনী সেনাদলের জবরদস্ত পাহলোয়ান জালুত (জুলিয়েট) বনী ইসরাঈলী সেনাদলকে প্রত্যক্ষ মুকাবিলায় আসার জন্য আহবান জানাচ্ছিল এবং ইসরাঈলীদের মধ্য থেকে একজনও তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল না। এ অবস্থা দেখে দাউদ (আ) নির্ভয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং জালুতকে হত্যা করলেন। এ ঘটনায় তিনি হয়ে উঠলেন ইসরাঈলীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তালুত নিজের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দিলেন। অবশেষে তিনিই হলেন ইসরাঈলীদের শাসক।[৫৯]

---

৫৬. আল-কুর'আন, ৩৪ঃ ১০
৫৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ১১৩৩
৫৮. আল-কুর'আন, ২ঃ ২৫১
৫৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ১১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থান

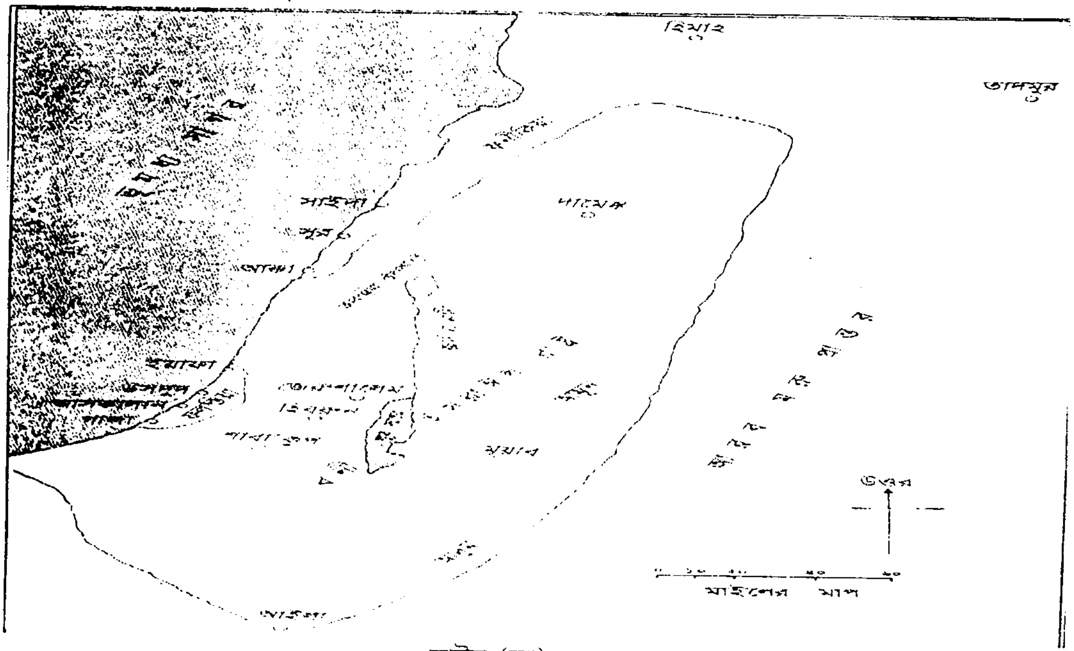

দাউদ (আ) এর স্থান

তুয়া উপত্যকা

তুয়া উপত্যকা একটা পবিত্র স্থান। যেখানে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আ) এর সাথে প্রথম কথা বলেছিলেন এবং তাঁকে জানিয়েছিলেন যে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন । এটাই সেই স্থান যেখানে মূসা (আ) আগুন দেখতে পেয়েছিলেন এবং যা দেখে তিনি তাঁর পরিবারকে পিছনে ফেলে সেদিক পানে ধাবিত হয়েছিলেন এবং তথায় উপস্থিত হলে একটা গাছের নিকট থেকে গায়েবী আওয়াজ শুনতে পান এবং তাঁকে সেখানে দেয়া হয়েছিল মুযিজা ।

তুয়া উপত্যকা সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى -

"আমিই তোমার রব, তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল, কেননা, তুমি পবিত্র তুয়া উপত্যকায় রয়েছে ।"[৬০]

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى -

"যখন তার রব তাকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহবান করে বলেছিলেন।"[৬১]

---

৬০. আল-কুর'আন, ২০ঃ ১২

৬১. আল-কুর'আন, ৭৯ঃ ১৬

Dhaka University Institutional Repository

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى
إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ -

"যখন মূসা উক্ত আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন উপত্যকার ডান দিক থেকে সেই পবিত্র স্হানটির একটি বৃক্ষ থেকে ডেকে বলা হল- হে মুসা ! আমিই আল্লাহ্ জগতসমূহের পালনকর্তা। "[৬২]

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

ওয়াদিয়ে মুকাদ্দাস

একদিন হযরত মূসা (আ) নিজ পরিবারবর্গসহ বকরী চরাইতে চরাইদে মাদ্ইয়ান হতে অনেক দূরে চলে গেলেন। বকরীচারক গোত্রসমূহের জন্য ইহা কোন বিচিত্র ব্যাপার নহে। যেহেতু শীতের রাত্রি ছিল; সুতরাং শীতের আধিক্য অগ্নির অন্বেষণে বাধ্য করেতেছিল, সম্মুখে তূরে সাইনা পর্বতশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তা ছিল সাইনা পাহাড়ের পূর্ব কোন। মাদ্ইয়ান হতে একদিনের পথ দূরে লোহিত সাগরের দুইটি শাখার মধ্যস্থলে মিশরের দিকে যাওয়ার পথের উপর অবস্থিত। হযরত মূসা (আ) চক্মক পাথর দ্বারা আগুন ধরাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অত্যধিক শীতের কারণে তাতে আগুন ধরল না। সম্মুখের ওয়াদির (ওয়াদিয়ে আইমানের) প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। দেখতে পেলেন, একটি অগ্নিশিখা দীপ্তি প্রকাশ করছে। পত্নীকে বললেন, তোমরা এখানেই অপেক্ষা কর, আমি আগুন নিয়ে আসছি। উত্তাপ গ্রহণের কাজও চলবে, আর ওখানে কোন পথপ্রদর্শকের সাক্ষাৎ পেলে ভুলা পথেরও সন্ধান পাওয়া যাবে। এই ঘটনাটিকে কুর'আন মজীদ নিম্নরূপে বর্ণনা করেছে ঃ

"অতঃপর মূসা (আ.) আপন স্ত্রীকে বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি আগুন দেখতে পেয়েছি। হয়ত ওখান হতে একটি ফুল্কি তোমাদের জন্য আনতে পারব অথবা সেখানে অগ্নির পার্শ্বে (উত্তাপ গ্রহণকারীদের মধ্যে) কোন পথপ্রদর্শকও পেতে পারি।"[৬৩, ৬৪]

---

৬২. আল-কুর'আন, ২৮ঃ ৩০

৬৩. আল-কুর'আন,

৬৪. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ৩৬, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

দওরান দূর্গ

আসহাবুল জান্নাত বা বাগানের মালিক বলতে ইয়ামেনের 'দওরান' দূর্গের অধিবাসীদের বুঝানো হয়েছে। এখানে বনী হারেস গোত্র বসবাস করত। এটি একটি উঁচু পাহাড়ের নাম।[৬৫]

দওরান দূর্গ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত:

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا - وَلَا يَسْتَثْنُونَ - فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ
لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ
فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ - أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ - وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ - بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ - قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ -
قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ - فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ - قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ -
عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ- كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"আমি এদের (মক্কাবাসী)-কে পরীক্ষায় ফেলেছি যেভাবে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব ভোরে গিয়ে অবশ্যি নিজেদের বাগানের ফল আহরণ করবে। তারা এ ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রমের সম্ভবনা স্বীকার করেছিলো না। অতপর তোমার রবের পক্ষ থেকে একটি বিপর্যয় এসে সে বাগানে চড়াও হলো তখন তারা ছিলো নিদ্রিত। বাগানের অবস্থা হয়ে গেলো কর্তিত ফসলের ন্যায়। ভোরে তারা একে অপরকে ডেকে বললো- তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল ফসলের মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়ো। সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়লো। তারা নীচু গলায় একে অপরকে বলছিলো, আজ যেন কোন অভাবী লোক বাগানে তোমাদের কাছে না আসতে পারে। তারা কিছুই না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভোরে এমনভাবে দ্রুত সেখানে গেল যেন তারা (ফল আহরণ করতে) সক্ষম হয়। কিন্তু বাগানের অবস্থা দেখার পর বলে উঠলোঃ আমরা রাস্তা ভুলে গিয়েছি। তাও না- আমার বরং বঞ্চিত হয়েছি। তাদের মধ্যকার সবচেয়ে ভাল লোকটি বললোঃ "আমি কি তোমাদের বলিনি তোমরা তাসবীহকরছো না কেন? তখন তারা বলে উঠলোঃ আমাদের রব অতি পবিত্র। বাস্তবিকই আমরা গোনাহগার ছিলাম। এরপর তারা সবাই একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগলো। অবশেষে তারা বললোঃ "আমাদের এ অবস্থার জন্য আফসোস! আমরা তো বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলাম। বিনিময়ে আমাদের রব হয়তো এর চেয়েও ভাল বাগান আমাদের দান করবেন। আমরা আমাদের রবের দিকে রুজু করছি। আযাব এরূপই হয়ে থাকে। আখেরাতের আযাব এর চেয়েও বড়। হায়! যদি তারা জানতো।"[৬৬]

নিজেদের ক্ষমতাও যোগ্যতার ওপর তাদের এমন আস্থা ছিল যে, শপথ করে দ্বিধাহীন চিত্তে বলে ফেললো, কালকে আমরা অবশ্যই আমাদের বাগানের ফল আহরণ করবো। আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে আমরা এ কাজ করবো এতটুকু কথা বলার প্রয়োজনও তারা বোধ করেনি।
এখানে ক্ষেত শব্দ ব্যবহার করার কারণ সম্ভবত এই যে, বাগানে বৃক্ষরাজির ফাঁকে ফাঁকে কৃষিক্ষেতও ছিলো। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হলো (عَلَى حَرْدٍ)। আরবী ভাষায়- হারদ শব্দটি বাধা দানকরা এবং না দেয়া বুঝাতেও বলা হয়, ইচ্ছা এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত বুঝাতেও বলা হয় এবং তাড়াহুড়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অনুবাদ করতে আমরা তিনটি অর্থের প্রতিই লক্ষ্য রেখেছি।

---

৬৫. মুজামূল বুলদান ৩/৪৬৪

৬৬. আল-কুর'আন, ৬৮ঃ ১৭-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

বাগান দেখে প্রথমে তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে, সেটিই তাদের বাগান। তাই তারা বলেছে, আমরা পথ ভুলে হয়তো অন্য কোথাও এসে পৌঁছেছি। পরে চিন্তা করে যখন তারা বুঝতে পারলো সেটি তাদের নিজেদেরই বাগান তখন চিৎকার করে বলে উঠলোঃ আমাদের কপাল পুড়ে গেছে!

এর মানে যখন তারা শপথ করে বলেছিল যে, আগামী দিন আমরা অবশ্যই বাগানের ফল আহরণ করব তখন এ ব্যক্তি তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিল। সে বলেছিল, তোমরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছ। তোমরা ইনশাআল্লাহ বলছ না কেন? কিন্তু তারা সে কথায় কর্ণপাত ও করল না। পুনরায় যখন তারা দুস্থ ও অসহায়দের কিছু না দেয়ার জন্য সলাপরামর্শ করেছিল তখনো সে তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বললঃ আল্লাহর কথা স্মরণ কর এবং এ খারাপ মনোভাব পরিত্যাগ কর। কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল রইল। তারা একে অপরকে এই বলে দোষারোপ করতে শুরু করল, আমরা অমুকের প্ররোচনায় আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলাম্ এবং এ কুমতলব এঁটেছিলাম।[৬৭]

পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থান

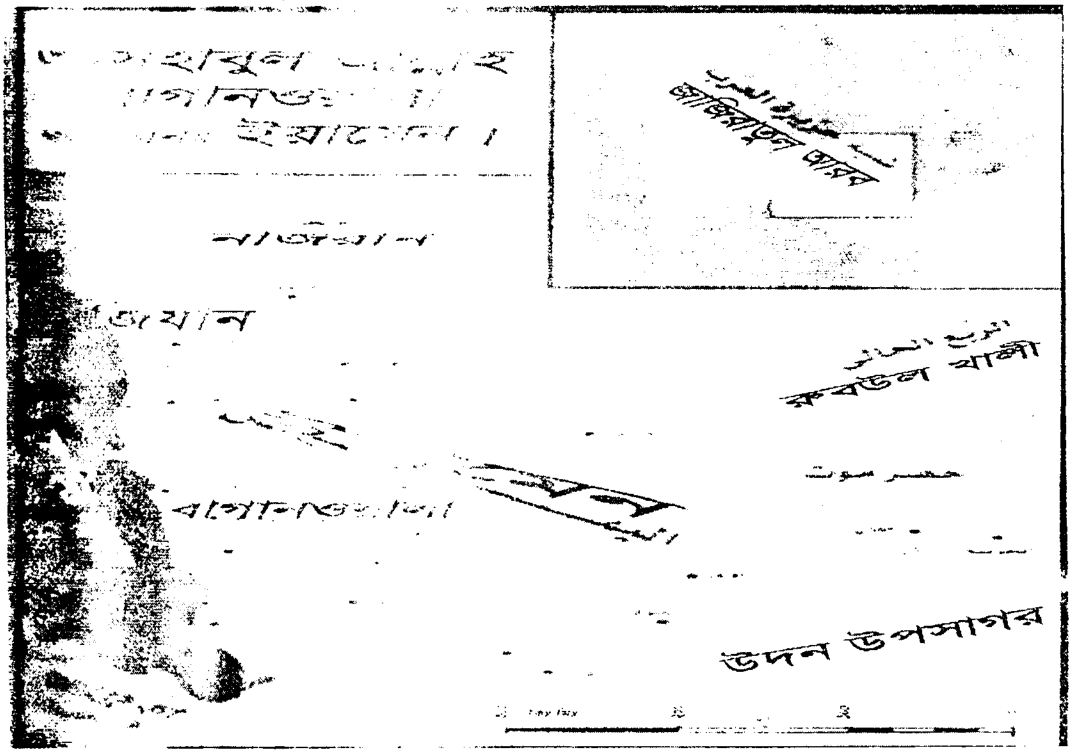

আসহাবুল জান্নাতের বাগানের স্থান

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

সূরা আল কালামে আল্লাহ তা'আলা মক্কার কাফেরদের অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বলেছেন যে, বাগান ওয়ালা যেমন আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতকে অবমাননা করেছে পায়ে ঠেলেছে এবং নেয়ামতের শোকর আদায় করেন নি। মক্কার মোশরেকদের অবস্থাও তদ্রুপ।[৬৮, ৬৯]

---

৬৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ১১৭৮

৬৮. আল-কুর'আন, ৬৮ : ১৭

৬৯. হিফযুর রহমান (র). মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৩খ, পৃ. ১৮৭, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

গুহা (কাহ্ফ)

কাহাফ অর্থ পাহাড়ের মধ্যকার গুহা। আর রাক্বীম- আসহাবে কাহাফের ব্যক্তিদের নাম যে ফলকে লেখা ছিল তার নাম ছিল আর রাক্বীম। সংক্ষিপ্ত ঘটনা- এক মূর্তিপূজক বাদশাহর নাম ছিল 'দাকয়ানুস'। তিনি রোম সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। তিনি সকল মুমিনদেরকে বেছে বেছে হত্যা করা শুরু করেন। কতিপয় একনিষ্ঠ আল্লাহ প্রেমিক যুবক বীরদর্পে দ্বীনি দাওয়াত দিতে লাগল। যখনই তাঁরা জালিম শাহী দাকয়ানুসের আগমন বার্তা আঁচ করলেন, তাঁরা তাঁদের পালিত কুকুরসহ তরসুস পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপর রহমতের ঘুম দিলেন। ৩০০ সূর্য বর্ষ তথা ৩০৯ চন্দ্রবর্ষ একটানা ঘুমিয়ে থাকলেন।

অতঃপর দীর্ঘ ৩০৯ বছর পর ঘুম থেকে জেগেই তাঁরা মনে করল আমরা একদিন বা দিনের সামান্য অংশ ঘুমিয়েছি। তাঁদের মধ্যে একজন বাজারে যেয়ে দেখেন সবই অপরিচিত।বাজারের লোকজন তাঁর নিকট তিনশত বছর পূর্বের মুদ্রা দেখে হতভম্ব হলো। আসহাবে কাহাফের লোকজনকে আল্লাহ তা'আলা উক্ত গুহায় মৃত্যু দান করেন।[৭০]

কাহ্ফ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا) -
তুমি কি মনে করো গুহা ও ফলক ওয়ালারা আমার বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর অন্তরভুক্ত ছিলো ?[৭১]

মূল শব্দ হচ্ছে "আর রকীম।" এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও তাবেঈর বর্ণনা মতে আসহাবে কাহফের ঘটনাটি যে জনপদে সংঘটিত হয়েছিল সেই জনপদটির নাম ছিল আর রকীম। এটি "আইলাহ" (অর্থাৎ আকাবাহ) ও ফিলিস্তীনের মাঝামাঝি একটি স্থানে অবস্থিত ছিল। আবার অনেক পুরাতন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, এ নাম দিয়ে গুহা মুখে আসহাবে কাহফের স্মৃতি রক্ষার্থে সে ফলক বা শিলালিপিটি লাগানো হয়েছিল ।

মাওলানা আবুল কালাম, আযদ তাঁর 'তরজমানুল কুর'আন' তাফসীর গ্রন্থে প্রথম অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন, এ স্থানটিকে বাইবেলের যিহোশূয় পুস্তকের ১৮: ২৬ শ্লোকে রেকম বা রাকম বলা হয়েছে। এরপর তিনি একে ফিলিস্তীনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কেন্দ্র পেট্টা এর প্রাচীন নাম হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু তিনি একথা চিন্তা করেননি যে, যিহোশূয় পুস্তকে রেকম বা রাকমের আলোচনা এসেছে বনী বিন ইয়ামীনের (বিন্যামীন সন্তান) মীরাস প্রসংগে । এ সংশ্লিষ্ট পুস্তকের নিজের বর্ণনামতে এ গোত্রের মীরাসের এলাকা জর্দান নদী ও লূত সাগরের (Dead sea) পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। সেখানে পেট্টার অবস্থানের কোন সম্ভাবনাই নেই । পেট্টার ধ্বংসাবশেষ যে এলাকায় পাওয়া গেছে তার ও বনী বিন ইয়ামীনের মীরাসের এলাকার মধ্যে ইয়াহুদা (যিহোদ) ও আদুমীয়ার পুরো এলাকা অবস্থিত ছিল। এ কারণে আধুনিক যুগের প্রত্নত্ত্ববিদগণ পেট্টার ও রেকম একই জায়গার নাম এ ধারণার কঠোর বিরোধিতা করেছেন । "আর রকীম" মানে ফলক বা শিলালিপি, এ মতটিই সঠিক।[৭২]

---

৭০. তাফসীরে মুনীরঃ ১৫/২০৭
৭১. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ৯
৭২. ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৪৬ সালে মুদ্রিত, ১৭ খণ্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا -

"স্মরণ করুন, যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহন করল তারপর প্রার্থনা করল- হে আমাদের রব! আমাদেরকে দান করুন আপনার কাছ থেকে রহমত এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে দিন।[৭৪] "

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا -

তারপর আমি তাদেরকে সে গুহায় বহু বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দিলাম ।[৭৫]

এবং আমি তাদের অন্তর দৃঢ় করে দিয়েছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়াল এবং বলতে লাগল ঃ আমাদের রব আসমান ও জমিনের পালনকর্তা, আমরা কখনও তাকে ছেড়ে অন্য উপাস্যের ইবাদত করব না, যদি করে বসি, তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এরা তো আমাদেরই স্বজাতি, এরা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। এরা এদের সম্পর্কে কোন প্রকাশ্য প্রমাণ কেন উপস্থিত করে না ? তবে তার চেয়ে অধিক জালিম কে, যে আল্লাহ সমন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে ?[৭৬]

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا -

যখন তোমরা পৃথক হয়েছ তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকেও, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর ; তোমাদের রব স্বীয় রহমত তোমাদের প্রতি বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের কাজ-কর্মকে তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করে দেবেন ।[৭৭]

পরিচিতি

সে সময় এ আল্লাহ বিশ্বাসী যুবকদের জনবসতি ত্যাগ করে পাহড়ে আশ্রয় নিতে হয় সে সময় এশিয়া মাইনরে এ এফিসুস শহর ছিল মূর্তি পূজা ও যাদু বিদ্যার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র । সেখানে ছিল ডায়না দেবীর একটি বিরাট মন্দির । এ খ্যাতি তখন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল । বহু দূরদেশ থেকে লোকেরা ডায়না দেবীর পূজা করার জন্য সেখানে আসতো । সেখানকার যাদুকর, গণক, জ্যোতিষী ও তাবিজ লেখকরা সারা দুনিয়ায় খ্যতিমান ছিল । সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসর পর্যন্ত তাদের জমজমাট কারবার ছিল । এ কাঁবারে ইহুদীদের বিরাট অংশ ছিল এবং ইহুদীরা তাদের এ কারবারকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আমল থেকে চলে আসা ব্যবসায় মনে করতো ।[৭৮]

---

৭৪. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ১০

৭৫. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ১১

৭৬. আল-কুর'আন, ১৮ ঃ১৪-১৫

৭৭. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ১৬

৭৮. ইনসাইক্লোপিডিয়া বিবলিক্যাল লিটারেচার

Dhaka University Institutional Repository

শিরক ও কুসংস্কারে ভারাক্রান্ত এ পরিবেশে আল্লাহ্ বিশ্বাসীরা যে অবস্থায় সম্মূখীন হচ্ছিলেন পরবর্তী রুকূতে আসাহবে কাহফের নিম্নোক্ত উক্তি থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে: " যদি তাদের হাত আমাদের ওপর পড়ে তাহলে তো তারা আমাদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা জোরপূর্বক নিজেদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে" ।[৭৯]

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى -

আমি তাদের সত্যিকার ঘটনা তোমাকে শুনাচ্ছি। তারা কয়েকজন যুবক ছিলো, তাদের রবের ওপর ঈমান এনেছিলো এবং আমি তাদের সঠিক পথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।[৮০]

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا -

তোমরা তাদেরকে দেখে মনে করতে তারা জেগে আছে, অথচ তারা ঘুমুচ্ছিল। আমি তাদের ডাইনে বাঁয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করাচ্ছিলাম। এবং তাদের কুকুর গুহা মুখে সামনের দু পা ছড়িয়ে বসেছিল। যদি তুমি কখনো উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে তাহলে পিছন ফিরে পালাতে থাকতে এবং তাদের দৃশ্য তোমাকে আতংকিত করতো।[৮১]

পাহাড়ের মধ্যে একটি গুহার কয়েকজন লোকের এভাবে অবস্থান করা এবং সামনে দিকে কুকরের বসে থাকা এমন একটি ভয়াবহ দৃশ্য পেশ করে যে, উঁকি দিয়ে যারা দেখতে যেতো তারাই তাদেরকে ডাকাত মনে করে ভয়ে পালিয়ে যেতো । এটি ছিল একটি বড় কারণ, যে জন্য লোকেরা এত দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদে সম্পর্কে জানতে পারেনি । কেউ কখনো ভিতরে ঢুকে আসল ব্যাপারের খোঁজ খবর নেবার সাহসই করেনি।

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا -

এভাবে আমি নগরবাসীদেরকে তাদের অবস্থা জানালাম, যাতে লোকেরা জানতে পারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই আসবে। (কিন্তু একটু ভেবে দেখো, যখন এটিই ছিল চিন্তার আসল বিষয়) সে সময় তারা পরস্পর এ বিষয়টি নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল যে, এদের (আসহাবে কাহফ) সাথে কি করা যায়। কিছু লোক বললো, "এদের ওপর একটি প্রাচীর নির্মাণ করো, এদের রবই এদের ব্যাপারটি ভালো জানেন।" কিন্তু তাদের বিষয়াবলীর ওপর যারা প্রবল ছিল তারা বললো, "আমরা অবশ্যি এদের ওপর একটি ইবাদাতখানা নির্মাণ করবো" ।[৮২]

---

৭৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ১২১০

৮০. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ১৩

৮১. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ১৮

৮২. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ২১

Dhaka University Institutional Repository

গুহাবাসী যুবকদের (আসহাবে কাহফ) একজন যখন শহরে খাবার কিনতে গিয়েছিলেন তখন সেখানকার দুনিয়া বদলে গিয়েছিল । মূর্তি পূজারী রোমানরা দীর্ঘদিন থেকে ঈসায়ী হয়ে গিয়েছিল । ভাষা, তাহযীব, তামাদ্দুন, পোষাক- পরিচ্ছেদ সব জিনিসেই সুস্পষ্ট পরিবর্তন এসে গিয়েছিল । দু' শো বছরের আগের এ লোকটি নিজের সাজ - সজ্জা, পোশাক, ভাষা ইত্যাদি প্রত্যেকটি ব্যাপারে হঠাৎ এক দর্শনীয় বিষয়ে পরিণত হলেন । তারপর যখন খাবার কেনার জন্য কাইজার ডিসিয়াসের যুগের মুদ্রা পেশ করলেন তখন দোকানদার অবাক হয়ে গেলো। মুরিয়ানী বর্ণনা অনুসারে বলা যায়, দোকানদারের সন্দেহ হলো হয়তো পুরাতন যুগের কোন গুপ্ত ধনের ভাণ্ডার থেকে এ মুদ্রা আনা হয়েছে ।

কাজেই আশেপাশের লোকদেরকে সেদিকে আকৃষ্ট করলো । শেষ পর্যন্ত তাঁকে নগর শাসকের হাতে সোপর্দ করা হলো। সেখানে গিয়ে বহস্যভেদ হলো যে, দু' শো বছর আগে হযরত ঈসার (আ) অনুসারীদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য পালিয়েছিলেন এ ব্যক্তি তাদেরই একজন। এ খবর শহরের ঈসায়ী অধিবাসীদের মধ্যে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো। ফলে শাসকের সাথে বিপুল সংখ্যক জনতাও গুহায় পৌঁছে গেলো। এখন নাসহাবে কাহফগণ যখন জানতে পারলেন যে, তারা দু'শো বছর ঘুমাবার পর জেগেছেন তখন তারা নিজেদের ঈসায়ী ভাইদেরকে সালাম করে শুয়ে পড়লেন এবং তাদের প্রাণবায়ূ উড়ে গেলো।[৮৩]

সুরিয়ানী বর্ণনা অনুযায়ী সেকালে সেখানে কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে বিষম বিতর্ক চলছিল । যদিও রোমান শাসনের প্রভবে সাধারণ লোক ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং পরকাল এ ধর্মের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের অংগ ছিল তবুও তখনো রোমীয় শিরক ও মূর্তি পূজা এবং গ্রীক দর্শনের প্রভাব ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী । এর ফলে বহু লোক আখেরাত অস্বীকার অথবা কমপক্ষে তার অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতো । আবার এ সন্দেহ ও অস্বীকরকে যে জিনিসটি শক্তিশালী করছিল সেটি ছিল এই যে, এফিসুসে বিপুল সংখ্যক ইহুদী বাস করতো এবং তাদের একটি সম্প্রদায় (যাদেরকে সাদুকী বলা হতো) প্রকাশ্যে আখেরাত অস্বীকার করতো । তারা আল্লাহর কিতাব (অর্থাৎ তাওরাত) থেকে আখেরাত অস্বীকৃতির প্রমাণ পেশ করতো ।

এর মোকাবিলা করার জন্য ঈসায়ী আলেমগণের কাছে শক্তিশালী যুক্তি - প্রমাণ ছিল না । মথি, মার্ক ও লুক লিখিত ইঞ্জিলগুলোতে আমরা সাদুকীদের সাথে ঈসা (আ) এর বিতর্কের উল্লেখ পাই । আখিরাত বিষয়ে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল । কিন্তু তিনজন ইঞ্জিল লেখকই ঈসা (আ) এর পক্ষ থেকে এমন দুর্বল জবাব সংকলন করেছেন যার দুর্বলতা খোদ খৃষ্টান পণ্ডিতগণই স্বীকার করেন ।[৮৪]

এ কারণে আখেরাত অস্বীকারকারীদের শক্তি বেড়ে যাচ্ছিল এবং আখেরাত বিশ্বাসীরাও সন্দেহ ও দোটানার মধ্যে অবস্থান করতে শুরু করছিল। ঠিক এ সময় আসহাবে কাহফের ঘুম থেকে জেগে ওঠার ঘটনাটি ঘটে এবং এটি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের স্বপক্ষে এমন চাক্ষুষ প্রমাণ পেশ করে যা অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না ।

---

৮৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৯৯৩

৮৪. মথি ২২: ৩২-৩৩, মার্ক ১২ : ১৮-২৭, লুক ২০: ২৭-৪০)।

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্যের তাৎপর্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি ছিল ঈসায়ী সজ্জনদের উক্তি । তাদের মতে আসহাবে কাহফ গুহার মধ্যে যেভাবে শুয়ে আছেন সেভাবেই তাদের শুয়ে থাকতে দাও এবং গুহা মুখ বন্ধ করে দাও । তাদের রবই ভাল জানেন তারা কারা, তাদের মর্যাদা কি এবং কোন ধরনের প্রতিদান তাদের উপযোগী ।][৮৫]

এখানে রোম সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং খৃষ্টীয় গীর্জার ধর্মীয় নেতৃবর্গের কথা বলা হয়েছে, যাদের মোকাবিলায় সঠিক আকীদা - বিশ্বাসের অধিকারী ঈসায়ীদের কথা মানুষের কাছে ঠাঁই পেতো না। পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাধারণ খৃষ্টানদের মধ্যে বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক গীর্জাসমূহে শিসক, আউলিয়া পূজা ও কবর পূজা পুরো জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। বুযর্গদের আস্তানা পূজা করা হচ্ছিল এবং ঈসা, মারয়াম ও হাওয়ারীগণের প্রতিমূর্তি গীর্জাগুলোতে স্থাপন করা হচ্ছিল। আসহাবে কাহফের নিদ্রাভংগের মাত্র কয়েক বছর আগে ৪৩১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের ধর্মীয় নেতাদের একটি কাউন্সিল এ এফিসুসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ।

সেখানে হযরত ঈসা আলইহিস সালামের আল্লাহ হওয়া এবং হযরত মারয়ামের (আ) "আল্লাহ- মাতা" হওয়ার আকীদা চার্চের সরকারী আকীদা হিসেবে গণ্য হয়েছিল । এ ইতিহাস সামনে রাখলে পরিষ্কার জানা যায়, (আরবী - الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ) বাক্যে যাদেরকে প্রাধান্য লাভকারী বলা হয়েছে তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা ঈসার সাচ্চা অনুসারীদের মোকাবিলায় তৎকালীন খৃষ্টান জনগণের নেতা এবং তাদের শাসকের মর্যাদার অধিষ্ঠিত ছিল এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী যাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল । মূলত এরাই ছিল শিরকের পতাকাবাহী এবং এরাই আসহাবে কাহফের সমাধি সৌধ নির্মাণ করে সেখানে মসজিদ তথা ইবাদাতখানা নির্মান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ।[৮৬]

মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক কুর'আন মজীদের এ আয়াতটির সম্পূর্ণ উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছে । তারা এ থেকে প্রমাণ করতে চান যে, সাহাবীগণের কবরের ওপর সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ জায়েয । অথচ কুর'আন এখানে তাদের এ গোমরাহীর প্রতি ইংগিত করছে যে, এ জালেমদের মনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও পরকাল অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি করার জন্য তাদের যে নিদর্শন দেখানো হয়েছিল তাকে তারা শিরকের কাজ করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ মনে করে নেয় এবং ভাবে যে, ভালই হলো পূজা করার জন্য আরো কিছু আল্লাহর অলী পাওয়া গেলো । তাছাড়া এই আয়াত থেকে "সালেহীন" লোকদের কবরের ওপর মসজিদ তৈরী করার প্রমাণ কেমন করে সংগ্রহ করা যেতে পারে যখন নবী (স)- এর বিভিন্ন উক্তির মধ্যে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে :

---

৮৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৮৩২

৮৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৭৫৪

Dhaka University Institutional Repository

"করব যিয়ারতকারী নারী ও কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে যারা বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি আল্লাহর লানত বর্ষণ করেছেন ।" [৮৭]

"সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদাতখানা বানিয়ে নিতো । আমি তোমাদের এ ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করছি ।"[৮৮]

"আল্লাহ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি লানত বর্ষণ করেছেন । তারা নিজেদের নবীদের কবরগুলোকে ইবাদাতখানা পরিণত করেছে।"[৮৯]

"এদের অবস্থা এ ছিল যে, যদি এদের মধ্যে কোন সৎলোক থাকতো তাহলে তার মৃত্যুর পর এরা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তার ছবি তৈরী করতো। এরা কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট সৃষ্টি হবে।"[৯০]

নবী (স) এর এ সুস্পষ্ট বিধান থাকার পরও কোন আল্লাহভীরু ব্যক্তি কুর'আন মজীদে ঈসায়ী পাদরী ও রোমীয় শাসকদের যে ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড কাহিনীচ্ছলে বর্ণনা করা হয়েছে তাকেই ঐ নিষিদ্ধ কর্মটি করার জন্য দলীল ও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাবার দুঃসাহস কিভাবে করতে পারে ?

এ প্রসংগে আরো বলা দরকার যে, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রেভারেন্ড আরুনডেল (Arundell) এশিয়া মাইনরের আবিষ্কার (Discoveries in Asia Minor) নামে নিজের যে প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলাফল পেশ করেন তাতে তিনি বলেন যে, প্রাচীন শহর এফিসুসের ধ্বংসাবশেষ সংলগ্ন পর্বতের ওপর তিনি হযতে মারয়াম ও "সাত ছেলে"র (অর্থাৎ আসহাবে কাহ্‌ফ সমাধি সৌধের ধবংসাবশেষ পেয়েছেন।)

---

৮৭. মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ
৮৮. মুসলিম
৮৯. আহমদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।
৯০. মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ

Dhaka University Institutional Repository

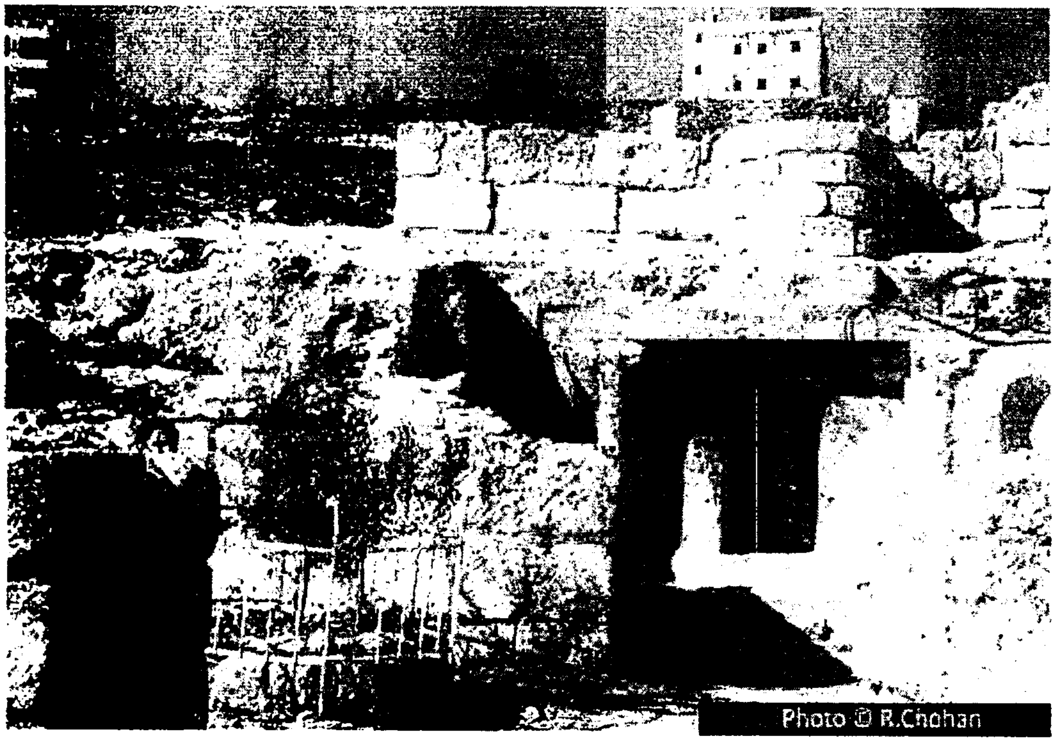

আসহাবে কাহ্‌ফ এর গুহা

ভৌগোলিক অবস্থান

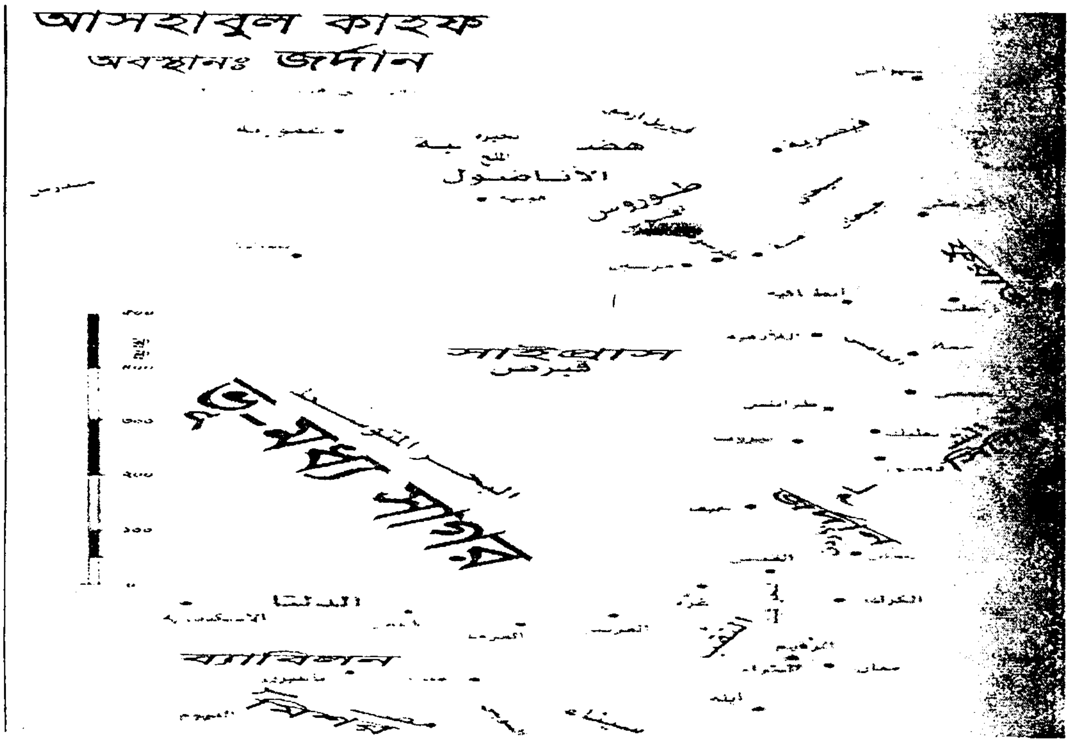

কাহ্ফ এর স্থান

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

এ কাহিনীর প্রাচীনতম বিবরণ পাওয়া গেছে জেমস সারোজি নামক সিরিয়ার একজন খৃষ্টান পাদরীর বক্তৃতামালায়। তার এ বক্তৃতা ও উপদেশবাণী সুরিয়ানী ভাষায় লিখিত । আসহাবে কাহফের মৃত্যুর কয়েক বছর পর ৪৫২ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম হয় । ৪৭৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি নিজের এ বক্তৃতামালা সংকলন করেন । এ বক্তৃতামালায় তিনি আসহাবে কাহফের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন । আমাদের প্রথম যুগের মুফাসসিরগণ এ সুরিয়ানী বর্ণনার সন্ধান পান । ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তাফসীরগ্রন্থের বিভিন্ন সূত্র মাধ্যমে এ কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন । অন্যদিকে এগুলো ইউরোপেও পৌঁছে যায় । সেখানে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশিত হয় ।

গিবন তার "রোম সম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস" গ্রন্থের ৩৩ অধ্যায়ে ঘুমন্ত সাতজন শিরোনামে ঐসব উৎস থেকে এ কাহিনীর যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন তা আমাদের মুফাসসিরগণের বর্ণনার সাথে এত বেশী মিলে যায় যে, উভয় বর্ণনা একই উৎস থেকে গৃহীত বলে মনে হয় । যেমন যে বাদশাহর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আসহাবে কাহফ গুহাভ্যন্তরে আশ্রয় নেন আমাদের মুফাসসিরগণ তাঁর নাম লিখেছেন 'দাকায়ানুস' বা 'দাকিয়ানুস' এবং গিবন বলেন, সে ছিল কাইজার 'ডিসিয়াস' (Decious) এ বাদশাহ ২৪৯ থেকে ২৫১

Dhaka University Institutional Repository

খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোম সম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে এবং ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন চালাবার ব্যাপারে তার আমলই সবচেয়ে বেশী দুর্ণাম কুড়িয়েছে । যে নগরীতে এ ঘটনাটি ঘটে আমাদের সুফাসসিরগণ তার নাম লিখেছেন 'আফসুস' বা আসসোস' । অন্যদিকে গিবন তরা নাম লিখেছেন 'এফিসুস' (Ephesus) এ নগরীটি এশিয়া মাইনরের পশ্চিম তীরে রোমীয়দের সবচেয়ে বড় শহর ও বন্দর নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান তুরস্কের 'ইজমীর' (স্মার্ণা) নগরী থেকে ২০-২৫ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায় । তারপর যে বাদশাহর শাসনামলে আসহাবে কাহফ জেগে উঠেন আমাদের মুফাসরিগণ তার নাম লিখেছেন 'তেযোসিস' এবং গিবন বলেন, তাদের নিদ্রাভংগের ঘটনাটি কাইজার দ্বিতীয় থিয়োডোসিস (theodosius) এর আমলে ঘটে ।

রোম সম্রোজ্য খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নেয়ার পর ৪০৮ থেকে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রোমের কাইজার ছিলেন । উভয় বর্ণনার সাদৃশ্য এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে আসহাবে কাহফ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তাদের যে সাথীকে খাবার আনার জন্য শহরে পাঠান তার নাম আমাদের মুফাসসিরগণ লিখেছেন 'ইয়ামলিখা' এবং গিবন লিখেছেন 'ইয়াসলিখুস' (lamblchus) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে উভয় বর্ণনা একই রকমের । এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, কাইজার ডিসিয়াসের আমলে যখন ঈসা (আ) এর অনুসারীদের ওপর চরম নিপীড়ন নির্যাতে চালানো হচ্ছিল তখন এ সাতজন যুবক একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন । তারপর কাইজার থিযোডোসিসের রাজত্বের ৩৮ তম বছরে অর্থাৎ প্রায় ৪৪৫ বা ৪৪৬ খৃষ্টাব্দে তারা জেগে উঠেছিলেন । এ সময় সমগ্র রোম সম্রোজ্য ছিল ঈসা (আ) এর দীনের অনুসারী । ঐ হিসেবে গুহায় তাদের ঘুমানোর সময় ধরা যায় প্রায় ১৯৬ বছর । কোন কোন প্রাচ্যবিদ এ কাহিনীটিকে আসহাবে কাহফের কাহিনী বলে মেনে নিতে এ জন্য অস্বীকার করেছেন যে, সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে কুর'আন তাদের গুহায় অবস্থানের সময় ৩০৯ বছর বলে বর্ণনা করছে । কিন্তু ২৫ টীকায় আমি এ জবাব দিয়েছি ।

এ সুরিয়ানী বর্ণনা ও কুর'আনের বিবৃতির মধ্যে সামান্য বিরোধও রয়েছে। এরি ভিত্তিতে গিবন নবী (স) এর বিরুদ্ধে "অজ্ঞতা"র অভিযোগ এনেছেন। অথচ যে বর্ণনার ভিত্তিতে তিনি এতবড় দুঃসাহস করছেন তার সম্পর্কে তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, সেটি এ ঘটনার তিরিশ চল্লিশ বছর পর সিরিয়ার এক ব্যক্তি লেখেন। আর এত বছর পর নিছক জনশ্রুতির মাধ্যমে একটি ঘটনার বর্ণনা এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছুতে পৌঁছুতে কিছু না কিছু বদলে যায়। এ ধরনের একটি ঘটনার বর্ণনাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য মনে করা এবং তার কোন অংশের সাথে বিরোধ হওয়াকে নিশ্চিতভাবে কুর'আনের ভ্রান্তি বলে মনে করা কেবলমাত্র এমনসব হঠকারী লোকের পক্ষেই শোভা পায় যারা ধর্মীয় বিদ্বেষ বশে বুদ্ধিমত্তার সামান্যতম দাবীও উপেক্ষা করে যায় ।

আসহাবে কাহফের ঘটনাটি ঘটে আফসোস (Ephesus) নগরীতে । খৃষ্টপূর্ব প্রায় এগারো শতকে এ নগরীটির পত্তন হয় । পরবর্তীকালে এটি মূর্তিপূজার বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয় । এখানকার লোকেরা চাঁদ বিবির পূজা করতো । তাকে বলা হতো ডায়না (diana) । এর সুবিশাল মন্দিরটি প্রাচীন যুগের দুনিয়ার অত্যাশ্চর্য বিষয় বলে গণ্য হতো । এশিয়া মাইনরের লোকেরা তার পূজা করতো । রোমান সাম্রাজ্যেও তাকে উপাস্যদের মধ্যে শামিল করে নেয়া হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ঈসা (আ) এর পর যখন তাঁর দাওয়াত রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছতে শুরু করে তখন এ শহরের কয়েকজন যুবকও শিরক থেকে তওবা করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে । খৃষ্টীয় বর্ণনাবলী একত্র করে তাদের ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ গ্রেগরী অব টুরস (Gregory of tours)তাঁর গ্রন্থে (Meraculorum liber) বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :

তারা ছিলেন সাতজন যুবক। তাদের ধর্মান্তরের কথা শুনে কাইজার ডিসিয়াস তাদের নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের ধর্ম কি ? তারা জানতেন, কাইজার ঈসার অনুসারীদের রক্তের পিপাসু। কিন্তু তারা কোন প্রকার শংকা না করে পরিস্কার বলে দেন, আমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদকে আমারা ডাকি না । যদি আমরা এমনটি করি তাহলে অনেক বড় গুনাহ করবো। কাইজার প্রথমে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোমাদের মুখ বন্ধ করো, নয়তো আমি এখানেই তোমাদের হত্যা করার ব্যবস্থা করবো । তারপর কিছুক্ষণ থেকে বললেন, তোমরা এখনো শিশু। তাই তোমাদের তিনদিন সময় দিলাম। ইতিমধ্যে যদি তোমরা নিজেদের মত বদলে ফেলো এবং জাতির ধর্মের দিকে ফিরে আসো তাহলে তো ভাল, নয়তো তোমাদের শিরশ্ছেদ করা হবে ।

"এ তিন দিনের অবকাশের সুযোগে এ সাতজন যুবক শহর ত্যাগ করেন। তারা কোন গুহায় লুকাবার জন্য পাহাড়ের পথ ধরেন। পথে একটি কুকুর তাদের সাথে চলতে থাকে। তারা কুকুরটাকে তাদের পিছু নেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য বহু চেষ্টা করেন । কিন্তু সে কিছুতেই তাদের সংগ ত্যাগ করতে রাযী হয়নি। শেষে একটি বড় গভীর বিস্তৃত গুহাকে ভাল আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়ে তারা তার মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। কুকুরটি গুহার মুখে বসে পড়ে। দারুন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত থাকার কারণে তারা সবাই সংগে সংগেই ঘুমিয়ে পড়েন। এটি ২৫০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ১৯৭ বছর পর ৪৪৭ খৃষ্টাব্দে তারা হঠাৎ জেগে উঠেন। তখন ছিল কাইজার দ্বিতীয় থিয়োডোসিসের শাসনামল। রোম সাম্রাজ্য তখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আফসোস শহরের লোকেরাও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল।"

"এটা ছিল এমন এক সময় যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যু পরের জীবন এবং কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে জমায়েত ও হিসেব নিকেশ হওয়া সম্পর্কে প্রচণ্ড মতবিরোধ চলছিল । আখেরাত অস্বীকাররের ধারণা লোকদের মন থেকে কিভাবে নির্মূল করা যায় এ ব্যাপারটা নিয়ে কাইজার নিজে বেশ চিন্তিত ছিলেন । একদিন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেন তিনি এমন কোন নিদর্শন দেখিয়ে দেন যার মাধ্যমে লোকেরা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে । ঘটনাক্রমে ঠিক এ সময়েই এ যুবকরা ঘুম থেকে জেগে ওঠেন।"

"জেগে ওঠেই তারা পরস্পরকে জিজ্ঞস করেন, আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি? কেউ বলেন একদিন, কেউ বলেন দিনের কিছু অংশ । তারপর আবার একথা বলে সবাই নীরব হয়ে যান যে এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। এরপর তারা জীন (Jean) নামে নিজেদের একজন সহযোগীকে রূপার কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে খাবার আনার জন্য শহরে পাঠান । লোকেরা যাতে চিনতে না পারে এ জন্য তাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন । তারা ভয় করছিলেন, লোকেরা আমাদের ঠিকানা জানতে পারলে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে এবং ডায়নার পূজা

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য আমাদের বাধ্য করবে । কিন্তু জীন শহরে পৌছে সবকিছু বদলে গেছে দেখে অবাক হয়ে যান । তিনি দেখেন সবাই ঈসায়ী হয়ে গেছে এবং ডায়না দেবীর পূজা কেউ করছে না। একটি দোকানে গিয়ে তিনি কিছু রুটি কিনেন এবং দোকনদারকে একটি রূপার মুদ্রা দেন। এ মুদ্রার গায় কাইজার ডিসিয়াসের ছবি ছাপানো ছিল। দোকানদার এ মুদ্রা দেখে অবাক হয়ে যায়। সে জিজ্ঞস করে, এ মুদ্রা কোথায় পেলে ? জীন বলে এ আমার নিজের টাকা, অন্য কোথাও থেকে নিয়ে আসিনি। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয় । লোকদের ভীড় জমে ওঠে। এমন কি শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নগর কোতায়ালের কাছে পৌঁছে যায়। কোতোয়াল বলেন, এ গুপ্ত ধন যেখান থেকে এনেছো সেই জায়গাটা কোথায় আমাকে বলো। জীন বলেন,কিসের গুপ্ত ধন ? এ আমার নিজের টাকা; কোন গুপ্তধনের কথা আমার জানা নেই। কোতোয়াল বলেন, তোমার একথা মেনে নেয়া যায় না। কারণ তুমি যে মুদ্রা এনেছো, এতো কয়েক শো বছরের পুরানো। তুমি তো সবেমাত্র যুবক, আমাদের বুড়োরাও এ মুদ্রা দেখেনি।

নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে । জীন যখন শোনেন কাইজার ডিসিয়াস মারা গেছে বহুযুগ আগে তখন তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন । কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন কথাই বলতে পারেন না । তারপর আস্তে আস্তে বলেন, এ তো মাত্র কালই আমি এবং আমার ছয়জন সাথী এ শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং ডিসিয়াসের জুলুম থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম । জীনের একথা শুনে কোতোয়ালও অবাক হয়ে যান। তিনি তাকে নিয়ে যেখানে তার কথা মতো তারা লুকিয়ে আছেন সেই গুহার দিকে চলেন । বিপুল সংখ্যক জনতাও তাদের সাথী হয়ে যায় । তারা যে যথাযর্থই কাইজার ডিসিয়াসের আমলের লোক সেখানে পৌঁছে এ ব্যাপারটি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায় । এ ঘটনার খবর কাইজার ডিসিয়াসের কাছেও পাঠানো হয়। তিনি নিজে এসে তাদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের থেকে বরকত গ্রহণ করেন। তারপর হঠাৎ তারা সাতজন গুহার মধ্যে গিয়ে সটান শুয়ে পড়েন এবং তাদের মৃত্যু ঘটে । এ সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে লোকেরা যথাযর্থই মৃত্যুর পরে জীবন আছে বলে বিশ্বাস করে । এ ঘটনার পর কাইজারের নির্দেশ গুহায় একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করা হয়।

খৃষ্টীয় বর্ণনাসমূহে গুহাবাসীদের সম্পর্কে এই যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে কুর'আন বর্ণিত কাহিনীর সাথে এর সাথে সাদৃশ্য এত বেশী যে, এদেরকেই আসহাবে কাহফ বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয় । এ ব্যাপারে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন যে, এ ঘটনাটি হচ্ছে এশিয়া মাইনরের আর আরব ভূখণ্ডের বাইরের কোন ঘটনা নিয়ে কুরআন আলোচনা করে না, কাজেই খৃষ্টীয় কাহিনীকেআসহাবে কাহফের ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া কুর'আনের পথ থেকে বিচ্যুতি হবে। কিন্তু আমার মতে এ আপত্তি ঠিক নয় । কারণ কুর'আন মজীদে আসলে আরববাসীদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য এমন সব জাতির এ শক্তির অবস্থা আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাদের সম্পর্কে তারা জানতো । তারা আরবের সীমানার মধ্যে থাকুক বা বাইরে তাতে কিছু আসে যায় না । এ কারণে মিসরের প্রাচীন ইতিহাস কুর'আনে আলোচিত হয়েছে । অথচ (প্রাচীন) মিশর আরবের বাইরে অবস্থিত ছিল । প্রশ্ন হচ্ছে, মিশরের ঘটনাবলী কেন হতে পারে না ? আরববাসীরা যেভাবে মিসর সম্পর্কে জানতো ঠিক তেমনি রোম সম্পর্কেও তো জানতো । রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা হিজাযের একেবারে উত্তর সীমান্তের সাথে লাগোয়া ছিল । আরবদের বাণিজ্য কাফেলা দিনরাত রোমীয় এলাকায় যাওয়া আসা করতো। বহু আরব গোত্র রোমানদের প্রভাবাধীন ছিল । রোম আরবদের জন্য মোটেই অজ্ঞাত দেশ ছিল না। সূরা রূম এর প্রমাণ । এ ছাড়া একথাও চিন্তা করার মতো যে, এ কাহিনীটি আল্লাহ নিজেই স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে কুর'আন মজীদে বর্ণনা করেননি । বরং মক্কার কাফেরদের জিজ্ঞাসার জবাবে বর্ণনা করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

আর আহলি কিতাবরা রসূলুল্লাহ (স) কে পরীক্ষা করার জন্য মক্কার কাফেরদেরকে তাঁর কাছ থেকে এমন ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দিয়েছিল যে সম্পর্কে আরবরা মোটেই কিছু জানতো না।[৯১]

কাহ্ফ ও রাক্বীম

অভিধানে পাহাড়ের অভ্যান্তরের প্রশস্ত গুহাকে কাহ্ফ বলে। অবশ্য 'রাক্বীম' শব্দের সমন্ধে মুফস্সেরীনের মধ্যে যথেষ্ঠ মতভেদ রহিয়াছে । যোহ্হাক ও সুদ্দী তাঁহারা উভয়ই প্রত্যেক তফসীরী রেওয়ায়তকে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) এর প্রতিই সম্পর্কিত করিয়া থাকেন । এখানে ও তাঁহারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

(১) 'রাক্বীম' শব্দটি 'রাক্বম্' শব্দ হইতে গৃহীত এবং 'রাক্বীম' কর্তৃবাচক শব্দটি এখানে 'মারক্বুম' কর্মবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ লিখিত। যেহেতু তৎকালীন বাদশাহ তাহাদের সন্ধান লাভের পর তাহাদের নাম একটি শিলাখন্ডে খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কারনে তাহাদিগকে 'আছাহাবুর রাক্বীম ' (অথাৎ, শীলা-লিপীওয়ালা বলা হয়। সাঈদ ইবনে জুবাইর ইহারই পোষাকতা করেন এবং মুফাস্সেরীনদের নিকট এই মতই প্রসদ্ধ।

(২) ইহা সেই উপত্যকার নাম, যেখানকার পাহাড়ে এই গুহাটি অবস্থিত ছিল। সেই গুহার মধ্যে 'আছহাবে কাহ্ফ' আত্মগোপন করিয়াছেন। ক্বাতাদা, আতিয়্যা আওফী এবং মজাহিদ ও এই মতই পোষন করেন।

(৩) 'রাক্বীন' সেই পাহাড়ের নাম যাহাতে গুহাটি ছিল ।

(৪) ইকরামা বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে ইহা বলতে শুণিয়াছি " আমি জানি না 'রাক্বীন' কি? রাক্বীন শব্দের দ্বারা কোন শিলালিপিই উদ্দেশ্যে, নাকি কোন শহর ?"

(৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইতে কা'বে আহবার ও ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ -এর রেওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, 'রক্বীম' আইলা অথাঃ আক্বাবার সন্নিকটে একটি শহরের নাম, ইহা রোম দেশে অবস্থিত। ইতিহাস এবং প্রত্মতত্ত্বানুসন্ধানের এই শেষোক্ত উক্তিটিই সঠিক এবং কোরআন মজিদের বর্ণনা অনুরূপ। আর বাকী অন্যান্য উক্তিগুলির ভিত্তি নিছিক ধারনা এবং অনুমানের উপর নিভরশীল ।

প্রকৃত কথা এই যে আসহাফের ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ) হওয়ার কিছু কাল পরবর্তী সময়ের ঘটনা এবং আনবাদ গোত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই আনবাদ কারা এবং এদের আবাসস্থল এবং দেশ কোথায় ? ইহাই সে সমস্যা যার সমাধান হয়ে গেলে প্রকৃত ঘটনাটি উদঘাটিত হতে পারে। আরব ঐতিহাসিক গণ আনবাদ সম্বন্ধে সাধারণত বলেন এরা অনারব বংশীয় এ কারণেই তারা নাবতিদিগকে আরবের প্রতিপক্ষ সাবস্থ্য করে থাকেন। আর আরব ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক উক্তি এবং তাওরাম ও রমিও গ্রীক ইতিহাস সমূহ প্রমাণ করছে যে, নাফতিরা খাঁটি আরবী ও ইসমাইলী বংশীয়। অবশ্য যাযাবর জীবন ত্যাগ করা এবং হেজায হতে বের হয়ে অন্যান্য অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করার দরুণ এরা আরবদের নিকট সম্পূর্ণ রূপে অপরিচিত হয়ে পড়েছে। এমনকি তারা নিজেরাও ভুলে গিয়েছে যে, আরবদের সাথে তাদের কী সম্পর্ক। এ কারণেই হযরত ফারুকে আযমের একটি উক্তি প্রসিদ্ধ রয়েছে।

---

৯১. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৭৯৯

Dhaka University Institutional Repository

"নিজের বংশধারা শিখে নেও ইরাকের নাফতিদের মতো হয়ো না কেননা তাদের মধ্য হতে কাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কোন বংশ হতে? তখন সে উত্তর দেয় আমি অমুক শহরের অধিবাসী।"

কিন্তু আনবাতের আলোচনা ত্যাগ করে যখন আরব ঐতিহাসিকগণকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাবত কিংবা নাবেদ কারা? তখন তারা কোন মতবেদ ব্যাতিরেকে তাৎক্ষণিক এই উত্তর প্রদান করবে "এরা ইবনে ইসমাইল (আ)" অর্থাৎ ইসমাইল (আ)" অর্থাৎ ইসমাইল (আ) এর বংশধর। কেননা হযরত ইসমাইল (আ) এর বার জন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল নাবেত কিংবা নাবত। যেমন ইবনে কাছির তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন

"সমস্ত হেযাযই আরবদের বিভিন্ন গোত্রসমূহের বংশধারা হযরত হযরত ইসমাইল (আ) এর দুই পুত্র নাবেত এবং কিদার পর্যন্ত যেয়ে সমাপ্ত হয়। আর হযরত ইসমাইল (আ) এর পরে নাবেত তার স্থলাভিশিক্ত হন। তিনি সমস্ত বিষয়ের নির্বাহক ও মক্কার শাসন কর্তা জমজম ও কাবাশরিফের মোতাওয়াল্লি সাবস্থ হন। তিনি বনি জুলহাম এর ভাগিনা ছিলেন। অতএব এ সম্পর্কের কারণে বণি জরহাম তার পরে একদীর্ঘ কাল পর্যন্ত মক্কার উপর শাসন কর্তা ও দখলকার ছিলেন। মক্কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের উপরে তার কতৃত্ব ছিল। দীর্ঘকাল পর নাবেতের নিম্নতম পঞ্চম পুরুষের মাজাজ নামক এক ব্যক্তি পুনরায় মক্কার শাসন ক্ষমতা এবং বায়তুল্লার মোতাওয়াল্লির পদ বনি জুরহামের অধিকার হতে বের করে নিজ তাহে গ্রহণ করেন।"

"আল বেতায়াতু ওয়ান নেহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড"[৯২]

পর্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ

ভোর বেলা চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেলে সবাই এক পর্বত গুহায় আশ্রয় নেন। তারা বলাবলি করলেন, এখানে কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি করি যাতে পথের শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হবে। অবশেষে তাঁরা পর্বত গুহায়ই বিশ্রাম নেন। তাঁদের পর্বত গুহায় বিশ্রাম নেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا -

স্মরণ করুন, যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহন করল তারপর প্রার্থনা করল- হে আমাদের রব! আমাদেরকে দান করুন আপনার কাছ থেকে রহমত এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে দিন।[৯৩]

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا -

তারপর আমি তাদেরকে সে গুহায় বহু বছর ঘূমন্ত অবস্থায় রেখে দিলাম ।[৯৪]

---

৯২. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৪খ, পৃ. ৫, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

৯৩. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ১০

৯৪. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ১১

Dhaka University Institutional Repository

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا -

অতঃপর তাদেরকে জাগালাম যেন জানতে পারি, তাদের মধ্যকার কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞাত ছিল।[৯৫]

বাদশাহ নন্দনরা খেলাচ্ছলে পালানোর পর দাকিয়ানুস তাদের খোজে খেলার মাঠে লোক পাঠায়, কিন্তু তাদেরকে পায় কোথায়। এতে জালেম দাকিয়ানুস খুবই আফসোস করে এবং কয়েকজন ঘোড় সওয়ারকে পলায়নরত বাদশাহ নন্দনদের পিছু ধাওয় করতে নির্দেশ করে । ঘোড় সওয়াররা খুজতে খুজতে সে পর্বত গুহার কাছে উপনীত হয় যেখানে বাদশাহ নন্দনরা বিশ্রামরত ছিলেন। আল্লাহর অনুগ্রহে সে গুহার মুখ পিঁপড়ার গর্তের রূপ ধারণ করে। ঘোড় সওয়াররা বাদশাহ নন্দনদের চিহ্ন মাত্রের সন্ধান লাভ করতে পারে নাই। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দাকিয়ানুস প্রেরিত ঘোড় সওয়াররা তথা হতেই প্রত্যাবর্তন করে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, সেই পর্বত গুহার কিনারায় তাদেরকে মৃত অবস্থায় পেযে সেখানেই রেখে চলে আসে। এ থেকেই তাঁরা আসহাবে কাহ্‌ফ অভিধায় অভিহিত হতে থাকেন।

আবার কেউ কেউ বর্ণনা করেন, তাঁরা বাদশাহ দাকিয়ানুসের বাবুর্চির ছেলে ছিল। তাদের কেউ কেউ ছিল রুটি প্রস্তুতকারীর ছেলে। দাকিয়ানুস তাদের একজনকে জাদুবিদ্যা শেখার জন্য এক জাদুকরের নিকট পাঠায়। একদিন রাস্তায় তার এক খ্রীস্টান পাদ্রীর সাথে সাক্ষাত হয়। পাদ্রী ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথায় যাচ্ছ ? ছেলেটি বলল, জাদু শিখতে যাচ্ছি। পাদ্রী বলল, জাদু তো কুফরী। তুমি কেন এ কুফরী বিদ্যা শিক্ষা করছ? তুমি মুসলমান হচ্ছ না কেন? পাদ্রীর কথায় ছেলেটির উপর আল্লাহর করুণা হয়। সে তক্ষুণি ইসলাম গ্রহণ করে। ছেলেটির ইসলাম গ্রহণের খবর জানতে পেরে দাকিয়ানুস তার প্রতি অতিশয় ক্ষেপে যায় এবং তাকে শূলিকাষ্ঠে চড়ানোর নির্দেশ দেয়। কথিত আছে, একে একে পাঁচ বার ছেলেটিকে শূলিকাষ্ঠে চড়ানো হলেও তার মৃত্যু ঘটে নাই।

আল্লাহর রহমতে সে নিরাপদ থাকে। এ অবস্থায়ও ছেলেটি বলে চলছিল– আমানতু বিরাব্বিল আলামীন– আমি সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালনকর্তার প্রতি ঈমান এনেছি। শূলিকাষ্ঠে চড়িয়েও ছেলেটিকে মারতে ব্যর্থ হয়ে দাকিয়ানুস তাকে কঠিন বন্দিদশায় নিক্ষেপ করে। তার সমমনা সমবয়সী আরও পাঁচটি ছেরে দাকিয়ানুসের কর্মচারী ছিল। তারা নিজেদের মাঝে শলা পরামর্শ করে যেকোন এক ফন্দিতে তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে। অতঃপর তারা সবাই ঐকমত্য হয়ে জালেম দাকিয়ানুসের আয়ত্ত থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্তক্রমে তারা দাকিয়ানুসের আওতা থেকে বেরিয়ে এক পর্বত গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই গুহাতেই তারা ঘুমিয়ে পড়ে এবং এ ঘুমে তিনশ' নয় বছর অতিবাহিত হয়। গুহায় তাদের এই দীর্ঘ নিদ্রা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কোরআন মজীদে বলেন–

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا -

هَؤُلَاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا -

---

৯৫. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ১২

Dhaka University Institutional Repository

এবং আমি তাদের অন্তর দৃঢ় করে দিয়েছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়াল এবং বলতে লাগল ঃ আমাদের রব আসমান ও জমিনের পালনকর্তা, আমরা কখনও তাকে ছেড়ে অন্য উপাস্যের ইবাদত করব না, যদি করে বসি, তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এরা তো আমাদেরই স্বজাতি, এরা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। এরা এদের সম্পর্কে কোন প্রকাশ্য প্রমাণ কেন উপস্থিত করে না ? তবে তার চেয়ে অধিক জালিম কে, যে আল্লাহ সমন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে ?[৯৬]

আসহাবে কাহ্ফের নাম ও সংখ্যা

আসহাবে কাহ্ফের নাম এবং সংখ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তারা রোমবাসী এবং তাদের গুহাটিও রোম ভূমিতেই অবস্থিত- এ ব্যাপারে অবশ্য ঐকমত্য রয়েছে। তাঁরা কোন দ্বীনের অনুসারী ছিরেন এবং কোন যুগের লোক ছিলেন- সবই মতভেদজনিত বিষয়। কেউ কেউ বলেন, আসহাবে কাহ্ফ হযরত ঈসা (আ)- এর দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। চরিতাভিধানে গ্রন্থ কামূসে উদ্ধৃত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মদ আল্লামা ইবনে কোতায়বার বর্ণনা মতে, আসহাবে কাহ্ফ হযরত ঈসা (আ)- এর পূর্ব যুগের লোক। কারো কারো মতে, তারা কোন দ্বীনের অনুসারী ছিলেন তা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। তবে এটা ঠিক যে, তাঁরা তাওহীদর উপর অধিষ্ঠিত ছিলন। তাঁরা কোন নবীর শরীআত অনুসরণ অবলম্বনের সুযোগ পান নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে যে-ই তাঁদের সম্পর্কে জানতে পেরেছে সে তাদের বিশ্রামস্থল গুহার পাশে একটি যেয়ারতাগাহ বানিয়েছে। যারা এসব যেয়ারতগাহ বানিয়েছে তারা ঈসা (আ)-এর দ্বীনের অনুসারী। আসহাবে কাহ্ফের নাম নিম্নরূপঃ

(১) মাকসালমীনা, (২) আমলীখা, (৩) ইয়াকসার, (৪) মারকূকাশ, (৫) নাওয়ানিশ, (৬) সায়েনূস, (৭) বাতীনূস, (৮) কাশফূতাত (৯) এই আট জন এবং নবম হচ্ছে তাদের সঙ্গী কুকুরটি ঃ কুকুরটির নাম কিতমীর।

কারো কারো মতে তাঁদের নাম- (১) মালীখা, (২) মাকসীনা, (৩) মারতুসে, (৪) নাওয়ানিস, (৫) আরীতানিস, (৬) কায়দ, (৭) সালতাতূস- এই সাত জন। অষ্টম হচ্ছে কুকুর।

আবার কেউ কেউ আসহাবে কাহ্ফের নাম এরূপ বর্ণনা করেন- (১) মাকসালমীনা, (২) ইয়ামলীখা, (৩) মারতূনিস, (৪) বেনূনিস, সাবূনিস, (৫) কাফাস্তাত্বস, (৬) যূনাওয়াস- সপ্তম হচ্ছে কুকুর।

কেউ কেউ বলেন- (১) মাকসালমীন, (২) আমলীখা, (৩) মারতূনিস, (৪) বাওয়ানিস, (৫) সারীনূশ, (৬) বাতানূশ, (৭) কাশফূতাত-অষ্টম হচ্ছে কুকুর।

কারো কারো মতে- (১) মাকসালমীনা, (২) নামলীখা, (৩) মারতূনিস, (৪) বনূনিস, (৫) সারীনূশ, (৬) যূনাওয়াস, (৭) কাশফীতাত ইউনূস- অষ্টম হচ্ছে কুকুর।[৯৭]

---

৯৬. আল-কুর'আন, ১৮ ঃ১৪-১৫

৯৭. আবু নায়ীম, মাওলানা, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ১৯৯৯, পৃ. ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত:

(حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا) -

অবশেষে সে চলতে চলতে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছল, তখন সে তথায় এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা কোন কথা একেবারেই বুঝতে চাইত না।[৯৮]

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا -

আমাকে লোহার পাত এনে দাও। তারপর যখন দু পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা সে পূর্ণ করে দিল তখন লোকদের বললো, এবার আগুন জ্বালাও। এমনকি যখন এ (অগ্নি প্রাচীর) পুরোপুরি আগুনের মতো লাল হয়ে গেলো তখন সে বললো, "আনো, এবার আমি গলিত তামা এর উপর ঢেলে দেবো।[৯৯]

পরিচিতি

যেহেতু সামনের দিকে বলা হচ্ছে যে, এ দু'পাহাড়ের বিপরীতে পাশে ইয়াজুজক মাজুজের এলাকা ছিল তাই ধরে নিতে হয় যে, এ পাহাড় বলতে কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী সুবিস্তীর্ণ ককেসীয় পবর্তমালাকে বুঝানো হয়েছে ।

অর্থাৎ যুলকারনাইন ও তার সাথীদের জন্য তাদের ভাষা ছিল প্রায়ই অপরিচিত ও দুর্বোধ্য । ভীষণভাবে সভ্যতার আলো বিবর্জিত ও বন্য হওয়ার কারণে তাদের ভাষা কেউ জানতো না এবং তারা ও কারোর ভাষা জানতো না ।[১০০]

---

৯৮. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ৯৩

৯৯. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ৯৬

১০০. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৮০১

Dhaka University Institutional Repository

সাইলুল আরিম

সাইলুল আরিম একটি উপত্যকার নাম। উক্ত উপত্যকাটি বন্যায় ভেসে যায়।[১০১]

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত:

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ -

অতঃপর তারা অবাধ্যতা করল ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা ! আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত করা হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ।[১০২]

মূলে বলা হয়েছে (سَيْلَ الْعَرِمِ) দক্ষিণ আরবের ভাষায় 'আরিম' শব্দটি উপত্তি হয়েছে 'আরিমন' থেকে। এর অর্থ হচ্ছে "বাঁধ"। ইয়ামনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সম্প্রতি যেসব প্রাচীন শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলোতে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ৫৪২ বা ৫৪৩ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি সম্পর্কে বলা যায়। ইয়ামনের হাবশী গভর্নর আবরাহা "সাদ্দি মারিব" এর সংস্কার কাজ শেষ করার পর এটি স্থাপন করেন। এতে তিনি বারবার এ শব্দটি বাঁধ অর্থে ব্যবহার করেন। কাজেই "সাইলুল আরিম" মানে হচ্ছে বাঁধ ভেংগে যে বন্যা আসে।

অর্থাৎ "সাইলুল আরিম" আসার ফলে সাবা এলাকা ধ্বংস হয়ে যায়। সাবার অধিবাসীরা পাহাড়ের মধ্যে বাঁধ বেঁধে যেসব খাল ও পানি প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল তা সব নষ্ট হয়ে যায় এবং পানি সেচের সমগ্র ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়। এরপর যে এলাকা এক সময় জান্নাত সদৃশ ছিল তা আগাছা ও জংগলে পরিপূর্ন হয়ে যায় এবং সেখানে নিছক বন্য কুল ছাড়া আর আহারযোগ্য কিছু থাকেনি।[১০৩]

---

১০১. দায়িরাতুল মা'য়ারিফ ৬/৩৯০

১০২. আল-কুর'আন, ৩৪ঃ ১৬

১০৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৭২১

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক অবস্থান

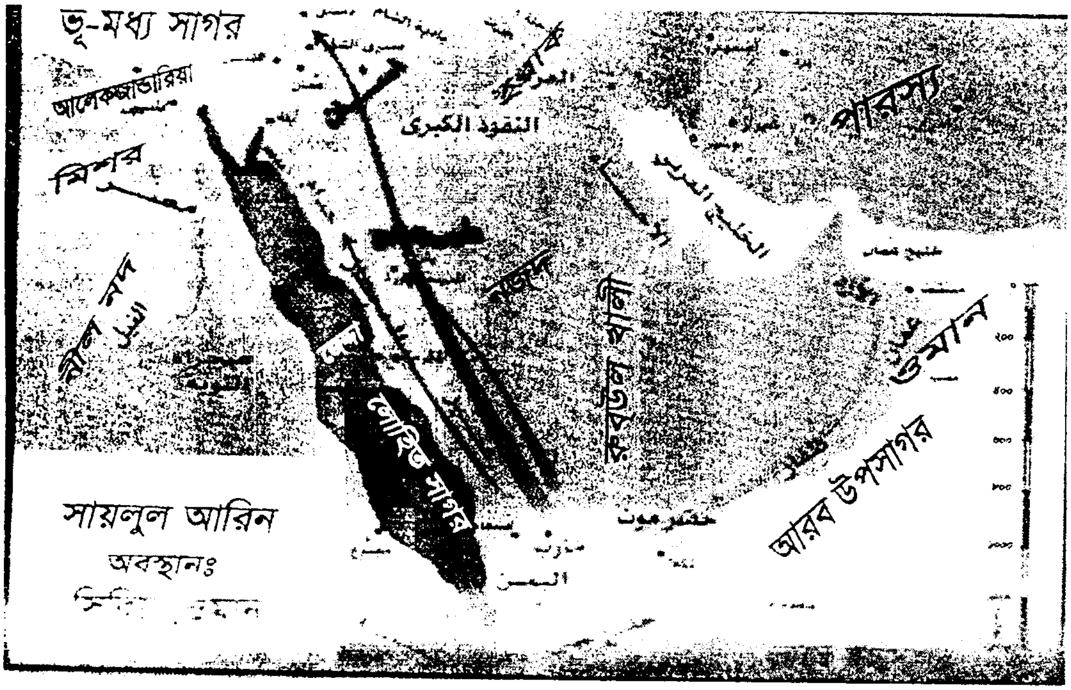

সাইলুল আরিম

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

সাইলে আরেম

ফলোত আল্লাহ তাআলা তাদের উপর দ্বিবিদ আযাব চাপিয়ে দিলেন যার ফলে তাদের বেহেশততুল্য বাগানগুলো বিনষ্ট হয়ে গেল এবং তৎসমুদয়ের স্থলে জংলিবড়ই, কাটা বিশিষ্ট বৃক্ষসমূহ এবং তিক্ত স্বাদ পীলু বৃক্ষসমূহ উৎপন্ন হয়ে এ সাক্ষ্য প্রদান করত এবং উপদেশের কাহিনী শোনাতে লাগল যে, আল্লাহ তাআলার অবিরত নাফরমানি এবং অবাধ্যতা চরণকারী গোত্রগুলির এমন শাস্তি হয়ে থাকে।

প্রথম শাস্তি: এই হলো যে, যে বাঁধ নির্মাণের উপর সাবা বাসীদের গর্ব ছিল এবং যার বদৌলতে তাদের রাজধানীর উভয় দিকে তিনশত বর্গমাইল পর্যন্ত সুন্দর ও মনোরম বাগানসমূহ এবং সরস, সতেজ ও শস্য শ্যামল খেতসমূহ এবং তাদের উৎপন্ন ফল ও শস্যসমূহ দ্বারা ইয়ামান পুষ্পদ্যানে পরিণত হয়েছিল। সে বাঁধটি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে অকস্মাৎ ভেঙ্গে গেল এবং হঠাৎ তার পানি ভীষণ প্লাবনে পরিণত হয়ে উপত্যাকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং মায়ারিফ ও মায়ারিব ও সে সমস্ত ভুখণ্ডকে প্লাবিত করে ফেলল যেখানে সে আনন্দদায়ক বাগানগুলো ছিল এবং সমস্ত বাগানগুলোকে ডুবিয়ে দিয়ে বিনষ্ট করে ফেলল। আর যখন পানি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হয়ে গেল তখন সে পূর্ণ এলাকায় জান্নাত তুল্য বাগানগুলোর স্থলে পাহাড়সমূহের উভয় পার্শ্ব হতে উপত্যাকার উভয়দিকে ঝাউগাছের ঝাড়, জংলিবড়ই গাছের ঝোপ এবং সেই পীলু বৃক্ষের সারি উৎপন্ন হল। যার ফল বিষাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালার এ আযাবকে সাবাবাসীদের কোন শক্তি এবং কোন প্রতিপত্তিই প্রতিরোধ করতে পারে নি এবং বাঁধটিকে পুনরায় বাঁধতে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জ্যামিতি

Dhaka University Institutional Repository

শাস্ত্রে তারা যে ব্যুৎপত্তি পরিচয় দিয়েছিল তা কোন কাজেই আসে নি। আর সাবা বাসীদের জন্য তাছাড়া আর কোন উপয়ই অবশিষ্ট রোলোনা যে, নিজেদের জন্মভূমি এবং পরিচ্ছন্ন শহর মায়ারিব ত্যাগ করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোরআন মাজিদ এই উপদেশমূলক ঘটনাকে বর্ণনা করে উপদেশগ্রাহী দৃষ্টি ও সজাগ অন্তরের মানুষকে এই সবক প্রদান করেছে।

দ্বিতীয় শাস্তি : মায়ারিবের পানির বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার পরে যখন মায়ারিব শহর এবং এর উভয়দিকের শহর শস্য শ্যামল ক্ষেতসমূহ উত্তম ফলফলাদিসমূহ এবং ফলের সতেজ বাগানসমূহ হতে বঞ্চিত হয়ে গেল তখন সে সমস্ত বস্তির বাসিন্দাদের অধিকাংশ লোক বিক্ষিপ্ত হয়ে কতকগুলো, সিরিয়া ও হেজাজের দিকে চলে গেল এবং কতক ইয়ামেনের অন্যান্য স্থানে গিয়ে বশতী স্থাপন করল। আল্লাহর আযাব পূর্ণ হওয়া এখন ও বাকী ছিল। কিন্তু সাবাবাসীরা শুধু অহংকার, অবাধ্যতাচরণ এবং কুফর ও শিরক ধারাই আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতসমূহের অপমান করে নাই বরং ইয়ামেন হতে সিরিয়া পর্যন্ত আরামদায়ক আবাদী ও বিশ্রামাগারের কারণে সেই সফরও তাদের পছন্দনীয় ছিল না। যাতে তারা অনুভব করত না যে, সফরের কষ্ট কীরূপ হয়ে থাকে। পানির কষ্ট এবং পানাহারের কষ্ট কাকে বলে এবং কদমে কদমে বহু মাইল পর্যন্ত দুই ধারে সুগন্ধি দ্রব্য এবং ফলের বাগানসমূহের দরুন গ্রীষ্ম ও সূর্যকীরণের সাথে তাদের পরিচয় ছিল না ।

এসমস্ত নেয়ামতের বিনিময় আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায়ের পরিবর্তে তারা বনি ইসরাইলদের ন্যায় নাসিকা ভ্রুকুঞ্চিত করে বলতে আরম্ভ করল ইহাও কি একট জীবন যে, মানুষ সফর হতে বাহির হলে তাও বুঝি পারে না। যে সে সফরেই আছে না বাড়িতেই আছে। ঐ সমস্ত লোক কত ভাগ্যবান যারা পুরুষোচিত সাহসের সাথে সফরের সর্ব প্রকার কষ্ট সহ্য করে পানি ও পানাহারের জন্য কষ্ট ভোগ করেন। এবং শান্তি ও উপকরণ সংগৃহীত না থাকার কারণে সফরের সাধ উপভোগ করেন। আহা কতইনা ভালো হতো আমাদের সফরও এমন হয়ে যেত। আমরা যদি অনুভব করতে পারতাম যে, আমরা নিজেদের বাড়িঘর ত্যাগ করে কোন দূর দূরন্তে সফরে বাহির হয়েছি এবং আমরা মঞ্জিলের দূরত্বের নানাবিধ কষ্ট সহ্য করে স্থায়ী বসতীর শান্তি ও সফরের কষ্টের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারতাম।

হতভাগ্য ও অকৃতজ্ঞ লোকদের এই নাশক্রি ছিল যার আকাঙক্ষা ও বাসানায় অস্থির হয়ে আল্লাহর আযাবকে ডেকে এনেছিল এবং এর নিকৃষ্ট পরিণাম সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে গিয়েছির। কাওমে সাবা যখন এই রূপে আল্লাহ তায়ালার নাশুকরি চরমে পৌছল তখন আল্লাহ তালাও তাদেরকে দ্বিতীয় শাস্তি এই দিলেন যে, ইয়ামেন হতে সিরিয়া পর্যন্ত তাদের সমস্ত বসতিকে জনমানবশূন্য করে দিলেন। যার কাছাকাছি ঘন ঘন ছোট শহর, গ্রাম আরামদায়ক পান্থশালা এবং তেজারতি বাজারের আকারের বসমী আর তাদের শান্তি ও আরামের উপকরণ ছিল এবং সফরের সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট হতে তাদেরকে রক্ষিত রাখত। আর এই রূপে সেই পূর্ন এলাকায় ধূলী উড়তে লাগল এবং ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত আবাদ বস্তিসমূহের সারিগুলি অনাবাদ মানবশূন্য ধূ ধূ প্রান্তরে রয়ে গেল।[১০৪]

---

১০৪. সূরা সাবা, রুকু-২ ও হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৪খ, পৃ. ৬১, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

হেরা গুহা

হেরা গুহায় ধ্যান

মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত জাবালুন নূর-এ 'হেরা' নামে একটি পর্বত-গুহা ছিল। হযরত (স) প্রায়শই সেখানে গিয়ে অবস্থান করতেন এবং নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা-ভাবনা ও খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। সাধারণত খানাপিনার দ্রব্যাদি তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন, শেষ হয়ে গেলে আবার নিয়ে আসতেন। কখনো কখনো হযরত খাদীজা (রা) তা পৌঁছে দিতেন।

সর্বপ্রথম ওহী নাযিল

এভাবে দীর্ঘ ছয়টি মাস কেটে গেল। হযরত চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। একদা তিনি হেরা গুহার ভেতর যথারীতি খোদার ধ্যানে মশগুল রয়েছেন্ সময়টি তখন রমজান মাসের শেষ দশক।সহসা তার সামনে আল্লাহর প্রেরিত এক ফেরেশতা আত্মপ্রকাশ করলেন। ইনি ফেরেশতা-শ্রেষ্ঠ জিবরাঈল (আ)।ইনিই যুগ যুগ ধরে আল্লাহর রাসূলদের কাছে তার পয়গাম নিয়ে আসতেন।

হযরত জিবরাঈল (আ) আত্মপ্রকাশ করেই হযরত (স)-কে বললেন- 'পড়ো'। তিনি বললেনঃ 'আমি পড়তে জানি না'।একথা শুনে জিবরাঈল (আ) হযরত (স)-কে বুকে জড়িয়ে এমনি জোরে চাপ দিলেন যে, তিনি থতমত খেয়ে গেলেন।অতঃপর হযরত (স)-কে ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন- 'পড়ো'।কিন্তু তিনি আগের জবাবেরই পুনরুক্তি করলেন।জিবরাঈল (আ) আবার তাকে আলিঙ্গন করে সজোরে চাপ দিলেন এবং বললেন- 'পড়ো'। এবারও হযরত (স) জবাব দিলেনঃ'আমি পড়তে জানি না।' পুনর্বার জিবরাঈল (আ) হযরত (স)-কে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{১} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{২} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{৩} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{৪} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{৫}

"পড়ো তোমার প্রভুর (রব) নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন জমাট-বাঁধা রক্ত থেকে। পড়ো এবং তোমার প্রভু অতীব সম্মানিত, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জিনিস শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।"

এই হচ্ছে সর্বপ্রথম ওহী নাযিলের ঘটনা। এ ঘটনার পর হযরত (স) বাড়ি চলে গেলেন। তখন তার পবিত্র অন্তঃকরণে এক প্রকার অস্থিরতা বিরাজ করছিল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে খাদীজা (রা) কে বললেনঃ 'আমাকে শিগগির কম্বল দ্বারা ঢেকে দাও' খাদীজা (রা) তাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর কিছুটা শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে এলে তিনি খাদীজা (রা)-এর কাছে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন; বললেনঃ 'আমার নিজের জীবন সম্পর্কে ভয় হচ্ছে' খাদীজা (রা) বললেনঃ 'না, কক্ষনোই নয়। আপনার জীবনের কোন ভয় নেই। খোদা আপনার প্রতি বিমুখ হবেন না। কেননা আত্মীয়দের হক আদায় করেন; অক্ষম লোকদের ভার-বোঝা নিজের কাঁধে তুরে নেন;গরীব-মিসকিনদের সাহায্য করেন; পথিক-মুসাফিরদের মেহমানদারী করেন।মোটকথা, ইনসাফের খাতিরে বিপদ- মুসিবতের সময় আপনিই লোকদের উপকার করে থাকেন।'

Dhaka University Institutional Repository

এরপর খাদীজা (রা) হযরত (স)-কে নিয়ে প্রবীণ খ্রিস্টান ধর্মবেত্তা অরাকা বিন নওফেলের কাছে গমন করলেন। তিনি তাওরাত সম্পর্কে খুব ভালো পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) তার কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন।তিনি সব শুনে বললেনঃ 'এ হচ্ছে মূসার ওপর অবতীর্ণ সেই 'নামূস' (গোপন রহস্যজ্ঞানী ফেরেশতা)। হায়! তোমার কওমের লোকেরা যখন তোমাকে বের করে দেবে, তখন পর্যন্ত আমি যদি জিন্দা থাকতাম! হযরত (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ আমার কওমের লোকেরা কি আমায় বের করে দেবে? অরাকা বললেনঃ তুমি যা কিছু নিয়ে এসেছো, তা নিয়ে ইতঃপূর্বে যে-ই এসেছে, তার কওমের লোকেরা তার সঙ্গে দুশমনি করেছে। আমি যদি তখন পর্যন্ত জিন্দা থাকি, তাহলে তোমায় যথাসাধ্য সাহায্য করবো' এর কিছুদিন পরই অরাকার মৃত্যু ঘটে।

এরপর কিছুদিন জিবরাঈলের আগমন বন্ধ রইলো। কিন্তু হযরত(স) যথারীতি হেরা গুহায় যেতে থাকলেন।এই অবস্থা অন্তত ছয়মাস চলতে থাকলো।এই বিরতির ফলে কিছুটা ফায়দা হলো। মানবীয় প্রকৃতির দরুণ তার অন্তরে ওহী নাযিলের ঔৎসুক্য সঞ্চারিত হলো। এমন কি, এই অবস্থা কিছুটা বিলম্বিত হলে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে জিবরাঈলের আগমন শুরু হলো। তবে ঘন ঘন নয়,মাঝে মাঝে। জিবরাঈল এসে তাকে এই বলে প্রবোধ দেন যে,আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল মনোনীত হয়েছেন। এরপর হযরত (স) শান্ত চিত্তে প্রতিক্ষা করতে লাগলেন। কিছুদিন পর জিবরাঈল ঘন ঘন আসা শুরু করলেন।[১০৫]

জাবালুন নূর

১০৫. আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, (অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), নাকিব পাবলিকেশন, ঢাকা: সর্বশেষ ২০০৬,

Dhaka University Institutional Repository

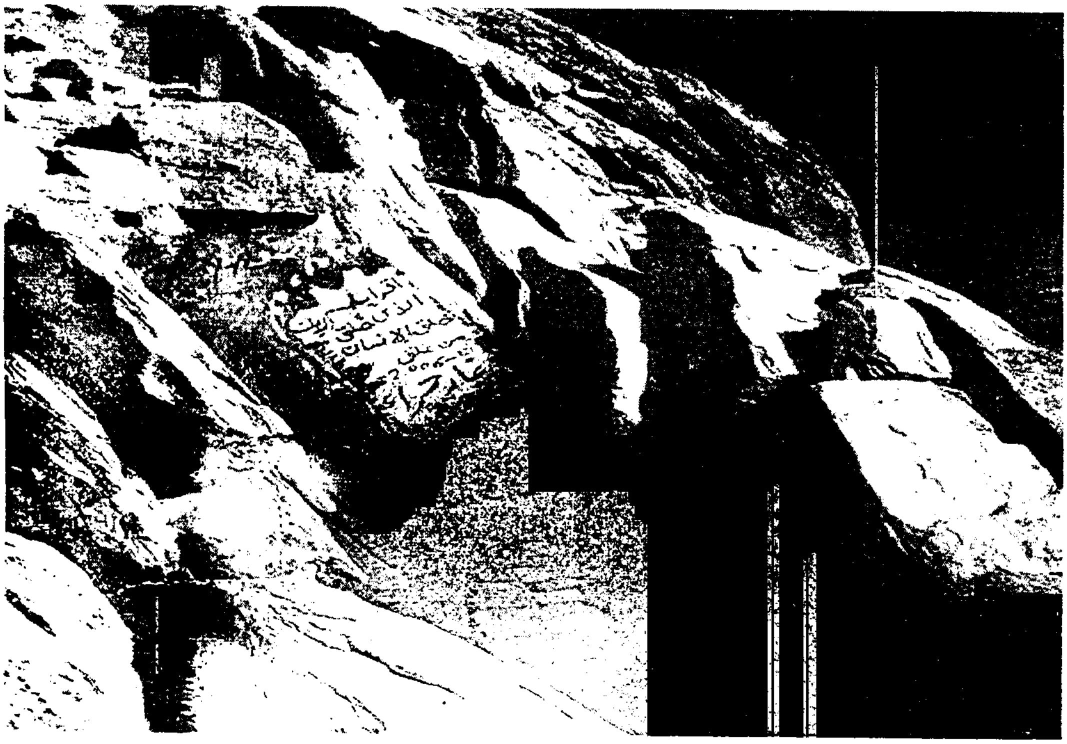

হেরা গুহা

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন সমুদ্র, কূপ, কারাগার, গর্ত এবং অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন সমুদ্র, কূপ, কারাগার, গর্ত এবং অন্যান্য

হযরত ইউনুস (আ)-এর জাহাজ

জাহাজ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ - فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ -
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ - فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ - لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ -
فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ - وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ -

আর ইউনুসও ছিলেন রাসুলগণের একজন। যখন তিনি পালিয়ে বোঝাই নৌযানে গিয়ে পৌছলেন, অতঃপর তিনি লটারীতে শরীক হলেন এবং অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। তারপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলেন। সুতরাং যদি তিনি আল্লাহর তাস্‌বীহ পাঠকারী না হতেন, তবে তিনি অবশ্যই থেকে যেতেন মাছের পেটে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম এক ময়দানে এবং তিনি ছিলেন পীড়িত। আর আমি উৎপন্ন করলাম তার উপর এক লাউ গাছ।[১]

এ বাক্যগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলে ঘটনার যে চিত্রটি সামনে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে-
এক : হযরত ইউনুস যে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তা তার ধারণা ক্ষমতার চাইতে বেশী বোঝাই (Overloaded) ছিল।

দুইঃ নৌকায় লটারী অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্ভবত এমন সময় হয় যখন সামুদ্রিক সফরে মাঝখানে মনে করা হয় যে, নৌকা তার ধারণ ক্ষমতার বেশী বোঝা বহন করার কারণে সকল যাত্রীর জীবন বিপদের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। কাজেই লটারীতে যার নাম উঠবে তাকেই পানিতে নিক্ষেপ করা হবে, এ উদ্দেশ্যে লটারী করা হয়।

তিন : লটারীতে হযরত ইউনুসের নামই ওঠে। তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় এবং একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে।

চার : হযরত ইউনুসের এ পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে প্রভুর (অর্থাৎ মহান আল্লাহ) অনুমতি ছাড়াই তাঁর কর্মস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। "আবাকা" শব্দটি এ অর্থই প্রকাশ করছে, ওপরের ৭৮ টীকায় এ ব্যাখ্যাই করা হয়েছে। "মূলীম" শব্দটিও একথাই বলছে। মূলীম এমন অপরপাধীকে বলা হয় যে নিজের অপরাধের কারণে নিজেই নিন্দিত হবার হকদার হয়ে গেছে, তাকে নিন্দা করা হোক বা না হোক।[২].

---

১. আল-কুর'আন, ৩৭ঃ ১৩৯-১৪৬

২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ১১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

এর দু'টি অর্থ হয় এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম পূর্বেই আল্লাহ থেকে গাফিল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না বরং তিনি তাদের অন্তরবুক্ত ছিলেন আল্লাহর চিরন্ত ন প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যখন তিনি মাছের পেটে পৌঁছুলেন তখন আল্লাহরই দিকে রুজূ ' করলেন এবং তারই প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষাণা করতে থাকলেন সূরা আল আম্বিয়ায় বলা হয়েছে :

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ -

" তাই সে অন্ধকারের মধ্যে তিনি ডেকে উঠলেন, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, পাক- পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধী। "[৩]

হযরত ইউনুস (আ) যখন তাঁর অপরাধ স্বীকার করে নিলেন এবং একজন মু'মিন ও ধৈর্যশীল বান্দার ন্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা গাইতে লাগলেন তখন আল্লহর হুকুমে মাছ তাঁকে উপকূলে উদগীরণ করলো। উপকূলে ছিল একটি বিরাণ প্রান্তর। সেখানে সবুজের কোন চিহ্ন ছিল না এবং এমন কোন জিনিসও ছিল না যা হযরত ইউনুসকে ছায়াদান করতে পারে। সেখানে খাদ্যের ও কোন সংস্থান ছিল না।

এখানে এসে অনেক বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের দাবীদারকে একথা বলতে শুনা গেছে যে, মাছের পেটে ঢুকে যাবার পর কোন মানুষের জীবিত বের হয়ে আসা অসম্ভব । কিন্তু বিগত শতকের শেষের দিকে এ তথাকথিত বুদ্ধি ও যুক্তিবাদীতার কেন্দ্র ভূমির (ইংল্যাণ্ড) উপকূলের সন্নিকটে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে । এ ঘটনাটি তাদের দাবী খণ্ডন করে । "১৮৯১ সালের আগষ্ট মাসে Star of the East নামক জাহাজে চড়ে কয়েকজন মৎস্য শিকারী তিমি শিকারের উদেশ্যে গভীর সমুদ্রে যায়। সেখানে তারা ২০ ফুট লম্বা , ৫ ফুট চওড়া ও ১০০ টন ওজনের একটি বিশাল মাছকে আহত করে। কিন্তু তার সাথে লাড়াই করার সময় জেমস বার্ডলে নামক একজন মৎস্য শিকারীকে তার সাথীদের চোখের সামনেই মাছটি গিলে ফেলে। একদিন পরে জাহাজের লোকেরা মাছটিকে মৃত অবস্থায় পায়। বহুকষ্টে সেটিকে তারা জাহাজে ওঠায় এবং তারপর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তার পেট কাটলে জেমস তার মধ্য থেকে জীবিত বের হয়ে আসে। এ ব্যক্তি মাছের পেটে পুরা ৬০ ঘন্টা থাকে।"[৪]

চিন্তায় ব্যাপার হচ্ছে, সাধারণ অবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে যদি এমনটি হওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহেল অস্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহর মু'জিযা হিসেবে এমনটি হওয়া কেমন করে অসম্ভব হতে পারে ?

পরিচিতি

কুর'আনে ইউনুস (আ)এর আলোচনা

কুর'আনে ছয়টি সূরায় মোট ১৮ বার ইউনুস (আ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সূরাগুলো হলো- আনআ'ম, ইউনুস, আস ছাফ্‌ফাত, আল আম্বিয়া এবং আল কৃলম। এর মাঝে প্রথম চারটি সূরায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। শেষের দু'টি সূরায় তাঁর গুণ প্রকাশক শব্দ 'যুন্নুন' (আরবি: ذو النون) এবং 'সাহিবুল হূত' (আরবি: صاحب الحوت) উল্লেখ করা হয়েছে। আর সূরা-নিসা ও সূরা-আনআ'মে পয়গম্বরদের তালিকার মাঝে শুধু তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে; অন্য কোন আলোচনা করা হয়নি। এছাড়া বাকী চারটি সূরায় তাঁর ঘটনার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। নিচে এ সম্পর্কিত একটি ছক দেয়া হলো-

---

৩. আল-কুর'আন, ২১ঃ ৮৭

৪. উর্দূ ডাইজেষ্ট, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আনে ইউনূস (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে সূরা আস-ছাফফাতেবলা হয়েছে-
আর ইউনুসও ছিলেন পয়গম্বরগণের একজন। যখন পালিয়ে তিনি বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। অতঃপর লটারী (সুরতি) করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। অতঃপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। যদি তিনি আল্লাহর তসবীহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। অতঃপর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম। এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। তারা বিশ্বাস স্থাপন করল অতঃপর আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।

নাম ও বংশপরিচয়
ইউনূস (আ) এর বংশ সম্পর্কে শুধু এটুকুই জানা যায় যে, তাঁর পিতার নাম ছিল 'মাত্তা'। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। বাইবেলে ইউনূস (আ) এর নাম 'ইউনাহ' এবং তাঁর পিতার নাম 'আমতা' বলা হয়েছে। তবে ইউনূস ইবনে মাত্তাহ এবং ইউনাহ ইবনে আমতার মাঝে ব্যক্তি হিসেবে কোন পার্থক্য নেই। এটা আরবি ও হিব্রু ভাষার উচ্চারণের পার্থক্য।

ধর্মপ্রচারের স্থান
ইরাকের সুপ্রসিদ্ধ জনপদ 'নীনাওয়া' এর অধিবাসীদের হিদায়াতের জন্য তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। নীনাওয়া আশূরী রাজ্যের রাজধানী এবং মাওসেল এলাকার কেন্দ্রীয় শহর ছিল। কুর'আনে এই শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষাধিক বলা হয়েছে।

ইউনূস (আ:)এর ঘটনা
২৮ বছর বয়সে ইউনূস (আ) নুবুয়্যত লাভ করেন এবং নীনাওয়াবাসী দাওয়াত দিতে আদিষ্ট হন। দীর্ঘদিন দাওয়াত দেয়ার পরও তারা ইমান না আনায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে নীনাওয়াবাসীর জন্য গজবের দোয়া করেন এবং ওই শহর ত্যাগ করেন। ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর তীরে পৌঁছার পর তিনি নৌকায় আরোহণ করেন। মাঝনদীতে যাওয়ার পর নৌকা ঝড়ে আক্রান্ত হয়। সে যুগের কুসংস্কার অনুযায়ী নৌকার আরোহীরা মনে করলো, নিশ্চয়ই এই নৌকায় কোন পলাতক দাস আছে। এটা শুনে ইউনূস (আ) এর চৈতন্যদয় হলো যে, তিনি শহর ছাড়ার ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষা করেননি। তিনি নিজের দোষ স্বীকার করলেন। কিন্তু নৌকার আরোহীরা তাঁর সততায় মুগ্ধ হলো এবং তাকে নৌকা থেকে ফেলে দিতে সম্মত হলো না। শেষপর্যন্ত তারা লটারী করলো এবং সেখানেও ইউনূস (আ)এর নামই উঠলো। ফলে বাধ্য হয়ে তারা ইউনুস (আ) কে নদীতে ফেলে দিল। এ সময় এক বিরাট মাছ তাকে গিলে ফেলে। কারো কারো মতে, সেটা ছিল তিমি মাছ। তিমির পেটের অন্ধকারের মাঝে তিনি আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে আল্লাহর আদেশে মাছটি তাকে তীরে এসে উগড়ে দিল। কোরআনরে বর্ণনামতে, দীর্ঘদিন মাছের পেটে থাকার কারণে তিনি অসুস্থ এবং দুর্বল হয়ে পড়েন। তাই আল্লাহ আপন অনুগ্রহে সেখানে লাউগাছ উৎপন্ন করেন। সুস্থ হওয়ার পর তাকে আবার নীনাওয়াবাসীদের কাছেই পাঠানো হয় এবং নীনাওয়াবাসী ঈমান আনে।[৫, ৬]

---

৫. কাছাছুল কোরআন। হিফজুর রহমান রচিত, মাওলানা নূরুর রহমান অনূদিত এবং এমদাদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত। তৃতীয় খন্ড। ১০০-১২৯ পৃষ্ঠা।
৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর। সূরা সাফফাত।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ -

এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি যে, একটি জনবসতি চাক্ষুস আযাব দেখে ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার জন্য সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে? ইউনুসের কওম ছাড়া (এর কোন নজির নেই) তারা যখন ঈমান এনেছিল তখন অবশ্যি আমি তাদের ওপর থেকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনার আযাব হটিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম।[৭]

ইউনুস (আ) (যাকে বাইবেলে যোনা নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ৮৬০ থেকে ৭৮৪ সালের মাঝামাঝি সময় বলা হয়ে থাকে) যদিও বনী ইসরাঈলী নবী ছিলেন তবুও তাকে আসিরিয়াবাসীদের হেদায়াতের জন্য ইরাকে পাঠানো হয়েছিল। এ কারণে আসিরিয়াবাসীদেরকে এখনো ইউনূসের কওম বলা হয়েছে। সে সময় এ কওমের কেন্দ্র ছিল ইতিহাস খ্যাত নিনোভা নগরী। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। দাজলা নদীর পূর্ব তীরে আজকের মুসেল শহরের ঠিক বিপরীত দিকে এ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ এলাকায় ইউনুস নবী নামে একটি স্থান আজো বর্তমান রয়েছে। এ জাতির রাজধানী নগরী নিনোভা প্রায় ৬০ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত ছিল।এ থেকে এদের জাতীয় উন্নতির বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে।[৮]

কুর'আনে এ ঘটনার দিকে তিন জায়গায় শুধুমাত্র ইংগিত করা হয়েছে। কোন বিস্তারিত বিবরণ সেখানে দেয়া হয়নি। তাই আযাবের ফায়সালা হয়ে যাবার পর কারোর ঈমান আনা তার জন্য উপকারী হয় না। আল্লাহ্ তার এ আইন থেকে হযরত ইউনুসের কওমকে কোন কোন কারণে নিষ্কৃতি দেন তা নিশ্চিতয়তার সাথে বলা সম্ভব নয়। বাইবেলে যোনা ভাববাদীর পুস্তক নাম দিয়ে যে সংক্ষিপ্ত সহীফা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে কিছু বিবরণ পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে তা নিভরযোগ্য নয়। প্রথমত তা আসমানী সহীফা নয় এবং ইউনুস (আ) এর লেখাও না। বরং তার তিরোধানের চার পাচশো বছর পর কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ইউনূসের ইতিহাস হিসেবে লিখে এটিকে পবিত্র গ্রন্থসমূহের অন্তরভুক্ত করেন। দ্বিতীয়ত এর মধ্যে কতক একেবারেই আজেবাজে কথাও পাওয়া যায়। এগুলো মেনে নেবার মত নয়।

তবুও কুর'আনের ইশারা ও ইউনুসের সহীফার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলে কুর'আনের তাফসীরকারকগণ যে কথা বলেছেন তাই সঠিক বলে মনে হয়। তারা বলেছেন, হযরত ইউনূস (আ) যেহেতু আযাবের ঘোষনা দেবার পর আল্লাহর অনুমতি, ছাড়াই নিজের আবাস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন তাই আযাবের লক্ষণ দেখে যখন আসিরীয়ারা তওবা করলো এবং গোনাহের জন্য ক্ষমা চাইলো তখণ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাদের কে ক্ষমা করে দিলেন।

---

৭. আল-কুর'আন, ১০ঃ ৯৮

৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৬১৭

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আন মজীদে আল্লাহর বিধানের যে মৌলক নিয়ম কানুন বর্ণনা করা হয়েছে তার একটি স্বতন্ত্র ধারা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ কোন জাতিকে ততক্ষণ আযাব দেন না যতক্ষণ না পূর্নাঙ্গ দলীল প্রমাণ সহকারে সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলেন। কাজেই নবী যখন সংশ্লিষ্ট জাতির জন্য নির্ধারিত অবকাশের শেষ মূহূর্তে পর্যন্ত উপদেশ বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারেননি এবং আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজ দায়িত্বে হিজরাত করে চলে গেছেন তখন আল্লাহর সুবিচার নীতি এ জাতিকে আযাব দেখা সমীচীন মনে করেনি। কারণ তার কাছে পূর্নাঙ্গ দলীল প্রমাণ সহকারে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার আইনগত শর্তাবলী পূর্ণ হতে পারেনি।[৯]

ঈমান আনার পর যে জাতিটির আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হলো। পরে তারা আবার চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে ভুল পথে পা বাড়ানো শুরু করলো। নাহোম নবী (খৃষ্টপূর্ব ৭২০ -৬৯৮) এ সময় তাদেরকে সতর্ক করলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। তারপর সফনীয় নবী (খৃস্টপূর্ব ৬৪০-৬০৯) তাদেরকে শেষবারের মত সতর্ক করলেন। তাও কার্যকর হলো না। শেষ পর্যন্ত ৬১২ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে আল্লাহ তাদের ওপর মিডিয়াবাসীদের অগ্রাসন সংঘটিত করালেন। মিডিয়ার বাদশাহ ব্যাবিলনবাসীদের সহায়তায় আসিরিয়া এলাকা আক্রমণ করলেন। আসিরীয় সেনাদল পরাজিত হয়ে রাজধানী নিনোভায় অন্তরীন হলো। কিছুকাল পর্যন্ত তারা জোরেশোরে মোকাবিলা করলো। তারপর দাজলায় এলো বন্যা। এ বন্যায় নগর প্রাচীর ধ্বসে পড়লো। সংগে সংগে আক্রমণকারীরা নগরে প্রবেশ করলো এবং পুরো শহর জ্বালিয়ে ভস্ম করলো। আশপাশের এলাকারও একই দশা হলো। আসিরীয়ার বাদশাহও নিজের মহলে আগুন লাগিয়ে তাতে পুড়ে মারলো। আর এ সাথে আসিরীয় রাজত্ব ও সভ্যতারও ইতি ঘটলো চিরকালের জন্য। আধুনিক কালে এ এলাকায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খননের যে প্রচেষ্টা চলেছে তাতে এখানে অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেছে।[১০]

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ -

আর মাছওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহ ভাজন করেছিলাম। স্মরণ করো যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করবো না। শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠলো : "তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি।"[১১]

হযরত ইউনুস (আ)। কোথাও সরাসরি তাঁর নাম নেয়া হয়েছে আবার কোথাও "যুন্নুন" ও " সাহেবুল হূত" বা মাছওয়ালা উপাধির মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হয়েছে। তিনি মাছ ধরতেন বা বেচতেন বলে তাঁকে মাছওয়ালা বলা হতো না বরং আল্লাহর হুকুমে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল, তাই তাঁকে বলা হয়েছে মাছওয়ালা।

---

৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৬১৮)

১০. আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী, *তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি., পৃ. ১৪১

১১. আল-কুর'আন, ২১ঃ ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যান। আল্লাহর পক্ষ থেকে তখনো হিজরত করার হুকুম আসেনি, যার ফলে তাঁর পক্ষ থেকে নিজের কর্তব্য ত্যাগ করা জায়েয হতে পারতো। তিনি মনে করেছিলেন, আমার সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর আযাব এসে যাচ্ছে। এখন আমাকে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়া উচিত। নাহলে আমি নিজেও আযাবের মধ্যে ঘেরাও হয়ে যাবো। নীতিগতভাবে এ বিষয়টি তো পাকড়াওযোগ্য ছিল না। কিন্তু নবীর পক্ষে আল্লাহর হুকুম ছাড়া দায়িত্বছেড়ে চলে যাওয়া ছিল পাকড়াওযোগ্য। মাছের পেটের মধ্যে থেকে সেখানে তো অন্ধকার ছিলই, তার ওপর ছিল সাগরেরঅন্ধকার।[১২]

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ -

তখন আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম এবং দুঃখ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।[১৩]

---

১২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৬১৯

১৩. আল-কুর'আন, ২১ঃ ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইউনুস (আ)-এর ময়দান

ইউনুস (আ) এর ময়দান সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ - فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ -
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ - فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ - لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ -
فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ - وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ -

আর ইউনুসও ছিলেন রাসুলগণের একজন। যখন তিনি পালিয়ে বোঝাই নৌযানে গিয়ে পৌছলেন, অতঃপর তিনি লটারীতে শরীক হলেন এবং অপরাধী সাব্যস্ত হলেন । তারপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলেন। সুতরাং যদি তিনি আল্লাহর তাস্‌বীহ্ পাঠকারী না হতেন, তবে তিনি অবশ্যই থেকে যেতেন মাছের পেটে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম এক ময়দানে এবং তিনি ছিলেন পীড়িত। আর আমি উৎপন্ন করলাম তার উপর এক লাউ গাছ ।[১৪]

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

হযরত ইউনুস (আ) যখন তাঁর অপরাধ স্বীকার করে নিলেন এবং একজন মু'মিন ও ধৈর্যশীল বান্দার ন্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা গাইতে লাগলেন তখন আল্লহর হুকুমে মাছ তাঁকে উপকূলে উদগীরণ করলো। উপকূলে ছিল একটি বিরাণ প্রান্তর। সেখানে সবুজের কোন চিহ্ন ছিল না এবং এমন কোন জিনিসও ছিল না যা হযরত ইউনুসকে ছায়াদান করতে পারে; সেখানে খাদ্যের ও কোন সংস্থান ছিল না।

এখানে এসে অনেক বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের দাবীদারকে একথা বলতে শুনা গেছে যে, মাছের পেটে ঢুকে যাবার পর কোন মানুষের জীবিত বের হয়ে আসা অসম্ভব। কিন্তু বিগত শতকের শেষের দিকে এ তথাকথিত বুদ্ধি ও যুক্তিবাদীতার কেন্দ্র ভূমির (ইংল্যাণ্ড) উপকূলের সন্নিকটে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে । এ ঘটনাটি তাদের দাবী খণ্ডন করে । "১৮৯১ সালের আগষ্ট মাসে Star of the East নামক জাহাজে চড়ে কয়েকজন মৎস্য শিকারী তিমি শিকারের উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রে যায়। সেখানে তারা ২০ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া ও ১০০ টন ওজনের একটি বিশাল মাছকে আহত করে । কিন্তু তার সাথে লাড়াই করার সময় জেমস বার্ডলে নামক একজন মৎস্য শিকারীকে তার সাথীদের চোখের সামনেই মাছটি গিলে ফেলে। একদিন পরে জাহাজের লোকেরা মাছটিকে মৃত অবস্থায় পায়; বহুকষ্টে সেটিকে তারা জাহাজে ওঠায় এবং তারপর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তার পেট কাটলে জেমস তার মধ্য থেকে জীবিত বের হয়ে আসে। এ ব্যক্তি মাছের পেটে পুরা ৬০ ঘন্টা থাকে।"[১৫]

---

১৪. আল-কুর'আন, ৩৭ঃ ১৩৯-১৪৬

১৫. উর্দূ ডাইজেষ্ট , ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তায় ব্যাপার হচ্ছে, সাধারণ অবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে যদি এমনটি হওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহেল অস্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহর মু'জিযা হিসেবে এমনটি হওয়া কেমন করে অসম্ভব হতে পারে ?

হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা

কুর'আন মাজীদের আলোকে ইউনুস (আ)-এর ঘটনাটি যদিও সংক্ষিপ্ত এবং ঘটনা প্রকাশে পরিস্কার ও স্পষ্ট, কিন্তু কোন কোন তাফসীরী আলাচনায় এর অংশ বিশেষকে জটিল করে দিয়েছে। সুতরাং প্রথমে কুর'আন পাকের আয়াতসমূহের আলোকে ঘটনাটিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেয়া সমীচীন মনে হয়েছে। অতঃপর তাফসীরী আলোচনা করা হবে, যাতে ঘটনাটির প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

হযরত ইউনুস (আ)-এর ২৮ বৎসর বয়সে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নুবুওতের পদ প্রদান করেন এবং 'নীনাওয়া' বাসীদিগকে হেদায়েত করতে আদেশ দেন। ইউনুস (আ) এক দীর্ঘকাল যাবৎ তাদের মধ্যে প্রচার কার্য চালিয়ে তাওহীদের দা'ওয়াত প্রদান করতে থাকেন। কিন্তু তারা সত্যের প্রচারের প্রতি কর্ণপাত করল না; বরং নাফরমানী ও অবাধ্যতাচরণের সাথে শিরক ও কুফরের উপর হঠতারিতা করতে রইল এবং অতীতকালের নাফরমান উম্মতদের ন্যায় আল্লাহ্ আ'আলার সত্য পয়গম্বরের সত্য প্রচারকেও ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকল। তখন অনবরত ও অবিরত বিরুদ্ধাচরণ ও শক্রুতার কারণে ব্যথিত হয়ে ইউনুস (আ) যখন ফোরাত নদীর তীরে পৌছলেন, (তাফসীরে রূহুল মা'আনী) তখন তিনি একটি খেয়া নৌকা যাত্রীভর্তি অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাতে আরোহণ করলেন, নৌকাটি লঙ্গর উঠিয়ে গন্তব্য পথে যাত্রা করল।

পথিমধ্যে ঝড়তুফান এসে নৌকাটিকে ঘেরাও করল। যখন নৌকাটি ভীষণভাবে টলতে লাগল এবং নৌকারোহীদের বিশ্বাস জন্মিল যে, তারা ডুবে মরবে, তখন তারা নিজেদের আকীদা অনুযায়ী বলতে লাগল, "মনে হয় নৌকা হতে নামিয়ে না দেয়া পর্যন্ত মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে।" এ কথা শুনে ইউনুস (আ)-এর চেতনা হল যে, আল্লাহ্ তা'আলার ওহীর অপেক্ষা না করে নীনাওয়া হতে এভাবে আমার চলে আসা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন নাই। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আমার পরীক্ষায় আলামত। এ কথা চিন্তা করে তিনি নৌকার আরোহীবৃন্দকে বললেন, সেই পলাতক গোলাম আমি। আমিই নিজ মনিব হতে পালিয়ে এসেছি। সুতরাং আমাকে নৌকার বাহিরে ফেলে দাও, কিন্তু তাঁর সততা ও পবিত্রতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়ল। তারা এরূপ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করল এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্তে আসল যে, "লটারী" করা হোক। ফলত তিনবার লটারী করা হল প্রত্যেকবারই লটারীতে হযরত ইউনুস (আ)-এর নাম আসল। তখন বাধ্য হয়েই তারা ইউনুস (আ) কে নদীতে নিক্ষেপ করল অথবা তিনি নিজেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তেই আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে একটি মৎস্য তাঁকে গিলে ফেলল। মৎস্যের উপর আদেশ ছিল যে, শুধু গিলে ফেলার অনুমতি আছে; কিন্তু ইউনুস তোমার খাদ্য নয়। সুতরাং তার দেহে যেন কোন প্রকার ক্ষতি না হয়।[১৬]

ইউনুস (আ) যখন মৎস্যের পেটে নিজেকে জীবিত দেখতে পেলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করলেন যে, কেন আমি আল্লাহ্ তা'আলার ওহীর অপেক্ষা না করে এবং তাঁর অনুমতি না নিয়ে, উম্মতের প্রতি ধর্মপ্রচার হতে অসন্তুষ্ট হয়ে নীনাওয়া হতে বের হয়ে আসলাম। তাই ত্রুটি মার্জনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এরূপে প্রার্থনা করতে লাগলেন- لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ "ইয়া আল্লাহ্! আপনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। আপনি অদ্বিতীয়। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি নিজ নফসের উপর নিজেই যুলুম করেছি।"[১৭]

---

১৬. ফতহুল বারীঃ ৬ষ্ঠ জিল্দ্ ঃ পৃষ্ঠা ৫১

১৭. আল-কুর'আন, ২১ঃ ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা ইউনুস (আ)-এর এই করুণ প্রার্থনা শ্রবণ করে কবুল করলেন এবং মৎস্যকে আদেশ করলেন, যেই ইউনুস তোমার উদরে আমার আমানত রয়েছে, তাকে উগরিয়ে বের করে দাও। ফলত মৎস্য ইউনুস (আ) কে নদীর তীরের উপর উগরিয়ে বের করে দিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, মৎস্যের উদরে অবস্থানের দরুন তাঁর দেহের অবস্থা এরূপ হয়ে গিয়েছিল, যেমন পাখীর একটি নবজাত বাচ্চা, যার দেহ অত্যন্ত কোমল ও নরম হয়ে থাকে। (তফসীরে ইবনে কাসীরঃ সূরা আস সাফ্ফাত) দেহে পালক বা লোমও থাকে না। ফলকথা ইউনুস (আ)কে অত্যন্ত দূর্বল ও নিশ্চল অবস্থায় স্থলভাগের উপর নিক্ষেপ করা হল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য একটি লতাগুল্মবিশিষ্ট গাছ উৎপন্ন করে দিলেন। (কথিত আছে য, তা লাউগাছ ছিল।) এর ছায়াতলে তিনি একটি কুটির নির্মাণ করে অবস্থান করতে রইলেন। কয়েকদিন পর আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে উক্ত গাছের শিকড়ে পোকা ধরে ওটাকে কর্তন করে ফেলল। লতা যখন শুকাতে আরম্ভ করল ইউনুস (আ) চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহী দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "ইউনুস! এই গাছটি শুকিয়ে যাওয়ার কারণে তুমি খুবই দুঃখিত হয়েছ, অথচ তা একটি তুচ্ছ পদার্থ। কিন্তু তুমি তা ভেবে দেখলে না যে, নীনাওয়ার অধিবাসী- যাতে লক্ষাধিক মানুষ বাস করছে, তদ্ব্যতীত তথায় বহু প্রাণীও বাস করে। তাকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিতে আমার একটুও অপছন্দ হবে না। এই লাউগাছের লতাটির প্রতি তোমার যতটুকু মমতা, আমি কি নীনাওয়াবাসীদের প্রতি এর চেয়ে অধিক সদয় ও মেহেরবান নই ? অথচ তুমি ওহীর অপেক্ষা না করে কাওমের জন্য বদদো'আ করতঃ তাদের মধ্য হতে বের হয়ে আসলে ? এর একজন নবীর শানের জন্য অসঙ্গত কাজ যে, সে কাওমের জন্য আযাবের বদদো'আ করতে এবং তাদেরকে ঘৃণা করে তাদের হতে পৃথক হয়ে যেতে ত্বরা করে এবং ওহীরও অপেক্ষা না করে।"

এদিকে ইউনুস (আ) বদদো'আ প্রতিফলিত হওয়ার কিছু লক্ষণ অনুভব করল। এতদ্ভিন্ন ইউনুস (আ) বস্তী ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর বস্তীবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার যথার্থ পয়গম্বর বটেন। সুতরাং এখন আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। সে কারণেই তো ইউনুস (আ) আমাদের মধ্য হতে পৃথক হয়ে গিয়েছেন। এই ভেবে রাজা হতে আরম্ভ করে সমস্ত প্রজাবৃন্দ পর্যন্ত সকলেরই অন্তর ভয়ে কম্পমান হয়ে উঠল এবং ইউনুস (আ)-এর অনুসন্ধান করতে লাগল, এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে আল্লাহ্ পাকের দরকারে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল, সর্বপ্রকারের পাপ কার্য ত্যাগ করে বস্তীর বাহিরে মুক্ত মাঠে বের হয়ে আসল। এমন কি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলিকেও সঙ্গে নিয়ে আসল, দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকেও তাদের মাতা হতে পৃথক করে দিল। এরূপে দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করতে লাগল। সকলে সমস্বয়ে এই অঙ্গীকার করতে লাগল যে, হে আমাদের প্রভূ ! ইউনুস (আ) আপনার যে বানী নিয়ে আমাদের নিকট এসেছিলেন, আমরা তার সত্যতার প্রতি ঈমান আনয়ন করছি। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করলেন এবং তাদেরকে আযাব হতে রক্ষা করলেন।

যা হোক, এখন ইউনুস (আ)-এর প্রতি পুনরায় নির্দেশ হল, তিনি যেন নীনাওয়ায় চলে যান এবং কাওমের মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে হেদায়েত করতে থাকেন, যেন আল্লাহ্ তা'আলার এত অধিক সংখ্যক মানুষ তাঁর ফয়েয হতে বঞ্চিত না থাকে। ফলত ইউনুস (আ) আল্লাহ্ পাকের এই আদেশ মান্য করলেন এবং নীনাওয়ায় ফিরে আসলেন। কাওমের লোকেরা তাঁকে দেখে অসীম আনন্দ প্রকাশ করল। তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা অর্জন করতে লাগল।[১৮]

---

১৮. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৩খ, পৃ. ১০০, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কুয়া

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত অর্থসহ:

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ -

তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল- তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর না ; তবে যদি তোমরা কিছু করতে চাও, তাহলে তাকে কোন কুপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাতে কোন পথিক তাকে তুলে নিয়ে যায় ।[১৯]

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ -

তারপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কুপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হল, তখন আমি তাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলাম যে, অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে, অথচ তারা তোমাকে তখন চিনতে পারবে না ।[২০]

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ -

আর ঘটনাক্রমে একটি কাফেলা তথায় এল। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে নিজের বালতি কুপে ফেলল। সে বলল- কি আনন্দ! এ যে এক উত্তম বালক! তারপর তারা তাকে পণ্যরূপে গোপন করে রাখল। তারা যা করেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।[২১]

পরিচিতি

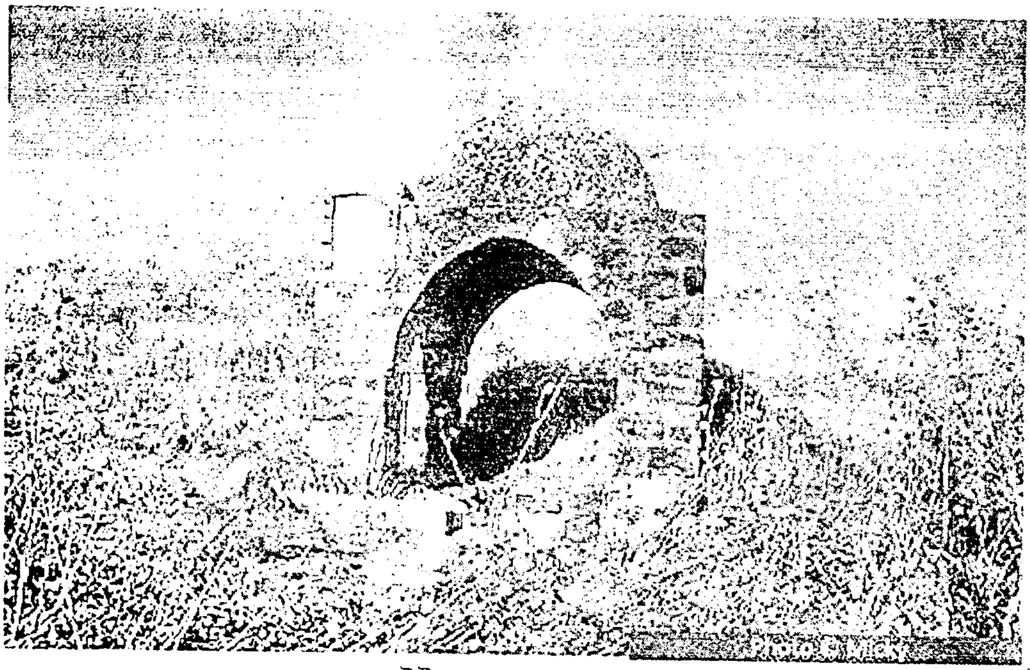

ইউসুফ (আ)-এর কূপ

---

১৯. আল-কুর'আন, ১২ঃ ১০

২০. আল-কুর'আন, ১২ঃ ১৫

২১. আল-কুর'আন, ১২ঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

কেন্‌আনের কূপ

মোটকথা, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা ইউসুফকে ময়দানে বেড়াইবার বাহানা দিয়া লইয়া গেল। পূর্ব পরামর্শনুযায়ী এমন একটি কূপের মধ্যে তাঁহাকে ফেলিয়া দিল যাহাতে পানি ছিল না, দীঘকাল শুষ্ক অবস্থায় ছিল। আর গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁহার কামীছটিকে কোন জন্তুর রক্ত মাখাইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আব্বা! যদিও আমরা আমাদের সত্যতা আপনাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন আপনি কখনও বিশ্বাস করিবেন না। আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় একে অন্যের আগে গন্তব্য স্থানে পৌছার চেষ্টায় মশগুল ছিলাম। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ আসিয়া ইউসুফকে উঠাইয়া লইয়া গেল। হযরত ইয়াকুব (আ) ইউসুফ (আ) এর জামাটি দেখিলেন উহাতে রক্ত মাখান আছে কিন্তু কোথাও ছেঁড়া ছিল না; কিম্বা আচলও ফাঁড়া ছিল না। তৎক্ষনাৎ তিনি প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু ধমক দেওয়া বা তিরস্কার করা, নিন্দা করা, ঘৃণা ও অপদস্থ করার পদ্ধতি অবলম্বনের পরিবর্তে পয়গম্বর সুলভ জ্ঞান ও অর্ন্তদৃষ্টি, ধৈর্য ও মার্জনার স্বরে বলিলেন, প্রকৃত অবস্থা গোপন করার চেষ্টা সত্ত্বেও তোমরা ইহাকে গোপন করিতে পার নাই।

"হযরত ইয়াকূব (আ) বললেন, (তোমরা যা বলছ, তা কখনই নহে) বরং তোমাদের নফ্‌স তোমাদের জন্য একটি কথা সাজিয়ে দিয়াছে। এখন ধৈর্যই উত্তম। আর যে কথা তোমরা প্রকাশ করেছ, সে বিষয়ে আল্লাহ পাকের নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি।"[২২, ২৩]

ভৌগোলিক অবস্থান

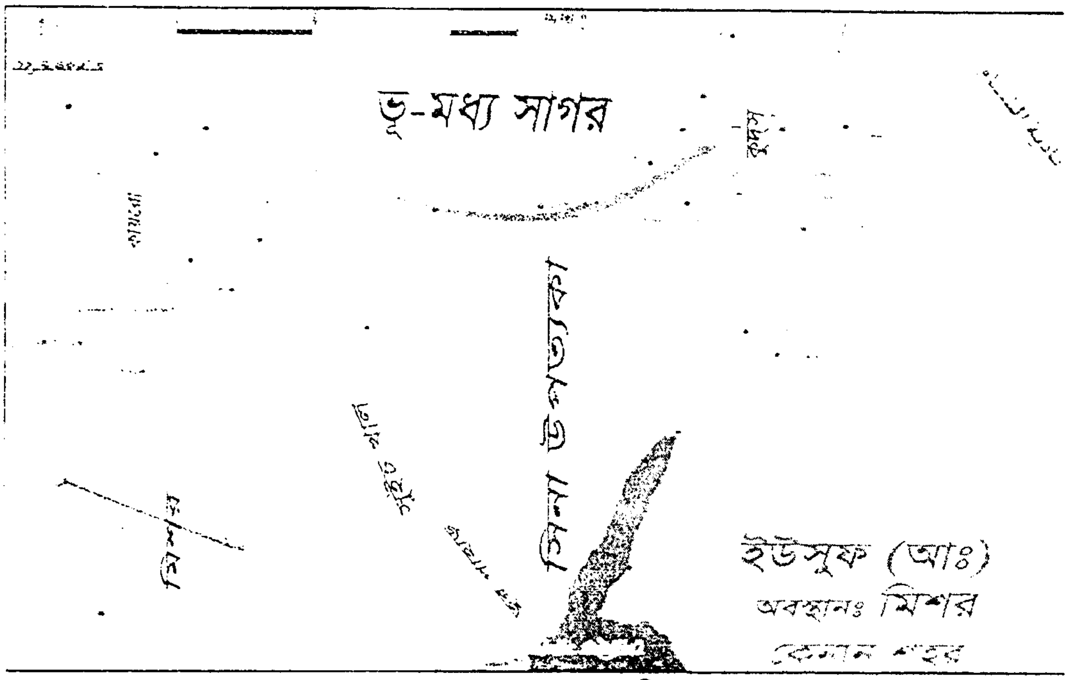

কেনআন শহর এর মানচিত্র

২২. আল-কুর'আন, ১২ : ১৮
২৩. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ২৮৩, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

মূল ইবারতে (আরবী) বাক্য এমনভাবে এসেছে যার ফলে তার তিনটি অর্থ হয় এবং তিনটি অর্থই এখানে মানানসই বলে মনে হয়। একটি অর্থ হচ্ছে, আমি ইউসুফকে এ সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম এবং তার ভাইয়েরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল যে, তাকে অহীর মাধ্যমে সবকিছু জানানো হচ্ছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তুমি এমন অবস্থায় তাদের এ কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে যেখানে তোমার অবস্থানের ব্যাপারটি তারা কল্পনাও করতে পারবে না। তৃতীয় অর্থটি হচ্ছে, আজ এরা না জেনে বুঝে একটি কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে এ ফলাফল কি হবে তা এরা জানে না।

এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ইউসুফ আলাইহি সালামকে যে কি সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল বাইবেল ও তালমূদে এর কোন উল্লেখ নেই। বিপরীত পক্ষে তালমূদে যে বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে এই যে, ইউসুফকে যখন কূপে ফেলে দেয়া হলো তখন তিনি জোরে জোরে কাঁদতে থাকলেন এবং চিৎকার করে ভাইদের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কুর'আনের বর্ণনা পড়লে মনে হবে এমন এক যুবকের কথা বলা হচ্ছে যিনি আগামীতে ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের অন্তরভুক্ত হবেন। অন্যদিকে তালমূদ পড়লে যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠবে তা হচ্ছে এই যে, জনমানবশূন্য বিয়াবনে কয়েকজন বন্দু একটি বালককে কূপের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে এবং এ সময় একজন সাধারণ বালক যা করে সে-ও তাই করছে।[২৪]

পরিবার

ইয়াকুবের বারপুত্রের মধ্যে প্রথম দশ জন জ্যেষ্টপুত্র, তার প্রথমা স্ত্রী "লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যানের" গর্ভে জন্মলাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াকুব "লাইয়্যার" ভাগিনী "রাহীলকে" বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু-পুত্র ইউসুফ এবং বেনজামিন জন্মলাভ করে। তার ছোট ছেলের জন্মের পরে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন।[২৫]

হিব্রু বাইবেল অনুসারে তার বার ছেলের নাম হলোঃ রেউবেন বা ইয়াহুদা, সিমোন, লেভি, জুদাহ, ডান, নাফতালি, গাড, আশের, ইসশাচার, জেবুলুন, ইউসুফ এবং বেনজামিন বা বেনইয়ামিন। [সম্পাদনা]

ইউসুফের স্বপ্ন

ইউসুফ ছোট সময় একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে, একাদশ নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র তার প্রতি অবনত অবস্থায় রয়েছে। পরের দিন ইউসুফ তার পিতাকে তার এই স্বপ্নের কথা বললেন। তার স্বপ্নের বাখ্যা হচ্ছে যে, এগারোটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফের এগারো ভাই, সূর্যের অর্থ পিতা এবং চন্দ্রের অর্থ মাতা। তিনি স্বপ্নের বর্ণনা শুনে বুঝতে পারলেন এবং ইউসুফের ভাইদের কাছে তার এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত না করার জন্য ইউসুফকে বললেন। কারণ, স্বপ্নের তাৎপর্য অনুধাবন করে ভাইরা ইউসুফের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তার ক্ষতি করতে পারে।

হযরত ইউসুফ (আ) (يوسف), রাজত্বকাল ৭০ বছর, জন্ম- ১৬১০ খ্রিস্টপূর্ব, জন্মস্থান- সিরিয়া, মৃত্যু- ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব, মৃত্যুস্থান - মিশর, পিতা- হযরত ইয়াকুব (আ), মাতা- রাহীল।[২৬]

---

২৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৬২১

২৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৬৫৪)

২৬. আছ-ছা'লাবী, আরাইসুল মাজালিস বা কাসাসুল আম্বিয়া, আল-মাতবা আল-কাসতুল্লিয়্যা ঃ ১২৮২ হি., পৃ. ৫৬)

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রাতাদের ইউসুফ (আঃ)-কে অন্ধ কূপে নিক্ষেপ

সপুত্রদের কথাবার্তায় প্রবঞ্চিত হয়ে ইয়াকুব (আ) ইউসুফকে এক দিনের জন্য ভাইদের সাথে গমনের অনুমতি প্রদান করেন। বিদায়কালে ইউসুফকে বললেন, হে আমার প্রাণপ্রিয়! এস একবার তোমাকে বক্ষের সাথে মিলাই তোমাকে আর দেখব কিনা কে জানে। অতঃপর পুত্রদেরকে বললেন- ইউসুফকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করলাম। এখন যাও, তোমরা নিরাপদে ফিরে আস এই কামনাই করছি। এই বলে তিনি পুত্রদেরকে বিদায় করলেন। পিতার সম্মুখ থেকে বিদায়ের পরবর্তী ঘটনার বর্ণনার আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ -

তারপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কুপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হল, তখন আমি তাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলাম যে, অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে, অথচ তারা তোমাকে তখন চিনতে পারবে না ।[২৭]

সুতরাং তারা কেনান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে নিজেদের বকরীর চারণ ভূমি উদ্দেশে বাড়ী ছেড়ে রওয়ানা করে। ইউসুফ খেলাধুলা করতে করতে সানন্দ চিত্তে পথ চলতে থাকেন। ভাইয়েরাও পিতার দৃষ্টির অন্তরাল হতেই তাঁর প্রতি জুলুম অত্যাচার চড় থাপ্পড় মারতে শুরু করে। ইউসুফ ভাইদেরকে অনকে কাকুতি মিনতি করে বলল, আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে, তোমরা প্রতি এহেন জুলুম করছ। আব্বা কি আমাকে তোমাদের দায়িত্ব অর্পণ করেন নাই।

তোমরা কি আমার ভাই নও। আব্বার অসিয়ত এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অবদানের কথ বিস্মৃত হয়ো না। আমি মাতৃহীন ছেলে। এখানে আব্বাও নাই। তোমরা আমার প্রতি দয়া কর। ইউসুফ এরূপ কাকুতি মিনতি করে ভাইদেরকে অনেক বললেন, কিন্তু তারা কিছুই শুনল না। জুলুম করতেই থাকল। ভাইয়েরা সবাই বলল, তুমি না মিছামিছি স্বপ্ন বানিয়ে আব্বার কাছে বর্ণনা করেছিলে যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগার নক্ষত্র তোমাকে সজদা করছে। তোমার কামনা বসনা সম্ভবত এটাই যে, আমরা সকলে তোমার অধীনস্থ হয়ে থাকি। তাই এখন তোমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। এখানে তোমাকে আশ্রয় দেবার মত কেউ নাই। তাঁকে হত্যা করা হবে- এহেন মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক কথা শুনে ইউসুফ (আ) ভাই ইয়াহুদার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েন। ইয়াহুদা অন্য ভাইদেরকে বলল, নিজেদের প্রতিশ্রুতি বজায় রাখ। তোমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তাকে হত্যা করবে না। এবার ভাইয়েরা বলল, একে কোন অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করা প্রয়োজন।

এই সিদ্ধান্তক্রমে তারা ইউসুফকে কূপের পাড়ে নিয়ে বিবস্ত্র করে হাত পা বেঁধে ডোলে বসিয়ে কূপে নিক্ষেপ করে। ইউসুফ (আ) ভাইদের কাছে কাকুতি মিনতি করতেই থাকলেন। অবশেষে বললেন, আজ এমন কেউ নাই যে আমার এ করুণ অবস্থার সংবাদ আমার বৃদ্ধ আব্বাকে জানাবে, তা হলে তিনি এসে দেখে যেতেন, জালেমরা কি দুঃখ কষ্ট আর মসিবতের গহবরে আমাকে নিক্ষেপ করেছে। সম্পূর্ণ নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও এই জালেমরা আমার প্রতি করুণা করল না। কোন প্রকার মায়া মমতা হৃদ্যতা তাদের মাঝে জাগ্রত হল না। অন্ধ কুপের অর্ধ পথ পর্যন্ত যখন ইউসুফ পৌছেন, তখনও ডোলের রশি ইয়াহুদার হাতে ধরা। জালেম শামউন এসে তাড়াতাড়ি ডোলের রাশি কেটে দেয়। তার ইচ্ছা ছিল, তাড়াতাড়ি কূপে নিক্ষিপ্ত হয়ে ইউসুফ (আ) মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহর হুকুমে কূপে এক বর্গ পরিমাণ স্থান পানি শূন্য ছিল। আল্লাহর নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে পানির মধ্যে একটি পাথরের উপর বসিয়ে দেন। এভাবে কূপের একেবারে তলদেশে যাওয়া হতে তাঁকে রক্ষা করা হয়।[২৮]

---

২৭. আল-কুর'আন, ১২ঃ ১৫

২৮. আবু নায়ীম, মাওলানা, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ১৯৯৯, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কারাগার

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ -

ইউসুফ বলল- হে আমার রব! কারাগারই আমার জন্য অধিক প্রিয়, এ নারীরা যে বিষয়ের প্রতি আমাকে আহবান করে তার চেয়ে। আপনি যদি তাদের চক্রান্ত থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং জাহেলদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব।[২৯]

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ -

তার সাথে আরও দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল ঃ আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম যে, শরাব নিঃসারণ করছি; আর অপরজন বলল ঃ আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম যে, নিজের মাথায় রুটি বহন করছি এবং তা থেকে পাখি খাচ্ছে। তুমি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দাও, আমরা তো তোমাকে নেক্কার দেখছি।[৩০]

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ -

হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়। বিভিন্ন উপাস্য শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ?[৩১]

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ -

হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন স্বীয় মনিবকে শরাব পান করাবে এবং অপরজন শূলবিদ্ধ হবে, তারপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।[৩২]

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ -

তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ধারণা ছিল, ইউসুফ তাকে বলল ঃ আমার কথা তোমার মনিবের কাছে উল্লেখ কর। কিন্তু শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল তার কথা তাঁর মনিবের কাছে বলতে। অতএব ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল।[৩২]

---

২৯. আল-কুর'আন, ১২ঃ ৩৩
৩০. আল-কুর'আন, ১২ঃ ৩৬
৩১. আল-কুর'আন, ১২ঃ ৩৯
৩২. আল-কুর'আন, ১২ঃ ৪১
৩৩. আল-কুর'আন, ১২ঃ ৪২

Dhaka University Institutional Repository

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ
وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ -

আযীযের স্ত্রী বললো, "দেখলে তো! এ হলো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করতে। অবশ্যই আমি তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে। যদি সে আমার কথা না মেনে নেয় তাহলে কারারুদ্ধ হবে এবং নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।"[৩৪]

পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থান

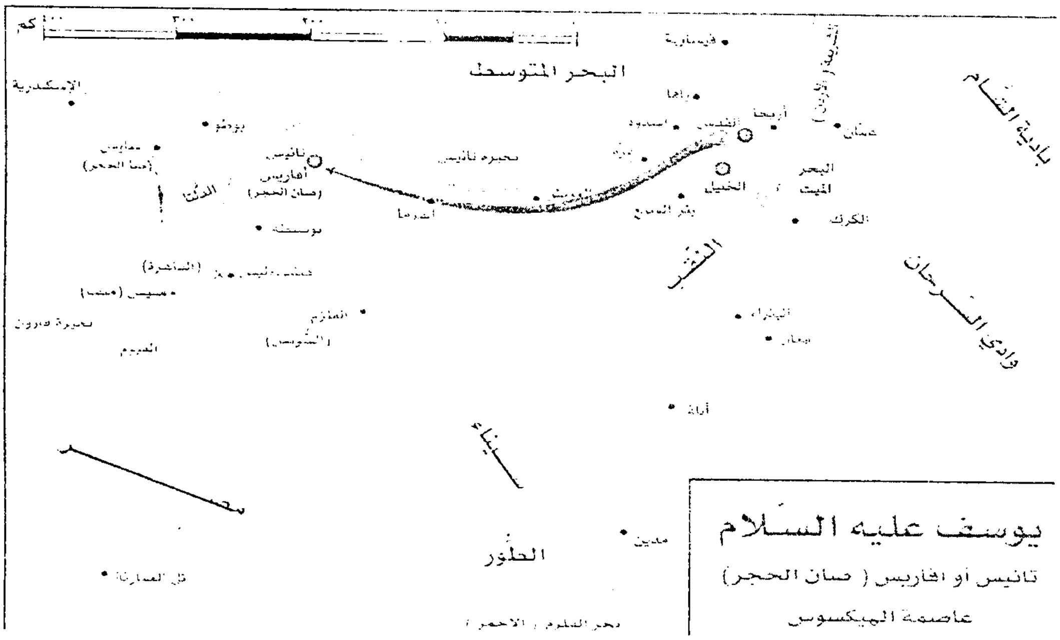

ইউসূফ (আ) এর কূপ ও কারাগারের স্থান

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

সে সময় হযরত ইউসুফ যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন এ আয়াতগুলো আমাদের সামনে তার একটি অদ্ভুত চিত্র তুলে ধরেছে। উনিশ বিশ বছরের একটি সুন্দর যুবক। বেদুইন জীবনের উদ্দামতায় লালিত বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহী। আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবাস জীবন, দেশান্তর ও বলপূর্বক দাসত্বের পর্যায় অতিক্রম করার পর ভাগ্য তাকে দুনিয়ার বৃহত্তম সুসভ্য রাষ্ট্রের রাজধানীতে একজন উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদমর্যদাসম্পন্ন ব্যক্তির বাড়িতে টেনে এনেছে। এখানে এ বাড়ির যে বেগম সাহেবার সাথে সকাল বিকাল তাকে ওঠাবসা করতে হয় সে-ই প্রথমে তার পেছনে লাগে। তারপর তার সৌন্দর্যের আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাষ্ট্রে। সারা শহরের অভিজাত পরিবারের মেয়েরা তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে। এখন তার চতুর্দিকে সবসময় শত শত সুন্দর জাল বিছানো থাকে তাকে আটকাবার জন্য তার ভাবাবেগকে উসকিয়ে দেবার এবং তার ধার্মিকতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার জন্য সব ধরনের কৌশল ও ফন্দি আঁটা হতে থাকে।

---

৩৪. আল-কুর'আন, ১২ঃ ৩২

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যেদিকে যান সেদিকেই দেখতে পান পাপ তার সমস্ত চাকচিক্য ও মোহনীয়তা নিয়ে দরজা উন্মুক্ত করে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে অসৎ ও অশালীন করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে। কিন্তু এখানে সুযোগই তাকে খুঁজে ফিরছে এবং সবসময় ওঁৎ পেতে আছে যখনই তার মনে অসৎকাজের প্রতি সামান্যতম ঝোঁকপ্রবণতা দেখা দেবে তখনই সে তার সামনে নিজেকে পেশ করে দেবে। দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা তিনি এক মহা আতংকের মধ্যে জীবন যাপন করছেন : কখনো মাত্র এক লহমার জন্য যদি তাঁর ইচ্ছা ও সংকল্পের বাঁধন সামান্যতম ঢিলে হয়ে যায় তাহলে পাপের যে অসংখ্য দরজা তার অপেক্ষায় হরহামেশা খোলা আছে তার যে কোন একটির মধ্য দিয়ে তিনি ভেতরে প্রবেশ করে যেতে পারেন। এ অবস্থায় এ আল্লাহ বিশ্বাসী যুবক যে সাফল্যের সাথে এসব শয়তানী প্ররোচণার মোকাবিলা করেছেন তা এমনিতেই কম প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু এ সর্বোচ্চ মানের আত্মসংযমের পরিচয় দেবার পর আত্মোপলব্ধি ও চিন্তার বিশুদ্ধতারও তিনি চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন : এমন নজীরবিহীন পরহেজগারীর দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরও তাঁর মনে কখনো এ মর্মে অহমিকা জাগেনি যে, "বাহ, কত মজবুত আমার চরিত্র! এতো সুন্দরী ও যুবতী মেয়েরা আমার প্রেমে পাগলপারা কিন্তু এরপরও আমার পদস্খলন হয়নি।"

বরং এর পরিবর্তে তিনি নিজের মানবিক দুর্বলতার কথা চিন্তা করে ভয়ে কেঁপে উঠেছেন এবং অত্যন্ত দীনতার সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে বলেছেন, হে আমার রব! আমি একজন দুর্বল মানুষ। এ অসংখ্য অগণিত প্ররোচণার মোকাবিলা করার শক্তি আমার কোথায়! তুমি আমাকে সহায়তা দান করো এবং আমাকে বাঁচাও : আমি ভয় করছি আমার পা পিছলে না যায় আসলে এটি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নৈতিক প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় অধ্যায় ছিল। বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সত্যনিষ্ঠা, অকপটতা, সংযম ও চিন্তার ভারসাম্যের অসাধারণ গুণাবলী এ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল এবং এ সম্পর্কে তিনি নিজেও বেখবর ছিলেন। এ কঠোর পরীক্ষার যুগে এ গুণগুলো সবই তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠলো। এগুলো পূর্ণ শক্তিতে কাজ করতে থাকলো। তিনি নিজেও জানতে পারলেন তাঁর মধ্যে কোন কোন শক্তি আছে এবং তাদেরকে তিনি কোন কোন কাজে লাগাতে পারেন।[৩৫]

কারাগারে হযরত ইউসুফকে কোন দৃষ্টিতে দেখা হতো এ থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। ওপরে যেসব ঘটনার কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো সামনে রাখলে ব্যাপারটা আর মোটেই বিস্ময়কর মনে হয় না যে, এ কয়েদী দু'জন হযরত ইউসুফের কাছেই-বা এসে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলো কেন এবং তাঁকে "আমরা আপনাকে সদাচারী হিসেবে পেয়েছি" বলে শ্রদ্ধার্ঘ পেশ করলো কেন। জেলখানার ভেতরে বাইরে সবাই জানতো, এ ব্যক্তি কোন অপরাধী নয়, বরং একজন হুকুম মেনে চলার প্রমাণ পেশ করেছেন : আজ সারাদেশে তাঁর চেয়ে বেশী সৎব্যক্তি আর কেউ নেই।

এমনকি দেশের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যেও তাঁর মতো লোক একজনও নেই। এ কারণে শুধু কয়েদীরাই তাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো না বরং কয়েদখানার পরিচালকবৃন্দ এবং কর্মচারীরাও তাঁর ভক্তদলে শামিল হয়ে গিয়েছিল। বাইবেলে বলা হয়েছেঃ "কারা রক্ষক কারাস্থিত সমস্ত বন্দির ভার যোসেফের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তথাকার লোকদের সমস্ত কর্ম যোসেফের আজ্ঞা অনুসারে চলিত লাগিল। কারারক্ষক তাঁহার হস্তগত কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেন না।"[৩৬]

---

৩৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৬৬৫

৩৬. আদি পুস্তক ৩৯: ২২, ২৩

Dhaka University Institutional Repository

এখানে যে কাহিনীটি বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাষণটি হচ্ছে তার প্রাণ। এটি কুরআনেরও তাওহীদ সম্পর্কিত সর্বোত্তম ভাষণগুলোর অন্যতম। কিন্তু বাইবেল ও তালমূদে কোথাও এ সম্পর্কে সামান্য ইংগিত ও নেই । সেখানে হযরত ইউসুফকে নিছক একজন জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু লোক হিসেবেই পেশ করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন কেবল তাঁর চরিত্রের এ দিকগুলোকে বাইবেল ও তালমূদের চাইতে বেশী উজ্জ্বল করে পেশ করেছে তাই নয় বরং এ ছাড়াও আমাদেরও একথা জানায় যে, হযরত ইউসুফের নিজের একটি নবুওয়াত মিশন ছিল এবং তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ তিনি কারাগারেই শুরু করে দিয়েছিলেন।

এ ভাষণটির ওপর শুধুমাত্র সাদামাটাভাবে চোক বুলিয়ে চলে যাওয়া যাবে, এমন পর্যায়ের ভাষণ এটি নয়। এর এমন অনেকগুলো দিক আছে যেগুলো প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন আছে :

একঃ এ প্রথম আমরা দেখছি হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহর সত্য দীনের প্রচার করছেন। এর আগে তাঁর জীবন কাহিনীর যে অংশ কুর'আন পেশ করেছে তাতে কেবলমাত্র তার উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু তাবলীগ বা প্রচারের কোন আবাস সেখানে পাওয়া যায় না। এ থেকে প্রমাণ হয়, প্রথম পর্যায়গুলো ছিল নিছক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণমূলক। নবুওয়াতের কাজ কার্যত এ কারাগার পর্যায়ে তাঁকে সোপর্দ করা হয় এবং নবী হিসেবে এটি তাঁর প্রথম দাওয়াতী ভাষণ।

দুইঃ এ প্রথম লোকদের সামনে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করেন। এর আগে আমরা দেখেছি তিনি যেসব অবস্থা সম্মুখীন হয়েছেন অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে সেগুলো গ্রহণ করতে থেকেছেন। যখন কাফেলার লোকেরা তাঁকে ধরে গোলাম বানালো, যখন তিনি মিসরে আনীত হলেন, যখন তাঁকে মিসরের আযীযের হাতে বিক্রি করা হলো, যখন তাঁকে কারাগারে পাঠানো হলো, এর মধ্যে কোন এক সময়েও তিনি একথা বলেননি যে, তিনি ইবরাহীম ও ইসহাক আলাইহিস সালামের পৌত্র এবং ইয়াকূব আলাইহিস সালামের ছেলে। তাঁর বাপ ও দাদা কেউ অপরিচিত ছিলেন না। কাফেলার লোকেরা, ময়দানবাসী হোক বা ইসমাঈলী উভয়েরই তাদের পরিবারের সাথে নিকট সম্পর্ক ছিল।

মিসরবাসীরাও তো কমপক্ষে হযরত ইবরাহীম সম্পর্কে বেখবর ছিল না। (বরং হযরত ইউসুফ যেভাবে তাঁদের এবং হযরত ইয়াকূব ও ইসহাকের কথা বলেছেন তাতে অনুমান করা যায় এ তিনজন মনীষীর খ্যাতি মিশরে পৌঁছে গিয়েছিল।) কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ) বিগত চার পাঁচ বছর ধরে যেমন অবস্থার সম্মুখীন হতে থেকেছেন তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কখনো নিজের বাপ-দাদাদের নাম নেননি। সম্ভবত তিনি নিজেও জানতেন, আল্লাহ তাঁকে যা কিছু বানাতে চান সে জন্য তাঁকে এসব অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন শুধুমাত্র নিজের দাওয়াত ও তাবলীগের খাতিরে তিনি এ সত্যটি সামনে তুলে ধরলেন যে, তিনি কোন নতুন অভিনব দীন পেশ করছেন না বরং তাওহীদ প্রচারের এমন একটি বিশ্বজনীন আন্দোলনের সাথে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে যার নেতা হচ্ছে ইবরাহীম ইসহাক ও ইয়াকূব আলাইহিমুস সালাম। তাঁর এমনটি করা এ জন্য জরুরী ছিল যে, সত্য দীনের আহবায়ক কখনো "আমি একটি নতুন কথা বলছি যা এর আগে কেউ বলেনি" এ ধরনের দাবীর মাধ্যমে তাঁর দাওয়াতের কাজ শুরু করেন না। বরং প্রথম পদক্ষেপেই তিনি একথা পরিষ্কার করে বলে দেন যে, তিনি একটি চিরন্তন ও চিরস্তায়ী সত্যের দিকে আহবান জানাচ্ছেন, যা ইতিপূর্বে সবসময়ই সকল সত্যপন্থী পেশ করে এসেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনঃ তারপর ইউসুফ (আ) নিজের বক্তব্য পেশ করার জন্য যেভাবে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আমরা প্রচার কৌশলের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি। দু'জন লোক তাদের স্বপ্ন বর্ণনা করছে। তারা নিজেদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করে তার তা'বীর জিজ্ঞেস করছে। জবাবে তিনি বলছেন, তা'বীর তো আমি অবশ্যি বলবো কিন্তু তার আগে শুনে রাখো, যে জ্ঞানের মাধ্যমে আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেবো তার উৎস কি? এভাবে তাদের কথার মধ্য থেকে নিজের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে তিনি তাদের সামনে নিজের দীন পেশ করতে থাকেন।

এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি সত্য প্রচারের ফিকিরে লেগে যায় এবং সে সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তিরও অধিকারী হয় তাহলে কেমন চমৎকারভাবে আলোচনার মোড় নিজের দিকে ফিরিয়ে নিতে পারে। যে ব্যক্তি দাওয়াত দেবার ধান্দায় থাকে না তার সামনে সুযোগের পর সুযোগ আসতে থাকে কিন্তু কোন সুযোগেই সে নিজের কথা পেশ করার প্রয়োজন অনুভব করে না। কিন্তু যার এ ধান্দা থাকে, সে সুযোগের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকে এবং সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই নিজের কাজ শুরু করে দেয়। তবে বিচক্ষণ ও জ্ঞানী প্রচারকের সুযোগ সন্ধান এবং নির্বোধ ও অবিবেচক প্রচারকের সুযোগ সন্ধানের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নির্বোধ প্রচারক পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি না রেখে লোকদের কানে জোরপূর্বক নিজের দাওয়াত ঠেসে দেবার চেষ্টা করে তারপর অনর্থক তর্কবিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে তাদের মনে নিজের দাওয়াতের প্রতি উল্টো বিরুক্তির সৃষ্টি করে।

চারঃ লোকদের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করার সঠিক পদ্ধতি কি, একথাও এখান থেকে জানা যেতে পারে। হযরত ইউসুফ (আ) সুযোগ পেতেই ইসলামের বিস্তারিত বিধান ও নীতিগুলো পেশ করতে শুরু করেননি। বরং শ্রোতাদের সামনে দীনের এমন একটি সূচনা বিন্দু তুলে ধরেন যেখান থেকে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের পথ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্যকে তুলে ধরেছেন। আবার এ পার্থক্যকে এমন যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট করেছেন যার ফলে সাধারণ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই তা অনুভব না করে পারেন না।

বিশেষ করে সে সময় যাদেরকে সম্বোধন করে তিনি একথা বলছিলেন তাদের মন মস্তিষ্কে তীরের মতো একথা গেঁথে গিয়ে থাকবে। কারণ তারা ছিল কর্মজীবী গোলাম। নিজেদের মনের গভীরে তারা একথা ভালোভাবে অনুভব করতো যে, একজন প্রভুর গোলাম হওয়া ভালো, না একাধিক প্রভুর গোলাম হওয়া আর সারা দুনিয়ার একক প্রভু যিনি, তার বন্দেগী করা ভালো, না তার বান্দাদের বন্দেগী করা? তারপর তিনি একথাও বলেন না যে, তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করো এবং আমার দীন গ্রহণ করো। বরং এক বিচিত্র ভংগীতে বলছেন, আল্লাহর কতবড় মেহেরবানী, তিনি আমাদের তাঁর ছাড়া আর কারো বান্দা হিসেবে পয়দা করেননি, অথচ অধিকাংশ লোক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না বরং অনর্থক নিজেরাই মনগড়া রব তৈরী করে তাদের পূজা ও বন্দেগী করছে। তারপর তিনি শ্রোতাদের অনুসৃত ধর্মের সমালোচনাও করছেন কিন্তু অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবে এবং কোন প্রকার মনোকষ্ট না দিয়ে।

তিনি এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, এই যেসব মাবুদ-যাদের কাউকে তোমরা অন্নদাতা, কাউকে অনুগ্রহদাতা ও করুণাবিধান, কাউকে ভূমির অধিপতি এবং কাউকে ধন-সম্পদের মালিক অথবা স্বাস্থ্য ও রোগের একচ্ছত্র অধিপতি ও পরিচালক ইত্যাদি বলে থাকো এরা নিছক অন্তসারশূন্য নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নামগুলোর পিছনে কোন সত্যিকার অন্নদাতা, অনুগ্রহকারী, মালিক ও প্রভুর অস্তিত্ব নেই। আসল মালিক ও প্রভু হচ্ছেন মহান আল্লাহ, যাকে তোমরাও বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলে স্বীকার করে থাকো। তিনি এসব মালিক ও প্রভুদের কাউকে মালিকানা, প্রভুত্ব ও উপাস্য হবার ছাড়পত্র দেননি। তিনি সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় অধিকার ও ক্ষমতা নিজের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং তাঁরই আদেশ হচ্ছে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচঃ হযরত ইউসুফ (আ) কারাগারের এ আট দশ বছরের জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছেন এ থেকে একথাও অনুমান করা যেতে পারে। লোকেরা মনে করে, কুর'আন যেহেতু তাঁর শুধু একটি মাত্র ভাষণের উল্লেখ আছে কাজেই তিনি কেবল একবারই দীনের দাওয়াত দেবার জন্য মুখ খুলেছিলেন। কিন্তু প্রথমত নবী তাঁর আসল কাজ থেকে গাফেল ছিলেন, একজন নবী সম্পর্কে এ ধারণা করা মারাত্মক ধরনের কুধারণার পর্যায়ভুক্ত। তারপর যে ব্যক্তির সত্যদীন প্রচারের আগ্রহ ও ফিকির এত বেশী প্রবল ছিল যে, দু'জন লোক স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতেই তিনি সেই সুযোগেই সদ্ব্যবহার করে তাদের কাছে দীনের তাবলীগ করতে শুরু করে দেন, তাঁর সম্পর্কে কেমন করে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি কারাবাসের এ কয়েক বছর নীরবে কাটিয়ে দিয়েছিলেন?[৩৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, "শয়তান হযরত ইউসুফকে তাঁর রবের (অর্থাৎ আল্লাহ) স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় এবং তিনি এক বান্দার কাছে চান যে, সে তার রবের (মিসরের বাদশাহর) কাছে তার কথা আলোচনা করে তার কারামুক্তির চেষ্টা করুক, তাই আল্লাহ তাঁকে কয়েক বছর জেলখানা পড়ে থাকার শাস্তি দেন।" মূলত এটি পুরোপুরি একটি ভুল ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেমন আল্লামা ইবনে কাসীর এবং প্রথম যুগের তাফসীরকারদের মধ্যে মুজাহিদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইত্যাদি তাফসীরকারগণ বলেন, (আরবী) (শয়তান তাকে ভুলিয়ে দেয় তার রবের বা প্রভুর স্মরণ) এর মধ্যে "তার" বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার সম্পর্কে হযরত ইউসুফের ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে এবং এ আয়াতের মানে হচ্ছে, "শয়তান তার প্রভুর কাছে হযরত ইউসুফের বিষয়টা উত্থাপন করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল।" এ প্রসংগে একটি হাদীসও পেশ করা হয়।

হাদীসটিতে বলা হয়েছেঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে কথা বলেছিলেন সে কথা যদি তিনি না বলতেন তাহলে তিনি কয়েক বছর কারাগারে আটক থাকতেন না।" কিন্তু আল্লামা ইবনে কাসীর বলেছেনঃ "এ হাদীস যে ক'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সব কটিই দুর্বল। কোন কোন সূত্রে এটি "মরফূ" হাদীস। সেখানে বর্ণনাকারী হচ্ছে সুফিয়ান ইবন ওয়াকী' ও ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ। এরা উভয়ই অনিভরযোগ্য। আবার কোন কোন সূত্রে এটি "মুরসাল" হাদীস। কিন্তু এ ধরনের বিষয়ে মুরসাল হাদীসের ওপর ভরসা করা যেতে পারে না।" এ ছাড়া একজন মজলুম ব্যক্তি নিজের মুক্তির জন্য পার্থিব পন্থা অবলম্বন করাকে আল্লাহ থেকে গাফলতির ও তাঁর প্রতি অনিভরশীলতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হবে - একথা যুক্তির দিক দিয়েও গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৮]

ইউসুফ (আ) কারাগারে

যা হোক, ইউসুফ (আ) কে কারাগারে প্রেরণ করা হল এবং একজন নির্দোষীকে দোষী এবং একজন নিরপরাধ লোককে অপরাধী বানিয়ে দেয়া হল, যেন আযীযের স্ত্রী অপমান ও দুর্নাম হইতে রক্ষা পায় এবং অপরাধীকে কেউ অপরাধী বলতে না পারে।

---

৩৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৬৭৬

৩৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৬৭৬

Dhaka University Institutional Repository

তাওরাতে বর্ণিত আছে "ইউসুফ (আ) এল্‌ম ও আমলের নৈপূণ্য জেলখানায়ও গুপ্ত থাকতে পারে নাই। জেল-দারোগা তাঁহার শিষ্যত্বের গণ্ডির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে এবং জেলখানায় যাবতীয় শৃংখলা বিধান এবং সমাধান তাঁর হাতে সোপর্দ করে দিল। ফলে জেলখানা সম্পূর্ণরূপে তাঁর স্বাধীন পরিচালনাধীনে এসে গেল। "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সেখানেও তাঁর যাবতীয় কাজে সৌভাগ্যশালী করে দিলেন।"

কুর'আন মজীদ হতেও এই বর্ণনার পোষকতা পাওয়া যায়। কেননা, সেকালের জেলখানাগুলির অবস্থার পরিদৃষ্টিতে ইউসুফ (আ)-এর নিকট বন্দীদের এইরূপ অবাধ যাতায়াত এবং তাঁর মাহাত্ম ও নেক স্বভাবের স্বীকৃতি তাই প্রকাশ করে যে, জেলখানায় ইউসুফ (আ)-এর পবিত্র গুণাবলীর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।[৩৯]

---

৩৯. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ২৯৮, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

মারইয়াম (আ)-এর নামাজের স্থান

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا -

তারপর তিনি কক্ষ থেকে বের হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে এলেন এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে বললেন।[৪০]

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ -

যেসব গৃহকে আল্লাহ্ মর্যাদায় সমুন্নত করতে ও যেখানে তাঁর নাম স্মরণ করতে আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে-[৪১]

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ -

তোমরা তো পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ নৈপুণ্যের সাথে ।[৪২]

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

আদ জাতির সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল, তারা উচু উচু স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারত নির্মান করতো। ঠিক তেমনি সামুদ জাতির সভ্যতা তার চেয়ে যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টের জন্য প্রাচীনকালের জাতিসমূহের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তা ছিল এই যে, তারা পাহাড় কেটে তার মধ্যে ইমারত নির্মাণ করতো। তাই সূরা আল ফজরে যেভাবে আদকে 'যাতুল ইমাদ' (ذات العماد) বলে অর্থাৎ স্তম্ভের অধিকারী পদবী দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি সামুদ জাতির বর্ণনা একথার মাধ্যমে করা হয়েছে :

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ -

"এমন সব লোক যার উপত্যাকায় পাহাড় কেটেছে।"[৪৩]
এ ছাড়া কুর'আনে একথাও বলা হয়েছে যে, তারা নিজেদের দেশের সমতল ভূমিতে বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করতো-

- سُهُولِهَا مِنْ تَتَّخِذُونَ قُصُورًا

---

৪০. আল-কুর'আন, ১৯ঃ ১১
৪১. আল-কুর'আন, ২৪ঃ ৩৬
৪২. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ১৪৯
৪৩. আল-কুর'আন, ৮৯ঃ ০৯

Dhaka University Institutional Repository

এসব গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল? فرهين শব্দের মাধ্যমে কুর'আন-এর ওপর আলোকপাত করে। অর্থাৎ এসব কিছু ছিল তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব, সম্পদ, শক্তি ও প্রযুক্তির নৈপুন্যের প্রদর্শনী। কোন যথার্থ প্রয়োজনের তাগিদ এর পেছনে কার্যকর ছিল না। একটি বিকৃত ও ভ্রষ্ট সভ্যতার ধরণ এমনিই হয়ে থাকে। একদিকে সমাজের গরীব লোকেরা মাথা গোঁজারও ঠাঁই পায় না আর অন্যদিকে ধনী নেতৃস্থানীয় লোকেরা থাকার জন্য যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করে ফেলে তখন প্রয়োজন ছাড়াই নিছক লোক দেখাবার জন্য স্মৃতিস্তম্ভসমূহ নির্মাণ করতে থাকে।

সামুদ জাতির এ ইমারতগুলোর কিছু সংখ্যক এখনো টিকে আছে। এ জায়গাটি মদীনা তাইয়্যেবা ও তাবুকের মধ্যবর্তী হিজাযের বিখ্যাত আল'উলা নামক স্থান, (যাকে নবীর জামানায় 'ওয়াদিউল কুরা' বলা হতো) থেকে কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা আজও এ জায়গাকে 'আল হিজর' ও 'মাদ্য়ানে সালেহ' নামে স্মরণ করে থাকে। এ এলাকায় 'আল উলা' এখনো একটি শস্য শ্যামল উপত্যকা। এখানে রয়েছে বিপুল সংখ্যক পানির নহর ও বাগিচা। কিন্তু আজ হিজরের আশেপাশে বড়ই নির্জন ও ভীতিকর পরিবেশ বিরাজমান। লোকবসতি নামমাত্র। সবুজের উপস্থিতি ক্ষীণ। কূয়া আছে কয়েকটি। এরই মধ্যে একটি কূয়ার ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের মধ্যে একথা প্রচলিত আছে যে, হযরত সালেহ (আ)-এর উটনী সেখান থেকে পানি পান করতো। বর্তমানে এটি তুর্কী আমলের একটি বিরান ক্ষুদ্র সামরিক চৌকির মধ্যে অবস্থিত।

কূয়াটি একবারেই শুকনা। (এর ছবিও পাশের পাতায় দেখানো হয়েছে)। এ এলাকায় প্রবেশ করে আল উলা'র কাছাকাছি পৌঁছুতেই আমরা সর্বত্র এমনসব পাহাড় দেখলাম যা একেবারেই ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পরিষ্কার মনে হচ্ছিল, কোন ভয়াবহ ভূমিকম্প এগুলোকে নীচে থেকে উপর পর্যন্ত ঝাঁকানি দিয়ে ফালি ফালি করে দিয়ে গেছে। (এ পাহাড়গুলোরও কিছু ছবি পাশের পাতাগুলোয় দেয়া হয়েছে)। এ ধরণের পাহাড় আমরা দেখতে দেখতে গিয়েছি পূবের দিকে আল'উলা থেকে খায়বার যাবার সময় প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে জর্ডানে রাজ্যের সীমানার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত। এর অর্থ দাঁড়ায়, তিন চারশো মাইল দীর্ঘ ও একশো মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট একটি এলাকা ভূমিকম্পে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আল হিজরে আমরা সামুদ জাতির যেসব ইমারত দেখেছিলাম ঠিক একই ধরণের কতিপয় ইমারত আমরা পেলাম আকাবা উপসাগরের কিনারে মাদ্য়ানে এবং জর্ডান রাজ্যের পেট্রা (PETRA) নামক স্থানেও। বিশেষ করে পেট্রায় সামূদী প্যাটার্নের ইমারত এবং নিবতীদের তৈরী করা অট্টালিকা পাশাপাশি দেখা গেছে। এগুলোর কারুকাজ ও নির্মাণ পদ্ধতিতে এত সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক নজর দেখার সাথে সাথেই বুঝতে পারবে এগুলো এক যুগেরও নয় এবং একই জাতির স্থাপত্যের নিদর্শনও নয়। এগুলোরও আলাদা আলাদা ছবি আমি পাশের পৃষ্ঠায় দিয়েছি। ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ডটি (Daughty) কুর'আনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আল হিজরের ইমারত সম্পর্কে দাবী করেছেন, এগুলো সামূদের নির্মিত নয় বরং নিবতীদের তৈরী ইমারত। কিন্তু উভয় জাতির স্থাপত্য পদ্ধতির মধ্যে বিস্তর ও সুস্পষ্ট ফারাক দেখা যায়। ফলে কেবলমাত্র একজন অন্ধই এগুলোকে একই জাতির নির্মিত বলে দাবী করতে পারে। আমার অনুমান, পাহাড় কেটে তার মধ্যে গৃহ নির্মাণ কৌশল সামূদই উদ্ভাবন করে এবং এর হাজার হাজার বছর পরে নিবতীরা খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে একে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়ে দেয়। অতপর ইলোরায় (পেট্রার প্রায় সাতশো বছর পরে নির্মিত গুহা) এ শিল্পটির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।[৪৪]

---

৪৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু.মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৮৯৩

Dhaka University Institutional Repository

যে স্থানে দুই সমুদ্র একত্রিত হয়েছে

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

(مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ) (بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ) -

তিনিই মুক্তভাবে প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া, যারা পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক পর্দা, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।[৪৫]

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا -

সে অনুসারে যখন তারা তাদের সংগমস্থলে পৌঁছে গেলো তখন নিজেদের মাছের ব্যাপারে গাফেল হয়ে গেলো এবং সেটি বের হয়ে সুড়ংগের মতো পথ তৈরি করে দরিয়ার মধ্যে চলে গেলো।[৪৬]

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا -

(এদেরকে সেই ঘটনাটি একটু শুনিয়ে দাও যা মূসার সাথে ঘটেছিল) যখন মূসা তার খাদেমকে বলেছিল, দুই দরিয়ার সংগমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি সফর শেষ করবো না, অন্যথায় আমি দীর্ঘকাল ধরে চলতেই থাকবো।[৪৭]

পরিচিতি

এ পর্যায়ে কাফের ও মুমিন উভয় গোষ্ঠীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সজাগ করারই মূল উদ্দেশ্য। সেই সত্যটি হচ্ছে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে মানুষের স্থূল দৃষ্টি তা থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল গ্রহণ করে; কারণ আল্লাহ যে উদ্দেশ্য ও কল্যাণ সামনে রেখে কাজ করেন তা তার জানা থাকে না ; মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে, জালেমরা স্ফীত হচ্ছে, উন্নতি লাভ করছে, নিরপরাধরা কষ্ট ও সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে, নাফরমানদের প্রতি অজস্রধারে অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে, আনুগত্যশীলদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে, অসৎলোকেরা আয়েশ আরামে দিন যাপন করছে এবং সৎলোকেদের দূরবস্থার শেষ নেই। লোকেরা নিছক এর গূঢ় রহস্য না জানার কারণে সাধারণভাবে তাদের মনে দোদুল্যমানতা এমন কি বিভ্রান্তিও দেখা দেয়। কাফের ও জালেমরা এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় যে, এ দুনিয়াটা একটা অরাজকতার মুল্লুক। এখানে কোন রাজা নেই। আর থাকলেও তার শাসন শৃংখলা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে ।

---

৪৫. আল-কুর'আন, ৫৫ঃ ১৯-২০
৪৬. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ৬১
৪৭. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ৬০

Dhaka University Institutional Repository

এখানে যারা যা ইচ্ছা করতে পারে। তাকে জিজ্ঞেস বা কৈফিয়ত তলব করার কেউ নেই । এ ধরনের ঘটনাবলী দেখে মুমিন মনমরা হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় কঠিন পরীক্ষাকালে তার ঈমানের ভিতও নড়ে যায় । এহেন অবস্থায় মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর নিজের ইচ্ছা জগতের পরদা উঠিয়ে এক ঝলক দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে সেখানে দিনরাত কি হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে এবং ঘটনার বহিরাগংন তার অভ্যন্তর থেকে কেমন ভিন্নতর হয় তা তিনি জানতে পারেন । হযরত মূসার (আ) এ ঘটনাটা কোথায় ও কবে সংঘটিত হয়? কুর'আনে একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি । হাদীসে অবশ্যি আমরা আওফীর একটি বর্ণনা পাই, যাতে তিনি

ইবনে আব্বাসের (রা) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন । তাতে বলা হয়েছে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) যখন মিসরে নিজের জাতির বসতি স্থাপন করেন তখন এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল । কিন্তু বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে তা এ বর্ণনা সমর্থন করে না । তাছাড়া অন্য কোন উপায়েও একথা প্রমাণ হয় না যে, ফেরউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) কখনো মিসরে গিয়েছিলেন । বরং কুর'আন একথা সুস্পষ্টভবে বর্ণনা করে যে, মিসর ত্যাগ করার পর তার সমস্তটা সময় সিনাই ও তীহ্ অঞ্চলে কাটে।

কাজেই এ রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয় । তবে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দুটি কথা পরিস্কার বুঝতে পারি । এক, হযরত মূসাকে (আ) হয়তো তাঁর নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে এ পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছিল । কারণ নবুওয়াতের শুরুতেই পয়গম্বরদের জন্য এ ধরনের শিক্ষা ও অনুশীলনের দরকার হয়ে থাকে। দুই, মুসলমানরা মক্কা মু'আযযমায় যে ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল বনী ইসরাঈলও যখন তেমনি ধরনের অবস্থার সম্মুখীণ হচ্ছিল তখনই হযরত মূসার জন্য এ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকবে । এ দু'টি কারণে আমাদের অনুমান, (অবশ্য সঠিক কথা একমাত্র আল্লাহ জানেন) এ ঘটনার সম্পর্কে এমন এক যুগের সাথে মিসরে বনী ইসরাঈলদের ওপর ফেরাউনের জুলুমের সিলসিলা জারি ছিল এবং মক্কার কুরাইশ সরদারদের মতো ফেরাউন ও তার সভাসদরাও আযাবে বিলম্ব দেখে ধারণা করছিল যে, তাদের ওপর এমন কোন সত্তা নেই যার কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে এবং মক্কার মজলুম মুসলমানদের মতো মিসরের মজলুম মুসলমানরাও অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করছিল, যে আল্লাহ! আর কত দিন এ জালেমদেরকে পুরস্কৃত এবং আমাদের ওপর বিপদের সয়লাব - স্রোত প্রবাহিত করা হবে? এমনকি হযরত মূসাও চীৎকার করে উঠেছিলেন:

وقَال مُوسى رَبّنا إنّك أتيْت فِرْعوْن وملأهْ زينة وأمْوالا في الحياةِ الدُّنْيا ربّنا لِيُضلُوا عن سبيلك
رَبّنَا اطْمِسْ عَلى أمْوَالِهمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلوبهمْ فلا يُؤْمِنُوا حتّى يرَوُا العَذاب الألِيمَ -

"হে পরওয়ারদিগার! তুমি ফেরাউন ও তার সভাসদদেরকে দুনিয়াব জীবনে বড়ই শান শওকত ও ধন দওলত দান করেছো। হে আমাদের প্রতিপালক! এটা কি এ জন্য যে, তারা দুনিয়াকে তোমার পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করবে?[৪৮]

---

৪৮. আল-কুর'আন, ১০: ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

যদি আমাদের এ অনুমান সঠিক হয় তাহলে ধারণা করা যেতে পারে যে, সম্ভবত হযরত মূসার (আ) এ সফরটি ছিল সুদানের দিকে । এ ক্ষেত্রে দু' দরিয়ার সংগমস্থল বলতে বুঝাবে বর্তমান খার্তুম শহরের নিকটবর্তী নীল নদের দই শাখা বাহরুল আবইয়াদ (হোয়াইট নীল) ও বাহরুল আযরাক (ব্লু নীল) সেখানে এসে মিলিত হয়েছে। হযরত মূসা (আ) সারা জীবন যেসব এলাকায় কাটিয়েছেন সেসব এলাকায় এ একটি স্থান ছাড়া আর কোথাও দু'নদীর সংগমস্থল নেই ।

এ ঘটনাটির ব্যাপারে বাইবেল একেবারে নীরব। তবে তালমুদে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে এ ঘটনাটিকে মূসার (আ) পরিবর্তে 'রাব্বী ইয়াহুহানান বিন লাভীর' সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে: "হযরত ইলিয়াসের সাথে উল্লেখিত রাব্বীর এ ঘটনাটি ঘটে। হযরত ইলিয়াসকে (আ) দুনিয়া থেকে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নেয়ার পর ফেরেশতাদের দলভুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি দুনিয়ার ব্যবস্থাপনারয় নিযুক্ত হয়েছেন ।"[৪৯]

সম্ভবত বনী ইসরাঈলের মিশর ত্যাগের পূর্বেকার ঘটনাবলীর ন্যায় এ ঘটনাটিও সঠিক অবস্থায় সংরক্ষিত থাকেনি এবং শত শত বছর পরে তারা ঘটনার এক জয়গায় কথা নিয়েং আর এক জায়গায় জুড়ে দিয়েছে । তালমুদের এ বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের কেউ কেউ একথা বলে দিয়েছেন যে, কুর'আনের এ স্থানে যে মূসার কথা বলা হয়েছে তিনি হযরত মূসা (আ) নন বরং অন্য কোন মূসা হবেন । কিন্তু তালমুদের প্রত্যেকটি বর্ণনাকে নির্ভল ইতিহাস গণ্য করা যেতে পারে না। আর কুর'আনে কোন অজানা ও অপরিচিত মূসার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে, এ ধরনের কোন কথা অনুমান করার কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই । তাছাড়া নিভুরযোগ্য হাদীসমূহে যখন হযরত উবাই ইবেন কা'বের (রা) এ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী (স) এ ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে মূসা (আ) বলতে বনী ইসরাঈলের নবী হযরত মূসাকে (আ) নির্দেশ করেছেন । তখন কোন মুসলমানের জন্য তালামুদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না ।

পশ্চিমী প্রাচ্যবিদরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে কুর'আন মজীদের এ কাহিনীটিরও উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হবার চেষ্টা করেছেন । তারা তিনটি কাহিনীর প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে বলেছেন যে, এসব জায়গা থেকে মুহাম্মদ (স) এটি নকল করেছেন এবং তারপর দাবী করেছেন, আমাকে অহীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানানো হয়েছে । এর মধ্যে একটি হচ্ছে গিলগামিশের কাহিনী, দ্বিতীয়টি সুরিয়ানী সিকান্দার নামা এবং তৃতীয়টি হচেছ ওপরে যে ইহুদী বর্ণনাটির উল্লেখ আমরা করেছি । কিন্তু এ কূটীল স্বভাব লোকেরা জ্ঞান চর্চার নামে যেসব গবেষণা ও অনুসন্ধান চালান সেখানে পূর্বাহ্নেই এ সিদ্ধান্ত করে নেন যে, কুর'আনকে কোনক্রমেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বলে মেনে নেয়া যাবে না ।

কাজেই এখন যে, কোনভাবেই এ বিষয়ের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, মুহাম্মাদ (স) যা কিছু পেশ করেছেন তা অমুক অমুক জায়গা থেকে চুরি করা বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি থেকে গৃহীত । এ ন্যক্কারজনক গবেষণা পদ্ধতিতে তারা এমন নির্লজ্জভাবে টানাহেঁচড়া করে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায় যে, তা দেখে স্বতঃ স্ফূর্তভাবে ঘৃণায় মন রি রি করে ওঠে এবং মানুষ বলতে বাধ্য হয়: যদি এর নাম হয় তাত্বিক গবেষণা তাহলে এ ধরনের তত্ব - জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি অভিশাপ । কোন জ্ঞানান্বেষণকারী তাদেরর কাছে যদি একবলমাত্র চারটি বিষয়ের জবাব চায় তাহেল তাদের বিদ্বেষমূলক মিথ্যাচারের একেবারেই হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে:

---

৪৯. THE TALMUD SELECTIONS BY H.POLANO.PP. ৩১৩ - ১৬

Dhaka University Institutional Repository

এক, আপনাদের কাছে এমন কি প্রমাণ আছে, যার ভিত্তিতে আপনারা দু'চারটে প্রাচীন গ্রন্থে কুর'আনের কোন বর্ণনার সাথে কিছুটা মিলে যায় এমন ধরনের বিষয় পেয়েই দাবী করে বসেন যে, কুর'আনের বর্ণনাটি অবশ্যই এ গ্রন্থগুলো থেকে নেয়া হয়েছে ।

দুই, আপনারা বিভিন্ন ভাষায় যেসব গ্রন্থকে কুর'আন মজীদের কাহিনী ও অন্যান্য বর্ণনার উৎস গণ্য করেছেন সেগুলোর তালিকা তৈরী করলে দস্তুরমতো একটি বড়সড় লাইব্রেরীর গ্রন্থ তালিকা তৈরী হয়ে যাবে । এ ধরনের কোন লাইব্রেরী কি সে সময় মক্কায় ছিল এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদকবৃন্দ সেখানে বসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপাদান সরবরাহ করছিলেন ? যদি এমনটি না হয়ে থাকে এবং নবুওয়াত লাভের কয়েক বছর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের বাইরে, যে দু'তিনটি সফর করেছিলেন শুধুমাত্র তারই ওপর আপনারা নির্ভর করে থাকেন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ বাণিজ্যিক সফরগুলোর তিনি কয়টি লাইব্রেরীর বই অনুলিখন বা মুখস্ত করে এনেছিলেন ? নবুওয়াতের ঘোষণার একদিন আগেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলাপ - আলোচনা ও কথাবার্তায় এ ধরনের তথ্যের কোন চিহ্ন পাওয়া না যাওয়ার যুক্তিসংগত কারণ কি ?

তিন, মক্কার কাফের সম্প্রদায়, ইহুদী ও খৃষ্টান সবাই অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাগুলো কোথা থেকে আনেন। আপনারা বলতে পারেন নবীর (সা) সমকালীনরা তাঁর এ চুরির কোন খবর পায়নি কেন? এর কারণ কি? তাদেরকে তো বারবারই এ মর্মে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছিল যে, এ কুর'আন আল্লাহ নাযিল করেছেন, অর্থ ছাড়া এর দ্বিতীয় কোন উৎস নেই, যদি তোমরা একে মানুষের বাণী বলো তাহলে মানুষ যে এমন বাণী তৈরী করতে পারে তা প্রমাণ করে দাও। এ চ্যালেঞ্জটি নবীর (সা) সমকালীন ইসলামের শত্রুদের কোমর ভেংগে দিয়েছিল । তারা এমন একটি উৎসের প্রতিও অংগুলি নির্দেশ করতে পারেনি যা তেকে কুর'আনের বিষয়বস্তু গ্রহীত হয়েছে বলে কোন বিবেকবান ব্যক্তি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা সন্দেহও করতে পারে । প্রশ্ন হচ্ছে, সমকালীনরা এ গোয়েন্দাবৃত্তিতে ব্যর্থ হলো কেন? আর হাজার বারোশো বছর পরে আজ বিরোধী পক্ষ এতে সফল হচ্ছেন কেমন করে ?

চার, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হচ্ছে, একথার সম্ভাবনা তো অবশ্যি আছে যে, কুর'আন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং এ কিতাবটি বিগত ইতিহাসের এমনসব ঘটনার সঠিক খবর দিচ্ছে যা হাজার হাজার বছর ধরে শ্রুতির মাধ্যমে বিকৃত হয়ে অন্য লোকদের কাছে পৌঁছেছে এবং গল্পের রূপ নিয়েছে । কোন ন্যায় সংগত প্রমাণের ভিত্তিতে এ সম্ভাবনাটিকে একদম উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এবং কেন শুধুমাত্র এ একটি সম্ভাবনাকে আলোচনা ও গবেষণার ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে যে, লোকদের মধ্যে গল্প ও মৌখিক প্রবাদ আকারে যেসব কিসসা কাহিনী প্রচলিত ছিল কুর'আন সেগুলো থেকেই গৃহীত হয়েছে? ধর্মীয় বিদ্বেষ ও হঠকারিতা ছাড়া এ প্রাধান্য দেবার অন্য কোন কারণ বর্ণনা করা যেতে পারে কি ?

এ প্রশ্নগুলো নিয়ে যে ব্যক্তিই একটু চিন্তা - ভাবনা করবে তারই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া ছাড়া আর কোন গন্তব্য থাকতে পারে না যে, প্রাচ্যবিদরা "তত্বজ্ঞানের" নামে যা কিছু পেশ করেছেন কোন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী ও জ্ঞানানুশীলনকারীর কাছে তার কানাকড়িও মূল্য নেই ।[৫০]

---

৫০. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৬৮০

Dhaka University Institutional Repository

দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থান

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا -

(এদেরকে সেই ঘটনাটি একটু শুনিয়ে দাও যা মূসার সাথে ঘটেছিল) যখন মূসা তার খাদেমকে বলেছিল, দুই দরিয়ার সংগমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি সফর শেষ করবো না, অন্যথায় আমি দীর্ঘকাল ধরে চলতেই থাকবো।[৫১]

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا -

সে অনুসারে যখন তারা তাদের সংগমস্থলে পৌঁছে গেলো তখন নিজেদের মাছের ব্যাপারে গাফেল হয়ে গেলো এবং সেটি বের হয়ে সুড়ংগের মতো পথ তৈরি করে দরিয়ার মধ্যে চলে গেলো।[৫২]

পরিচিতি

এ পর্যায়ে কাফের ও মুমিন উভয় গোষ্ঠীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সজাগ করারই মূল উদ্দেশ্য। সেই সত্যটি হচ্ছে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে মানুষের স্থূল দৃষ্টি তা থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল গ্রহণ করে । কারণ আল্লাহ যে উদ্দেশ্য ও কল্যাণ সামনে রেখে কাজ করেন তা তার জানা থাকে না । মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে, জালেমরা স্ফীত হচ্ছে, উন্নতি লাভ করছে, নিরপরাধরা কষ্ট ও সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে, নাফরমানদের প্রতি অজস্রধারে অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে, আনুগত্যশীলদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে, অসৎলোকেরা আয়েশ আরামে দিন যাপন করছে এবং সৎলোকেদের দূরবস্থার শেষ নেই। লোকেরা নিছক এর গুঢ় রহস্য না জানার কারণে সাধারণভাবে তাদের মনে দোদুল্যমানতা এমন কি বিভ্রান্তিও দেখা দেয় ।

কাফের ও জালেমরা এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় যে, এ দুনিয়াটা একটা অরাজকতার মুল্লুক। এখানে কোন রাজা নেই। আর থাকলেও তার শাসন শৃংখলা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এখানে যারা যা ইচ্ছা করতে পারে। তাকে জিজ্ঞেস বা কৈফিয়ত তলব করার কেউ নেই। এ ধরনের ঘটনাবলী দেখে মুমিন মনমরা হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় কঠিন পরীক্ষাকালে তার ঈমানের ভিতও নড়ে যায়। এহেন অবস্থায় মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর নিজের ইচ্ছা জগতের পরদা উঠিয়ে এক ঝলক দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে সেখানে দিনরাত কি হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে এবং ঘটনার বহিরাগংন তার অভ্যন্তর থেকে কেমন ভিন্নতর হয় তা তিনি জানতে পারেন ।

হযরত মূসার (আ) এ ঘটনাটা কোথায় ও কবে সংঘটিত হয় ? কুর'আনে একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি । হাদীসে অবশ্যি আমরা আওফীর একটি বর্ণনা পাই, যাতে তিনি ইবনে আব্বাসের (রা) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) যখন মিশরে নিজের জাতির বসতি স্থাপন করেন তখন এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল । কিন্তু বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে তা এ বর্ণনা সমর্থন করে না । তাছাড়া অন্য কোন উপায়েও একথা প্রমাণ হয় না যে, ফেরউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) কখনো মিসরে গিয়েছিলেন ।

---

৫১. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ৬০

৫২. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ৬১

Dhaka University Institutional Repository

বরং কুর'আন একথা সুস্পষ্টভবে বর্ণনা করে যে, মিসর ত্যাগ করার পর তার সমস্তটা সময় সিনাই ও তীহ্ অঞ্চলে কাটে । কাজেই এ রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দুটি কথা পরিস্কার বুঝতে পারি । এক, হযরত মূসাকে (আ) হয়তো তাঁর নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে এ পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছিল। কারণ নবুওয়াতের শুরুতেই পয়গম্বরদের জন্য এ ধরনের শিক্ষা ও অনুশীলনের দরকার হয়ে থাকে। দুই, মুসলমানরা মক্কা মু'আযযমায় যে ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল বনী ইসরাঈলও যখন তেমনি ধরনের অবস্থার সম্মুখীণ হচ্ছিল তখনই হযরত মূসার জন্য এ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকবে।

এ দু'টি কারণে আমাদের অনুমান, (অবশ্য সঠিক কথা একমাত্র আল্লাহ্ জানেন) এ ঘটনার সম্পর্কে এমন এক যুগের সাথে মিসরে বনী ইসরাঈলদের ওপর ফেরাউনের জুলুমের সিলসিলা জারি ছিল এবং মক্কার কুরাইশ সরদারদের মতো ফেরাউন ও তার সভাসদরাও আযাবে বিলম্ব দেখে ধারণা করছিল যে, তাদের ওপর এমন কোন সত্তা নেই যার কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে এবং মক্কার মজলুম মুসলমানদের মতো মিসরের মজলুম মুসলমানরাও অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করছিল, যে আল্লাহ! আর কত দিন এ জালেমদেরকে পুরস্কৃত এবং আমাদের ওপর বিপদের সয়লাব- স্রোত প্রবাহিত করা হবে? এমনকি হযরত মূসাও চীৎকার করে উঠেছিলেন:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ -

"হে পরওয়ারদিগার ! তুমি ফেরাউন ও তার সভাসদদেরকে দুনিয়ার জীবনে বড়ই শান শওকত ও ধন দওলত দান করেছো। হে আমাদের প্রতিপালক ! এটা কি এ জন্য যে, তারা দুনিয়াকে তোমার পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করবে ?[৫৩]

যদি আমাদের এ অনুমান সঠিক হয় তাহলে ধারণা করা যেতে পারে যে, সম্ভবত হযরত মূসার (আ) এ সফরটি ছিল সুদানের দিকে। এ ক্ষেত্রে দু' দরিয়ার সংগমস্থল বলতে বুঝাবে বর্তমান খার্তুম শহরের নিকটবর্তী নীল নদের দুই শাখা বাহরুল আবইয়াদ (হোয়াইট নীল) ও বাহরুল আযরাক (ব্লু নীল) সেখানে এসে মিলিত হয়েছে। হযরত মূসা (আ) সারা জীবন যেসব এলাকায় কাটিয়েছেন সেসব এলাকায় এ একটি স্থান ছাড়া আর কোথাও দু'নদীর সংগমস্থল নেই ।

এ ঘটনাটির ব্যাপারে বাইবেল একেবারে নীরব । তবে তালমুদে এর উল্লেখ আছে । কিন্তু সেখানে এ ঘটনাটিকে মূসার (আ) পরিবর্তে 'রাব্বী ইয়াহুহানান বিন লাভীর' সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে : "হযরত ইলিয়াসের সাথে উল্লেখিত রাব্বীর এ ঘটনাটি ঘটে । হযরত ইলিয়াসকে (আ) দুনিয়া থেকে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নেয়ার পর ফেরেশতাদের দলভুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি দুনিয়ার ব্যবস্থাপনারয় নিযুক্ত হয়েছেন ।"[৫৪]

---

৫৩. আল-কুর'আন, ১০: ৮৮
৫৪. THE TALMUD SELECTIONS BY H.POLANO.PP. ৩১৩- ১৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবত বনী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগের পূর্বেকার ঘটনাবলীর ন্যায় এ ঘটনাটিও সঠিক অবস্থায় সংরক্ষিত থাকেনি এবং শত শত বছর পরে তারা ঘটনার এক জায়গায় কথা নিয়েং আর এক জায়গায় জুড়ে দিয়েছে। তালমুদের এ বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের কেউ কেউ একথা বলে দিয়েছেন যে, কুর'আনের এ স্থানে যে মূসার কথা বলা হয়েছে তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নন বরং অন্য কোন মূসা হবেন ।

কিন্তু তালমূদের প্রত্যেকটি বর্ণনাকে নির্ভুল ইতিহাস গণ্য করা যেতে পারে না। আর কুর'আনে কোন অজানা ও অপরিচিত মূসার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে, এ ধরনের কোন কথা অনুমান করার কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তাছাড়া নির্ভরযোগ্য হাদীসমূহে যখন হযরত উবাই ইবেন কা'বের (রা) এ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী (স) এ ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে মূসা (আ) বলতে বনী ইসরাঈলের নবী হযরত মূসাকে (আ) নির্দেশ করেছেন । তখন কোন মুসলমানের জন্য তালামুদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না ।

পশ্চিমী প্রাচ্যবিদরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে কুর'আন মজীদের এ কাহিনীটিরও উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হবার চেষ্টা করেছেন । তারা তিনটি কাহিনীর প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে বলেছেন যে, এসব জায়গা থেকে মুহাম্মদ (স) এটি নকল করেছেন এবং তারপর দাবী করেছেন, আমাকে অহীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানানো হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে গিলগামিশের কাহিনী, দ্বিতীয়টি সুরিয়ানী সিকান্দার নামা এবং তৃতীয়টি হচেছ ওপরে যে ইহুদী বর্ণনাটির উল্লেখ আমরা করেছি । কিন্তু এ কুটীল স্বভাব লোকেরা জ্ঞান চর্চার নামে যেসব গবেষণা ও অনুসন্ধান চালান সেখানে পূর্বাহ্নেই এ সিদ্ধান্ত করে নেন যে, কুর'আনকে কোনক্রমেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বলে মেনে নেয়া যাবে না ।

কাজেই এখন যে, কোনভাবেই এ বিষয়ের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, মুহাম্মদ (স) যা কিছু পেশ করেছেন তা অমুক অমুক জায়গা থেকে চুরি করা বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি থেকে গৃহীত । এ ন্যক্কারজনক গবেষণা পদ্ধতিতে তারা এমন নির্লজ্জভাবে টানাহেঁচড়া করে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায় যে, তা দেখে স্বতঃ স্ফূর্তভাবে ঘৃণায় মন রি রি করে ওঠে এবং মানুষ বলতে বাধ্য হয়: যদি এর নাম হয় তাত্ত্বিক গবেষণা তাহলে এ ধরনের তত্ত্ব- জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি অভিশাপ। কোন জ্ঞানান্বেষণকারী তাদেরর কাছে যদি একবলমাত্র চারটি বিষয়ের জবাব চায় তাহেল তাদের বিদ্বেষমূলক মিথ্যাচারের একেবারেই হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে:

এক. আপনাদের কাছে এমন কি প্রমাণ আছে, যার ভিত্তিতে আপনারা দু'চারটে প্রাচীন গ্রন্থে কুর'আনের কোন বর্ণনার সাথে কিছুটা মিলে যায় এমন ধরনের বিষয় পেয়েই দাবী করে বসেন যে, কুর'আনের বর্ণনাটি অবশ্যই এ গ্রন্থগুলো থেকে নেয়া হয়েছে ।

দুই. আপনারা বিভিন্ন ভাষায় যেসব গ্রন্থকে কুর'আন মজীদের কাহিনী ও অন্যান্য বর্ণনার উৎস গণ্য করেছেন সেগুলোর তালিকা তৈরী করলে দস্তুরমতো একটি বড়সড় লাইব্রেরীর গ্রন্থ তালিকা তৈরী হয়ে যাবে । এ ধরনের কোন লাইব্রেরী কি সে সময় মক্কায় ছিল এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদকবৃন্দ সেখানে বসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপাদান সরবরাহ করছিলেন ? যদি এমনটি না হয়ে থাকে এবং নবুওয়াত লাভের কয়েক বছর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের বাইরে, যে দু'তিনটি সফর করেছিলেন শুধুমাত্র তারই ওপর আপনারা নির্ভর করে থাকেন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ বাণিজ্যিক সফরগুলোর তিনি কয়টি লাইব্রেরীর বই অনুলিখন বা মুখস্ত করে এনেছিলেন? নবুওয়াতের ঘোষণার একদিন আগেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলাপ- আলোচনা ও কথাবার্তায় এ ধরনের তথ্যের কোন চিহ্ন পাওয়া না যাওয়ার যুক্তিসংগত কারণ কি ?

Dhaka University Institutional Repository

তিন. মক্কার কাফের সম্প্রদায়, ইহুদী ও খৃষ্টান সবাই অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাগুলো কোথা থেকে আনেন। আপনারা বলতে পারেন নবীর (সা) সমকালীনরা তাঁর এ চুরির কোন খবর পায়নি কেন? এর কারণ কি? তাদেরকে তো বারবারই এ মর্মে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছিল যে, এ কুর'আন আল্লাহ নাযিল করেছেন, অর্থ ছাড়া এর দ্বিতীয় কোন উৎস নেই, যদি তোমরা একে মানুষের বাণী বলো তাহলে মানুষ যে এমন বাণী তৈরী করতে পারে তা প্রমাণ করে দাও।

এ চ্যালেঞ্জটি নবীর (সা) সমকালীন ইসলামের শত্রুদের কোমর ভেংগে দিয়েছিল। তারা এমন একটি উৎসের প্রতিও অংগুলি নির্দেশ করতে পারেনি যা থেকে কুর'আনের বিষয়বস্তু গ্রহীত হয়েছে বলে কোন বিবেকবান ব্যক্তি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা সন্দেহও করতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, সমকালীনরা এ গোয়েন্দাবৃত্তিতে ব্যর্থ হলো কেন ? আর হাজার বারোশো বছর পরে আজ বিরোধী পক্ষ এতে সফল হচ্ছেন কেমন করে ?

চার. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হচ্ছে, একথার সম্ভাবনা তো অবশ্যি আছে যে, কুর'আন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং এ কিতাবটি বিগত ইতিহাসের এমনসব ঘটনার সঠিক খবর দিচ্ছে যা হাজার হাজার বছর ধরে শ্রুতির মাধ্যমে বিকৃত হয়ে অন্য লোকদের কাছে পৌঁছেছে এবং গল্পের রূপ নিয়েছে। কোন ন্যায় সংগত প্রমাণের ভিত্তিতে এ সম্ভাবনাটিকে একদম উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এবং কেন শুধুমাত্র এ একটি সম্ভাবনাকে আলোচনা ও গবেষণার ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে যে, লোকদের মধ্যে গল্প ও মৌখিক প্রবাদ আকারে যেসব কিসসা কাহিনী প্রচলিত ছিল কুর'আন সেগুলো থেকেই গৃহীত হয়েছে ? ধর্মীয় বিদ্বেষ ও হঠকারিতা ছাড়া এ প্রাধান্য দেবার অন্য কোন কারণ বর্ণনা করা যেতে পারে কি ?

এ প্রশ্নগুলো নিয়ে যে ব্যক্তিই একটু চিন্তা- ভাবনা করবে তারই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া ছাড়া আর কোন গন্তব্য থাকতে পারে না যে, প্রাচ্যবিদরা "তত্ত্বজ্ঞানের" নামে যা কিছু পেশ করেছেন কোন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী ও জ্ঞানানুশীলনকারীর কাছে তার কানাকড়িও মূল্য নেই।[৫৫]

---

৫৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৬৮০

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক অবস্থান

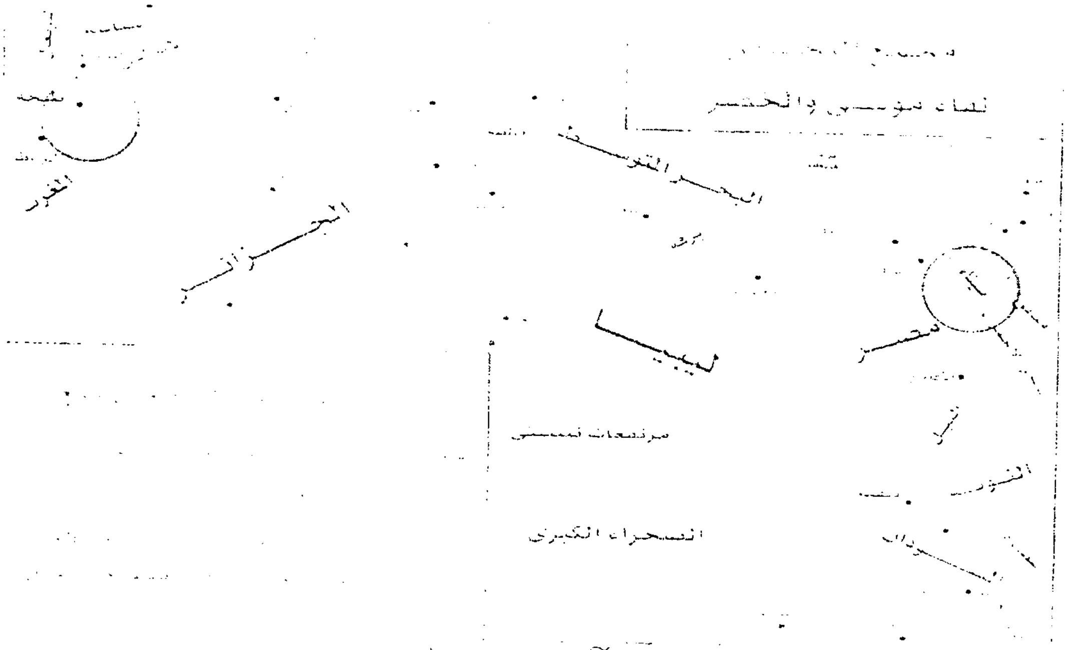

দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থান

যে স্থানে সূর্য অস্ত যায়

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين
إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا -

এমনকি যখন সে চলতে চলতে সূর্যের অস্তগমনস্থলে পৌছল, তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখল এবং সে তথায় এক জাতিকে দেখতে পেল। আমি বললাম- হে যুল-কারাইন! হয় শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর।[৫৬]

ইবনে কাসীরের মতে সূর্যাস্তের সীমানা বলতে বুঝাচ্ছে- তিনি পশ্চিম দিকে দেশের পর দেশ জয় করতে করতে স্থলভাগের শেষ সীমানায় পৌছে যান, এরপর ছিল সমুদ্র । এটিই হচ্ছে সর্যাস্তের সীমানার অর্থ । সূর্য যেখানে অস্ত যায় সেই জায়গায় কথা এখানে বলা হয়নি ।[৫৭]

---

৫৬. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ৮৬

৫৭. আল-কুর'আন, 18t86

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ সেখানে সূর্যাস্তের সময় মনে হতো যেন সূর্য সমুদ্রের কালো বর্ণের পংকিল পানির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে । মুলকারণাইন বলতে যদি সত্যিই খুরসকেই বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে এটি হবে এশিয়া মাইনরের পশ্চিমক সমুদ্রতট, যেখানে ঈজিয়ান সাগর বিভিন্ন ছোট ছোট উপসাগরের রূপ নিয়েছে । কুর'আন এখানে "বাহর" (সমুদ্র) শব্দের পরিবর্তে "আয়েন" শব্দ ব্যবহার করেছেন,যা সমুদ্রের পরিবর্তে হ্রদ বা উপসারগ অর্থে অধিক নির্ভুলতার সাথে বলা যেতে পারে একথাটি আমাদের উপরোক্ত অনুমানকে সঠিক প্রমাণ করে ।[৫৮]

যে স্থানে সূর্য উদিত হয়

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

حَتّٰى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا -

এমনকি যখন সে চলতে চলতে সূর্যোদয়স্থলে পৌছল, তখন সে সূর্যকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখল যাদের জন্য আমি সূর্যের সামনে কোন আবরণ রাখিনি ।[৫৯]

অর্থাৎ তিনি দেশ জয় করতে করতে পূর্ব দিকে এমন এলাকায় পৌছে গেলেন যেখানে সভ্য জগতের সীমানা শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সামনের দিকে এমন একটি অসভ্য জাতির এলাকা ছিল, যারা ইমরাত নির্মাণ তো দূরের কথা তাঁবু তৈরী করতে ও পারতো না ।[৬০]

---

৫৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৮১৮

৫৯. আল-কুর'আন, ১৮ঃ ৯০

৬০. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., পৃ. ৮১৯

Dhaka University Institutional Repository

রস্‌স বা পাথর বেষ্টিত কূপ

পবিত্র কুরআনে আসহাবে রস্‌স বা রস্‌স বাসী বলতে সামূদ জাতির একটি শাখা গোত্রকে বুঝানো হয়েছে, যাদের জন্য 'রস্‌স' নামক কূপটি নির্দিষ্ট ছিল। তারা তাদের নবীদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নবীদেরকে উক্ত কূপে নিক্ষেপ করেছিল। তারা রিয়াদের নিকটে ইয়ামামায় অবস্থান করত।[৬১]

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত অর্থসহ

وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا -

এভাবে আদ ও সামূদ এবং আসহাবুর রস্‌ ও মাঝখানের শতাব্দীগুলোর বহু লোককে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।[৬২]

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ -

তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কূপবাসী এবং সামুদ সম্প্রদায়।[৬৩]

পরিচিতি

আসহাবুর রস্‌ কারা ছিল, এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাদের কোন বর্ণনাই সন্তোষজনক নয়। বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে, তারা এমন এক সম্প্রদায় ছিল যারা তাদের নবীকে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে বা ঝুলিয়ে রেখে হত্যা করেছিল। আরবী ভাষায় "রাস্‌স" বলা হয় পুরাতন বা অন্ধ কূপকে।[৬৪]

নবীদের অস্বীকারকারী জাতিসমূহের সাথে কেবল মাত্র তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কোন বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। আরবের কিংবদন্তীতে আর রাস নামে দুটি স্থান সুপরিচিত। একটি নাজদে এবং দ্বিতীয়টি উত্তর হিজাযে। এর মধ্যে নাজদের আর রাস অধিক পরিচিত এবং জাহেলী যুগের কাব্য গাঁথায় এর উল্লেখই বেশী পাওয়া যায়। অসহাবুর রাস এ দুটি স্থানের কোনটির অধিবাসী ছিল তা এখন নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। কোন বর্ণনাতেই তাদের কাহিনীর নির্ভরযোগ্য বিশাদ বিবরণ পাওয়া যায় না। বড় জোর এতটুকু সঠিকভাবে বলা যেতে পারে যে, তারা ছিল এমন এক জাতি যারা তাদের নবীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। তবে তাদের বিষয়ে কুর'আন মজীদে শুধু ইংগিত দিয়েই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, কুর'আন নাযিলের সময় আরবরা ব্যাপকভাবে তাদের কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এসব বর্ণনা ও কাহিনী ইতিহাসে সংরক্ষিত হতে পারেনি।[৬৫]

---

৬১. ড. শাওকী আবু খলীল, *ইটলাসুল কুর'আন*, দারুল ফিকর আল-মা'আসির, লেবানন, বৈরূত : ১৪২৭/২০০৬, পৃ. ১২৫

৬২. আল-কুর'আন, ২৫ঃ ৩৮

৬৩. আল-কুর'আন, ৫০ঃ ১২

৬৪. ড. শাওকী আবু খলীল, *ইটলাসুল কুর'আন*, দারুল ফিকর আল-মা'আসির, লেবানন, বৈরূত : ১৪২৭/২০০৬, পৃ. ১২৫

৬৫. ড. শাওকী আবু খলীল, *ইটলাসুল কুর'আন*, দারুল ফিকর আল-মা'আসির, লেবানন, বৈরূত : ১৪২৭/২০০৬, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক অবস্থান

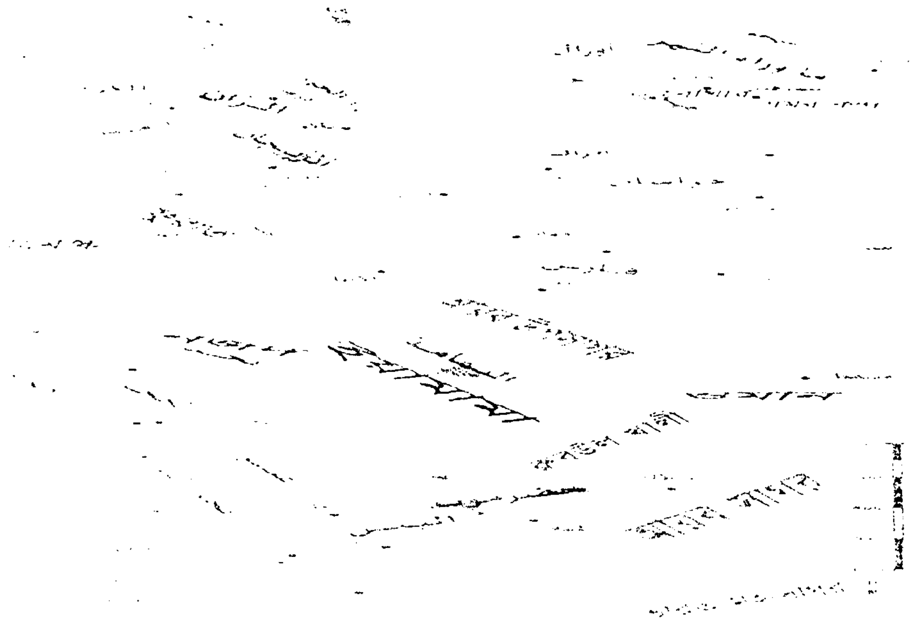

আসহাবুর রাস্‌স

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

আসহাবুর রাস্‌স

এদেরকে "আসহাবুর রাস্‌স" কেন বলা হয় ? তার উত্তরে তফসীরকার ওলামায়ে কেরামের মত এত বিভিন্ন যে, প্রকৃত অবস্থা উন্মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে আরও অধিক আবৃত হয়ে পড়েছে।

১। ইবনে জারীর বলেন-

واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود، الذين ذكروا في سورة البروج. فالله أعلم.

"রাস্‌স শব্দের অর্থ যেহেতু 'গর্ত'ও সুতরাং "আসহাবে উখদুদ' (গর্তওয়ালাগণ)- কেই আসহাবুর রাস্‌সও বলা হয়।" কিন্তু এই মতটি এজন্য সঠিক নয় যে, সূরা-ক্বাফের মধ্যে আছ্‌হাবুর রাস্‌সের উল্লেখ ঐ সকল কাওমের সাথে করা হয়েছে, যারা হযরত ঈসা (আ)- এর পূর্বে অতীত হয়ে গিয়েছে। আর সূরা ফোরক্বানে আদ, সামূদ ও আসহাবুর রাস্‌সের উল্লেখ করার পরে বলা হয়েছে- وقرونا بين ذلك كثيرا। "আর তাহাদের মধ্যবর্তীকালের বহু কাওমকে আমি হালাক করিয়া দিয়াছি।" (সূরা ফোরক্বান- ২৫: ৩৮) একথা এটাই তাকাদা করে যে, আসহাবুর রাস্‌সের যমানা অন্তত হযরত ঈসা (আ)- এর যমানার পূর্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর আসহাবে উখদূদের যমানা হযরত ঈসা (আ)- এর অনেক পরে।

এতদ্ব্যতীত কুর'আন মাজীদের এসমস্ত বর্ণনায় পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, আসহাবুর রাস্‌স বিধ্বস্ত কাওমগুলির মধ্যে অন্যতম। আর আসহাবে উখদূদ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ মত এই যে, তাদিগকে তাদের সেই বিশ্বনিন্দিত যুলুমের পরে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে দেয়া হয় নাই; বরং তাদেরকে অবকাশ প্রদান করা হয়েছিল, যেন তারা যুলুম হতে বিরত হয়। অন্যথায় কর্মের প্রতিফল ভোগ করার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে যেমন, ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হতে অনতিপরেই জানা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। ইবনে আসাকের ইতিহাসে নিজের মনের ঝোঁক এই রেওয়ায়েতের প্রতি প্রকাশ করেছেন যে, "আসহাবুর রাস্‌স" কাওমে আদ হতেও বাহু শতাব্দী পূর্বেকার একটি কাওমের নাম. তারা যে স্থানে বসবাস করত, তথায় আল্লাহ্ তা'আলা হান্‌যালা ইবনে ছাফওয়ান নামক একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন, তিনি তাদের মধ্যে থেকে ইসলাম প্রচার করেন। কিন্তু আসহাবুর রাস্‌স কোনক্রমেই সত্যকে গ্রহণ করল না এবং আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বরকে হত্যা করে ফেলল। তারই প্রতিফলে তাদের সকলকে ধ্বংস করে দেয়া হল। কিন্তু এই রেওয়ায়েতটি দ্বারা একথা পরিস্কার হয় না যে, তাদেরকে 'কূপওয়ালা' কেন বলা হত, আর কূপের সাথে কাওমের এই সম্পর্ক স্থাপন মূল ঘটনার সাথে কি সম্পর্ক রাখে ?

৩। ইবনে আবী হাতেম আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়েত নকল করেছেন যে, আযারবাইজানের নিকটে একটি কূপ ছিল; এ ঘটনাটি যেহেতু সেই কূপের সথে সম্পর্ক রাখে, সুতরাং তথাকার অধিবাসীদেরকে "আসহাবুর রাস্‌স" বলা হয়। ইকরামা (রা) বলেন, এ কূপের নিকটে বসবাসকারী কাওম তাদের নবীকে যেহেতু উপরোক্ত কূপে নিক্ষেপ করে সেই কূপেই জীবন্ত দাফন করেছিল, সুতরাং তাদেরকে 'আসহাবুর রাস্‌স' বলা হয়েছে।[৬৬]

৪। ক্বাতাদাহ্ (র) বলেন, ইয়ামামা অঞ্চলে 'ফলজ" নামক একটি বস্তী ছিল। আসহাবুর রাস্‌স সেই স্থানেই বসবাস করত, তারা এবং 'আসহাবে ইয়াসীন' (আসহাবুল ক্বারইয়াহ্) একই সম্প্রদায়, বিভিন্ন নামে ডাকা হয়।[৬৭]

এই উক্তির পোষকতায় একটি রেওয়ায়েত ইকরামা হতেও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং মনে হয়, ইবনে আবী হাতেম ও ইকরামা উভয়ের রেওয়ায়েতের একই অর্থ; কিন্তু এই দু'টি অভিমতেও সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা, কুর'আন মাজীদ আসহাবুল ক্বারইয়াহ্ (আসহাবে ইয়াসীন) এবং আসহাবুর রাস্‌সের আলোচনা পৃথকপৃথক ভাবে করেছে। উভয় আলোচনার কোন এক স্থানেও এরূপ ইঙ্গিত করা হয় নাই যে, এই উভয় সম্প্রদায় একই সম্প্রদায়। অথচ এই বর্ণনাপদ্ধতি বালাগাত শাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ যে, একই ব্যাপারকে পৃথক পৃথক সম্পর্ক ও অবস্থার সথে বর্ণনা করা হয় অথচ এগুলোর কোন একটিতেও এরূপ ইঙ্গিত বিদ্যমান না থাকে যে, এই বিভিন্ন সম্পর্ক এবং অভিমত প্রকাশ একই ব্যাপারের সথে সংশ্লিষ্ট এবং হযরত নবী করীম (স) হতেও এমন কোন তফসীর উল্লেখ নেই, যা উভয়কে একই বলে প্রকাশ করে। বিশষত যখন একাধিক লক্ষণ বলছে যে, আসহাবুর রাস্‌সের ঘটনার ব্যাপারটি ঈসা মাসীহ্ (আ)- এর পূর্বকার ঘটনা; ইতিহাস ও অনুসন্ধান তাই প্রমাণ করছে যে, আসহাবুল ক্বারইয়ার ঘটনা ঈসা (আ)- এর বহু পরের ঘটনা।

৫। আবুবকর, ওমর ইবনে হাসান, নাক্কাশ এবং সুহাইলী বলেন- আসহাবুর রাস্‌স- এর জনপদে একটি বিরাট কূপ ছিল, যার পানি তারা পান করত এবং কৃষিক্ষেত্রে সিঞ্চন করত; এই জনপদের বাদশা্ অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; জনগণ তাঁকে অতিশয় ভালবাসত; তাঁর মৃত্যু হলে শহরবাসীরা তাঁর বিচ্ছেদে অত্যন্ত শোকাতুর ও চিন্তবিম্বত হয়ে পড়েছিল; এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শয়তান সেই ন্যায়বিচারক বাদশাহর আকৃতি করল যে, আমি কিছুদিনের জন্য তোমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম, মরেছিলাম না। এখন আবার এসেছে, এখন সর্বদার তরে জীবিত থাকব। লোকেরা চরম মহব্বতের কারণে বিশ্বাস করল, তারা তাঁর আগমন উপলক্ষে উৎসব উদ্‌যাপন করল।

---

৬৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ সূরা ফোরক্বান ও তারীখে ইবনে কাসীর ঃ ১ম জিল্‌দ
৬৭. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ সূরা ফোরক্বান এবং তারীখে ইবনে কাসীর ঃ ১ম জিল্‌দ।

Dhaka University Institutional Repository

তখন শয়তান তাদেরকে আদেশ করলঃ তারা যেন সর্বদা তার সাথে পর্দার আড়ালে থেকে কথাবর্তা বলে। ফলত তার আদেশ প্রতিপালিত হল এবং সে পর্দার অন্তরালে বসে গোমরাহী বিস্তার করতে লাগল। ঠিক সেই সময় (রাওযুল আন্‌ফ- এর রচয়িতা সুহাইলীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী,) হানযালা ইবনে ছাফওয়ান নামক এক ব্যক্তিকে স্বপ্নযোগে বলা হল যে, "তুমি এই জনপদের লোকদেরকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শনের জন্য পয়গম্বর নিযুক্ত হয়েছ।

অতঃপর ছাফওয়ানের পুত্র হানযালা সেই বস্তীবাসীদের নিকট গমন করে তাদেরকে তাওহীদ এখতিয়ার এবং শিরক হতে দূরে থাকার তা'লীম দিলেন এবং বললেন, এই ব্যক্তি তোমাদের বাদশাহ্ নহে; বরং পর্দার আড়ালে তারা সত্যকে কবূল করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলার নবীর উপর হামলা করে তাঁকে শহীদ করে ফেলল। এই গর্হিত কর্মের প্রতিফলে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব তাদেরকে ধ্বংস করে দিল। কাল যে বস্তীতে আনন্দোৎসব চলেছিল, বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহ দ্বারা "জঙ্গলে মঙ্গল" বিদ্যমান ছিল; আজ তা জ্বলে পুড়ে সমতল ময়দানরূপে দৃষ্ট হতে লাগল। তাতে কুকুর, নেকড়ে ও বাঘের বসবাস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রয় নি। এই রেওয়ায়েতটি রেওয়ায়েত ও দেরায়েতের নীতি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। মনগড়া কাহিনীর অধিক মর্যাদার অধিকারী নয়। (তফসীরে ইবনে কাসীরঃ সূরা ফোরক্বানঃ আল বেদায়াহ্ ওয়ান্নেহায়াহ্ঃ ১ম জিল্‌দ।)

৬।

قال محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب [القرظي] (8) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود، وذلك أن الله -تعالى وتبارك -بعث نبيا (9) إلى أهل قرية، فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود، ثم إن أهل القرية عدوا على النبي، فحفروا له بئرا فألقوه فيها، ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم (10) قال: "فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره، ثم يأتي بحطبه فيبيعه، ويشتري به طعاما وشرابا، ثم يأتي به إلى تلك البئر، فيرفع تلك الصخرة، ويعينه الله عليها، فيدلي إليه طعامه وشرابه، ثم يردها كما كانت". قال: "فكان ذلك ما شاء الله أن يكون. ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع، فجمع حطبه وحزم وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة، فاضطجع فنام، فضرب الله على أذنه سبع سنين نائما، ثم إنه هبّ فتمطى، فتحول لشقه الآخر فاضطجع، فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى، ثم إنه هب واحتمل حُزْمته ولا يحسبُ إلا أنه نام ساعة من نهار (11) فجاء إلى القرية فباع حزمته، ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع. ثم ذهب (12) إلى الحفيرة في موضعها الذي كانت فيه، فالتمسه فلم يجده. وكان قد بدا لقومه فيه بَداء، فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه". قال: فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود: ما فعل؟ فيقولون له: لا ندري. حتى قبض الله النبي، وأهبَّ الأسود من نومته بعد ذلك". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة".

মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুরাযী হতে বর্ণিত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন- "সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে, সে একজন কৃষ্ণকায় গোলাম হইবে।" আর এর কারণ, আল্লাহ তা'আলার কোন এক বস্তীতে স্বীয় পয়গম্বর প্রেরণ করলেন, কিন্তু সেই কৃষ্ণকায় গোলাম ব্যতীত কেউই তাঁর হেদায়েত কবূল করল না এবং কেউই ঈমান আনল না। শহরবাসীরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত রইল না; বরং উক্ত নবী (আঃ) কে একটি কূপের মধ্যে আবদ্ধ করে তার মুখের উপর একটি ভারি পাথর চাপা দিয়ে রাখল, যেন কেউ খুলতে না পারে।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এই কৃষ্ণকায় গোলামটি জঙ্গল হতে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রয় করত এবং বিক্রয় লব্ধ পয়সা দ্বারা খাদ্য ক্রয় করে প্রত্যহ কূপের নিকট এসে প্রস্তরখন্ডটিকে সরিয়ে ফেলত এবং পয়গম্বর (আ)- এর খেদমতে খাদ্যদ্রব্য পেশ করত। কিন্তু দিন পরে একদিন আল্লাহ্ তা'আলা সেই কৃষ্ণকায় গোলামের উপর কাষ্ঠ সংগ্রহরত অবস্থায় নিদ্রা প্রবল করে দিলেন এবং নিদ্রিত অবস্থায় তার উপর চৌদ্দটি বৎসর অতীত হয়ে গেল। এখানে তো এরূপ হল, অপর দিকে কাওমের লোকেরা নিজেদের অশোভনীয় কার্যের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নবীকে কুক থেকে বের করে আনল এবং তওবা করে তাঁর উপর ঈমান আনল। এই গোলামটি সম্বন্ধেই হুযূরে আকরাম (স) বলেছিলেন যে, বেহেশতে সর্বপ্রথম এক কৃষ্ণকায় গোলাম প্রবেশ করবে।[৬৮]

এই রেওয়ায়েতটি সনদের দিক দিয়েও সমালোচনার সম্মুখীন এবং যৌক্তিকতার হিসাবেও; যেমন মুহাদ্দেসীনে কেরাম বলেন, এই দীর্ঘ কাহিনীটি স্বয়ং মুহাম্মদ ইবনে কা'আবেরই তরফ হতে বটে, যা তিনি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হতে গ্রহণপূর্বক বর্ণনা করেছেন; হযরত নবী করীম (স)- এর সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই[৬৯]

এতদ্ভিন্ন কুর'আন মাজীদে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রয়েছে যে, আসহাবুর রাস্সও ধ্বংসকৃত কাওমগুলির অন্ত র্ভূক্ত। আর এই রেওয়ায়েতটি এর বিপরীত এই কাওমটিকে আযাব হতে মুক্তিপ্রাপ্ত বলছে; সুতরাং তা সম্পূর্ণ ভুল। আর কৃষ্ঠকায় গোলাম সম্বন্ধে যেই বাক্যটি বলা হয়েছে তা যদি বিশুদ্ধ সনদের দ্বারা নবী আকরাম (স)- এর বাণী বলে সাব্যস্তও হয়, তবুও আসহাবে রাস্সের ঘটনার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। ইবনে জারীরও এই রেওয়ায়েতটি নকল করে তার উপর এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

৭। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মাসউদী বলেন, আসহাবুর রাস্স হযরত ইসমাঈল (আ)- এর বংশে একটি সম্প্রদায়, তাদের দুইটি গোত্র ছিল। ক্বীদমাঁ (ক্বীদমাহ্) এবং ইয়ামীন বা রা'বীল, তারা ইয়ামানে বসবাস করত। কিন্তু মাসউদী শুধু এতটুকু পরিচয় প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়েছেন; ঐতিহাসিক বিবরণ কিছুই বলেন নাই যে, তারা কি কি কারণে 'ক্বীদমাহ্' এবং 'রা'বীল'কে আসহাবুর রাস্স বলে এবং রাস্সের সাথে তাদের কি সম্পর্ক। একথা ঠিক যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বার পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ক্বীদ্আহ্ও ছিল। কিন্তু তাওরাত এবং তারীখ উভয়েই এ বিষয়ে নীরব যে, তাঁর আওলাদকে আসহাবুর রাস্সও বলা হয়। সুতরাং মাসউদীর এই অভিমত প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু কুর'আন ওয়ালা শুধু মাসউদীর এই অভিমতকে প্রবল বলেছেন যে, মাসউদী নিজের অভিমত দ্বিধাদ্বন্দের সাথে বর্ণনা করেন নাই।

৮। মিশরের একজন বিখ্যাত সমসাময়িক আলেম ফারজুল্লাহ্ যাকী কুর্দী বলেন, 'রাস্স' শব্দটি 'আরাস্স' শব্দের সহজকৃত রূপ এবং আরাস্স সেই বিখ্যাত শহরের নাম, যাহা ক্বাফক্বায অঞ্চলে অবস্থিত। এই 'আরাস্স' নামক উপত্যকাঞ্চলে আল্লাহ্ তা'আলা একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন, যার নাম ছিল ইবরাহীম যারদাশ্ত। তিনি স্বীয় কাওমকে সত্য ধর্মের দা'ওয়াত প্রদান করলেন, কিন্তু কাওম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল এবং সত্য ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল; তাঁর দা'ওয়াত ও নছীহতের মোকাবিলায় আরও অধিক অবাধ্যতাচরণ ও নাফরমানী এবং বিরোধিতা করতে লাগল; ফলত কাওম তার শাস্তিপ্রাপ্ত হল এবং ধ্বংস করে দেয়া হল। অতঃপর তাঁর ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র সেই নির্দিষ্ট অঞ্চল ক্বাফক্বায (আযারবাইজান প্রভৃতি) হইতে সমগ্র ইরানে ছড়িয়ে পড়ল।

---

৬৮. মুরুজুজ্জাহাব, পৃ. ৮৬, হাশিয়া আল্ কামেলঃ ১ম জিল্দ

৬৯. আরদুল কুনআনঃ ২য় জিল্দ ঃ পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

যারদাশ্‌তের 'আসমানী ছহীফা' যদিও বিকৃত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার একটি অংশ আজও পুরাতন ফার্সী ভাষায় লিখিত বিদ্যামান রয়েছে, ('আবিস্তা'র দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে)। সেই ছহীফায় আজও নবী করীম (স)- এর নুবুওত এবং ইসলাম ধর্মের সুসংবাদ পাওয়া যায়। যার ভাবার্থ এইঃ "অচিরেই আরবদেশে একজন মহানবী প্রেরিত হবেন, যখন তাঁর শরীআতের উপর এক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হবে, তখন সেই ধর্মে এমন বিষয়সমূহের উৎপত্তি হবে, যার ফলে তা চিনে নেয়া কঠিন হবে যে, এই ধর্মই সেই ধর্ম যা নিজ প্রাথমিক যুগে ছিল।" (অর্থাৎ, বিদ্'আত, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং গর্হিত রসম রেওয়াজের আবির্ভাব হবে।)

এটা হতে পরস্কার বুঝা যায় যে, যারদাশ্‌তের ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ছিল 'তা'লীমে হক্', এবং এ কারণেই তিনি মুহাম্মদ (স)- এর নুবুওতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন; আর এমন কতিপয় বিস্তারিত বিবরণও প্রদান করেছিলেন, যা আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে এবং সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য ধর্মগুলির ন্যায় তাঁর অনুসারীগণও সেই 'তালীমে হক'কে বিকৃত এবং পরিবর্তিত করে দিয়েছে। তাঁর অনুসারী 'মাজূস' (পারসিক) আজও ইরানে এবং হিন্দুস্তানে দেখতে পাওয়া যায়।[৭০]

আল্লামা যাকী-র এই অভিমতের পোষকতা এটা দ্বারাও হচ্ছে যে, তাফসীরের কিতাবসমূহে একটি বাণী ইবনে আব্বাস (রা) হতে তাও নকল করা হয়েছে যে, 'আসহাবুর রাস্‌স' আযারবাইজানের নিকটবর্তী একটি কূপের প্রতি সম্পর্কিত বলে খ্যাত ছিল। সুতরাং সম্ভবত ইহা 'নহরে আরাস্‌স'- এর সাথে সম্পর্কিত হওয়াই উদ্দেশ্য হতে পারে। আর ইবনে কাসীরে আছে-

حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم [النبيل] ، حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم، حدثنا شبيب بن بشر ، حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله: { وَأَصْحَابَ الرَّسِّ } قال: بئر بأذربيجان.

"কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আযারবাইজানে 'রাস্‌স' নামে একটি পুরাতন কূপ ছিল, সেই উপত্যকার বাসিন্দাগণকে এই কারণেই আসহাবুর রাস্‌স বলা হত।"[৭১]

---

৭০. হাশিয়া তারীখে ইবনে কাসীরঃ ২য় জিদঃ পৃষ্ঠা ৪২-৪৩

৭১. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৩খ, পৃ. ২৬০, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

হুদায়বিয়া

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত অর্থসহ

إنا فتحنا لك فتحا مبينا -

হে নবী, আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।[৭২]

পরিচিতি

হুদায়বিয়ার ঘটনা

'হুদায়বিয়াহ্' নামক স্থানটি মক্কা শরীফ হতে জিদ্দার পথে এক মঞ্জির দূরত্বে অবস্থিত। উহা অধুনা 'শুমাইসিয়াহ্' নামে বিখ্যাত। 'হুদায়বিয়াহ্' আসলে একটি কূপের নাম। ইহা সেই স্থান যার সহিত 'ফাত্হে মুবীন' 'বাই'আতে রিয্ওয়ান'-এর ইতিহাস সংশ্লিষ্ট।

হিজরী ৬ সনের যিল্কাআদাহ্ মাস মুতাবেক ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের সোমবার সেই সৌভাগ্যময় সময়টুকু ছিল, যখন হুযুরে আকরাম (স) চৌদ্দশত সাহাবায়ে কেরাম (রা) সঙ্গে নিয়ে ওমরাব্রত পালনের উদ্দেশ্যে 'মক্কা মুআয্যমাহ্' যাত্রা করিলেন। 'যুল্ হুলাইফা' নামক স্থানে পৌঁছিলে কোরবানীর জন্তুসমূহের গলায় 'দোয়াল' পরাইলেন এবং ওমরার ইহ্রাম বাঁধলেন। বনু খুযা'আহ্র এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করে পাঠালেন, যেন তিনি কোরাইশদের অবস্থাবলীর সন্ধান নিয়ে সংবাদ প্রদান করেন।

হুযূরে আকরাম (স) 'গাদীরে আশ্তাত' নামক স্থানে পৌঁছিলে, গুপ্তচর ফিরে এসে সংবাদ প্রদান করল যে, কোরাইশগণ আপনার আগমনের সংবাদ জানতে পেরেছে এবং তারা সমস্ত মুশরিক আরব গোত্রগুলিকে একত্রিত করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে মশ্গুল রয়েছে। আপনাকে মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করতে না দেয়াই তাদের ইচ্ছা।

নবী আকরাম (স) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। ছিদ্দীকে আকবর হযরত আবুবকর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো বাইতুল্লাহ্র যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই বের হয়েছি। যুদ্ধ বা মারামারি কাটাকাটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অতএব, আমরা বাইতুল্লাহ্র যেয়ারত কেই একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে অবশ্যই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকব। অতঃপর যেই দলই অযথা আমাদের যাত্রাপথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, বাধ্য হয়ে তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। পরামর্শের পর হুযুরে পাক (স) করলেন- "এখন আল্লাহ তা'আলার নাম লইয়া যাত্রা কর"।

বাইতুল্লার যিয়ারতকামীগণ আল্লাহ্ তা'আলার ইশ্কে মত্ত এবং বাইতুল্লাহ্র যিয়ারাতের আনন্দে আত্মহারা হয়ে মক্কা শরীফের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, খালেদ ইবনে ওলীদ এক সেনাবাহিনী সহ 'আতীম' নামক স্থানে ওৎ পাতিয়া তোমাদের অপেক্ষা করছে। সুতরাং আমাদের উচিত, ওদিক হতে ঘুরে ডান দিকে চলতে থাকি, এবং অকস্মাৎ তার অজ্ঞাতসারে তার সম্মুখে পৌঁছে যাই। তাই করা হল এবং মুসলমানগণ যখন অকস্মাৎ খালেদ ইব্নে ওলীদের সেনাবাহিনীর সম্মুখে এসে পড়লেন, তখন নিজের চাতুরী বিফল হতে দেখে খালেদ ইব্নে ওলীদ ঘাবড়ে গেলেন। এবং তিনি নিজ সেনাবাহিনী সহ দ্রুত গতিতে মক্কার মুশরিকদের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন, এবং তাদেরকে মুসলমানদের আগমনের সংবাদ জানালেন।

---

৭২. আল-কুর'আন, ৪৮: ১

Dhaka University Institutional Repository

নবী আকরাম (স) যখন সেই টিলার উপর পৌছলেন, যার পরে উপত্যকায় নেমে মক্কায় যেতে হত, তখন অকস্মাৎ তাঁর উষ্ট্রী 'ক্বাছওয়া' বসে পড়ল। সাহাবায়ে কেরাম তা দেখে উষ্ট্রীটিকে খোঁচা মারলেন, উত্তেজিত করলেন এবং সর্ব প্রকারের চেষ্টা করলেন, যাতে উষ্ট্রী সোজা হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু উষ্ট্রী উঠল না। সাহাবায়ে কেরাম যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন বলতে লাগলেন। কাছ্ওয়া অবাধ্য হয়ে গিয়েছে।

নবী আকরাম (স) ইহা শুনে বললেন- "কাছ্ওয়া কখনও অবাধ্য হয় নাই এবং এটা তার অভ্যাসও নয়; বরং সেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে থামিয়ে দিয়েছেন, যিনি হাতীওয়ালাদিগকে থামিয়ে দিয়েছিলেন", অর্থাৎ, মক্কার কোরাইশদের অন্যায় আচরণ এবং যুদ্ধের মনোভাবের দরুন যেহেতু যুদ্ধের অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা এই যে, আমরা বাইতুল্লাহ্ শরীফের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকারাবদ্ধ না হয়ে যেন সম্মুখের দিকে অগ্রসর না হই।
হুযুর (স) এরূপ বলার পর বললেন-

"সেই আল্লাহ্ তা'আলার কসম যাঁর কবলে আমার প্রাণ, তিনি আমার নিকট এমন যে কোন বিষয়ই চাইবেন, যাতে, 'হুরুমাতুল্লাহ্'- এর মান-মর্যাদা রক্ষা তাঁর লক্ষ্য হবে, তবে আমি অবশ্যই উহা পূর্ণ করব।"

হুযুরে পাক (স) যখন এই ঘোষণা করে দিলেন, তখন 'কাছ্ওয়া'কে দাঁড়াবার জন্য ইঙ্গিত করা মাত্র 'কাছ্ওয়া' তৎক্ষনাৎ দাঁড়িয়ে গেল এবং চলতে আরম্ভ করে হুদায়বিয়ার ময়দানে পৌছল।

বাইতুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারতকামীদের পবিত্র কাফেলা যখন হুদায়বিয়ার ময়দানে অবতরণ করলেন, তখন পরামর্শের পর তা স্থির হল যে, হযরত ওসমান (রা) মক্কায় প্রেরণ করা হোক, যেন তিনি মক্কায় পৌছে মুশরিকদিগকে তা জানিয়ে দেন যে, "আমাদের উদ্দেশ্য বাইতুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারত ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আমাদিগকে এতে বাধা প্রদান করা তোমাদের উচিত নয়।

হযরত ওসমান (রা) মক্কায় প্রবেশ করে আবু সুফিয়ান প্রভৃতি কোরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। তারা তার কোন কথায়ই কর্ণপাত করল না এবং বলতে লাগল, "তোমার ইচ্ছা হলে একাকী বাইতুল্লাহ্র তওয়াফ করে লও, অন্যথায় আমরা মোহাম্মদ (স) এবং তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদিগকে কখনই মক্কায় প্রবেশ করতে দিব না।

হযরত ওসমান (রা.) বললেন, "তা তো আমি কখনোই করতে পারব না যে, রাসুলুল্লাহ্ (স) কে ছাড়া আমি একাকী তওয়াফ ও ওমরা আদায় করে লই।" কোরাইশরা হযরত ওসমান (র) এই 'জিদ্' দেখে তাঁকে ফিরে যেতে দিল না এবং আটক করে ফেলল।[৭৩]

---

৭৩. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৫খ, পৃ. ২৪৭, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক অবস্থান

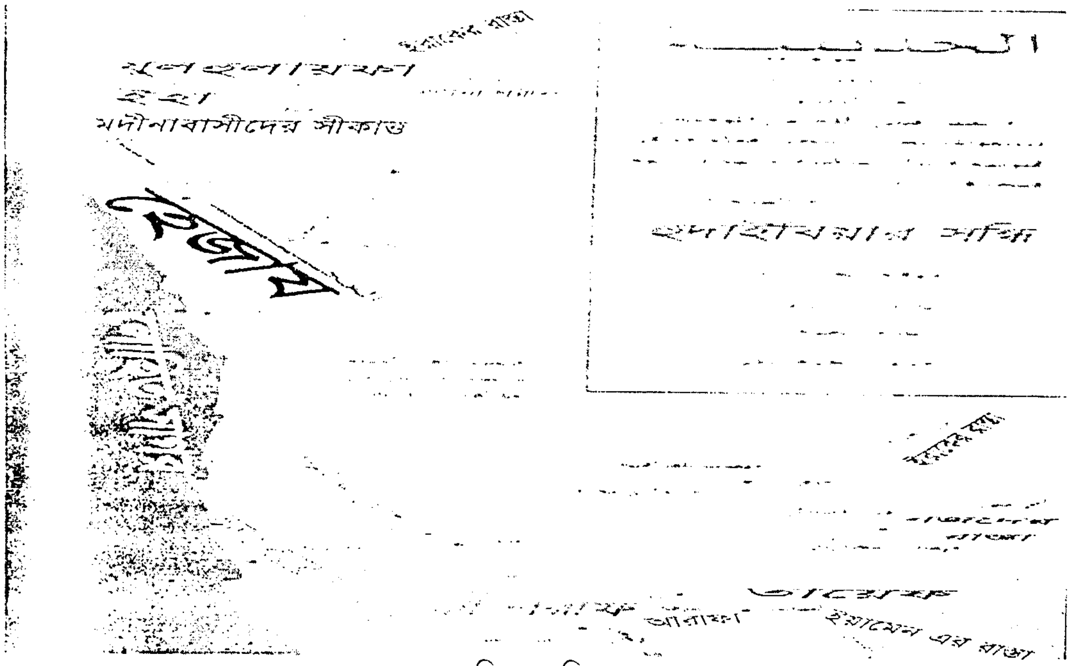

হুদায়বিয়ার সন্ধির স্থান

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে বিজয়ের এ সুসংবাদ শুনানো হলে লোকজন বিস্মিত হলো এই ভেবে যে, এ সন্ধিকে বিজয় বলা যায় কি করে? ঈমানের ভিত্তিতে আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়া ভিন্ন কথা। কিন্তু তাকে বিজয় বলাটা করোরই বোধগম্য হচ্ছিলো না। এ আয়াতটি শুনে হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রসূল (স), এটা কি বিজয়? নবী (স) বললেন- হ্যাঁ। (ইবনে জারীর)

অন্য একজন সাহাবীও নবীর (স) কাছে এসে একই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন- সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের (স) প্রাণ, এটা অবশ্যই বিজয়। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ)

মদীনায় ফেরার পর আরো এক ব্যক্তি তার সংগীকে বললো, "এটা কেমন বিজয়? বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে আমাদের বাধা দেয়া হয়েছে, আমাদের কুরবানীর উটগুলোও আর সামনে অগ্রসর হতে পারেনি, রসূলুল্লাহ (স) কে হুদাইবিয়াতেই থামতে হয়েছে এবং এ সন্ধির ফলেই আমাদের দু'মজলুম ভাই আবু জানদাল ও আবু বাসীরকে জালেমদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। "একথাটি নবী (স) এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন- এটা অত্যন্ত ভুল কথা।

প্রকৃতপক্ষে এটা বিরাট বিজয়। তোমরা একেবারে মুশরিকদের বাড়ীর দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছিলে এবং তারা আগামী বছর উমরা করতে দেয়ার প্রস্তাব দিয়ে তোমাদের ফিরে যেতে সম্মত করেছিল। যুদ্ধ বন্ধ করা এবং সন্ধি করার জন্য তারা নিজেরাই ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের মনে তোমাদের প্রতি যে শত্রুতা রয়েছে তা অজানা নয়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করেছেন। সেদিনের কথা কি ভুলে গেলে উহুদে যেদিন তোমরা ছুটে পালাচ্ছিলে আর আমি পশ্চাত দিক থেকে চিৎকার করে তোমাদের ডাকছিলাম? সেদিনের কথা কি ভুলে গেলে যেদিন আহযাবের যুদ্ধে শত্রুরা সব দিক থেকে চড়াও হয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

এবং তোমাদের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল? (বায়হাকীতে উরওয়া ইবনে যুবায়ের বর্ণনা) কিন্তু এ সন্ধি যে প্রকৃতই বিজয় তা কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রকাশ পেতে থাকলো এবং সব শ্রেণীর মানুষের কাছে একথা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রকৃতপক্ষে হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকেই ইসলামের বিজয়ের সূচনা হয়েছিলো ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এবং হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) এ তিন সাহাবী থেকে প্রায় একই অর্থে একটি কথা বর্ণিত হয়েছে যে, লোকেরা মক্কা বিজয়েকেই প্রকৃত বিজয় বলে থাকে। কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই প্রকৃত বিজয় মনে করি ।
(বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর) ।

হুদাইবিয়া নামক স্থানে সাহাবায়ে কিরামের কাছে যে বাইয়াত নেয়া হয়েছিল এখানে পুনরায় তার উল্লেখ করা হচ্ছে । এ বাইয়াতকে "বাইয়াতে রিদওয়ান" বলা হয়ে থাকে । কারণ, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দান করেছেন যে, যারা এ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে জীবন বাজি রাখতে সমান্য দ্বিধাও করেনি এবং রসূলের হাত হাত দিয়ে জীবনপাত করার বাইয়াত করে ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। সময়টি ছিল এমন যে, মুসলমানগণ শুধুমাত্র একখানা করে তরবারি নিয়ে এসেছিলেন এবং সংখ্যায় ছিলেন মাত্র চৌদ্দ শ'। তাদের পরিধানেও সামরিক পোশাক ছিল না বরং ইহরামের চাদর বাধা ছিল।

নিজেদের সামরিক কেন্দ্র (মদীনা) থেকে আড়াই শ' মাইল এবং শত্রুদের দূর্গ থেকে মাত্র ১৩ মাইল দূরে ছিল যেখান থেকে শত্রুরা সব রকমের সাহায্য লাভ করতে পারতো । আল্লাহ ও তাঁর সূর এবং তাঁর দীনের প্রতি এ মানুষগুলোর মনে যদি আন্তরিকতার সামান্য ঘাটতিও থাকতো তাহলে তারা এ চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ (স) কে পরিত্যাগ করে চলে যেতো এবং ইসলাম বাতিলের সাথে লড়াইয়ে চিরদিনের জন্য হেরে যেতো। আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা ছাড়া বাইরের এমন কোন চাপ তাদের ওপর ছিল না যা তাদেরকে এ বাইয়াত গ্রহণে বাধ্য করতে পারতো। আল্লাহর দীনের জন্য সবকিছু করতে সে মুহূর্তেই তাদের প্রস্তুত হয়ে যাওয়া স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, তাঁরা তাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী ও আন্তরিক এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে পূর্ণতার স্তরে উন্নীত ।

এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ দান করেছেন । আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার পর কেউ যদি তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি হয় কিংবা তাদেরকে তিরস্কার করার সাহস করে তাহলে তাদের বুঝাপড়া তাদের সাথে নয়, আল্লাহর সাথে । এ ক্ষেত্রে যারা বলে, যে সময় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ দান করেছিলেন তখন তাঁরা আন্তরিক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য হারিয়ে ফেলেছেন, তারা সম্ভবত আল্লাহ সম্পর্কে এ কুধারণা পোষণ করে যে, এ আয়াত নাযিল করার সময় তিনি তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতেন না । তাই শুধু এ সে সময়কার অবস্থা দেখে তিনি তাদেরকে এ সনদ পত্র দিয়ে ফেলেছেন । আর সম্ভবত এ না জানার কারণেই তাঁর পবিত্র কিতাবেও তা অন্তরভুক্ত করেছেন যাতে পরে যখন এরা অবিশ্বাসী হয়ে যাবে তখনো দুনিয়ার মানুষ তাদের সম্পর্কে এ আয়াত পড়তে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার 'গায়েবী ইলম' সম্পর্কে বাহবা দিতে থাকে যিনি (নাউযুবিল্লাহ) ঐ অবিশ্বাসীদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদপত্র দান করেছিলেন ।

Dhaka University Institutional Repository

যে গাছের নীচে এ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সেটি সম্পর্কে হযরত ইবনে উমরের আযাতকৃত ক্রীতদাস নাফের এ বর্ণনাটি সাধারণভাবে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে যে, লোকজন সেখানে গিয়ে নামায পড়তে শুরু করেছিলো। বিষয়টি জানতে পেরে হযরত উমর (রা) লোকদের তিরস্কার করেন এবং গাছটি কাটিয়ে ফেলেন।[৭৪]

কিন্তু এর বিপরীতমুখী কয়েকটি বর্ণনাও রয়েছে। হযরত নাফে, থেকেই তাবকাতে ইবনে সা'দে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, বাইয়াতে রিদওয়ানের কয়েক বছর পর সাহাবায়ে কিরাম ঐ গাছটি তালাশ করেছিলেন কিন্তু চিনতে পারেননি এবং সে গাছটি কোনটি সে ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়। দ্বিতীয় বর্ণনাটি বুখারী, মুসলিম ও তবকাতে ইবনে সা'দে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের। তিনি বলেন- আমার পিতা বাইয়াতে রিদওয়ান শরীক ছিলেন।

তিনি আমাকে বলেছেন পরের বছর আমরা যখন উমরাতুল কাযার জন্য গিয়েছিলাম তখন গাছটি হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনুসন্ধান করেও তার কোন হদিস করতে পারিনি। তৃতীয় বর্ণনাটি ইবনে জারীরের। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফত কালে যখন হুদাইবিয়া অতিক্রম করেন তখন জিজ্ঞেস করেন, যে গাছটি নিজে বাইয়াত হয়েছিলো তা কোথায়? কেউ বলে, অমুক গাছটি এবং কেউ বলেন অমুকটি। তখন হযরত উমর (রা) বলেন, এ কষ্ট বাদ দাও, এর কোন প্রয়োজন নেই।[৭৫]

হুদাইবিয়া সন্ধির পটভূমি

কা'বা ছিলো ইসলামের মূল কেন্দ্র। এটি আল্লাহর নির্দেশানুক্রমে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) নির্মাণ করেছিলেন। মুসলমানরা ইসলামের এই কেন্দ্রস্থল থেকে বেরোবার পর ছয়টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিলো। পরন্ত হজ্জ ইসলামের অন্যতম মৌল স্তম্ভ হওয়া সত্ত্বেও তারা এটি পালন করতে পারছিলো না। তাই কা'বা শরীফ জিয়ারত ও হজ্জ উদযাপন করার জন্যে মুসলমানদের মনে তীব্র বাসনা জাগলো।

কা'বা জিয়ারতের জন্যে সফর

আরবরা সাধারণত তামাম বছরব্যাপী যুদ্ধে মেতে থাকতো। কিন্তু হজ্জ উপলক্ষে লোকেরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে কা'বা পর্যন্ত যাতায়াত করতে এবং নিশ্চিন্তে আল্লাহর ঘরের জিয়ারত সম্পন্ন করতে পারে, এজন্যে চার মাসকাল তারা যুদ্ধ বন্ধ রাখতো। ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হযরত (স) কা'বা জিয়ারতের সিদ্ধান্ত নিলেন। এহেন সৌভাগ্য লাভের জন্যে বহু আনসার ও মুহাজির প্রতীক্ষা করছিলো। তাই চৌদ্দ শ' মুসলমান হযরত (স)-এর সহগামী হলেন। যুল হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা কুরবানীর প্রাথমিক রীতিসমূহ পালন করলেন। এভাবে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, মুসলমানদের উদ্দেশ্য শুধু কা'বা শরীফ জিয়ারত করা, কোনোরূপ যুদ্ধ বা আক্রমণের অভিসন্ধি নেই। তবুও কুরাইশদের অভিপ্রায় জেনে আসবার জন্যে হযরত (স) এক ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করলেন। সে এই মর্মে খবর নিয়ে এলো যে, কুরাইশরা সমস্ত গোত্রকে একত্রিত করে মুহাম্মদ (স)-এর মক্কায় প্রবেশকে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন কি, তারা মক্কার বাইরে এক জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করতেও শুরু করেছে এবং মুকাবিলার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে।

---

৭৪. তাবকাতে ইবনে সাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০(

৭৫. ড. শাওকী আবু খলীল, *ইটলাসুল কু*
১৪২৭/২০০৬, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

কুরাইশদের সঙ্গে আলোচনা

এই সংবাদ জানার পরও হযরত (স) সামনে অগ্রসর হলেন এবং হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করলেন। এ জায়গাটি মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত।৪৫ এখানকার খোজায়া গোত্রের প্রধান হযরত (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললো : 'কুরাইশরা লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।' হযরত (স) বললেন : 'তাদেরকে গিয়ে বলো যে, আমরা শুধু হজ্জের নিয়্যাতে এসেছি, লড়াই করার জন্য নয়। কাজেই আমাদেরকে কা'বা শরীফ তাওয়াফ ও জিয়ারত করার সুযোগ দেয়া উচিত।' কুরাইশদের কাছে যখন এই পয়গাম গিয়ে পৌঁছলো, তখন কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলে উঠলো : 'মুহাম্মদের পয়গাম শোনার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই।' কিন্তু চিন্তাশীল লোকদের ভেতর থেকে ওরওয়া নামক এক ব্যক্তি বললো : 'না, তোমরা আমার উপর নির্ভর করো; আমি গিয়ে মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গে কথা বলছি।'

ওরওয়া হযরত (স)-এর খেদমতে হাযির হলো বটে, কিন্তু কোনো বিষয়েই মীমাংসা হলো না। ইতোমধ্যে কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্যে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলো এবং তারা মুসলমানদের হাতে বন্দীও হলো; কিন্তু হযরত (স) তাঁর স্বভাবসুলভ করুণার বলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাদেরকে মুক্তি দেয়া হলো। এর পর সন্ধির আলোচনা চালানোর জন্যে হযরত উসমান (রা) মক্কায় চলে গেলেন; কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদেরকে কা'বা জিয়ারত করার সুযোগ দিতে কিছুতেই রাযী হলো না; বরঞ্চ তারা হযরত উসমান (রা)-কে আটক করে রাখলো।

রিযওয়ানের শপথ

এই পর্যায়ে মুসলমানদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছলো যে, হযরত উসমান (রা) নিহত হয়েছেন। এই খবর মুসলমানদেরকে সাংঘাতিকভাবে অস্থির করে তুললো। হযরত (স) খবরটি শুনে বললেন: 'আমাদেরকে অবশ্যই উসমান (সা)-এর রক্তের বদলা নিতে হবে।' একথা বলেই তিনি একটি বাবলা গাছের নীচে বসে পড়লেন। তিনি সাহাবীদের কাছ থেকে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করলেন: 'আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো, তবু লড়াই থেকে পিছু হটবো না। কুরাইশদের কাছ থেকে আমরা হযরত উসমান (রা)-এর রক্তের বদলা নেবোই।' এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মুসলমানদের মধ্যে এক আশ্চর্য উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো। তারা শাহাদাতের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হলেন। এরই নাম হচ্ছে 'রিযওয়ানের শপথ'। কুর'আন পাকেও এই শপথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে সব ভাগ্যবান ব্যক্তি এ সময় হযরত (স)-এর পবিত্র হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে পুরস্কৃত করার কথা বলেছেন।

হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তাবলী

মুসলমানদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা কুরাইশদের কাছেও গিয়ে পৌঁছলো। সেই সঙ্গে এ-ও জানা গেলো যে, হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার খবর সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে কুরাইশরা সন্ধি করতে প্রস্তুত হলো এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে সুহাইল বিন্ আমরকে দূত বানিয়ে পাঠালো। তার সঙ্গে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আলোচনা হলো এবং শেষ পর্যন্ত সন্ধির শর্তাবলী স্থিরিকৃত হলো। সন্ধিপত্র লেখার জন্যে হযরত আলী (রা)-কে ডাকা হলো। সন্ধিপত্রে যখন লেখা হলো 'এই সন্ধি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর তরফ থেকে তখন কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল প্রতিবাদ জানিয়ে বললো: 'আল্লাহর রাসূল' কথাটি লেখা যাবে না; এ ব্যাপারে আমাদের আপত্তি আছে।' একথায় সাহাবীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। সন্ধিপত্র লেখক হযরত আলী (রা) কিছুতেই এটা মানতে রাযী হলেন না। কিন্তু হযরত (স) নানাদিক বিবেচনা করে সুহাইলের দাবি মেনে নিলেন এবং নিজের পবিত্র হাতে 'আল্লাহর রাসূল' কথাটি কেটে দিয়ে বললেন: 'তোমরা না মানো, তাতে কি? কিন্তু খোদার কসম, আমি তাঁর রাসূল।' এরপর নিম্নোক্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো :

Dhaka University Institutional Repository

১. মুসলমানরা এ বছর হজ্জ না করেই ফিরে যাবে।
২. তারা আগামী বছর আসবে এবং মাত্র তিন দিন থেকে চলে যাবে।
৩. কেউ অস্ত্রপাতি নিয়ে আসবে না। শুধু তলোয়ার সঙ্গে রাখতে পারবে; কিন্তু তাও কোষবদ্ধ থাকবে, বাইরে বের করা যাবে না।
৪. মক্কায় সে সব মুসলমান অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। আর কোনো মুসলমান মক্কায় ফিরে আসতে চাইলে তাকেও বাধা দেয়া যাবে না।
৫. কাফির বা মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ মদীনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে; কিন্তু কোনো মুসলমান মক্কায় গেলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।
৬. আরবের গোত্রগুলো মুসলমান বা কাফির যে কোনো পক্ষের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।
৭. এ সন্ধি-চুক্তি দশ বছরকাল বহাল থাকবে।

দৃশ্যত এই শর্তাবলী ছিলো মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী আর মুসলমানরা যে চাপে পড়েই এ সন্ধি করেছিলো, তাও বেশ বোঝা যাচ্ছিলো।

হযরত আবু জান্দালের ঘটনা

সন্ধিপত্র যখন লিখিত হচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটনাচক্রে সুহাইলের পুত্র হযরত আবু জান্দাল (রা) মক্কা থেকে পালিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি শৃংখলিত অবস্থায় মুসলমানদের সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এবং সবাইকে নিজের দুর্গতির কথা শোনালেন। তাঁকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কি কি ধরণের শাস্তি দেয়া হয়েছে, তা-ও সবিস্তারে খুলে বললেন। অবশেষে তিনি হযরত (স)-এর কাছে আবেদন জানালেন: 'হুযুর আমাকে কাফিরদের কবল থেকেকে মুক্ত করে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।' একথা শুনে সুহাইল বলে উঠলো: 'দেখুন, সন্ধির শর্ত নিয়ে যেতে পারেন না।'

এটা ছিলো বাস্তবিকই এক নাজুক সময়। কারণ, আবু জান্দাল ইসলাম গ্রহণ করে নির্যাতন ভোগ করছিলেন এবং বারবার ফরিয়াদ জানাচ্ছিলেন: 'হে মুসলিম ভাইগণ! তোমরা কি আমাকে আবার কাফিরদের হাতে তুলে দিতে চাও?' সমস্ত মুসলমান এই পরিস্তিতিতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলো। হযরত উমর (রা) তো রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ পর্যন্ত বললেন যে, 'আপনি যখন আল্লাহর সত্য নবী, তখন আর আমরা এ অপমান কেন সইব? হযরত (স) তাকে বললেন : 'আমি খোদার পয়গাম্বর, তাঁর হুকুমের নাফরমানী আমি করতে পারিন না। খোদা-ই আমায় সাহায্য করবেন।'

মোটকথা, সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হলো। সন্ধির শর্ত মুতাবেক আবু জান্দালকে ফিরে যেতে হলো। এভাবে ইসলামের পথে জীবন উৎসর্গকারীরা রাসূলের আনুগত্যের এক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। একদিকে ছিলো দৃশ্যত ইসলামের অবমাননা ও হযরত আবু জান্দালের শোচনীয় দুর্গতি আর অন্যদিকে ছিলো রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিরংকুশ আনুগত্যের প্রশ্ন।

হযরত (স) আবু জান্দালকে বললেন : 'আবু জান্দাল! ধৈর্য্য ও সংযমের সাথে কাজ করো। খোদা তোমার এবং অন্যান্য মজলুমের জন্যে কোনো রাস্তা বের করে দিবেনই। সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে। কাজেই আমরা তাদের তাদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারি না।' তাই আবু জান্দালকে সেই শৃংখলিত অবস্থায়ই ফিরে যেতে হলো।

Dhaka University Institutional Repository

হুদাইবিয়া সন্ধির প্রভাব

সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হবার পর হযরত (স) সেখানেই কুরবানী করার জন্যে লোকদেরকে হুকুম দিলেন। সর্বপ্রথম তিনি নিজেই কুরবানী করলেন। সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের পর হযরত (স) তিন দিন সেখানে অবস্থান করলেন। ফিরবার পথে সূরা ফাতাহ নাযিল হলো। তাতে এই সন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করে এতে 'ফাতহুম মুবীন' বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করা হলো। যে সন্ধি-চুক্তি মুসলমানরা চাপে পড়ে সম্পাদন করলো, তাকে আবার 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে আখ্যা দেয়া দৃশ্যত একটি বেখাপ্পা ব্যাপার ছিলো। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ স্পষ্টত প্রমাণ করে দিলো যে, ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিলো একটি বিরাট বিজয়ের সূচনা মাত্র। এর বিস্তৃত বিবরণ হচ্ছে নিম্নরূপ :

এতদিন মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পুরোপুরি একটা যুদ্ধংদেহী অবস্থা বিরাজ করছিলো। উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশার কোনোই সুযোগ ছিলো না। এই সন্ধি-চুক্তি সেই চরম অবস্থার অবসান ঘটিয়ে রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলো। এরপর মুসলমান ও অমুসলমানরা নির্বাধে মদীনায় আসতে লাগলো। এভাবে তারা এই নতুন ইসলামী সংগঠনের লোকদেরকে অতি নিকট থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পেলো।

এর পরিণতিতে তারা বিস্ময়কর রকমে প্রভাবিত হতে লাগলো। যে সব লোকের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্রোধ ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়েছিলো, তাদেরকে তারা নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে আপন লোকদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত মানের দেখতে পেলো। তারা আরো প্রত্যক্ষ করলো, আল্লাহর যে সব বান্দাহর বিরুদ্ধে তারা এদ্দিন যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করে আসছে, তাদের মনে কোনো ঘৃণা বা শত্রুতা নেই; বরং তাদের যা কিছুই ঘৃণা, তা শুধু বিশ্বাস ও গলদ আচার-পদ্ধতির বিরুদ্ধে। তারা (মুসলমানরা) যা কিছুই বলে,তার প্রতিটি কথা সহানুভূতি ও মানবিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ। এতো যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও তারা বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সহানুভূতি সদাচরণের বেলায় কোনো ত্রুটি করে না।

পরন্ত এরূপ মেলামেশার ফলে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের সন্দেহ ও আপত্তিগুলো সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা করাও প্রচুর সুযোগ হলো। এতে করে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমরা কতোখানি ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত ছিলো, তা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলো। মোটকথা, এই পরিস্থিতি এমনি এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো যে, অমুসলিমদের হৃদয় স্বভাবতঃই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। এর ফলে সন্ধির-চুক্তির মাত্র দেড়-দুই বছরের মধ্যে এতো লোক ইসলাম গ্রহণ করলো যে, ইতঃপূর্বে কখনো তা ঘটেনি। এরই মধ্যে কুরাইশদের কতিপয় নামজাদা সর্দার ও যোদ্ধা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলালো।

হযরত খালিদ বিন্ অলিদ (রা) এবং হযরত আমর বিন্ আস (রা) এ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এর ফলে ইসলামের প্রভাব-বলয় এতোটা বিস্তৃত হলো এবং তার শক্তিও এতোটা প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করলো যে, পুরনো জাহিলিয়াত স্পষ্টত মৃত্যু-লক্ষণ দেখতে লাগলো। কাফির নেতৃবৃন্দ এই পরিস্থিতি অনুধাবণ করে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলো। তারা স্পষ্টত বুঝতে পারলো, ইসলামের মুকাবিলায় তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই অনতিবিলম্বে সন্ধি-চুক্তি ভেঙে দেয়ার এবং এর ক্রমবর্ধমান সয়লাবকে প্রতিরোধ করার জন্যে আর একবার ইসলামী আন্দোলনের সাথে ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ তারা খুঁজে পেলো না। এই চুক্তি ভঙ্গের কথা পরে মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, (অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), নাকিব পাবলিকেশন, ঢাকা: সর্বশেষ ২০০৬,

Dhaka University Institutional Repository

উখদূদ বা গর্ত

আসহাবে উখদূদ বা গর্ত ওয়ালাদের কথা পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়। এটি ইয়ামেনের নাজরানে অবস্থিত।[৭৫]

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত অর্থসহ

قُتِلَ أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ

মারা পড়েছে গর্তওয়ালারা যে গর্তে দাউ দাউ করে জ্বলা জ্বালানীর আগুন ছিল। (সূরা বুরূজ- ৮৫ঃ ৪)

পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থান

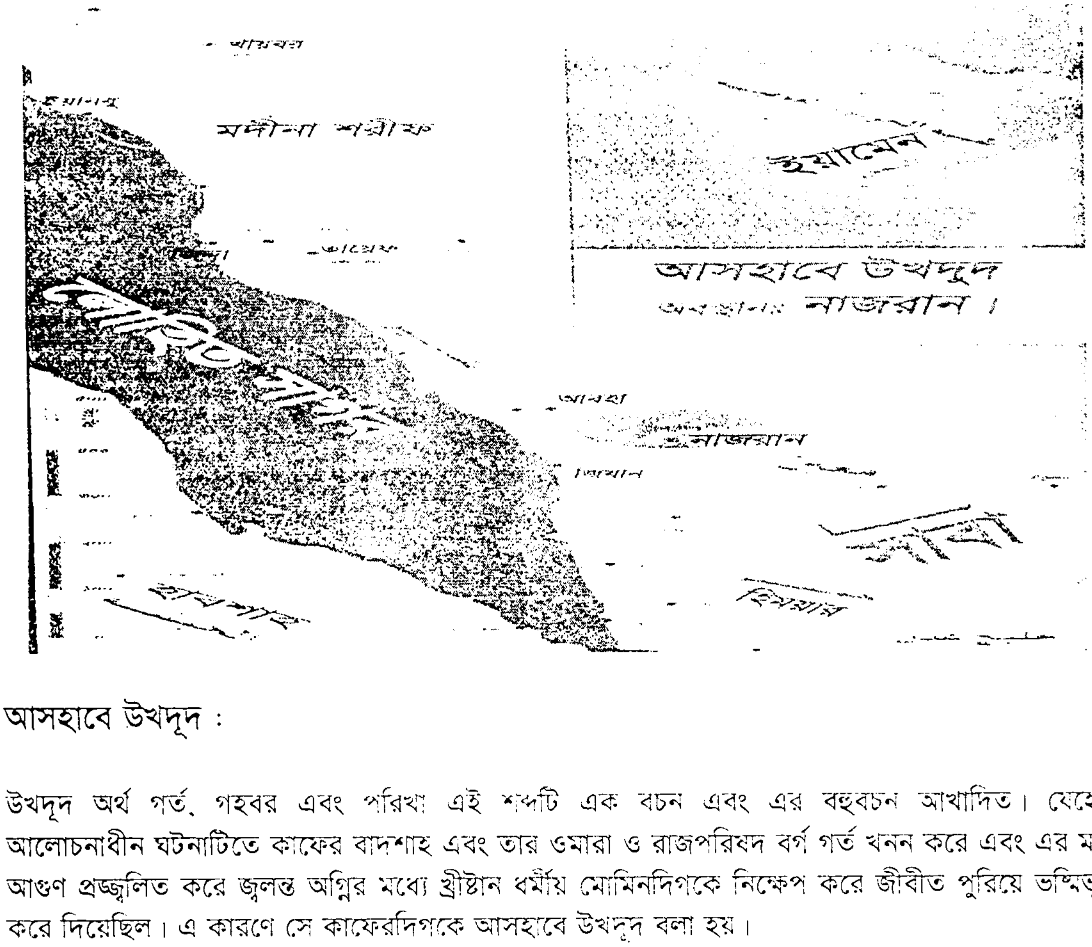

আসহাবে উখদূদ :

উখদূদ অর্থ গর্ত, গহবর এবং পরিখা এই শব্দটি এক বচন এবং এর বহুবচন আখাদিত। যেহেতু আলোচনাধীন ঘটনাটিতে কাফের বাদশাহ এবং তার ওমারা ও রাজপরিষদ বর্গ গর্ত খনন করে এবং এর মধ্য আগুণ প্রজ্জ্বলিত করে জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মীয় মোমিনদিগকে নিক্ষেপ করে জীবীত পুরিয়ে ভষ্মিভূত করে দিয়েছিল। এ কারণে সে কাফেরদিগকে আসহাবে উখদূদ বলা হয়।

---

৭৫. ড. শাওকী আবু খলীল, *ইটলাসুল কুর'আন*, দারুল ফিকর আল-মা'আসির, লেবানন, বৈরূত : ১৪২৭/২০০৬, পৃ. ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

আসহাবে উখদূদ ও কুর'আন মাজিদ :

কুর'আন মাজিদের সূরা বুরুজ এর মধ্যে আসহাবের উখদূদ আলোচনা করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে এতটুকুই বলা হয়েছে যা তাবলীগ ও হেদায়াতের জন্য নছিহাত ও জ্ঞানলাভের উপকরণস্বরূপ। পবিত্র কোরআন বলে হযরত মুহাম্মদ (স) নবুয়াতের পূর্বে এক স্থানে হক ও বাতিলের মধ্যে এক সংগ্রাম দেখা দেয়। একদিকে ছিল আল্লাহ তাআলার মোমিন বান্দাগণ যাতের নিকট যদিও জড়বাদি শক্তি ও ক্ষমতা ছিল না এবং সেদিকদিয়ে তারা দূর্বল ছিল। কিন্তু ঈমান ও সত্য সততার বলে আল্লাহ তায়ালার নামে নিজেদেরকে কোরবান করবার বলে বলিয়ান ছিল; অপরপক্ষে ঈমানবিল্লাহ ও সত্য গ্রহণ হতে বঞ্চিত এবং বাতিলের পূজারি ছিল।

কিন্তু জড়বাদি শানশওকাত, প্রতাপ প্রতিপত্তি এবং অত্যাচারিসুলভ শক্তির প্রাচুর্য্য ছিল। এমতাবস্থায় কাফের ও মুসরেক শক্তি এবং সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়ার আহবান জানাইয়ে ছিল যে, হয়তো ঈমান বিল্লাহ পরিহার পূর্বক শিরক ও কুফরের দিকে ফিরে যাও অন্যথায় ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। সত্যিকার মুমিনগণ তাদের এ আহবান এবং চ্যালেঞ্জকে ঈমানীশক্তি ও সাহসের সাথে গ্রহণ করল এবং ঈমান বিল্লাহর আলো হতে বের হয়ে শিরক ও কুফরের অন্ধকারে প্রবেশ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করল। তা দেখে কাফের দলের পক্ষ হতে রাজকীয় ক্ষমতা এবং অত্যাচারিসুলভ প্রতাপের সহিত শহরের বিভন্ন অংশ হতে গর্ত খনন করা হয়েছে।

গর্তসমূহের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, লেলিহান শিখা ধাউ ধাউ করছে এবং শহরের অধিকাংশ ভাগই অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। অনন্তর মুমিনদের আত্মমর্যাবান এবং আল্লাহর নামে আত্মোৎসর্গকারী লোকদিগকে দলে দলে টেনে এনে স্থানে স্থানে অগ্নিকুণ্ডের ধারে দার করানো হচ্ছে। আর শিরক ও কুফর স্বীয় জড়বাদী শক্তির বলে বলছে হয় আমাদের গ্রহণ কর অথবা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির জ্বলন্ত গহবরে নিক্ষিপ্ত হবে। ঈমানদারগণ বলছে দোযখের আগুনের মোকাবেলায় তোমাদের আগুনের আজাব একটি খেলা মাত্র। অতএব ঈমানবিল্লাহ জাহান্নামের আগুনের মোকাবেলায় তাদের আগুণের মোকাবেলায় আনন্দের সাথে অগ্নিকুণ্ডকে কবুল করে নেয়। কিন্তু শিরক ও কুফরকে এক মুহূর্তের জন্য বরদাস্ত করতে পারে না।

কিন্তু কুফর ও শিরকের শক্তি তা শ্রবণ করে তা নিরুত্তোর হয়ে যায়। এবং ক্রোধে উম্মত হয়ে তাওহিদের জন্য আত্মোৎসর্গকারীদেরকে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে এবং এরূপে সত্য বিজয়ী ও সফলকাম এবং মিথ্যা পরাজিত ও বিফলকাম হয়ে যায়; কেননা যাদেরকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে অগ্নিকুণ্ডসমূহের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মধ্য পুরিয়ে ভষ্মিভূত করা হলো। বাস্তবিক পক্ষে তারা পুরে নি এবং মরে নি। বরং চীরঞ্জীব হয়ে অনন্ত বেহেস্তে প্রবেশ করেছে। আর যারা নিজেদের অহংকারে মত্ত হয়ে নেক্কার লোকদের উপর অস্থায়ী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিল। তারা চিস্থায়ী ও অনন্ত অগ্নির অর্থাৎ জাহান্নামের উপযোগী সাবস্ত হয়েছিল। যারা দুনিয়ার বুকে অগ্নিকুন্ড প্রজ্জ্বলিত করেছে এবং সত্যিকার মুমিনদেরকে তার ইন্দোন বানিয়েছে আল্লাহ তায়ালা পরকালে এক ভয়ংকর অগ্নিকুন্ড জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। এর ইন্দন হবে কাফের ও মোশরেকগণ এবং অত্যাচারী এবং উৎপিড়কের দল, এদের অগ্নিকুণ্ড সত্তর হোক ও বিলম্ব হোক একদিন নিভে যাবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অগ্নিকুণ্ড অনন্ত স্থায়ী তা কোন কালে নিভবেও না ও বিলীনও হবে না। কুফর ও শিরক পার্থক্য মতের উপর গর্বিত হয়েছে কিন্তু তার শাস্তি আযাবুল হারিক ও আযাবে জাহান্নামে।[৭৬]

---

৭৬. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৪খ, পৃ. ৮২, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

বদর

রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম সংঘটিত বদর যুদ্ধ বদর নামক স্থানে হয়েছে।

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত অর্থসহ:

(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) -

বস্তুত আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।[৭৭]

পরিচিতি

বদর

কুর'আন মজীদ যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গায্ওয়াহ্র উল্লেখ করিয়াছে, তন্মধ্যে 'গাযওয়ায়ে বদর' সর্বাপেক্ষা অধিক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। বদর আসলে একটি কূপের নাম, উহার সাথে সংযুক্ত উপত্যকাটিকেও 'বদর' বলা হয়। এই উপত্যকাটি মক্কা ও মদীনার মধ্যে মদীনার নিকটবর্তী 'সুলতানী সড়কের' উপর অবস্থিত। (হুকুমতে উস্মানীর শাসনকালে মক্কা হতে মদীনা যাওয়ার জন্য যেই মহাসড়ক নির্ধারিত হয়েছে তাকে 'সুলতানী সড়ক' বলা হয়।) এই স্থানেই সেই গুরুত্বপূর্ণ গায্ওয়া সংঘটিত হয়েছে, যা দুনিয়ার ধর্ম ও মায্হাবসমূহের ইতিহাসই নহে; বরং জীবেরন প্রত্যেকটি শাখারই গতি পরিবর্তন করে অত্যাচার ও উৎপীড়ন হতে ন্যায়ের দিকে ফিরে দিয়েছে।[৭৮]

ভৌগোলিক অবস্থান

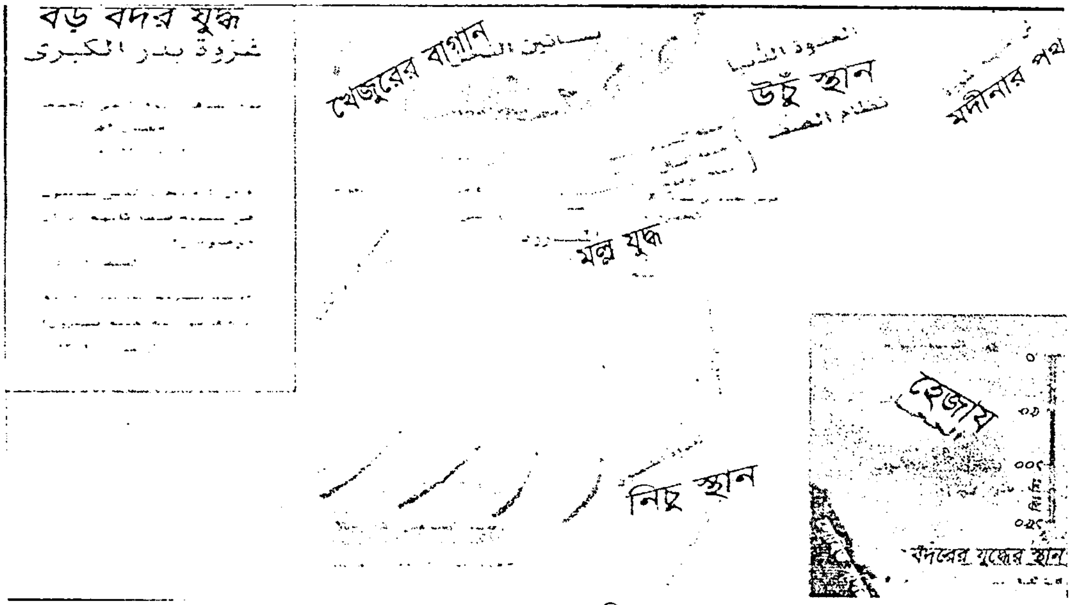

বদর যুদ্ধের মানচিত্র

৭৭. আল-কুর'আন, ৩ঃ ১২৩

৭৮. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ৫খ, পৃ. ১৯৩, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

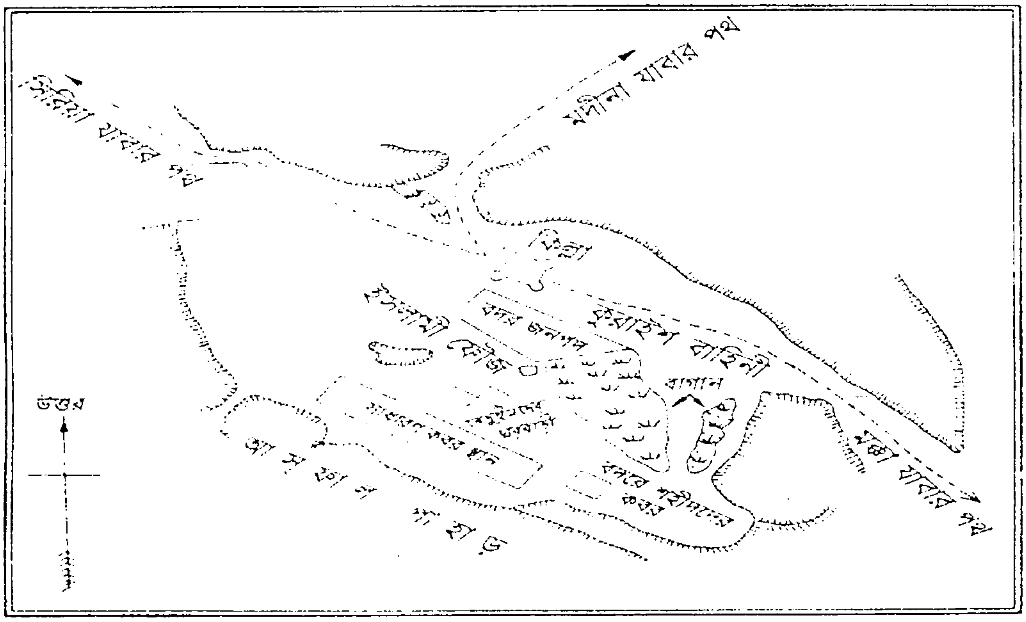

বদর যুদ্ধের মানচিত্র

বদর যুদ্ধের পটভূমি

এমনি অবস্থায় দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে (৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী কিংবা মার্চ) কুরাইশদের এক বিরাট কাফেলা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুসলিম অধিকৃত এলাকার কাছাকাছি এসে পৌছলো। কাফেলার সঙ্গে প্রায় ৫০ হাজার আশরাফী মূল্যের ধন-মাল এবং ৩০/৪০জনের মতো তত্ত্বাবধায়ক (মুহাফেজ) ছিল। তাদের ভয় ছিল, মদিনার নিকটে পৌছলে মুসলমানরা হয়ত তাদের ওপর হামলা করে বসতে পারে। কাফেলার নেতা ছিল আবু সুফিয়ান। সে এই বিপদাশংকা উপলব্ধি করেই এক ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্যে মক্কায় পাঠিয়ে দিল। ঐ লোকটি মক্কায় পৌছেই এই বলে শোরগোল শুরু করলো যে, 'তাদের কাফেলার ওপর মুসলমানরা লুটতরাজ চালাচ্ছে; সুতরাং সাহায্যের জন্যে সবাই ছুটে চলো।'

কাফেলার সঙ্গে যে ধন-মাল ছিল, তার সাথে বহু লোকের স্বার্থ জড়িত ছিল। ফলে এ একটা জাতীয় সমস্যায় পরিণত হলো। তাই সাহায্যের ডাকে সাড়া দিয়ে কুরাইশদের সমস্ত বড় বড় সর্দারই যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে পড়লো। এভাবে প্রায় এক হাজার যোদ্ধার এক বিরাট বাহিনী তৈরি হয়ে গেল।এই বাহিনী অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শান-শওকতের সঙ্গে মক্কা থেকে যাত্রা করলো; এদের হৃদয়ে একমাত্র সংকল্প :মুসলমানদের অস্তিত্ব এবার নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে, যেন নিত্যকার এই ঝঞ্ঝাট চিরতরে মিটে যায়। বস্তুত, একদিকে তাদের ধন-মাল রক্ষার আগ্রহ, অন্যদিকে পুরনো দুশমনি ও বিদ্বেষের তাড়না- এই দ্বিবিধ ক্রোধ ও উন্মাদনার সঙ্গে কুরাইশ বাহিনী মদিনা আক্রমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো।

Dhaka University Institutional Repository

কুরাইশদের হামলা

এদিকে রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছেও এই পরিস্থিতি সম্পর্কে যথারীতি খবর পৌঁছতে লাগলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এবার সত্যসত্যই মুসলমানদের সামনে এক কঠিন সংকটকাল উপস্থিত হয়েছে। এবার যদি কুরাইশরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয় এবং মুসলমানদের এই নয়া সমাজ-সংগঠনটিকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে সামনে এগোনো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। এমনকি, এর ফলে ইসলামের আওয়াজও হয়তো চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। মদিনায় হিজরতের এ যাবত দুটি বছর ও অতিক্রান্ত হয়নি। মুহাজিরগণ তাদের সবকিছুই মক্কায় ফেলে এসেছে এবং এখনো তারা রিক্তহস্ত । আনসার গণ যুদ্ধ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। অন্যদিকে ইহুদীদেরও অনেকগুলো গোত্র বিরুদ্ধতার জন্যে প্রস্তুত। খোদ মদিনায় মুনাফিক এবং মুশরিকদের অবস্থিতি এক বিরাট সমস্যার রুপ পরিগ্রহ করেছে।

এমনি অবস্থায় কুরাইশরা যদি মদিনা আক্রমণ করে ,তাহলে মুসলমানদের এই মুষ্টিমেয় দলটি হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়েও যেতে পারে। আর হামলা যদি নাও করে বরং আপন শক্তি বলে ,শুধু কাফেলাকে মুক্ত করে নিয়ে যায়,তবুও মুসলমানরা নির্বীর্য হয়ে পড়বে। অতঃপর তাদেরকে জব্দ করতে আশ-পাশের গোত্রগুলোকে আর কোন বেগ পেতে হবে না। কুরাইশদের ইঙ্গিতে তারা মুসলমানদের কে নানাভাবে উত্যক্ত করতে শুরু করবে। এদিকে মদিনার ইহুদী ,মুনাফিক এবং মুশরিকগণও মাথা তুলে দাঁড়াবে। ফলে মুসলমানদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে। এসব কারণেই হযরত মুহাম্মদ (স) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বর্তমানে যতটুকু শক্তিই সঞ্চয় করা সম্ভব ,তা নিয়েই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং মুসলমানদের কে আপন বাহুবল দ্বারা টিকে থাকার অধিকার প্রমাণ করতে হবে।

মুসলমানদের প্রস্তুতি

এই সিদ্ধান্তের পর নবী করীম (স) মুহাজির ও আনসারগণকে জমায়েত করে তাদের সামনে সমগ্র পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরলেনঃ'একদিকে মদিনার উত্তর প্রান্তে রয়েছে ব্যবসায়ী কাফেলা আর অন্য দিকে দক্ষিণ দিক থেকে আসছে কুরাইশদের সৈন্য-সামন্ত । আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, এর যেকোন একটি তোমরা লাভ করবে। বলো, তোমরা এর কোনটি মুকাবেলা করতে চাও? জবাবে বহু সাহাবী কাফেলার ওপর আক্রমণ চালানোর অগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু নবী করীম (স) এর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী । তাই তিনি তার প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলেন।

এরপর মুহাজির দের ভেতর থেকে মিকদাদ বিন আমর (রা) নামক জনৈক্য সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল ! প্রভু আপনাকে যেদিকে আদেশ করেছেন সেদিকেই চলুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আমরা বনী ইসরাঈলের মতো বলতে চাইনা - যাও তুমি এবং তোমার খোদা গিয়ে লড়াই করো, আমরা এখানে বসে থাকবো।

কিন্তু এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আনসারদের থেকেও মতামত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল । এজন্যে হযরত (স) তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে উল্লিখিত প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলেন । এরপর হযরত সা'দ বিন মা'আজ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন। হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছি। সর্বোপরি আমরা আপনার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছি। অতএব হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা-ই কার্যে পরিণত করুন।

Dhaka University Institutional Repository

যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, তার কসম , আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে গিয়ে ও ঝাঁপ দেন, তবুও আমরা আপনার সাথে থাকবো এবং এ ব্যাপারে আমাদের একটি লোকও পিছু হঠবে না। আমরা যে শপথ নিয়েছি, যুদ্ধকালে তা হরফে হরফে পালন করবো। সাচ্চা আত্মোৎসর্গীর ন্যায় আমরা শত্রুদের মুকাবেলা করবো। কাজেই আল্লাহ খুবই শিগগিরই আমাদের দ্বারা আপনাকে এমন জিনিস দেখাবেন, যা দেখে আপনার চক্ষু শীতল হয়ে যাবে। অতএব , আল্লাহর রহমত ও বরকতের ওপর ভরসা করে আপনি আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলুন।

এই বক্তৃতার পর স্থির করা হলো যে, কাফেলার পরিবর্তে সৈন্যদেরই মুকাবেলা করা হবে। কিন্তু এটা কোনো মামুলি সিদ্ধান্ত ছিল না। কারণ কুরাইশদের তুলনায় মুসলমানদের সংগঠন ছিল নেহাত দুর্বল। এর মধ্যে ঘোড়া ছিল মাত্র দু'-তিন জনের কাছে। উট ছিল মাত্র সত্তরটির মতো। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও ছিল অপ্রতুল। মাত্র ষাট ব্যক্তির কাছে ছিল লৌহবর্ম। এ কারণে মাত্র কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাদবাকী সবারই মনে ভীতির সঞ্চার হলো।

তাদের অবস্থা দেখে মনে হতে লাগলো, যেনো জেনে-শুনে তারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতে এই দৃশ্যই ফুটে উঠেছেঃ "(হে নবী!) এই লোকগুলো তো আপন বাড়ি ঘর থেকে তেমনি বের হওয়া উচিত ছিল ,তোমার প্রভু যেমন তোমায় সত্য সহকারে তোমার গৃহ থেকে বের করে এনেছেন; কিন্তু মুসলমানদের একটি দলের কাছে এ ছিল অত্যন্ত অপছন্দনীয় । তারা সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পরও সে সম্পর্কে তোমার সঙ্গে তর্ক করছিল; তাদেরকে যেন দৃশমান মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। (সেই সময়ের কথা) স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন,(আবু সুফিয়ান ও আবু জেহেলের) দুই দলের মধ্যে থেকে যেকোন একটি তোমাদের করায়ত্ত হবে। আর তোমরা চেয়েছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল (অর্থাৎ নিরস্ত্র) দলটিকে বশীভূত করতে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তিনি আপন বিধানের দ্বারা সত্যকে অজেয় করে রাখবেন এবং কাফিরদের মূলোচ্ছেদ করে দিবেন, যেন সত্য সত্য হয়েই থাকে এবং মিথ্যা মিথ্যাই থেকে যায়-অপরাধীদের কাছে এটা যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন।"

মদিনা থেকে মুসলমানদের যাত্রা

যুদ্ধ সম্ভার ও রসদ পত্রের এই দৈন্য সত্ত্বেও দ্বিতীয় হিজরীর ১২ রমজান নবী করীম (স) আল্লাহর ওপর ভরসা করে মাত্র তিনশ'র মতো মুসলমান নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। তারা সোজা দক্ষিণ কোণে পা বাড়ালেন; কারণ কুরাইশদের বাহিনীটি ঐ দিক থেকে আসছিল। ১৬ রমজান তারা বদরের নিকটে পৌছলেন। এটি মদিনা থেকে কিঞ্চিত দিক ৮০ মাইল দক্ষিন-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রান্তর । এখানে পৌঁছার পর জানা গেল যে, কুরাইশ বাহিনী প্রান্তরের অপর সীমান্তে এসে পৌছেছে। তাই হযরত (স) এর নির্দেশে এখানে ছাউনি ফেলা হলো।

কুরাইশদের বাহিনীটি অত্যন্ত জাঁকালো সাজ-সজ্জা সহকারে বের হয়েছিল । এদের দলে এক সহস্রাধিক সৈন্য ছিলো,সর্দার ছিলো প্রায় একশোর মতো। সৈন্যদের জন্যে রসদ-পত্রেরও খুব উত্তম আয়োজন ছিল। উতবা বিন রাবিয়া ছিল সিপাহসালার । বদরের কাছে কাছে পৌছে কুরাইশ সৈন্যরা জানতে পারলো যে, তাদের বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের আয়ত্বের বাইরে রয়েছে ।এতে জাররাহ ও আদী গোত্রের প্রধানগণ বললো যে, এখন আর আমাদের যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই । কিন্তু আবু জেহেল তাতে সায় দিলেন না। ফলে জাররাহ ও আদী গোত্রের লোকেরা মক্কায় ফিরে গেল এবং বাকী সৈন্যরা সামনে অগ্রসর হলো।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধক্ষেত্রের যে অংশটি কুরাইশদের দখলে ছিল, উপযোগিতার দিক দিয়ে তা ছিল খুবই উত্তম তাদের জমিন ছিল অত্যন্ত মজবুত। পক্ষান্তরে মুসলমানরা যেখানে ছাউনি ফেলেছিল,তা ছিল লবণাক্ত ভূমি। সৈন্যদের পা তাতে দেবে যাচ্ছিল। অন্যান্য দিক দিয়েও তাদের অসুবিধা ছিল প্রচুর। এই পরিস্থিতিতে রাতভর সমস্ত সৈন্য বিশ্রাম গ্রহণ করলো;কিন্তু নবী করীম (স) সারারাত ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল রইলেন। ১৭ রমজান ফজরের পর তিনি মুসলিম সৈন্যদের সামনে জিহাদ সম্পর্কে এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দিলেন। অতঃপর যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করা হলো। এ বছরই মুসলমানদের প্রতি রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এই পয়লা রোজার মধ্যেই মুসলমানদের তিনগুন বেশি সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হতে হলো। কি কঠোর পরীক্ষা!

সে রাতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত স্বরুপ দুটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। প্রথমত ,মুসলিম সৈন্যগণ অত্যন্ত প্রশান্তি ও সুনিদ্রার ভেতর দিয়ে রাত যাপন করলো। প্রত্যুষে তারা সতেজ বল-বীর্য নিয়ে ঘুম থেকে জাগলো দ্বিতীয়ত, রাতে খুব বৃষ্টিপাত হলো। তার ফলে লবণাক্ত জমি শক্ত হয়ে গেলো। এবং মুসলমানদের পক্ষে ময়দান খুব উপযোগী হলো। পক্ষান্তরে এই বৃষ্টির ফলে কুরাইশদের অধিকৃত অংশ কর্দমাক্ত হয়ে গেল এবং তাতে সৈন্যদের পা দেবে যেতে লাগলো । পরন্ত মুসলমানদের অধিকৃত অংশের নীচু ভূমিতে পানি জমে গেল এবং তাতে তাদের ওযু-গোসল ইত্যাদির প্রচুর সুযোগ হলো। এসব কারণে মুসলমানদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি ও শংকাবোধ দূর হয়ে গেল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে তারা শত্রু সৈন্যদের মুকাবেলার জন্যে প্রস্তত হলো।

ময়দানে যখন উভয় পক্ষের সৈন্যদল মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো, তখন এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হলো। একদিকে ছিল আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারী তার বন্দেগী ও আনুগত্য স্বীকারকারী মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান, যাদের কাছে সাধারুণ যুদ্ধ সরঞ্জাম পর্যন্ত ছিল না। অন্যদিকে ছিল অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ-পত্রে সুসজ্জিত এক সহস্রাধিক কাফির সৈন্য,যারা এসেছে তওহীদের আওয়াজকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে। যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে নবী করীম (স) খোদার দরবারে হাত তুললেন এবং অতীব বিনয় নম্রতার সাথে বললেনঃ'হে খোদা এই কুরাইশরা চরম ঔদ্ধত্য ও অহমিকা নিয়ে এসেছে তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে । অতএব আমায় যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছিলে ,এখন সে সাহায্য প্রেরণ করো। হে খোদা! আজ এই মুষ্টিমেয় দলটি যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়ায় তোমার বন্দেগী করার আর কেউ থাকবে না। '

এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল মুহাজিরদেরকে। এদের প্রতিপক্ষ ছিল আপন ভাই,পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। কারো বাপ , কারো চাচা, কারো মামা আর কারো ভাই ছিল তার তলোয়ারের লক্ষ্যবস্তু এবং নিজ হাতে তাদের হত্যা করতে হয়েছিল এইসব কলিজার টুকরা কে । এই কঠিন পরীক্ষায় কেবল তারাই টিকে থাকতে পেরেছিল , যারা সাচ্চা দিলে আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করেছিলঃ যে সব সম্বন্ধকে তিনি বজায় রাখতে বলেছেন,তারা শুধু তাই বজায় রাখবে আর যেগুলোকে তিনি ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন- তা যতোই প্রিয় হোক না কেন- তারা ছিন্ন করে ফেলবে ।

কিন্তু সেই সঙ্গে আনসারদের পরীক্ষাও কোনো দিক দিয়ে সহজ ছিল না। এ যাবত আরবের কাফির এবং মক্কার মুশরিকদের চোখে তাদের 'অপরাধ' ছিল এটুকু যে, তারা তাদের দুশমন অর্থাৎ মুসলমানদের কে আশ্রয় দান করেছে। কিন্তু এবার তারা প্রকাশ্যভাবেই ইসলামের সমর্থনে কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা তাদের জনপদটির (মদিনা) বিরুদ্ধে গোটা আরবদেরকেই দুশমন বানিয়ে নিয়েছে। অথচ মদিনার জনসংখ্যা তখন সাকুল্যে এক হাজারের বেশি ছিল না । এতো বড় দুঃসাহস তারা এজন্যেই করতে পেরেছিল যে, তাদের হৃদয় আল্লাহর ও রাসূলের মুহাব্বত এবং আখিরাতের প্রতি অবিচল ঈমানে পরিপূর্ণ হয়েছিল। নতুবা আপন ধন-দৌলত স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে এভাবে সমগ্র আরব ভূমির শত্রুতার ন্যায় কঠিন বিপদের মুখে কে নিক্ষেপ করতে পারে ?

Dhaka University Institutional Repository

কুরাইশদের পরাজয়

বস্তুত ঈমানের এই স্তরে উন্নীত হবার পরই বান্দার জন্যে আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়ে থাকে । বদর যুদ্ধেও তাই আল্লাহ তাআলা এই সহায়-সম্বলহীন ৩১৩ জন মুসলমানকে সাহায্য দান করেন। এর ফলে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এক সহস্রাধিক সুসজ্জিত সৈন্য অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো এবং তাদের সমস্ত শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। এই যুদ্ধে কুরাইশ পক্ষের প্রায় ৭০ ব্যক্তি নিহত হলো এবং সম সংখ্যক লোক বন্দী হলো।নিহতদের মধ্যে তাদের বড় বড় নামজাদা সর্দারগণ প্রায় সবাই ছিল। এদের মধ্যে শায়বা, উতবা, আবু জেহেল, জামআহ , আস, উমাইয়া প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব নামজাদা সর্দারের মৃত্যুর ফলে কুরাইশদের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। মুসলমানদের পক্ষে প্রায় ৬ জন মুহাজির এবং ৮ জন আনসার শহীদ হলেন।

যুদ্ধে যারা বন্দী হলো, তাদের কে দু'-দু' চার জন করে সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হলো এবং নবী করীম (সাঃ) তাদের কে সদাচরণ করার নির্দেশ দান করলেন। ফলে সাহাবীগণ তাদের কে এমনি আরামে রাখলেন যে, বহুতর ক্ষেত্রে তারা নিজেরা কষ্ট স্বীকার করলেও বন্দীদের কষ্ট দেন নি। এই সদাচরণের ফলে তাদের হৃদয়ে ইসলামের জন্যে অনেক নম্রতার সৃষ্টি হলো। আর এটাই ছিল আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য । পরে এইসব বন্দীর অনেকেই ফিদয়ার (মুক্তিপণ) বিনিময়ে মুক্তি লাভ করে। যারা গরীব অথচ শিক্ষিত ছিল, তাদেরকে দশ-দশটি শিশুকে লেখাপড়া শেখানোর বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হয়।

বদর যুদ্ধের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া

ফলাফল ও প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে বদর যুদ্ধ ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ । প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দাওয়াত অগ্রাহ্য করার দরুন মক্কার কাফের দের জন্যে যে খোদায়ী আযাব নির্ধারিত হয়েছিল, এ যুদ্ধ ছিল তারই প্রথম নিদর্শন। তাছাড়া ইসলাম ও কুফরের মধ্যে মূলত কার টিকে থাকবার অধিকার রয়েছে এবং ভবিষ্যতের হাওয়ার গতিই বা কোন দিকে মোড় নেবে, এ যুদ্ধ তা স্পষ্টত জানিয়ে দিল। এ কারণেই একে ইসলামী ইতিহাসের পয়লা যুদ্ধ বলা হয়। কুর'আন পাকের সূরা আনফালে এই যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে দুনিয়ার রাজা- বাদশাহ বা জেনারেলগণ কোন যুদ্ধ জয়ের পর যে ধরণের পর্যালোচনা করে থাকে, এ পর্যালোচনা তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ।

এ পর্যালোচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর ওপর একটু বিস্তৃত ভাবে দৃষ্টিপাত করলে ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি এবং মুসলমানদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অত্যন্ত সুস্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

বদর যুদ্ধের পর্যালোচনা এবং মুসলমানদের প্রশিক্ষণ

১. পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামের আগে যুদ্ধ ছিল আরবদের একটি প্রিয় 'হবি'। যুদ্ধে যে মাল-পত্র (গনিমত) হস্তগত হতো, তার প্রতি ছিল তাদের দুর্নিবার মোহ। এমনকি কখনো কখনো ঐ মাল-পত্রের আকর্ষণই তাদের যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল ধন-সম্পদের চেয়ে অনেক উন্নত সে উদ্দেশ্যকে মুসলমানদের হৃদয়-মূলে বদ্ধমূল করে নেয়া অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এ দিক দিয়ে বদর যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্যে একটি পরীক্ষামূলক যুদ্ধ। মুসলমানদের হৃদয়-মূলে ইসলামী যুদ্ধের নিয়ম-নীতি ও নৈতিক আদর্শ পুরোপুরি বদ্ধমূল হয়েছে, না অনৈসলামী যুদ্ধের ধ্যান-ধারণা তাদের হৃদয়ে এখনো প্রভাব বিস্তার করে আছে, এই যুদ্ধ ছিল তারই পরীক্ষামাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

বদর যুদ্ধে কাফিরদের মালমাত্তা যাদের হস্তগত হয়েছিল , তারা পুরনো রীতি অনুযায়ী তাকে তাদের আপন সম্পত্তি বলেই মনে করে বসলো। ফলে যারা কাফিরদের পেছনে ধাওয়া করা কিংবা হযরত (স) এর নিরাপত্তার কাজে ব্যস্ত ছিল,তারা কিছুই পেল না। এভাবে তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হলো। ইসলামী আন্দোলনের ধারক ও বাহকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার এটাই ছিল উপযুক্ত সময়। তাই সর্ব প্রথম তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলা হলো যে, গনীমতের মাল প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের কোন পারিশ্রমিক নয়। এ হচ্ছে আপন পারিশ্রমিকের বাইরে মালিকের তরফ থেকে দেয়া একটি বাড়তি অবদান বা পুরস্কার বিশেষ (আনফাল)। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার যথার্থ প্রতিদান তো তিনি আখেরাতেই দান করবেন।

এখানে যা কিছু পাওয়া যায়, তা কারো ব্যক্তিগত স্বত্ব (হক) নয়, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার একটি বাড়তি অবদান মাত্র। কাজেই এই অবদান সম্পর্কে কারোর স্বত্বাধিকার দাবির প্রশ্নই উঠে না। এর স্বত্বাধিকার হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসূলের। তারা যেভাবে চান, সেভাবেই এর বিলি-বন্টন করা হবে। এর পর সামনে অগ্রসর হয়ে এই বিলি-বন্টনের নীতিমালাও বাতলে দেয়া হলো। এভাবে যুদ্ধ সংক্রান্ত এক বিরাট প্রশ্নের নিস্পত্তি করা হলো।

মুসলমানদের কে চূড়ান্ত ভাবে বলে দেয়া হলো যে, তারা দুনিয়ার ফায়দা হাসিলের জন্যে কখনো অস্ত্র ধারণ করতে পারে না,বরং দুনিয়ার নৈতিক বিকৃতিকে সংশোধন করা এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে গায়রুল্লাহর গোলামী থেকে মুক্ত করার অপরিহার্য প্রয়োজনেই তাদের শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। তারা যখন দেখবে যে, বিরুদ্ধ শক্তি তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সংশোধন প্রচেষ্টাকে অসম্ভব করে তুলেছে ,ঠিক তখনি এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে কাজেই তারা যে সংস্কার সংকল্প নিয়েছে, তাদের দৃষ্টি শুধু সেদিকেই নিবদ্ধ থাকা উচিত এবং এই লক্ষ্য অর্জনের পথে কোনরূপ অন্তরায় হতে পারে, এমন কোন পার্থিব স্বার্থের দিকেই তাদের ফিরে তাকানো উচিত নয়।

২. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আমীর বা নেতার আনুগত্য হচ্ছে দেহের ভেতর রুহের সমতুল্য। তাই নেতৃত আদশের্র পরিপূর্ণ ও নির্ভেজাল আনুগত্যের জন্যে মনকে প্রস'ত করার নিমিত্ত বারবার মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। আলোচ্য যুদ্ধের গনীমতের মাল সম্পর্কেও তাই সর্বপ্রথম লোকদের কাছে পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের দাবি জানানো হলো এবং তাদেরকে বলে দেয়া হলো যে,এসব কিছুই আল্লাহ এবং তার রাসূলের স্বত্ত্বা। এ ব্যাপারে তারা যা ফয়সালা করেন, তাতেই সবার রাযী থাকতে হবে।

৩. সাধারণ আন্দোলনগুলোর প্রকৃতি এই যে, সেগুলো আপন কর্মী ও অনুবর্তীদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্যে তাদের কৃতিত্বের কথা নানাভাবে উল্লেখ করে থাকে। এভাবে খ্যাতি-যশ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে উস্কিয়ে দিয়ে লোকদের কে ত্যাগ তিতিক্ষার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বস্তুত এ কারণেই বড় বড় যুদ্ধ বা বিজয় অভিযানের পর এইসব আন্দোলন তার আত্মোৎসর্গী কর্মীদের মধ্যে বড়ো বড়ো খেতাব পদক ইনাম ইত্যাদি বিতরণ এবং নানাভাবে তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করে থাকে। ফলে একদিকে তারা আপন কৃতিত্বের বদলা পেয়ে সন্তোষ লাভ করে এবং ভবিষ্যতে আরো অধিক ত্যাগ স্বীকারের জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়, অন্যদিকে অপর লোকদের মনেও তাদেরই মতো উন্নত মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত ।

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র ৩১৩ জন মুসলিম সৈন্য কর্তৃক এক সহস্রাধিক কাফের সৈন্যকে পরাজিত করা এবং এক প্রকার বিনা সাজ-সরঞ্জামে কয়েকগুণ বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে নির্মূল করা সত্ত্বেও তাদের কে বলে দেয়া হলোঃতারা যেন এ ঘটনাকে নিজেদের বাহাদুরি বা কৃতিত্ব বলে মনে না করে। কারণ তাদের এ বিজয় শুধু আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ মাত্র। কেবল তারই দয়া এবং করুণার ফলে এতো বড়ো শত্রু বাহিনীকে তারা পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই তাদের কখনো আপন শক্তি -সামর্থের ওপর নিভর্র করা উচিত নয়; বরং সর্বদা আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং তারই করুণা ও অনুগ্রহের ওপর নিভর্র করে ময়দানে অবতরণ করার ভেতরে নিহিত রয়েছে তাদের আসল শক্তি। যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে হযরত (স) এক মুঠো বালু হাতে নিয়ে 'শাহাদাতুল ওজুহ' (চেহারা আচ্ছন্ন হয়ে যাক) বলে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারেন।

এরপরই মুসলমান সেনারা একযোগে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের কে ধরাশয়ী করে। অন্য লোক হলে এই ঘটনাকে নিজের 'কেরামত ' বা অলৌকিক কীর্তি বলে ইচ্ছামত গর্ব করতে পারতো এবং একে ভিত্তি করে তার অনুগামীরা ও নানারুপ কিস্‌সা-কাহিনীর সৃষ্টি করতো। কিন্তু কুর'আন পাকে খোদ আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে বলে দিলেন-

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ - سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'তাদেরকে (কাফিরদেরকে) তোমরা হত্যা করো নি, বরং তাদের হত্যা করেছেন আল্লাহ। ' এমনকি তিনি হযরত (স) কে পর্যন্ত বলে দিলেন যে, '(বালু) তুমি ছুঁড়োনি, বরং ছুঁড়েছেন আল্লাহ এবং মুমিনদের কে একটি উত্তম পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ করা হয়েছে।'[৭৯]

এভাবে মুসলমানদেরকে বলে দেয়া হলো যে প্রকৃত পক্ষে সমস্ত কাজের চাবিকাঠি রয়েছে আল্লাহর হাতে এবং যা কিছু ঘটে তার নির্দেশ ও ইচ্ছানুক্রমেই ঘটে থাকে। মুমিনদের কাজ হচ্ছে আল্লাহর ওপর পুরোপুরি নিভর্র করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা এর ভেতরই নিহিত রয়েছে তাদের জন্যে সাফল্য।

৪. ইসলামী আন্দোলনে জিহাদ হচ্ছে চূড়ান্ত পরীক্ষা, যার মাধ্যমে আন্দোলনের অনুবর্তীদের পূর্ণ যাচাই হয়ে যায়। যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং মুমিনদের পক্ষে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে ময়দানে অবতরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, তখন সেখান থেকে তাদের পশ্চাদপসরণ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে নেমে ময়দান থেকে পলায়ন করার অর্থ এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে,

ক. মুমিন যে উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করতে নেমেছে, তার চেয়ে তার নিজের প্রাণ অধিকতর প্রিয় কিংবা
খ. জীবন ও মৃত্যু যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ এবং তার হুকুম না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু আসতেই পারে না আর হুকুম যখন এসে যায় ,তখন মৃত্যু এক মুহূর্ত ও বিলম্বিত হতে পারে না - তার এই ঈমানই অত্যন্ত দুর্বল অথবা

---

৭৯. আল-কুর'আন, ৮ঃ ১৭

Dhaka University Institutional Repository

গ. তার হৃদয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সাফল্যে ছাড়াও অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা লালিত হচ্ছে এবং প্রকৃত পক্ষে সে খোদার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করতে পারেনি। যে, ঈমানের ভেতর এর কোনো একটি জিনিসও ঠাঁই নিয়েছে, তাকে কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ ঈমান বলা যায় না। এ কারণেই ইসলামের এই প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধোপলক্ষে মুসলমানদের কে সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেয়া হলো যে, যুদ্ধ থেকে পশ্চাদপসরণ করা মুমিনদের কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত (স) ইরশাদ করেন, তিনটি গুনাহের মুকাবেলায় মানুষের কোন নেকীই ফলপ্রসূ হতে পারে নাঃ এক, খোদার সাথে শিরক, দুই ,পিতামাতার অধিকার হরণ এবং তিন ,আল্লাহর পথে চালিত যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা।

৫. যখন পার্থিব সম্পর্ক -সম্বন্ধের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সঙ্গত সীমা অতিক্রম করে যায় ,তখন আল্লাহর পথে অগ্রসর হতেও তার শৈথিল্য এসে যায়। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিই হচ্ছে এ পথের প্রধান প্রতিবন্ধক। তাই এই উপলক্ষে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ ও সন্তান -সন্ততির সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে ও মুসলমানদের অবহিত করলেন। তিনি বললেন-

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ -

"জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের পরীক্ষায় উপকরণ মাত্র ; আল্লাহর কাছে প্রতিফল দেবার জন্যে অনেক কিছুই রয়েছে।"[৮০]

বস্তুত ,মুমিন তার ধন-সম্পদের সদ্ব্যবহার করে কিনা এবং সম্পদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ হেতু আল্লাহর পথে জীবন পণ করতে তার হৃদয়ে কিছুমাত্র সংকীর্ণতা আসে কিনা অথবা সম্পদের মোহে সত্যের জিহাদে সে শৈথিল্য দেখায় কিনা, ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ শুধু তা-ই পরীক্ষা করে থাকেন। অনুরূপ ভাবে সন্তান-সন্ততি হচ্ছে মানুষের পরীক্ষার দ্বিতীয় পত্র। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে প্রথমত সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহর বন্দেগী এবং তার আনুগত্যের পথে নিয়োজিত করার পূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুমিনকে তাদের প্রতি সঠিক কর্তব্য পালন করতে হবে। দ্বিতীয়ত ,মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ জাগিয়ে দিয়েছেন , তার আধিক্যহেতু আল্লাহর পথে পা বাড়াতে গিয়ে যাতে বাধার সৃষ্টি না হয়, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে এই মহা পরীক্ষার জন্যে প্রতিটি মুমিনের তৈরি থাকা উচিত।

৬. ধৈর্য যে কোন আন্দোলনেরই প্রাণবস্তু। দেহের জন্যে আত্মা যতোখানি প্রয়োজনীয় ,ইসলামী আন্দোলনের জন্যে এই গুণটি ততোখানিই আবশ্যক। মক্কার মুসলমানরা যে দুরবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছিল ,সেখানেও এই গুণটি বেশি করে অর্জন করার জন্যে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে শুধু একতরফা জুলুম-পীড়ন সহ্য করা ছাড়া মুসলমানদের আর কিছুই করণীয় ছিল না।

কিন্তু এখন আন্দোলন দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করার দরুণ খোদ মুসলমানদের দ্বারাই অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ হবার আশংকা দেখা দিল। কাজেই এই পরিবর্তিত অবস্থায়ও এ গুণটি বেশি পরিমাণে অর্জন করার জন্যে তাগিদ দেয়া হলো। বলা হলো-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ -

---

৮০. আল-কুর'আন, ৮ ঃ ২৮

Dhaka University Institutional Repository

"হে ঈমানদারগণ ! যখন কোন দলের সঙ্গে তোমাদের মুকাবেলা হয়,তখন তোমরা সঠিক পথে থেকো এবং আল্লাহ্ কে বেশি পরিমাণে স্মরণ করো। আশা করা যায় তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে। আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর বিবাদ করো না। (বিবাদ করলে)তাহলে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের অবস্থার অবনতি ঘটবে। সবর বা ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করো; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য অবলম্বনকারীদের সাথে রয়েছেন।[৮১]

এখানে ধৈর্যের (সবরের)তাৎপর্য হচ্ছে এই-

১. আপন প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগকে সংযত রাখতে হবে।
২. তাড়াহুড়া,ভয়-ভীতি ও উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে হবে।
৩. কোন প্রলোভন বা অসঙ্গত উৎসাহকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।
৪. শান্ত মন সুচিন্তিত ফয়সালার ভিত্তিতে সকল কাজ সম্পাদন করতে হবে।
৫. বিপদ-মুসিবত সামনে এলে দৃঢ় পদে তার মুকাবেলা করতে হবে।
৬. উত্তেজনা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন অন্যায় কাজ করা যাবে না।
৭. বিপদ-মুসিবতের কারণে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে আতঙ্ক বা অস্থিরতার কারণে মনোবল হারানো যাবে না।
৮. লক্ষ্য অর্জনের আগ্রহাতিশয্যে কোনো অসঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা যাবে না।
৯. পার্থিব স্বার্থ ও প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজের কামনা-বাসনাকে আচ্ছন্ন করা এবং সে সবের মুকাবেলায় দুর্বলতা প্রকাশ করে কোনো স্বার্থের হাতছানিতে আকৃষ্ট হওয়া যাবে না।

এখন এই পরিবর্তিত অবস্থায় মুমিনদের আপন ধৈর্যের পরীক্ষা অন্যভাবেও দেয়ার প্রয়োজন ছিল। মানুষের ওপর উদ্দেশ্য-প্রীতির প্রাধান্য কখনো কখনো এতোটা চেপে বসে যে, তার মুকাবেলায় সে হক ও ইনসাফের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখতে পারে না। সে মনে করে যে, উদ্দেশ্যের খাতিরে এরূপ করায় কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন সর্বতো ভাবে একটি সত্য ভিত্তিক আন্দোলন বিধায় স্বীয় অনুগামীকে সে কখনো হক ও ইনসাফের সীমা অতিক্রম করতে অনুমতি দেয় না। তাই কুফর ও ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বের সময় অন্যান্য নৈতিক ও শিক্ষামূলক নির্দেশাবলীর সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে রাজনৈতিক চুক্তির ব্যাপারেও মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ হক ইনসাফভিত্তিক নির্দেশাবলী প্রদান করা হলো। এইসব নির্দেশাবলীর সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কখনো জয়-পরাজয় কিংবা পার্থিব স্বার্থের হাতছানিতে চুক্তিভঙ্গ না করে, বরং আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে যেনো চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে। এর ফলে তার আপন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য থেকেও যদি বঞ্চিত হতে হয়,তবুও যেনো সে পিছপা না হয়।

বদর যুদ্ধের পর কুর'আন পাকে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে যে পর্যালোচনা করা হয়, এ হচ্ছে তার কয়েকটি উল্লেখ বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার অন্যান্য আন্দোলনের তুলনায় ইসলামী আন্দোলন যে কতোখানি উন্নত ও শ্রেষ্ঠ এবং অনুবর্তীদের কে সে কি ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, এ থেকে তা সহজেই অনুমান করা চলে।[৮২]

---

৮১. আল-কুর'আন, ৮ঃ ৪৫-৪৬
৮২. আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, (অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), নাকিব পাবলিকেশন, ঢাকা: সর্বশেষ ২০০৬,

Dhaka University Institutional Repository

হুনাইন

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত অর্থসহ:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ -
ثُمَّ أَنزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ -
جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

এর আগে আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করছেন। এই তো সেদিন, হুনায়েন যুদ্ধের দিন (তাঁর সাহায্যের অভাবনীয় রূপ তোমরা দেখছো). সেদিন তোমাদের মনে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের অহমিকা ছিল . কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। আর এত বড় বিশাল পৃথিবীও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তোমরা পেছনে ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের ওপর নিজের তরফ থেকে সান্ত্বনা ও প্রশান্তির ভাবধারা নাযিল করলেন এবং তোমরা দেখতে পাওনি এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে কাফিরদের শাস্তি দিলেন। কাফিরদের জন্যে এমনি শাস্তিই নির্ধারিত।'[৮৩]

দায়িত্ব মুক্তি ও সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা সম্বলিত ভয়ংকর নীতি কার্যকর করার ফলে সারা আরবে সর্বত্র যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে এবং তার মোকিবালা করা অসম্ভব হবে বলে যারা আশংকা করছিল তাদেরকে বলা হচ্ছে, এসব অমূলক ভয়ে ভীত হচ্ছো কেন? এর চাইতেও বেশী কঠিন বিপদের সময় যে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন তিনি এখনো তোমাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছেন। এ কাজ যদি তোমাদের শক্তির ওপর নির্ভর করতো তাহলে এর আর মক্কা সীমানা পার হতে হতো না। আর না হোক, বদরের ময়দানে তো খতমই হয়ে যেতো। কিন্তু এর পেছনে তো রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর শক্তি। আর অতীতের অভিজ্ঞতাসমূহ তোমার কাছে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এখনো পর্যন্ত আল্লাহর শক্তিই এর উন্নতি ও বিকাশ সাধন করে এসেছে। কাজেই নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো, আজো তিনিই একে উন্নতি ও অগ্রগতি দান করবেন।

এখানে হুনায়েন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এ যুদ্ধটি ৮ হিজরীর শওয়াল মাসে এ আয়াতগুলো নাযিলের মাত্র বার তের মাস আগে মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে হুনায়েন উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ছিল ১২ হাজার সৈন্য । এর আগে কোন যুদ্ধে মুসলমানদের এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য জামায়েত হয়নি। অন্যদিকে কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু এ সত্ত্বেও হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাজরা যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিল। মুসলিম সেনাদলে মরাত্মক বিশৃংখলা দেখা দিল। তারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটতে লাগলো। এ সময় শুধুমাত্র নবী (সা) এবং মুষ্টিমেয় কতিপয় মরণপণ সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ ছিলেন তাদের অবিচলতার ফলেই সেনাবাহিনী পুনর্বার সংগঠিত হলো এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করলো। অন্যথায় মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানরা যে পরিমাণে লাভবান হয়েছিল হুনায়েনে তাদেরকে তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হতে হতো।[৮৪]

---

৮৩. আল-কুর'আন, ৯ঃ ২৫-২৬

৮৪. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী *আর রাহীকুল মাখতুম*, (অনু. খাদিজা আক্তার রেজায়ী), আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ঢাকা : চতুর্থ প্রকাশ- ২০০০, পৃ. ৪৬৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি ও ভৌগোলিক অবস্থান

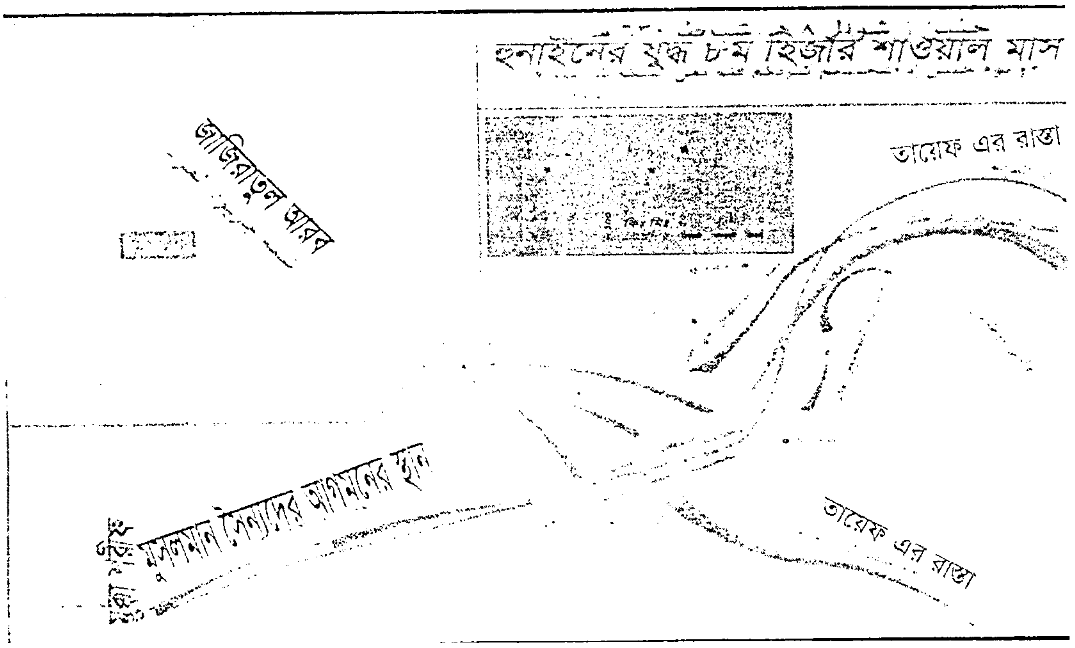

হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার স্থান

হুনাইনের যুদ্ধে মক্কা বিজয়ের প্রভাব

হযরত (স)-এর দয়া সুলভ আচরণ এং মুসলমানদের সাথে মেলামেশার ফলে একদিকে মক্কায় দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো, অন্যদিকে তামাম আরব গোত্রের ওপর বিজয়ের এর বিরাট প্রভাব পড়লো। তারা বুঝতে পারলো, ইসলামের প্রতি আহবানকারী বাস্তবিকই ধন-দৌলত বা রাজত্বের কোনো কাঙাল নন; বরং তিনি আল্লাহরই পয়গাম্বর। পরন্ত এ সময়ে ইসলাম ও তার বৈশিষ্ট্য কোনো চোরা-গুপ্ত জিনিস ছিলো না; বরং ইসলামী আদর্শের স্বরূপটা প্রায় গোটা আরব দেশই জেনে ফেলেছিলো। যাদের হৃদয়ে বুঝবার শক্তি ছিলো, তারা বুঝে নিয়েছিলো যে, এই হচ্ছে আসল সত্য। তাই মক্কা বিজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরবের দূর-দূরাঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এসে ইসলাম কবুল করতে লাগলো। এতদসত্ত্বেও যে সব লোকের অন্তরে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্তমান ছিলো, তারা এ দৃশ্য দেখে যারপর নাই অস্থির হয়ে উঠলো। তাদের ভেতরে বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। এদিক দিয়ে হুনাইনের অধিবাসী হাওয়াজেন ও সাকীফ নামক দুটি গোত্র অত্যন্ত অগ্রবর্তী ছিলো।

তারা এমনিতেও খুব যুদ্ধবাজ লোক ছিলো; তদুপরি ইসলামের অগ্রগতি দেখে তারা আরো অস্থির হয়ে পড়লো। তারা স্পষ্টত বুঝতে পারলো, মক্কার পর এবার তাদের পালা। তাই উভয় গোত্রের প্রধানদ্বয় একত্র হয়ে পরামর্শ করলো এবং এই সিদ্ধান্ত নিলো যে, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, দৃঢ়তার সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে হবে। কারণ ক্রমবর্ধমান বিপদকে প্রতিরোধ করতে না পারলে তাদের কল্যাণ নেই। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা মালিক ইবনে আওফ নাযারী নামক তাদের জনৈক সর্দারকে বাদশাহ মনোনীত করলো এবং মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করে দিলো। এ ব্যাপারে তারা আরো বহু গোত্রকে নিজেদের সঙ্গী বানিয়ে নিলো।

Dhaka University Institutional Repository

হুনাইনের যুদ্ধ

এ প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে নবী করীম (স)-ও সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই ক্রমবর্ধমান ফিতনাকে সময় থাকতেই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অষ্টম হিজরীর ১০ শাওয়াল প্রায় বারো হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে হযরত (স) দুশমনের মুকাবিলার জন্যে রওয়ানা হলেন। ঐ সময় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো বিপুল আর তাদের যুদ্ধ-সরঞ্জামও ছিলো প্রচুর। এটা দেখেই তাদের মনে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মালো যে, দুশমনরা তাদের মুকাবিলা করতে কিছুতেই সমর্থ হবে না; বরং অচিরেই তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এমন কি, কোনো কোনো মুসলমানের মুখ থেকে এ উক্তি পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লো : 'আজ আর আমাদের ওপর কে জয়লাভ করতে পারে কিন্তু এরূপ ধারণা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কিছুমাত্রও সামঞ্জস্যশীল ছিল না। কারণ তাদের কখনো আপন শক্তি-সামর্থ্যের ওপর ভরসা করা উচিত নয়। তাদের শক্তি হওয়া উচিত শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও করুণা। কুর'আন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ -
ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ -

'হুনাইনের দিনকে স্মরণ করো, যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যতে তুষ্ট ছিলে; কিন্তু তাতে তোমাদের কোনো কাজ হয়নি; বরং জমিন প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো এবং তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের ওপর নিজের তরফ থেকে সান্ত্বনা ও প্রশান্তির ভাবধারা নাযিল করলেন এবং তোমরা দেখতে পাওনি এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে কাফিরদের শাস্তি দিলেন। কাফিরদের জন্যে এমনি শাস্তিই নির্ধারিত।'[৮৫]

হুনাইন হচ্ছে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। এখানেই এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা সামনে আসা মাত্র দুশমনরা আশ-পাশের পাহাড় থেকে এলোপাথাড়ি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। এ পরিস্থিতির জন্যে মুসলমানরা মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। এর ফলে তাদের সৈন্যদলে বিশৃংখলা দেখা দিলো এবং কিছুক্ষণের জন্যে তারা ময়দান ত্যাগ করলো। অনেক বেদুইন গোত্র ময়দান থেকে পালিয়ে গেলো। এদের মধ্যে সবেমাত্র ঈমান এনেছে এবং পূর্ণ প্রশিক্ষণ পায়নি এমন অনেক নও-মুসলিমও ছিলো।

এই বিশৃংখল পরিস্থিতিতে হযরত (স) অত্যন্ত দৃঢ়তা ও প্রশান্ত চিত্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং দুশমনদের মুকাবিলা করা ও ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার জন্যে মুসলমানদের প্রতি ক্রমাগত আহ্বান জানাতে লাগলেন। তাঁর এই অপূর্ব ধৈর্য-স্থৈর্য এবং তাঁর চারপাশে বহু সাহাবীর অকৃত্রিম দৃঢ়তা দেখে মুসলিম সৈন্যরা পুনরায় ময়দানে আসতে শুরু করলো এবং নবতর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীদের এই ধৈর্য ও দৃঢ়তাকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তরফ থেকে অবতীর্ণ সান্ত্বনা ও প্রশান্তির লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। এর ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো এবং মুসলমানরা পুরোপুরি জয়লাভ করলো। কাফিরদের প্রায় ৭০ ব্যক্তি নিহত এবং সহস্রাধিক লোক বন্দী হলো।

---

৮৫. আল-কুর'আন, ৯ঃ ২৫.২৬

দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন ও কল্যাণ কামনা

কাফিরদের বাকি সৈন্যদের পালিয়ে গিয়ে তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করলো। কারণ তায়েফকে একটি নিরাপদ স্থান মনে করা হতো। হযরত (স) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং তায়েফ অবরোধ করলেন। তয়েফে একটি মশহুর ও মজবুত দুর্গ ছিলো। এর ভেতরেই কাফিরগণ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। অবরোধ প্রায় বিশ দিন অব্যাহত রইলো। হযরত (স) যখন ভালোমতো বুঝতে পারলেন যে, দুশমনদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে এবং এখন আর তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার কোনো আশংকা নেই, তখন তিনি অবরোধ তুলে নিলেন এবং তাদের জন্যে দোআ করলেন : 'হে আল্লাহ! সাকীফ গোত্রকে সুপথ প্রদর্শন করো এবং তাদেরকে আমার কাছে হাযির হবার তাওফিক দাও।' কেবল দ্বীন-ইসলামের জন্যে সংগ্রামকারী খোদার নবী ছাড়া কে এমনি পরিস্থিতিতে একখানি দয়ার্দ্র হৃদয় ও স্নেহশীল হতে পারে এবং বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে কল্যাণ কামনা করতে পারে?[৮৬]

নীল নদ

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত অর্থসহ:

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ -

তাই আমি তাদের থেকে বদলা নিয়েছি এবং তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি। কারণ তারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলেছিল এবং সেগুলোর ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল।[৮৭]

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا
إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ -

বনী ইসরাঈলকে আমি সাগর পার করে দিয়েছি। তারপর তারা চলতে চলতে এমন একটি জাতির কাছে উপস্থিত হলো যারা নিজেদের কতিপয় মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। বনী ইসরাঈল বলতে লাগলোঃ হে মূসা! এদের মাবূদের মত আমাদের জন্যে একটা মাবূদ বানিয়ে দাও। মূসা বললোঃ তোমরা বড়ই অজ্ঞের মত কথা বলছো।[৮৮]

---

৮৬. আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, (অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), নাকিব পাবলিকেশন, ঢাকা: সর্বশেষ ২০০৬

৮৭. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১৩৬

৮৮. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বনী ইসরাঈল যে স্থান থেকে লোহিত সাগর অতিক্রম করেছিল সেটি ছিল সম্ভবত বর্তমান সুয়েজ ও ইসমাঈমীয়ার মধ্যবর্তী কোন একটি স্থান্ এখান থেকে লোহিত সাগর পার হয়ে তারা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে উপকূলের কিনারা ঘেষে রওয়ানা হয়েছিল। সে সময় সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম ও উত্তরাংশ মিসরের শাসনাধীন ছিল। দক্ষিনের এলাকায় বর্তমান তূর শহর ও আবু যানীমার মধ্যবর্তী স্থানে তামা ও নীলাম পাথরের খনি ছিল।

এ খনিজ সম্পদ দ্বারা মিসরবাসী প্রচুর লাভবান হতো। এ খনিগুলো সংরক্ষন করার জন্যে মিসরীয়রা কয়েক জায়গায় টহলদার চৌকি স্থাপন করেছিল। মাফকাহ নামক স্থানে এ ধরনের একটি চৌকি ছিল। এখানে ছিল মিসরীয়দের একটি বিরাট মন্দির। উপদ্বিপের দক্ষিণ -পশ্চিম অঞ্চলে এখনো এর ধ্বংসাবশেষে পাওয়া যায়। এর কাছাকাছি আর একটি স্থানে প্রাচীন সিরিয় জাতিসমূহের চন্দ্রদেবীর মন্দির ছিল ।সম্ভবত এরই কোন একটি জায়গা দিয়ে যাবার সময় দীর্ঘকাল মিসরীয়দের গোলামীতে জীবন যাপন করার কারণে মিসরীয় পৌত্তলিক ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মনে একটি কৃত্রিম খোদার প্রয়োজন অনুভূম হয়ে থাকবে।

মিসরবাসীদের দাসত্ব বনী ইসরাঈলীদের মনমানসকে কিভাবে বিকৃত করে দিয়েছিল। নিম্নোক্ত বিষয়টি থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। মিসর থেকে বের হয়ে আসার ৭০ বছর পর হযরত মূসার প্রথম খলীফা হযরত ইউসা ইবনে নূন বনী ইসরাঈলীদের সাধারণ সমাবেশে তাঁর শেষ ভাষনে বলেনঃ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎ সংকল্প ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর উপাসনা করো। আর তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা বড় নদীর (ফোরাত) ওপারে ও মিসরে যেসব দেবতার পুজা করতো তাদেরকে বাদ দাও। আর একমাত্র আল্লাহর ইবাদত যদি তোমাদের খারাপ লাগে তাহলে তোমরা যার উপাসনা করবে আজই তাকে মনোনীত করে নাও।..এখনো রইলো আমার ও আমার পরিবারবগের্র কথা, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করতে থাকবো"।[৮৯]

এ থেকে বুঝা যায় যে, ফেরাউন শাসিত মিসরের দাসত্বের যুগে এ জাতির শিরা উপশিরা পৌত্তিকতার যে প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, ৪০ বছর পর্যন্ত হযরত মূসার এবং ২৮ বছর পর্যন্ত হযরত ইউশার অধীনে শিক্ষা ও অনুশীলন লাভ এবং তাঁদের নের্তৃত্ব জীবন পরিচালনা করার পরও তা দূর করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় তারা নিজেদের সাবেক প্রভুদেরকে এসব মূত্তির পদতলে মাথা ঘষতে দেখেছে, মিসর থেকে বের হয়ে সাথে সাথেই সেই ধরনের মূর্তি দেখে তার সামনে মাথা নোয়াতে এসব বিকৃতমনা ও পথভ্রষ্ট মুসলমানরা যে উদগ্রীক হয়ে উঠবে না, সেটা কেমন করেই বা সম্ভব

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى -

আমি মূসার কাছে অহী পাঠালাম যে, এবার রাতারাতি আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে পড়ো এবং তাদের জন্য সাগরের বুকে শুকনা সড়ক বানিয়ে নাও। কেউ তোমাদের পিছু নেয় কিনা সে ব্যাপারে একটুও ভয় করো না, এবং (সাগরের মাঝখান দিয়ে পার হতে গিয়ে) শংকিত হয়ো না।[৯০]

---

৮৯. যিহোশূয় ২৪: ১৪-১৫
৯০. আল-কুর'আন, ২০ঃ ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ -

পিছন থেকে ফেরাউন তার সেনাবাহীনি নিয়ে পৌঁছলো এবং তৎক্ষণাত সমুদ্র তাদের উপর ছেয়ে গেলো যেমন ছেয়ে যাওয়া সমীচীন ছিল।[৯১]

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ -

সমুদ্রকে আপন অবস্থায় উন্মুক্ত থাকতে দাও। এই পুরো সেনাবাহিনী নিমজ্জিত হবে।[৯২]

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ -

আমি মূসাকে ওহীর মাধ্যমে হুকুম দিলাম, "মারো তোমার লাঠি সাগরের বুকে।" সহসাই সাগর দীর্ণ হয়ে গেল এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা হয়ে গেলো এক একটি বিশাল পাহাড়ের মতো।[৯৩]

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করে নিয়ে গেলাম। তারপর ফেরাউন ও তার সেনাদল জুলুম নির্যতন ও সীমালংঘন করার উদ্দেশ্য তাদের পেছনে চললো; অবশেষে যখন ফেরাউন ডুবতে থাকলো তখন বলে উঠলো, আমি মেনে নিলাম, নবী ইসরাঈল যার উপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, এবং আমিও আনুগত্যের শির নতকারীদের অন্তরভুক্ত।[৯৪]

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ -

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা সাগর চিরে তোমাদের জন্য পথ করে দিয়েছিলাম, তারপর তার মধ্য দিয়ে তোমাদের নির্বিঘ্নে পার করে দিয়েছিলাম, আবার সেখানে তোমাদের চোখের সামনেই ফেরাউনী দলকে সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।[৯৫]

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ -

আরো স্মরণ করো যখন আমরা বলেছিলাম, "তোমাদের সামনের এই জনপদে প্রবেশ করো এবং সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেমন ইচ্ছা খাও মজা করে। কিন্তু জনপদের দুয়ারে সিজদানত হয়ে প্রবেশ করবে 'হিত্তাতুন' 'হিত্তাতুন' বলতে বলতে। আমরা তোমাদের ত্রুটিগুলো মাফ করে দেবো এবং সৎকর্মশীলদের প্রতি অত্যধিক অনুগ্রহ করবো।"[৯৬]

---

৯১. আল-কুর'আন, ২০ঃ ৭৮
৯২. আল-কুর'আন, ৪৪ঃ ২৪
৯৩. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ৬৩
৯৪. আল-কুর'আন, ১০ঃ ৯০
৯৫. আল-কুর'আন, ২ঃ ৫০
৯৬. আল-কুর'আন, ২ঃ ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

এখনো পর্যন্ত যথার্থ অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ জনপদটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি । তবে যে ঘটনা পরম্পরায় এর উল্লেখ হয়েছে তা এমন এক যুগের সাথে সম্পর্কিত যখন বনী ইসরাঈল সাইনা উপদ্বীপেই অবস্থান করছিল। তাতেই মনে হয়, উল্লেখিত জনপদটির অবস্থান এ উপদ্বীপের কোথাও হবে । কিন্তু এ জনপদটি 'সিত্তীম' ও হতে পারে। 'সিত্তীম শহরটি 'ইয়ারীহো'-এর ঠিক বিপরীত দিকে জর্দান নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল। বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে, বনী ইসরাঈলরা মূসার (আ) জীবনের শেষ অধ্যায়ে এ শহরটি জয় করেছিল। সেখানে তারা ব্যাপক ব্যভিচার করে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ভয়াবহ মহামারীর শিকারে পরিণত করেন এবং এতে চব্বিশ হাজার লোকের মৃত্যু হয় ।[৯৭]

পরিচিতি

নীল নদ (আরবি: النيل আন-নীল, মিশরীয় আরবি উপভাষায় el nil; প্রাচীন মিশরীয় ভাষা ইতেরু), আফ্রিকা মহাদেশের একটি নদী। এটি বিশ্বের দীর্ঘতম নদী। এর দুইটি উপনদী রয়েছে, শ্বেত নীল নদ ও নীলাভ নীল নদ। এর মধ্যে শ্বেত নীল নদ দীর্ঘতর। শ্বেত নীল নদ আফ্রিকার মধ্যভাগের হ্রদ অঞ্চল হতে উৎপন্ন হয়েছে। এর সর্বদক্ষিণের উৎস হল দক্ষিণ রুয়ান্ডাতে 2°16′55.92″S, 29°19′52.32″E, এবং এটি এখান থেকে উত্তর দিকে তাঞ্জানিয়া, লেক ভিক্টোরিয়া, উগান্ডা, ও দক্ষিণ সুদানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নীলাভ নীল নদ ইথিওপিয়ার লেক তানা হতে উৎপন্ন হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে সুদানে প্রবেশ করেছে। দুইটি উপনদী সুদানের রাজধানী খার্তুমের নিকটে মিলিত হয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থান

নীল নদ

৯৭. গণনা পুস্তক, ২৫ অনুচ্ছেদ, ১-৮ শ্লোক

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

মূলে (كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় বড় পাহাড়কে طَوْدٌ (তওদ) বলা হয়। লিসানুল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে- 'তওদ' মানে বিশাল পাহাড়। কাজেই এর পরে আবার عَظِيْم গুণবাচক শব্দটি ব্যবহার করার অর্থ দাঁড়ায়-পানি উভয় দিকে খুব উঁচু উঁচু পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর আমরা এ বিষয়টিও চিন্তা করি যে, মূসার লাঠির আঘাতে সমুদ্রে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। এ কাজটি একদিকে বনী ইসরাঈলের সমগ্র কাফেলাটির সাগর অতিক্রম করার জন্য করা হয়েছিল এবং অন্যদিকে এর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সমস্ত সৈন্য সামন্তকে ডুবিয়ে দেয়া। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, লাঠির আঘাতে পানি বিশাল উঁচু পাহাড়ের আকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং এতটা সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল, যতটা সময় লেগেছিল হাজার হাজার লাখো লাখো বনী ইসরাঈল তার মধ্য দিয়ে সাগর সাগর অতিক্রম করতে। তারপর ফেরাউনের সমগ্র সেনাবাহিনী তার মাঝখানে পৌঁছে গিয়েছিল। একথা সুস্পষ্ট, সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যে ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হয় তা যতই তীব্র ও বেগবান হোক না কেন তার প্রভাবে কখনো সাগরের পানি এভাবে বিশাল পাহাড়ের মতো এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না। এরপর আরো সূরা তা-হা-এ বলা হয়েছে- (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا) "তাদের জন্য সমুদ্রের বুকে শুকনো পথ তৈরী করে দাও।"[৯৮]

এর অর্থ দাঁড়ায়, সাগরের উপর লাঠির আঘাত করার কারণে কেবল সাগরের পানি ফাঁক হয়ে গিয়ে দু'দিকে পাহাড় সমান উঁচু হয়ে যায়নি বরং মাঝখানে যে পথ বের হয় তা শুকনো খটখটেও হয়ে যায় এবং কোথাও এমন কোন কাদা থাকেনি যার উপর দিয়ে হেঁটে চলা সম্ভব নয়। এ সংগে সূরা দু'খানের ২৪ আয়াতের এ শব্দগুলোও প্রণিধানযোগ্য যেখানে আল্লাহ্ মূসাকে নির্দেশ দেন-

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ -

সমুদ্র অতিক্রম করার পর "তাকে এ অবস্থার উপর ছেড়ে দাও, ফেরাউনের সেনাদল এখানে নিমজ্জিত হবে।"[৯৯]

এ থেকে বুঝা যায় যে, মূসা সমুদ্রের অপর পাড়ে উঠে যদি সমুদ্রের উপর লাঠির আঘাত করতেন, তাহলে উভয় দিকে খাড়া পানির দেয়াল ভেংগে পড়তো এবং সাগর সমান হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ্ তাঁকে এরূপ করতে নিষেধ করেন, যাতে ফেরাউনের সেনাদল এ পথে নেমে আসে এবং তারপর পানি দু'দিক থেকে এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়। এটি একটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন মু'জিযার বর্ণনা। যারা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের আওতায় এ ঘটনাটির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাদের চিন্তার গলদ এ থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

---

৯৮. আল-কুর'আন, ২০:৭৭
৯৯. আল-কুর'আন, ৪৪: ২৪

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক গুরুত্ব
ফেরআউনের নিমজ্জন

হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, ভয় করিও না, আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা সত্য। তিনি অবশ্যই তোমাদিগকে নাজাত দিবেন, পরিশেষে তোমরাই সফলকাম হইবে। অতঃপর মুসা (আ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত উঠাইয়া দো'আ করিলেন। আল্লাহ্ পাকের ওহী মূসা (আ)-কে আদেশ করিল, তোমরা লাঠি দ্বারা সমুদ্রের পানির উপর আঘাত কর, তাহা হইলে মধ্যস্থলে পথ বাহির হইবে। যখন তিনি লোহিত সাগরের বুকে স্বীয় লাঠি দ্বারা আঘাত করিলেন, তৎক্ষনাৎ পানি দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুই পার্শ্বে দুই পাহাড়েরর মত দাঁড়াইয়া গেল মধ্যস্থলে রাস্তা বাহির হইল এবং হযরত মূসার আদেশে বনী ইসরাঈলরা উহাতে নামিয়া পড়িল এবং শুক্না পথের মত উহার উপর দিয়া হাঁটিয়া সমুদ্রের অপর পারে চলিয়া গেল। ফেরআউন ইহা দেখিয়া নিজ কাওমকে বলিল, ইহা আমারই মহিমা যে, তোমরা বনী ইসরাঈলকে যাইয়া ধরিয়া ফেলিবে, অতএব, তোমরা চল। ফেরআউন এবং তাহার সেনাবাহিনী বনী ইসরাঈলের পিছে পিছে সেই পথেই নামিয়া পড়িল। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের মহিমা দেখুন, বনী ইসরাঈলরা যখন প্রত্যেকে অপর পারে নিরাপদে পৌঁছিয়া গেল, তখন পানি আল্লাহ্ পাকের আদেশে পুনরায় নিজের আসল অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। এদিকে ফেরাআউন ও তাহার গোটা সেনাবাহিনী, যাহারা এখনও মধ্য সমুদ্রে ছিল, নিমজ্জিত হইয়া গেল।[১০০]

ফেরআউন যখন ডুবিতে লাগিল এবং আযাবের ফেরেশ্তাদিগকে সম্মুখে দেখিতে লাগিল। তখন ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "আমি সেই ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু'র উপর ঈমান আনিতেছি, যাঁহার উপর বনী ইসরাঈলগণ ঈমান আনিয়াছে আর আমি আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দাগণের দলভুক্ত।" কিন্তু এই ঈমান যেহেতু প্রকৃত ঈমান ছিল না; বরং অতীতকারের ধোঁকাবাজির মত মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ইহাও একটি অস্থিরতামূলক উক্তি ছিল। সুতরাং আল্লাহ্ পাকের তরফ হইতে জবাব আসিল :

الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ -

"এখন ইহা বলিতেছ, অথচ ইহার পূর্বে যখন স্বীকার করার সময় ছিল, তখন অস্বীকার এবং বিরোধিতা করিতেই রহিয়াছিলে। আর প্রকৃতপক্ষে তুমি ফাসাদ বিস্তারকারীদের মধ্যে ছিলে।"[১০১]

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা বেশ অবগত আছেন যে, তুমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নও; বরং ফাসাদ বিস্তারকারীদের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে ফেরআউনের এই সম্বোধন তেমনি সম্বোধন ছিল, যাহা ঈমান আনয়ন এবং দৃঢ় বিশ্বাস লাভের উদ্দেশ্যে নহে; বরং ইহা তাহাই যাহা আল্লাহর আযাব স্বচক্ষে দর্শনের পর বাধ্যতামূলক ও স্বাধীন ইচ্ছাবিহীন অবস্থায় মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়। বস্তুত: আযাব স্বচক্ষে দর্শন করার সময় তাহার এই ঈমান আনয়নের ঘোষণা হযরত মূসা (আ.)-এর সেই দো'আরই ফল ছিল, যাহার উল্লেখ পাঠকগণ পিছনের পৃষ্ঠাসমূহে পাঠ করিয়াছেন

---

১০০. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ১০৭, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

১০১. আল-কুর'আন, ১০: ৯১

Dhaka University Institutional Repository

فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم - قال قد أجيبت دعوتكما -

"অতএব, তারা যেন ঈমান আনয়ন না করে তখন পর্যন্ত যখন তারা নিজেদের চোখে আল্লাহর আযাব এবং নিজেদের ধ্বংস দেখে লয়। এই দো'আর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন, নিঃসন্দেহ, তোমাদের উভয়ের দো'আ কবুল করে নেয়া হল।"[১০২]

এস্থলে ফেরআউনের সম্বোধনের উত্তরে আল্লাহর দরবার হইতে ইহাও উত্তর প্রদান করা হয়েছিল

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية -

"আজ আমি তোমার দেহকে নাজাত দিব, যেন তুমি উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত হও ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা তোমার পিছনে আসবে।"[১০৩]

অতএব, যদি অতীতকালের মিসরীয় শিলালিপির বিষয়বস্তু শুদ্ধ হইয়া থাকে যে, মিন্‌ফাতাহ্ (দ্বিতীয় রীমসীস)-ই মূসা (আ)-এর যমানার ফেরআউন ছিল, তবে তো নিঃসন্দেহে, তার লাশ আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে। কিছুক্ষণ সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকার কারণে মাছ তার নাক খেয়ে ফেলেছিল এবং আজও তা মিসরের জাদুঘরে বিশিষ্ট ও সাধারণ শ্রেণীর দর্শকদের জন্য তামাশার বস্তু হয়ে রয়েছে।

আর যদি মেনে নেয়া হয় যে, এই লাশটি সেই ফেরআউনের নয়, তবুও আয়াতটির ভাবার্থ নিজের স্থানে সঠিক রয়েছে। কেননা, তাওরাতে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলগণ নিমজ্জিত মিসরীদের লাশ সাগরের তীরের উপর পতিত অবস্থায় স্বচক্ষে দেখেছিল : "আর ইসরাঈলীরা মিসরীয়দের লাশগুলিকে সমুদ্র তীরে মৃতাবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিল।"[১০৪]

---

১০২. আল-কুর'আন, ১০: ৮৮-৮৯

১০৩. আল-কুর'আন, ১০: ৯২

১০৪. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ১০৭, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত নূহ (আ)-এর কিস্তি

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত অর্থসহ

فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين -

তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, ফলে আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় ছিল সবাইকে রক্ষা করেছি এবং তাদেরকেই পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি আর যার আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছে। কাজেই যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল (এবং তারপরও তারা মেনে নেয়নি) তাদের পরিণাম কি দেখো।[১০৫]

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون -

অতঃপর আমি তাকে ওহীর মাধ্যমে আদেশ করলাম : তুমি নৌকা তৈরী কর আমার দৃষ্টির সামনে ও আমার আদেশে। তারপর যখন আমার আদেশ এসে যাবে ও চুলার নিম্ন থেকে পানি উথলে উঠতে থাকবে, তখন নৌকায় তুলে নেবে প্রত্যেক প্রকার প্রাণী থেকে এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকেও, তবে তাকে ছাড়া যার ব্যাপারে পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়েগেছে। আর তুমি আমাকে জালিমদের সম্পর্কে কিছু বলনা, তারা তো নিমজ্জিত হবেই।[১০৬]

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين -

তারপর যখন তুমি নিজের সাথীদের নিয়ে নৌকায় আরোহণ করবে তখন বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন জালেমদের হাত থেকে।[১০৭]

وحملناه على ذات ألواح ودسر -

আর আমি নূহকে আরোহণ করালাম তক্তা ও পেরেক বিশিষ্ট নৌযানে।[১০৮]

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين -

আর নির্দেশ দেয়া হল- হে পৃথিবী : তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ ক্ষান্ত হও। পানি হ্রাস করার হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল। জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, দুরাত্মা কাফেররা নিপাত যাক।[১০৯]

---

১০৫. আল-কুর'আন, ১০ঃ ৭৩
১০৬. আল-কুর'আন, ২৩ঃ ২৭
১০৭. আল-কুর'আন, ২৩ঃ ২৮
১০৮. আল-কুর'আন, ৫৪ঃ ১৩
১০৯. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا -

তোমরা তাদের আওলাদ যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় উঠিয়েছিলাম এবং নূহ একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল।[১১০]

পরিচিতি

জুদী পাহাড়টি কুর্দিস্তান অঞ্চলে ইবনে উমর দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। বাইবেলে উল্লেখিত নৌকার অবস্থান স্থলের নাম আরারত বলা হয়েছে। এটি আর্মেনিয়ার একটি পাহাড়েরও নাম এবং একটি পাহাড় শ্রেণীর নামও। পাহাড় শ্রেণী বলতে যে আরারতের কথা বলা হয়েছে সেটি আর্মেনিয়ার উচ্চ মালভূমি থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে কুর্দিস্থান পর্যন্ত চলে গেছে। এ পাহাড় শ্রেণীর একটি পাহাড়ের নাম জুদী পাহাড়। আজো এ পাহাড়টি এ নামেই পরিচিত। প্রাচীন ইতিহাসে এটাকেই নৌকা থামার জায়গা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ) এর জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে বেরাসাস (BERASUS) নামে ব্যবিলনের একজন ধর্মীয় নেতা পুরাতন কুলদানী বর্ণনার ভিত্তিতে নিজের দেশের যে ইতিহাস লেখেন তাতে তিনি জুদী নামক স্থানকেই নূহের নৌকা থামার জায়গা হিসেবে উল্লেখ করেন। এরিষ্টটলের শিষ্য এবিডেনাস (ABYDENUS) ও নিজের ইতিহাস গ্রন্থে একথা সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি নিজের সময়ের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইরাকে বহু লোকের কাছে এ নৌকার অংশ বিশেষ রয়েছে। সেসব ধুয়ে তারা রোগ নিরাময়ের জন্য রোগীদের পান করায়।

এখানে যে প্লাবনের কথা বলা হয়েছে সেটি কি সারা পৃথিবীব্যাপী ছিল অথবা যে এলাকায় নূহের সম্প্রদায়ের অধিবাস ছিল কেবল সেই এলাকাভিত্তিক ছিল? এটি এমন একটি প্রশ্ন যার মীমাংসা আজো হয়নি। ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোর কারণে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এ প্লাবন এসেছিল সারা দুনিয়া জুড়ে।[১১১]

কিন্তু কুর'আনের কোথাও একথা বলা হয়নি। কুর'আনের ইংগিতসমূহ থেকে অবশ্যি একথা জানা যায় যে, নূহের প্লাবন থেকে যাদেরকে রক্ষা করা হয়েছিল পরবর্তী মানব বংশ তাদেরই আওলাদ।

কওমে নূহ-এর এলাকা ও জুদী পাহাড়

কিন্তু এথেকে একথা প্রমাণ হয় না যে, প্লাবন সারা দুনিয়া জুড়ে এসেছিল। কেননা একথা এভাবেও সত্য হতে পারে যে, সে সময় দুনিয়ার যে অংশ জুড়ে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল প্লাবন সে অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর প্লাবনের পরে মানুষের যে বংশধারার উন্মেষ ঘটেছিল তারাই ধীরে ধীরে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ মতবাদের সমর্থন দু'টি জিনিস থেকে পাওয়া যায়। এক, ঐতিহাসিক বিবরণ, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও মৃত্তিকাস্তরের ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দাজলা ও ফোরাত বিধৌত এলাকায় একটি মহাপ্লাবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সারা দুনিয়ার সমস্ত অংশ জুড়ে কোন এক সময় একটি মহাপ্লাবন হয়েছিল এমন কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুই, সারা দুনিয়ার অধিকাংশ জাতির মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে একটি মহাপ্লাবনের কাহিনী শ্রুত হয়ে আসছে। এমন কি অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও নিউগিনির মতো দূরবর্তী দেশগুলোর পুরাকালের কাহিনীতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোন এক সময় এসব জাতির পূর্বপুরুষরা পৃথিবীর একই ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিল এবং তখন সেখানেই এ মহাপ্লাবন এসেছিল। তারপর যখন তাদের বংশধররা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল তখন এ ঘটনার কাহিনীও তারা সংগে করে নিয়ে গিয়েছিল।[১১২]

---

১১০. আল-কুর'আন, ১৭ঃ ৩

১১১. আদিপুস্তক ৭:১৮-২৪

১১২. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ১০৭, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ -

আর তুমি আমার সামনে আমার প্রত্যাদেশ মোতাবেক নৌকা নির্মাণ কর এবং যারা জুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেনা । তারা অবশ্যই নিমজ্জিত হবে ।[১১৩]

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ -

সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল । আর যখনই তার কওমের সর্দাররা তার পার্শ্ব দিয়ে যাতায়াত করত, তখনই তারা তার সাথে উপহাস করত ; সে বলত ঃ তোমরা যদি আমাদেরকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদের উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ ।[১১৪]

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ -

তারপর নৌকাখানি তাদের নিয়ে বয়ে চলল পর্বতসম তরঙ্গের মধ্যে; আর নূহ্ ডেকে বলল তাঁর পুত্রকে, যে ছিল পৃথক স্থানে ঃ হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেক না ।[১১৫]

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ -

অতঃপর আমি তাকে ও তার সাথে যারা বোঝাই নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম ।[১১৬]

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ -

অবশেষে আমি রক্ষা করলাম তাকে ও তার সঙ্গী নৌকারোহীদেরকে এবং এ ঘটনাকে করলাম একটি নিদর্শন বিশ্ববাসীর জন্য ।[১১৭]

---

১১৩. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৩৭
১১৪. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৩৮
১১৫. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৪২
১১৬. আল-কুর'আন, ২৬ঃ ১১৯
১১৭. আল-কুর'আন, ২৯ঃ ১৫

Dhaka University Institutional Repository

এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ ভয়াবহ শাস্তি অথবা এ যুগান্তকারী ঘটনাটিকে পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে এবং সূরা কামারে একথাটি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নৌকাটিই ছিল শিক্ষণীয় নিদর্শন। শত শত বছর ধরে সেটি পর্বত শৃঙ্গে অবস্থান করছিল। এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে যেতে থেকেছে যে, এ ভূখণ্ডে এক সময় এমন ভয়াবহ প্লাবন এসেছিল যার ফলে এ নৌকাটি পাহাড়ের মাথায় উঠে যায়। সূরা আল কামারে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ - تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ - وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ -

"আর নূহকে আমি আরোহণ করালাম তখতা ও পেরেকের তৈরি নৌকায়। তা চলছিল আমার তত্ত্বাবধানে সেই ব্যক্তির জন্য পুরস্কার স্বরূপ যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল। আর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম একটি নিদর্শনে পরিণত করে; কাজেই আছে কি কেউ শিক্ষা গ্রহণকারী ?"[১১৮]

সূরা আল কামারের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে জারীর কাতাদার এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেনঃ সাহাবীগণের আমলে মুসলমানরা যখন আল জাযীরায় যায় তখন তারা জুদী পাহাড়ের ওপর (অন্য একটি বর্ণনা মতে বাকেরওয়া নামক জনবসতির কাছে) এ নৌকাটি দেখে। বর্তমানকালে মাঝে মাঝে এ ধরনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখা গেছে যে, নূহের নৌকা অনুসন্ধান করার জন্য অভিযাত্রী দল পাঠানো হচ্ছে। এর কারণ বর্ণনা করে বলা হয়, অনেক সময় বিমান আরারাতের পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করার সময় আরোহীরা একটি পর্বতশৃঙ্গে একটি নৌকার মতো জিনিস দেখেছে।[১১৯]

পরিচিতি

আল্লাহ্ পাক হযরত নূহ্ (আ)-এর দো'আ কবুল করলেন এবং আমলের প্রতিফলের নিয়ম অনুযায়ী অবাধ্যদের অবাধ্যতার শাস্তির ঘোষণা করে দিলেন। আর মু'মেনদের রক্ষার জন্য প্রথমে হযরত নূহ্ (আ)-কে নির্দেশ দিলেন যে একটি নৌকা নির্মাণ কর ; যাতে বাহ্যিক কারণ হিসাবে তিনি এবং অনুগত মু'মেনগণ সেই শাস্তি হতে সুরক্ষিত থাকেন। তা অবাধ্য ও নাফরমান লোকদের প্রতি অচিরেই নাযিল হবে ; হযরত নূহ্ (আ) আল্লাহ্ পাকের আদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করতে আরম্ভ করলে তারা হাস্য বিদ্রূপ করতে লাগল। যখনই নির্মীয়মাণ নৌকার নিকট দিয়ে যাতায়াত করত তখনই বলত, চমৎকার! আমরা যখন নিমজ্জিত হতে আরম্ভ করব, তখন তুমি ও তোমার অনুসারীরা এই নৌকায় আরোহণ করে সুরক্ষিত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে ; কেমন নির্বোধসুলভ কল্পনা। হযরত নূহ্ (আ)-ও তাদের পরিণাম সম্বন্ধে অসতর্কতা এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার নাফরমানীর উপর দুঃসাহস দেখে তাদেরই অনুরূপ জবাব দিতেন এবং নিজের কাজে মনোযোগ দিতেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে খবরদার করে দিয়েছিলেন:

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ -

হে নূহ্! তুমি আমারই রক্ষণাবেক্ষণে আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করতে থাক। আর এখন আমাকে সম্বোধন করিয়া যালিমদের জন্য কোন সুপারিশ করিও না, নিঃসন্দেহে তারা নিমজ্জিত হবে।[১২০]

---

১১৮. আল-কুর'আন, ৫৪ঃ ১৩, ১৪, ১৫

১১৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., ১৩১১

১২০. আল-কুর'আন, ৫৪ : ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে নূহের (আ) নৌকা প্রস্তুত হয়ে গেল। এখন আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুত আযাব নাযিল হওয়ার সময় নিকতবর্তী হল। নূহ্ (আ) সেই প্রথম আলামত (নিদর্শন) দেখতে পেলেন, যা তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ ভূগর্ভ হতে পানি উৎলিয়ে উঠতে আরম্ভ করল। তখন আল্লাহ্ পাকের ওহী তাঁকে আদশে শুনাল- "নিজের বংশধরদিগকে নৌকায় আরোহণের আদেশ দাও। আর সমস্ত প্রাণীকূল হতে প্রত্যেক প্রকারের এক এক জোড়াও নৌকায় উঠিয়ে লও। (প্রায় ৪০ জনের) সেই ক্ষুদ্র দলটিকেও যারা তোমার উপর ঈমান আনয়ন করেছে নৌকায় আরোহণ করতে আদেশ দাও।

যখন আল্লাহ পাকের ওহী সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হল, তখন আসমানের প্রতি আদেশ হল, পানি বর্ষণ করতে আরম্ভ কর, আর যমিনের ফোয়ারাসমূহের প্রতি আদেশ হল, পূর্ণ মাত্রায় উৎলাতে থাক। আল্লাহ্ পাকের আদেশে যখন এ সবকিছু হতে থাকল, তখন নৌকা তাঁর হেফাযতে পানির উপর ভাসতে থাকল সে পর্যন্ত যে সমস্ত অবিশ্বাসী ও অবাধ্য লোকেরা পানিতে ডুবে গেল এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধিব্যবস্থা 'কর্ম-ফল' এর অনুযায়ী নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করল।[১২১]

ভৌগোলিক অবস্থান
ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين -

কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো। অবশেষে আমি তাকে ও তার সাথীদেরকে একটি নৌকায় (আরোহণ করিয়ে) রক্ষা করি এবং আমার আয়াতকে যারা মিথ্যা বলেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দেই। নিসন্দেহে তারা ছিল দৃষ্টিশক্তিহীন জনগোষ্ঠি।[১২২]

কুর'আনের বর্ণনাভংগীর সাথে যাদের ভাল পরিচয় নেই তারা অনেক সময় এ সন্দেহ পড়ে যান যে, সম্ভবত এই সমগ্র ব্যাপারটি একটি বা দুটি বৈঠকেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। গোটা কার্যধারা এরূপ ছিল বলে মনে হয় যে, নবী এলেন এবং তিনি নিজের দাওয়াত পেশ করলেন। লোকেরা আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপন করলো এবং তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর লোকেরা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখান করলো আর অমনি আল্লাহ আযাব পাঠিয়ে দিলেন।অথচ ব্যাপারটি ঠিক এমন নয়। যেসব ঘটনাকে যুথবদ্ধ করে এখানে মাত্র কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো সংঘটিত হতে সুদীর্ঘকাল ও বছরের পর বছর সময় লেগেছিল। কুর'আনের একটি বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি হচ্ছে, কুর'আন ও শুধুমাত্র গল্প বলার জন্যে ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনা করে যায় না বরং শিক্ষা দেবার জন্যে বর্ণনা করে যায়।তাই সর্বত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করার সময় কাহিনীর কেলমাত্র সেই অংশটুকুই কুর'আন উপস্থাপন করে, যার সাথে উদ্দেশ্য ও মূল বিষয়বস্তুর কোন সম্পর্ক থাকে।

---

১২১. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৬০, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

১২২. আল-কুর'আন, ৭: ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া কাহিনীর অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়। আবার যদি কোন কাহিনীকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকে তাহলে সর্বত্র উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন বিস্তারিত বিবরণও পেশ করে থাকে। যেমন এই নূহ্ আলাইহিস সালামের কাহিনীটির কথাই ধরা যাক। নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার ও তাকে মিথ্যুক বলার পরিণাম বর্ণনা করাই এখানে এর উদ্দেশ্য। কাজেই নবী যত দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিজের জাতিকে দাওয়াত দিতে থাকেছেন, সে কথা বলার এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যেখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে সবর করার উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বিশেষভাবে নূহ (আ)- এর দাওয়াতের দীর্ঘ সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে যাতে নবী (স) ও তাঁর সাথীগণ নিজেদের মাত্র কয়েক বছরের প্রচেষ্টা ও সাধনা ফলপ্রসূ হতে না দেখে হতোদ্যম না হয়ে পড়েন এবং অন্যদিকে তারা যেন নূহ আলাইহিস সালামের সবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, যিনি সুদীর্ঘকাল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশে সত্যের দাওয়াত দেয়া অব্যাহত রেখেছেন, এবং কোন সময় একটুও হতাশ হননি।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ -

আমি নূহকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই এবং সে তাদের মধ্যে থাকে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর; শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে ঘিরে ফেলে এমন অবস্থায় যখন তারা জালেম ছিল।[১২৩]

এখানে আর একটি সন্দেহ ও দেখা দেয়। এটি দূর করাও প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি যখন বারবার কুর'আনে পড়তে থাকে, অমুক জাতি নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল, নবী তাদেরকে আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হবার খবর দিয়েছিলেন এবং অকস্মাত একদিন আল্লাহর আযাব এসে সেই জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ সময় তার মনে প্রশ্ন জাগে, এ ধরনের ঘটনা এখন ঘটে না কেন? যদিও এখনো বিভিন্ন জাতির উত্থান পতন হয় কিন্তু এ উত্থান পতনের ধরনই আলাদা। এখন তো এমন হয় না যে, একটি সতর্কবানী উচ্চারণ করার পর ভুমিকম্প, প্লাবন বা ঝড় এলো এবং পুরো এক একটি জাতি ধ্বংস হয়ে গেলো। এর জবাবে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে একজন নবী সরাসরি যে জাতিকে দাওয়াত দেন তার ব্যাপারটি অন্য জাতিদের ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। যে জাতির মধ্যে কোন নবীর জন্ম হয়, তিনি সরাসরি তার ভাষায় তার কাছে আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দেন এবং নিজের নিখুঁত ব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমে নিজের বিশ্বস্ততা ও সত্যতার জীবন্ত আদর্শ তার সামনে তুলে ধরেন এতে করে তার সমানে আল্লাহর যুক্তি প্রমাণ তথা তার দাওয়াত পূর্ণরূপে উপস্থাপিত হয়েছে বলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় তার জন্যে ওযর -আপত্তি পেশ করার আর কোন অবকাশই থাকেনা।

আল্লাহর পাঠানো রসূলকে সামনা -সামনি অস্বীকার করার পর তার অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছে , যার ফলে ঘটনাস্থলেই তার সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেসব জাতির কাছে আল্লাহর বাণী সরাসরি নয় বরং বিভিন্ন মাধ্যমে এসে পৌছেছে তাদের ব্যাপারটির ধরন এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কাজেই নবীদের সময় যেসব ঘটনার অবতারণা হতে দেখা যেতো এখন যদি আর সে ধরনের কোন ঘটনা না ঘটে থাকে তাহলে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের পর নবুওয়াতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, কোন নবীকে সামনা সামনি প্রত্যাখ্যান করার পর কোন জাতির ওপর যে আযাব আসবে তেমনি ধরনের কোন আযাব যদি বর্তমানে কোন জাতির ওপর আসে তাহলে তাতেই বরং অবাক হতে হবে।

---

১২৩. আল-কুর'আন, ২৯: ১৪

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, বর্তমানে যেসব জাতি আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করছে এবং নৈতিক ও চিন্তাগত দিক দিয়ে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসা বন্ধ হয়ে গেছে প্রকৃতপক্ষে এখনো এসব জাতির ওপর আযাব আসছে; কখনো সতর্ককারী ছোট ছোট আযাব, আবার কখনো চূড়ান্ত ফায়সালাকারী বড় বড় আযাব। কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিস সালাম ও আসমানী কিতাবগুলোর মত এ আযাবগুলোর নৈতিক তাৎপর্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করছে না। বরং এর বিপরীত পক্ষে স্থূল দৃষ্টির অধিকারী বিজ্ঞানী, সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের একটি বিরাট গোষ্ঠী মানব জাতির ঘাড়ে চেপে বসে আছে। তারা এ ধরনের যাবতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা করে প্রাকৃতিক আইন বা ঐতিহাসিক কার্যকারণের মানদণ্ডে।

এভাবে তারা মানুষকে অচেতনতা ও বিস্মৃতির মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। তারা মানুষকে কখনো একথা বুঝার সুযোগ দেয় না যে, উপরে একজন আল্লাহ্ আছেন, তিনি অসৎকর্মশীল জাতিদেরকে প্রথমে তাদের অসৎকর্মের জন্যে সতর্ক করে দেন, তারপর যখন তারা তাঁর পাঠানো সতর্ক সংকেতসমূহ থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিজেদের অসৎকর্মে চালিয়ে যেতে থাকে অবিশ্রান্ত ভাবে, তখন তিনি তাদেরকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করেন।[১২৪]

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ -

শিগ্‌গীর তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব নাযিল হবে এবং কার ওপর এমন আযাব নাযিল হবে যা ঠেকাতে চাইলেও ঠেকানো যাবে না।[১২৫]

এটি একটি চমকপ্রদ ব্যাপার। এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, মানুষ দুনিয়ার বাইরের চেহারা দেখে কেমন প্রতারিত হয়। যখন নূহ আলাইহিস সালাম সাগর থেকে অনেক দূরে শুকনো স্থলভূমির ওপর নিজের জাহাজটি নির্মাণ করছিলেন তখন যথার্থই লোকদের দৃষ্টিতে তাঁর এ কাজটি অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয়ে থাকবে এবং তারা হয়তো হাসতে হাসতে বলে থাকবে, "মিয়া সাহেবের পাগলামী শেষ পর্যন্ত এতদূর পৌঁছে গেছে যে, এবার তিনি শুকনো ডাংগায় জাহাজ চালাবেন।" সেদিন তাদের কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, কয়েকদিন পরে সত্যিই এখানে জাহাজ চলবে।

তারা এ কাজটিকে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের মস্তিষ্ক বিকৃতির একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ গণ্য করে থাকবে এবং পরস্পরকে বলে থাকবে, যদি ইতিপূর্বে এ ব্যক্তির পাগলামির ব্যাপারে তোমাদের মনে কোন সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে এবার নিজের চোখে দেখে নাও কি কাণ্ডটা সে এখন করছে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য ব্যাপার জানতো এবং আগামীকাল এখানে জাহাজের কি রকম প্রয়োজন হবে একথা যার জানা ছিল সে উলটো তাদের অজ্ঞতা ও প্রকৃত ব্যাপার না জানা এবং তদুপরি তাদের বোকার মতো নিশ্চিন্ত থাকার ব্যাপারটি নিয়ে নিশ্চয়ই হেসে থাকবে।

---

১২৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হি., ৪৫১

১২৫. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

সে নিশ্চয়ই বলে থাকবে "কত বড় অজ্ঞ নাদান এ লোকগুলো, এদের মাথার ওপর উদ্যত মৃত্যুর খড়গ, আমি এদেরকে সাবধানও করে দিলাম যে সেই খড়গ মাথার ওপর পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং এরপর এদের চোখের সামনেই তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি নিজেও প্রস্তুতি গ্রহণ করছি কিন্তু এরা নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে এবং উলটো আমাকেই পাগল মনে করছে। এ বিষয়টিকে যদি একটু বিস্তারিতভাবে ভেবে দেখা যায় তাহলে বুঝা যাবে যে, দুনিয়ায় বাহ্যিক ও স্থূল জ্ঞানের আলোকে বুদ্ধিমত্তা ও নির্বুদ্ধিতার যে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয় তা প্রকৃত ও যথার্থ সত্য জ্ঞানের আলোকে নির্ধারিত মানদণ্ডের তুলনায় কত বেশী ভিন্নতর হয়ে থাকে। বাহ্য দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি দেখে, সে যে জিনিসটিকে চরম বুদ্ধিমত্তা মনে করে, প্রকৃত সত্যদর্শীর চোখে তা হয় চরম নির্বুদ্ধিতা। অন্যদিকে বাহ্যদর্শীর চোখে যে জিনিসটি একেবারেই অর্থহীন, পুরোপুরি পাগলামি ও নেহাত হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়, সত্যদর্শীর কাছে তা-ই পরম জ্ঞানগর্ভ, সুচিন্তিত ও গুরুত্বের অধিকারী এবং বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ দাবী হিসেবে পরিগণিত হয়।[১২৬]

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ -

অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেলো এবং চুলা উথলে উঠলো তখন আমি বললাম, "সব ধরনের প্রাণীর এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নাও। নিজের পরিবারবর্গকেও- তবে তাদের ছাড়া যাদেরকে আগেই চিহ্নিত করা হয়েছে - এতে তুলে নাও এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এতে বসাও। তবে সামান্য সংখ্যক লোকই নূহের সাথে ঈমান এনেছিল।[১২৭]

এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কুর'আনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায় সেটিকেই আমরা সঠিক মনে করি। কুর'আনের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, প্লাবনের সূচনা হয় একটি বিশেষ চুলা থেকে। তার তলা থেকে পানির স্রোত বের হয়ে আসে। তারপর একদিকে আকাশ থেকে মুশল ধারে বৃষ্টি হতে থাকে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায় মাটি ফুঁড়ে পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসতে থাকে। এখানে কেবল চুলা থেকে পানি উথলে ওঠার কথা বলা হয়েছে এবং সামনের দিকে গিয়ে বৃষ্টির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু সূরা 'কামারে' এর বিস্তরিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ - وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ -

"আমি আকাশের দরজা খুলে দিলাম। এর ফলে অনবরত বৃষ্টি পড়তে লাগলো। মাটিতে ফাটল সৃষ্টি করলাম। ফলে চারদিকে পানির ফোয়ারা বের হতে লাগলো। আর যে কাজটি নির্ধারিত করা হয়েছিল এ দু'ধরনের পানি তা পূর্ণ করার জন্য পাওয়া গেলো।"[১২৮]

---

১২৬. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৬০, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

১২৭. আল-কুর'আন, ১১ঃ ৪০

১২৮. আল-কুর'আন, ৫৪ঃ ১১, ১২

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া "তান্নুর" (চুলা) শব্দটির ওপর আলিফ-লাম বসানোর মাধ্যমে একথা প্রকাশ করা হয় যে, একটি বিশেষ চুলাকে আল্লাহ এ কাজ শুরু করার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই চুলাটির তলা ঠিক সময়মতো ফেটে পানি উথলে ওঠে। পরে এ চুলাটিই প্লাবনের চুলা হিসেবে পরিচিত হয়। সূরা মুমিনূনের ২৭ আয়াতে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, এ চুলাটির কথা আগেই বলে দেয়া হয়েছিল।

যেসব ঐতিহাসিক ও নৃ-বিজ্ঞানী সমগ্র মানবজাতির বংশধারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের তিন ছেলের সাথে সংযুক্ত করেন, এখান থেকে তাদের মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আসলে ইসরাঈলী পৌরণিক বর্ণনাগুলো এ বিভ্রান্তির উৎস। সেখানে বলা হয়েছে যে, নূহের প্লাবনের হাত থেকে হযরত নূহ (আ) ও তার তিন ছেলে এবং তাদের স্ত্রীরা ছাড়া আর কেউ রক্ষা পায়নি। কিন্তু কুর'আনের বহু জায়গায় একথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত নূহের পরিবার ছাড়া তাঁর কওমের বেশ কিছুসংখ্যক লোককেও, তাঁদের সংখ্যা সামান্য হলেও আল্লাহ প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাছাড়া কুর'আন পরবর্তী মানব সম্প্রদায়কে শুধুমাত্র নূহের বংশধর নয় বরং তাঁর সাথে নৌকায় যেসব লোককে আল্লাহ রক্ষা করেছিলেন তাদের সবার বংশধর গণ্য করেছে।[১২৯]

বলা হয়েছে-

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا -

"যাদেরকে আমি নৌকায় নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম তাদের বংশধর।"[১৩০]

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ -

"আদমের বংশধরদের মধ্য থেকে এবং নূহের সাথে যাদেরকে আমি নৌকায় সওয়ার করিয়েছিলাম তাদের মধ্য থেকে।"[১৩১]

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

নোহ ও জল প্লাবনের বৃত্তান্ত

এইরূপে যখন ভূমণ্ডেল মনুষ্যধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব; মনুষ্যের সহিত পশু, সরীসৃপ, জীব ও আকাশের পক্ষীদিগকেও উচ্ছিন্ন করিব। কেননা তাহাদের নির্মাণ প্রযুক্ত আমার অনুশোচনা হইতেছে। (কিন্তু) নোহ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইলেন। নোহের বংশ-বৃত্তান্ত এই ঃ নোহ তৎকালীন লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও সিদ্ধলোক ছিলেন, নোহ, শেম, হাম ও যেফৎ নামে তিন পুত্রের জন্ম দেন। তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট, পৃথিবী দৌরাত্মে পরিপূর্ণ ছিল। আর ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ ইহা ভ্রষ্ট হইয়াছে, কেননা পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল।

---

১২৯. হিফযুর রহমান (র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৬০, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

১৩০. আল-কুর'আন, ১৭ঃ ৩

১৩১. আল-কুর'আন, ১৯: ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

তখন ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, আমি সকল প্রাণীকে ধ্বংস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি, কেননা তাহাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্মে পরিপূর্ণ হইয়াছে; আর দেখ আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। তুমি গোদর কাষ্ঠ দ্বারা এক জাহাজ নির্মাণ করিবে ও তাহার ভিতরে ও বাহিরে ধুনা দিয়া লেপন করিবে। এই প্রকারে তাহা নির্মাণ করিবে। জাহাজ দৈর্ঘ্যে তিন শত হাত, প্রস্থে পাঁচ শত হাত ও উচ্চতায় ত্রিশ হাত হইবে। আর তাহার ছাদের এক হাত নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া রাখিবে ও জাহাজের পার্শ্বে দ্বার রাখিতেব; তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা নির্মাণ করিবে।

আর দেখ আকাশের নীচে প্রাণবায়ু বিশিষ্ট যত জীব-জন্তু আছে সকলকে বিনষ্ট করণার্থে আমি পৃথিবীর উপরে জল প্লাবন আনিব, পৃথিবীস্থ সকলে প্রাণ ত্যাগ করিবে। কিন্তু তোমার সহিত আমি নিজস্ব নিয়ম স্থির করিব: তুমি আপন পুত্রগণ, স্ত্রী ও পুত্রবধূদিগকে সংগে লইয়া সেই জাহাজে প্রবেশ করিবে। আর বংশবিশিষ্ট সমস্ত জীব-জন্তুর স্ত্রী-পুরুষ জোড়া জোড়া লইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষার্থে নিজের সাথে সেই জাহাজে প্রবেশ করাবে। সর্ব জাতীয় পক্ষী ও সর্বজাতীয় পশু ও সর্ব জাতীয় ভূচর সরীসৃপ জোড় জোড় প্রাণ রক্ষার্থে তোমার নিকটে প্রবেশ করিবে। আর তোমার ও তাদের আহারার্থে তুমি সর্বপ্রকার খাদ্য সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকটে সঞ্চয় করিবে। তাতে নোহ সেইরূপ করিলেন, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই সকল কর্ম করিলেন।[১৩২]

আর সদাপ্রভু নোহকে কহিলেন, তুমি সপরিবারে জাহাজে প্রবেশ কর, কেননা এই কালের লোকদের মধ্যে আমার সাক্ষাতে তোমাকেই ধার্মিক দেখিয়াছি। তুমি শুচি পশুর স্ত্রী-পুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া এবং অশুচি পশুর-স্ত্রী পুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির এক এক জোড়া এবং আকাশের পক্ষীদিগেরও স্ত্রী-পুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া সমস্ত ভূমণ্ডলে তাদের বংশ রক্ষার্থে নিজের সঙ্গে রাখ।

কেননা সাত দিনের পর আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবা-রাত্র বৃষ্টি বর্ষাইয়া আমার সৃষ্টি যাবতীয় প্রাণীকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব। তখন নোহ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই সকল কর্ম করিলেন। নোহের ছয় শত বৎসর বয়সে পৃথিবীতে জল প্লাবন হইল, জল প্লাবন হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নোহ ও তার পুত্রগণ ও তার স্ত্রী ও পুত্রবধুগণ জাহাজে প্রবেশ করিলেন। নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে শুচি অশুচি পশুর এবং পক্ষীর ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবের স্ত্রী-পুরুষ জোড়া জোড়া জাহাজে নোহের নিকট প্রবেশ করল। পরে সেই সাত দিন গত হইলে পৃথিবীতে জল প্লাবন হইল। নোহের বয়সের ছয় শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে মহা জলধির সমস্ত স্রোতধারা উথলিয়া উঠিল এবং আকাশের বাতায়ন সকল মুক্ত; তাতে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্র মহাবৃষ্টি হইল।

সেই দিন নোহ এবং শেম, হাম ও যেফৎ নামে নোহের পুত্রগণ এবং তাদের সহিত নোহের স্ত্রী ও তিন পুত্রবধূ জাহাজে প্রবেশ করিলেন। আর তাদের সহিত সর্ব জাতীয় বন্য পশু, সর্ব জাতীয় গ্রাম্য পশু, সর্ব জাতীয় ভূচর সরীসৃপ জীব ও সর্ব জাতীয় পক্ষী, সর্ব জাতীয় খেচর, প্রাণবায়ুবিশিষ্ট সর্ব প্রকার জীব-জন্তু জোড়া জোড়া জাহাজে নোহের নিকট প্রবেশ করিল। ফলত তার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষ প্রবেশ করিল। পরে সদাপ্রভু তাহার পশ্চাৎদ্বার বন্ধ করিলেন। আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে জল প্লাবন হল, তাতে পানি বৃদ্ধি পাই জাহাজ ভাসাইলে তাহা মৃত্তিকা ছাড়িয়া উঠিল। পরে পানি প্রবল হইয়া পৃথিবীতে অতিশয় বৃদ্ধি পাইল এবং জাহাজ পানির উপর ভাসতে থাকল। আর পৃথিবীতে পানি অত্যন্ত প্রবল হইয়া, আকাশ মণ্ডলের অধঃস্থিত সকল মহাপর্বত নিমগ্ন হইল।

---

১৩২. Genesis 6 : 1-22; বাংলা অনু. পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক, পৃ. ৭-৮; ঈষৎ পরিবর্তনসহ

Dhaka University Institutional Repository

তার উপরে পনের হাত পানি উঠে প্রবল হল, পর্বত সকল নিমগ্ন হল। তাহাতে ভূচর যাবতীয় প্রাণী-পক্ষী, গ্রাম্য ও বন্য পশু, ভূচর সরীসৃপ সকল এবং মনুষ্য সকল মরিল। এইরূপে ভূমণ্ডল নিবাসী সমস্ত প্রাণী-মনুষ্য, পশু সরীসৃপ জীব ও আকাশীয় পক্ষী সকল উচ্ছিন্ন হল, কেবল নোহ ও তার সঙ্গী জাহাজস্থ প্রাণীরা বাঁচল। আর পানি পৃথিবীর উপরে এক শত পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত প্রবল থাকল।[১৩৩]

আর ঈশ্বর নোহকে ও জাহাজে স্থিত তাহার সঙ্গী পশ্বাদি যাবতীয় প্রাণীকে স্মরণ করিলেন, ঈশ্বর পৃথিবীতে বায়ু বহাইলেন, তাতে পানি থামল। আর জলধির স্রোতধারা ও আকাশের বাতায়ন সকল বন্ধ এবং আকাশের মহাবৃষ্টি নিবৃত্ত হল; আর পানি ক্রমশ ভূমির উপর হতে সরে গিয়া এক শত পঞ্চাশ দিনের শেষে হ্রাস পেল। পরে দশম মাস পর্যন্ত পানি ক্রমশ সরিয়া হ্রাস পেল। ঐ দশম মাসের প্রথম দিনে পর্বতগুলোর শৃঙ্গ দেখা গেল।

আর চল্লিশ দিন গত হলে নোহ আপনার নির্মিত জাহাজের বাতায়ন খুলে একটি দাঁড় কাক ছাড়িয়া দিলেন; তাহাতে সে উড়িয়া ভূমির উপরস্থ পানি শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত ইতস্ততঃ গতায়াত করিল। আর ভূমির উপরে পানি হ্রাস পাইয়াছে কি না তা জানবার জন্য তিনি নিজের নিকট হতে একটি কপোত ছেড়ে দিলেন। তাতে সমস্ত পৃথিবী পানিতে আচ্ছাদিত থাকায় কপোত পদার্পণের স্থান পাইল না, তাই জাহাজে তার নিকট ফিরে আসল।

তখন তিনি হাত বাড়িয়ে উহাকে ধরলেন এবং জাহাজের ভিতর আপনার নিকট রাখলেন। পরে তিনি আর সাত দিন বিলম্ব করি জাহাজ হতে সেই কপোত পুনর্বার ছেড়ে দিলেন এবং কপোতটি সন্ধ্যাকালে তার নিকট ফিরে আসল; তার চঞ্চুতে জিত বৃক্ষের একটি নবীন পত্র ছিল; এতে নোহ বুঝলেন, ভূমির উপরে পানি হ্রাস পেয়েছে। পরে তিনি আর সাত দিন বিলম্ব করে সেই কপোত ছেড়ে দিলেন; তখন সে তার নিকট আর ফিরে আসল না। [নোহের বয়সের] ছয় শত এক বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথিবীর উপরে পানি শুষ্ক হল; তাতে জাহাজের ছাদ খুলে দৃষ্টিপাত করলেন, ভূতল নির্জল; পরে দ্বিতীয় মাসের সাতাইশতম দিনে ভূমি শুষ্ক হইল।[১৩৪, ১৩৫]

আল্লাহর নির্দেশে জাহাজ নির্মাণ

স্বীয় কাওম সম্পর্কিত নূহ (আ.)-এর এই দো'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করিলেন (৩৭ ঃ ৭৫) এবং তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি কাফির মুশরিকদিগকে এক মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করিবেন। আর তাকে ও তার অনুসারী মু'মিনদিগকে জাহাজে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নিজের তত্ত্বাবধানে জাহাজ তৈরীর নির্দেশ দিলেন (১১ ঃ ৩৭)

---

১৩৩. Genesis 7 : 1-24; বাংলা অনু. পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক, পৃ. ৯
১৩৪. প্রাগুক্ত, ৪ ঃ ১-১৪, বাংলা আদিপুস্তক, পৃ-৯-১০
১৩৫. সীরাত বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ: ১৯০, ইফাবা, সম্পাদনা পরিষদ, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ছা'লাবী জাহাজ তৈরীর বিবরণ এইভাবে দিয়াছেন ঃ তখনও পর্যন্ত যেহেতু নৌযান ব্যবহার শুরু হয় নাই, তাই নূহ (আ) কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রতিপালক! নৌযান কি? আল্লাহ তা'আলা বললেন, একটি কাষ্ঠ্য নির্মিত গৃহ যা পানির উপর চলে। নূহ (আ.) বললেন, হে প্রতিপালক! কাষ্ঠ কোথায় পাব? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে নূহ! আমি যা চাই তা করিতে সক্ষম। নূহ (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! বৃক্ষ কোথায় পাব? আল্লাহ তা'আলা বললেন, একটি বৃক্ষ তুমি রোপণ কর; অতঃপর তিনি একটি সেগুন, মতান্তরে দেবদারু (আল-বিদায়া, ১খ, ১১) আর বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে গোফর বৃক্ষ (Genesis 6 : 6-14) রোপণ করলেন, অতঃপর চল্লিশ বৎসর মতান্তরে এক শত বৎসর (আল-বিদায়া, প্রাগুক্ত) কাটিয়া গেল। এই সময়কালে তিনি কওমের উপর বদদো'আ করা হতে বিরত রইলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরের বর্ণনামতে এই সময়কাল পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের মহিলাদিগকে বন্ধ্যা করে রাখলেন। ফলে তাদের আর কোন সন্তান পয়দা হল না।[১৩৬]

প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। কোনও বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য সূত্রে ইহার উল্লেখ নাই। ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণ সম্ভবত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে উহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, জন্মের ধারা চালু থাকিলে অনেক নিষ্পাপ শিশুই পিতামাতার সহিত প্লাবনে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিষ্পাপ শিশুকে শাস্তি হতে রক্ষা করবার জন্য এই জাতীয় বর্ণনার প্রয়োজন নাই। কারণ আল্লাহর নিয়ম হল, কোনও অঞ্চলে আযাব আসলে সেখানকার ছোট-বড়, ধনী-গরীব, যুবা-বৃদ্ধ, পাপী-নিষ্পাপ নির্বিশেষে সকলে এতে ধ্বংস হয়। অতঃপর পাপিষ্ঠদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতই বরবাদ হয়ে যায়। আর নিষ্পাপদের জন্য এটা হয় সৌভাগ্যের ব্যাপার; কারণ তার দুঃখ-কষ্টের জগত হতে চিরস্থায়ী শান্তির জগতে উপনীত হয়; তাই নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের যুবা-বৃদ্ধ-শিশু সকলেই প্লাবনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[১৩৭]

অতঃপর বৃক্ষটি যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হল, সালমান (রা.)-এর বর্ণনামতে ৪ বৎসর হল (আত-তাবারী, তারিখ, ১খ, ৯১), তখন আল্লাহ তাআলা তাকে উহা কাটার নির্দেশ দিলেন। তিনি উহা কেটে রৌদ্রে শুকালেন এবং বললেন, হে আমার প্রতিপালক! ইহা দ্বারা কিভাবে আমি উক্ত গৃহ নির্মাণ করব? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, উহাকে তিনটি আকৃতিতে বিন্যস্ত কর, উহার মাথা মোরগের ন্যায়, পেট পাখির পেটের ন্যায় এবং লেজ অনেকটা মোরগের লেজের মত বানাও; উহা বদ্ধ আকৃতির বানাও। দরজাগুলি বানাও উহার দুই পার্শ্বে। উহাতে ত্রিতলবিশিষ্ট বানাও। ৮০ হাত দৈর্ঘ্য, ৫০ হাত প্রস্থ এবং উচ্চতায় ৩০ হাত বানাও। ইহা আহলে কিতাবদের বর্ণনা বলিয়া ইমাম ছা'লাবী উল্লেখ করেছেন । কিন্তু বাইবেলে ৩০০ হাত দৈর্ঘ্য, ৫০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চতার কথা উল্লেক রয়েছে (দ্র. Genesis 6 : 15)। এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ.)-কে জাহাজ তৈয়ার করা শিক্ষাদান করতে জিবরীল (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। নূহ (আ.) কাঠ কাটিয়া তাতে পেরেক ঢুকাইয়া জাহাজের আকৃতি বানাতে লাগলেন।[১৩৮]

আর তার কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যখনই তার নিকট দিয়া গমন করত তখনই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।[১৩৯]

---

১৩৬. ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১ খ, ৫৬; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ.৫৭

১৩৭. হিফজুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুর'আন , ১খ, ৮৪-৮৫

১৩৮. আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ.৫৭; ছানাউল্লাহ পানীপতি, আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ, ৮৪

১৩৯. ১১ ঃ ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

তারা বলত, নূহ! তুমি নবুওয়াতের দাবি করিয়া এখন কাঠমিস্ত্রি হয়ে গেছ! তারা আরও বলত, এই পাগলের কাণ্ড দেখ, কাষ্ঠ দিয়া ঘর বানাইতেছে যা নাকি পানির উপর দিয়া চলবে! এই মরুভূমিতে পানি কোথা থেকে আসবে! এই বলিয়া তাহরা পরস্পর হাসাহাসি করত।[১৪০]

নূহ (আ.) ও তাদের পরিণতি সম্পর্কে উদাসীনতা এবং আল্লাহর নাফরমানীতে অটল থাকার ধৃষ্টতা দেখিয়ে তাদের পন্থায় উত্তর দিতেন, তোমরা যদি আমাদেরকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ এবং তোমরা অচিরে জানতে পারবে কার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।[১৪১]

অতঃপর তিনি নিজ কাজে মনোনিবেশ করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই তাকে ইহাদের বিষয় জানাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। আর যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না; তারা তো নিমজ্জিত হবে।"[১৪২]

তাদের ব্যাপারে নূহ (আ.)-এর দো'আ কবুল হইয়াছিল এবং আল্লাহর সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ.)-কে নৌকা নির্মাণ কর্ম তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করার জন্য প্রত্যাদেশ পাঠাইলেন এবং বললেন, পাপিষ্ঠদের প্রতি আমার ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং নৌকা নির্মাণ কর্ম তাড়াতাড়ি সম্পাদন কর। তখন নূহ (আ.) দুইজন কাঠমিস্ত্রি ভাড়া করলেন এবং তার পুত্র সাম, হাম ও য়াফিছও নৌকা বানাতে লেগে গেলেন। অতঃপর তিনি উহার নির্মাণ কর্ম সমাপ্ত করেন। কত বৎসরে উহা সমাপ্ত হয় সে ব্যাপারে অনেক মতভেদ আছে। যায়দ ইবনে আসলাম (রা)-এর বর্ণনামতে রোপন ও কর্তনে ১০০ (এক শত) বৎসর অতিবাহিত হয় এবং নৌকা নির্মাণে আরও এক শত বৎসর ব্যয় হ। অন্য এক বর্ণনামতে বৃক্ষ লাগানোর পর ৪০ বৎসর ব্যয় হবে। কা'ব আল-আহবারের এক বর্ণনাতে নূহ (আ.) ৩০ বৎসরে নৌকা নির্মাণ করেণ (ছানাউল্লাহ্ পানীপতি, তাফসীরুর-মাজহারী, ৫খ, ৮৫)। কিন্তু কা'ব হতে অপর একটি বর্ণনা পাওয়া যায় ৪০ বৎসরের (আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, ১২খ, ৫০)। মুজাহিদের বর্ণনামতে ৩ বৎসরে নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত ৬০ ও ৪০০ বৎসরের বর্ণনাও পাওয়া যায় (প্রাগুক্ত)। আর ইবন আব্বাস (রা.) হইতে একটি রিওয়ায়াত পাওয়া যায় যে, দুই বৎসরে তিনি নির্মাণ কর্ম সমাপ্ত করেন।[১৪৩]

এই মতটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। উক্ত নৌকার পার্শ্বে আল্লাহ্ তা'আলা আলকাতরার একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলেন যাহা টগবগ করেছিল। অতঃপর নৌকার ভিতর ও বাহিরের দিকে উক্ত আলকাতরা দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হইল এবং লৌহ কীলক দ্বারা মজবূত করা হইল (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ.৫৮)। ইহাই কুর'আন করীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আর আমি তাকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে"[১৪৪], [১৪৫]

---

১৪০. আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, প্রাগুক্ত; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৬১
১৪১. আল-কুর'আন, ১১ ঃ ৩৮-৩৯
১৪২. আল-কুর'আন, ১১ ঃ ৩৭
১৪৩. আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ, ৮৪
১৪৪. আল-কুর'আন, ৫৪ ঃ ১৩
১৪৫. সীরাত বিশ্বকোষ, ১খ, পৃঃ ২০০, ইফাবা, সম্পাদনা পরিষদ, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

নৌযানের আকৃতি

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত নৌকার অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ ছিল মোরগের মাথা ও লেজের আকৃতিসম্পন্ন এবং মধ্যভাগ ছিল পাখির পেটের ন্যায়। ইমাম ছাওরীর বর্ণনামতে উহার বুক ছিল সরু, যাতে পানি ভেদ করে চলতে পারে।[১৪৬]

উক্ত নৌকার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা কতটুকু ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে ঃ বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী উহার দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ হাত, প্রস্থ ৫০ হাত এবং উচ্চতা ৩০ হাত।[১৪৭]

অধিকাংশ মুফাসসির ও মুহাদ্দিছ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। ইবন্ মারদূয়া সামুরা ইবন জুনদূব (রা) সূত্রে এবং 'আবদ ইবন হুমায়দ, ইবনুল-মুনযির ও আবুশ-শায়খ কাতাদা হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাগাবী ইবন আব্বাস (রা) সূত্র হইতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতি তার আত-তাফসীরুল মাজহারী গ্রন্থে একে প্রসিদ্ধ মত বলিয়া উল্লেক করেছেন।[১৪৮]

দাহ্হাক সূত্রে বর্ণিত ইবন আব্বাস (রা.)-এর অপর এক মতে দৈর্ঘ্য ৬০০ হাত, প্রস্থ ৩৩০ হাত এবং উচ্চতা ৩৩ হাত।[১৪৯]

ইবন আব্বাস (রা)-এর আরও একটি রিওয়ায়াত রয়েছে, সেই মতে দৈর্ঘ্য ১২০০ হাত, প্রস্থ ৬০০ হাত।[১৫০]

ইমাম বাগাবী ও ইবন জারীর তাবারী প্রমুখ হাসান বাসরী (র) হতে অনুরূপ মত বর্ণনা করেছেন (আল-আলূসী, আল-কামিল, ১খ, ৫৬)। শামীর বর্ণনামতে নৌকার দৈর্ঘ্য ৮০ হাত, প্রস্থ ৫০ হাত এবং উচ্চতা ছিল ৩০ হাত (প্রাগুক্ত)। ইবন আব্বাস (রা)-এর একটিমাত্র রিওয়ায়াত ছাড়া আর সকলেই এই ব্যাপারে একমত যে উক্ত নৌকার উচ্চতা ছিল ৩০ হাত; ইহার তিনটি তলা ছিল। প্রত্যেক তলার উচ্চতা ছিল ১০ হাত। ইহার দরজা ছিল প্রস্থের দিকে যার উপর পর্দা ছিল।[১৫১]

ছাদের এক হাত নিচে ছিল বাতায়ন।[১৫২]

এখানে উল্লেখ্য যে, হাত বলতে ইবনে সা'দের মতে নূহ (আ)-এর পিতার দাদার হাত বুঝানো হয়েছে।[১৫৩]

---

১৪৬. ইবন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ.৭৩
১৪৭. Genesis 6 : 15
১৪৮. ছানাউল্লাহ পানিপতী, আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ, ৮৪-৮৫
১৪৯. ছা'লাবী, কাসাস, পৃ.৫৮
১৫০. ইবন কাছীর, কাসাস, পৃ.৭৩
১৫১. ইবন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ.৭৩; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১০
১৫২. বাইবেল, আদিপুস্তক ৬ ঃ ১৬; বাংলা অনু. বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, পৃ.৮
১৫৩. দ্র. তাবাকাত, ১খ, ৪১

Dhaka University Institutional Repository

ছানাউল্লাহ পানিপতী বলেন, হাতের সীমানা হইল কাঁধের সীমানা জোড়া পর্যন্ত।[১৫৪]

হাফিজ ইবন কাছীর উল্লেখ করেছেন যে, এমন বিশাল এক নৌকা তৈরী হল, যার দৃষ্টান্ত পূর্বেও কখনও ছিল না, পরবর্তীতেও হবে না।[১৫৫]

---

১৫৪. তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ, ৮৫

১৫৫. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ.৭১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১০৯

১৫৬. সীরাত বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ: ২০২, ইফাবা, সম্পাদনা পরিষদ, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

আরাফাতের ময়দান ও মুয্দালিফা

সমর্থনে পবিত্র কুর'আনের আয়াত

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ -

আর হজ্জের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের রবের অনুগ্রহের সন্ধান করতে থাকো তাহলে তাতে কোন দোষ নেই । তারপর আরাফাত থেকে অগ্রসর হয়ে 'মাশআরুল হারাম' (মুযদালিফা) এর কাছে থেমে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং এমনভাবে স্মরণ করো যেভাবে স্মরণ করার জন্য তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন । নয়তো ইতিপূর্বে তোমরা তো ছিলে পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত ।[১৫৭]

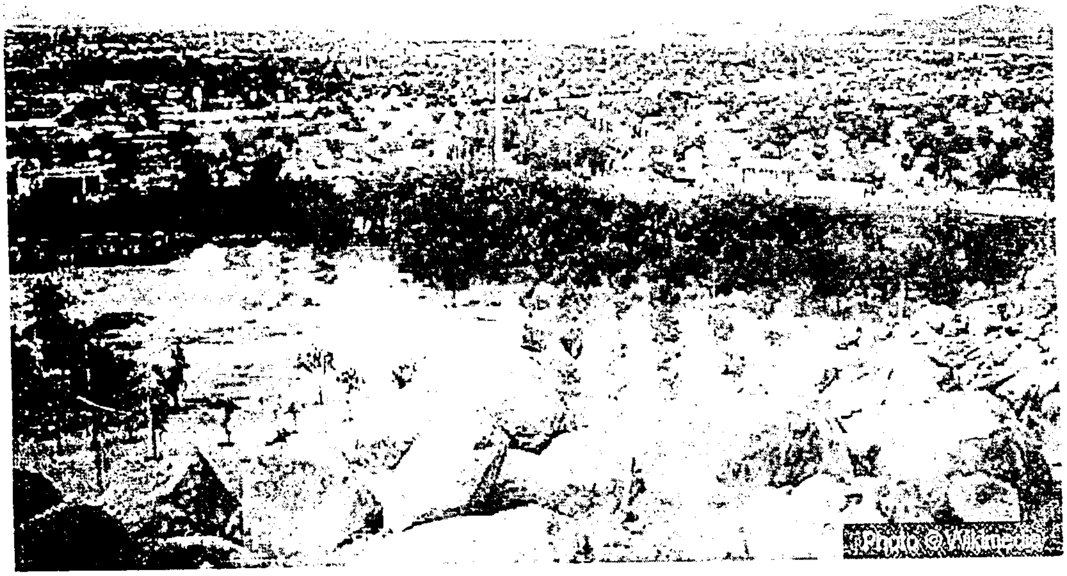

মুযদালিফা

১৫৭. আল-কুর'আন, ২ঃ ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

আরাফাতের ময়দান

পরিচিতি

মুযদালিফার আরবি (مزدلفة)। মুযদালিফা হল হাজ্জ্বকে কেন্দ্র করে সৌদী আরবের মক্কার নিকটবর্তী সমতল এলাকা। এটি মনা ও আরাফাতের পথে মীনা ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত।

ভৌগোলিক অবস্থান

Mosque and pebble collecting place at Muzdalifah

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সময় আরবে হজ্জের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি ছিল এই যে, ৯ই যিলহজ্জ তারা মিনা থেকে আরাফাত যেতো এবং ১০ তারিখের সকালে সেখান থেকে ফিরে এসে মুযদালিফায় অবস্থান করতো। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন ধীরে ধীরে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের ন্যায় আরবে কুরাইশদের ধর্মীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন তারা বললো, আমরা হারাম শরীফের অধিবাসী, সাধারন আরবদের সাথে আমরা আরাফাত পর্যন্ত যাবো, এটা আমাদের জন্য মর্যাদাহানিকর। কাজেই তারা নিজেদের জন্য পৃথক মর্যাদাজনক ব্যবস্থার প্রচলন করলো। তারা মুযদালিফা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে এবং সাধারণ লোকদের আরাফাত পর্যন্ত যাবার জন্য ছেড়ে দিতো। পরে বনী খুযাআ ও বনী কিনানা গোত্রদ্বয় এবং কুরাইশদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য গোত্রও এই পৃথক অভিজাতমূলক ব্যবস্থার অধিকারী হলো। অবশেষে সাধারণ আরবদের তুলনায় অনেক উঁচু হলে গেলো।

তারাও আরাফাতে যাওয়া বন্ধ করে দিল। এ গর্ব ও অহংকারের পুত্তলিটিকে এ আয়াতে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে কুরাইশ, তাদের আত্মীয় ও চুক্তি বদ্ধ গোত্রগুলোকে এবং সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এমন সব লোকদেরকে যারা আগামীতে কখনো নিজেদের জন্য এ ধরনের পৃথক ব্যবস্থা প্রচলনের আকাংখা মনে মনে পোষণ করে। তাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে,সবাই যতদূর পর্যন্ত যায় তোমরাও তাদের সাথে ততদূর যাও তাদের সাথে অবস্থান করো, তাদের সাথে ফিরে এসো এবং এ পর্যন্ত জাহেলী অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণে, তোমরা সুন্নাতে ইবরাহিমীর যে বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছো সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমতা প্রার্থনা করো।

Dhaka University Institutional Repository

আইলা

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ
شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ -

আর সমুদ্রের তীরে যে জনপদটি অবস্থিত ছিল তার অবস্থা সম্পর্কেও তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করো। তাদের সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দাও যে, সেখানকার লোকেরা শনিবারে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতো এবং শনিবারেই মাছেরা পানিতে ভেসে ভেসে তাদের সামনে আসতো; অথচ শনিবার ছাড়া অন্য দিন আসতো না। তাদের নাফরমানীর কারণে তাদেরকে আমি ক্রমাগত পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিলাম বলেই এমনটি হতো।[১৫৮]

বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের মতে এ স্থানটি ছিল 'আয়লা', 'আয়লাত' বা 'আয়লূত'। ইসরাঈলের ইহুদী রাষ্ট্র বর্তমানে এখানে এ নামে একটি বন্দর নির্মাণ করেছে। এর কাছেই রয়েছে জর্দানের বিখ্যাত বন্দর আকাবা। লোহিত সাগরের যে শাখাটি সিনাই উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল ও আরবের পশ্চিম উপকূলের মাঝখানে একই লম্বা উপসাগরের মত দেখায় তার ঠিক শেষ মাথায় এ স্থানটি অবস্থিত। বনী ইসরাঈলের উত্থান যুগে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিকেন্দ্র ছিল। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এ শহরেই তাঁর লোহিত সাগরের সামরিক ও বাণিজ্যিক নৌবহরের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

এখানে যে ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে আমরা তার কোন উল্লেখ পাই না। তাদের ইতিহাসেও এ প্রসংগে নীরব। কিন্তু কুর'আন মজীদে যেভাবে এ ঘটনাটিকে এখানে ও সূরা বাকারায় বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, কুর'আন নাযিলের সময় বনী ইসরাঈলীরা সাধারণভাবে এ ঘটনাটি সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিল। এটি একটি প্রমানিত সত্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতার প্রশ্ন যেখানে মদীনার ইহুদীরা কোন একটি সুযোগও হাতছাড়া হতে দিতো না সেখানে কুর'আনের এ বর্ণনার বিরুদ্ধে তারা আদৌ কোন আপত্তিই তোলেনি।

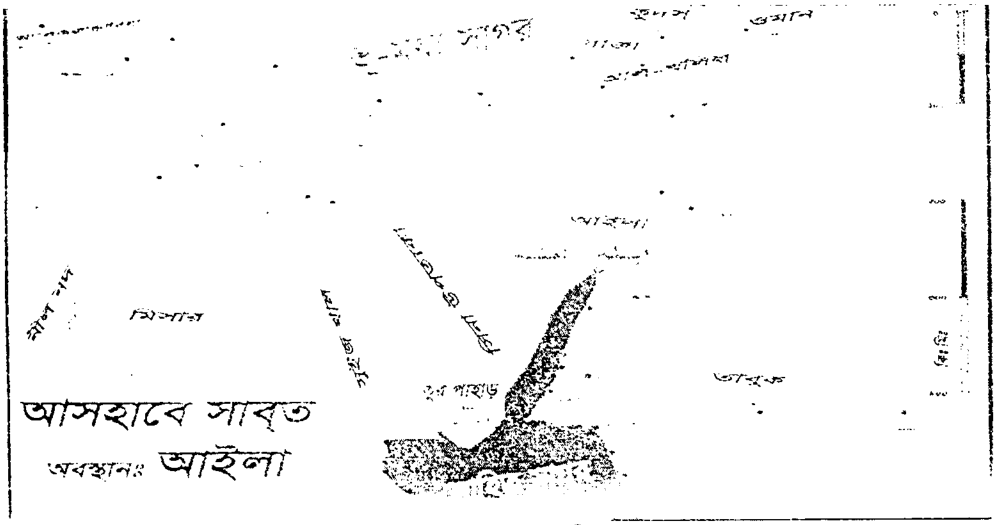

আইলা -এর মানচিত্র

১৫৮. আল-কুর'আন, ৭ঃ ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

আহ্‌কাফ

আ'দ সম্প্রদায়ের বাসস্থান

আ'দ সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল 'আহক্বাফ' অঞ্চল। ইহা হাযরা মাউতের উত্তরে এইরূপে অবস্থিত যে, উহার পূর্বে 'ওম্মান, উত্তরে রোবউলখালী, কিন্তু বর্তমানে এখানে বালুকাস্তুপ ছাড়া আর কিছুই নাই। আর কোন কোন ঐতিহাসিকরা বলেন, তাহাদের বসতি আরবের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ হাযরামাউত ও ইয়ামানে পারস্যোপসাগরের তীরে ইরাকের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইয়ামান ছিল তাহাদের রাজধানী।[১৫৯]

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ -

আর 'আদ' (জাতি)র কাছে আমি পাঠাই তাদের ভাই হূদকে। সে বলেঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। এরপরও কি তোমরা ভুল পথে চলার ব্যাপারে সাবধান হবে না?"[১৬০]

'আদ' ছিল আরবের প্রাচীনতম জাতি। আরবের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এদের কাহিনী প্রচলিত ছিল। ছোট ছোট শিশুরাও তাদের নাম জানতো। তাদের অতীত কালের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও গৌরব গাঁথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। তারপর দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়াটাও প্রবাদের রূপ নিয়েছিল। আদ জাতির এ বিপুল পরিচিতির কারণেই আরবী ভাষায় প্রত্যেকটি প্রাচীন ও পুরাতন জিনিসের জন্য 'আদি' শব্দ ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষকে 'আদিয়াত' বলা হয়। যে জমির মালিক বেঁচে নেই এবং চাষাবাদকারী না থাকার কারণে যে জমি অনাবাদ পড়ে থাকে তাকে 'আদি-উল-আরদ' বলা হয়। প্রাচীন আরবী কবিতায় আমরা এ জাতির নামের ব্যবহার দেখি প্রচুর পরিমাণে। আরবের বংশধারা বিশেষজ্ঞগণও নিজেদের দেশের বিলুপ্ত জাতিদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ জাতিটির নামোচ্চারণ করে থাকেন। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বনু যহল ইবনে শাইবান গোত্রের এক ব্যক্তি আসেন। তিনি আদ জাতির এলাকার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রাচীনকাল থেকে তাদের এলাকার লোকদের মধ্যে আদজাতি সম্পর্কে যেসব কিংবদন্তী চলে আসছে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনান।

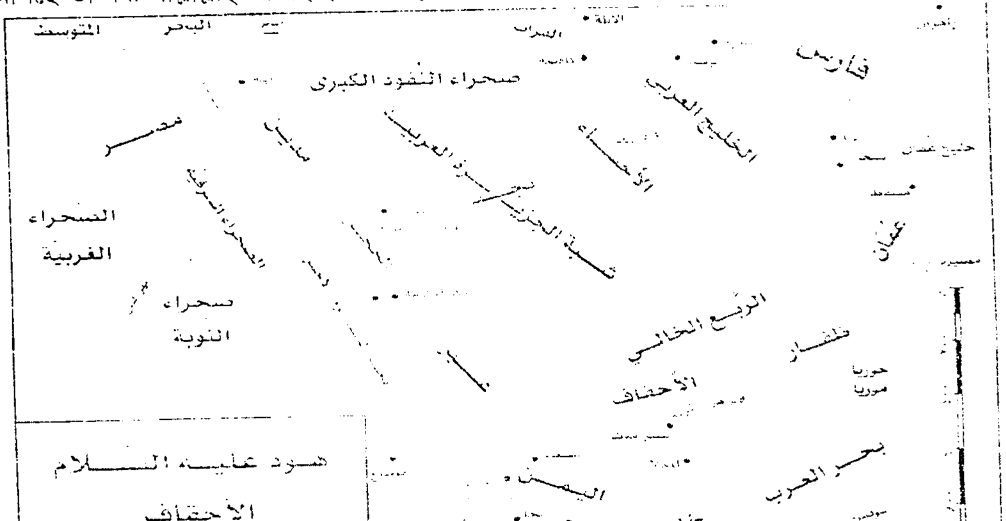

আহকাফ এর মানচিত্র

---

১৫৯. হিফযুর রহমান(র), মাওলানা, কাসাসুল কুর'আন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৯২, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯।

১৬০. আল-কুর'আন, ৭ : ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আনের বর্ণনা মতে এ জাতিটির আবাসস্থল ছিল 'আহকাফ' এলাকা। এ এলাকাটি হিজায, ইয়ামন ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী 'রাবয়ুল খালী'র দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখন থেকে অগ্রসর হয়ে তারা ইয়ামনের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাজরা মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ জাতিটির নিদর্শনাবলী দুনিয়ার বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ আরবের কোথাও কোথাও এখনো কিছু পুরাতন ধ্বংস স্তুপ দেখা যায়। সেগুলোকে আদ জাতির নিদর্শন মনে করা হয়ে থাকে। হাজরা মাউতে এক জায়গায় হযরত হূদ আলাইহিস সালামের নামে একটি কবরও পরিচিত লাভ করেছে। ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে ঔধসবং জ.ডবষষবংঃবফ নামক একজন ইংরেজ নৌ-সেনাপতি 'হিসনে গুরাবে' একটি পুরাতন ফলকের সন্ধান লাভ করেন। এতে হযরত হূদ আলাইহিস সালামের উল্লেখ রয়েছে। এ ফলকে উৎকীর্ণ লিপি থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এটি হযরত হূদের শরীয়াতের অনুসারীদের লেখা ফলক।

আহক্বাফ মরুভূমি

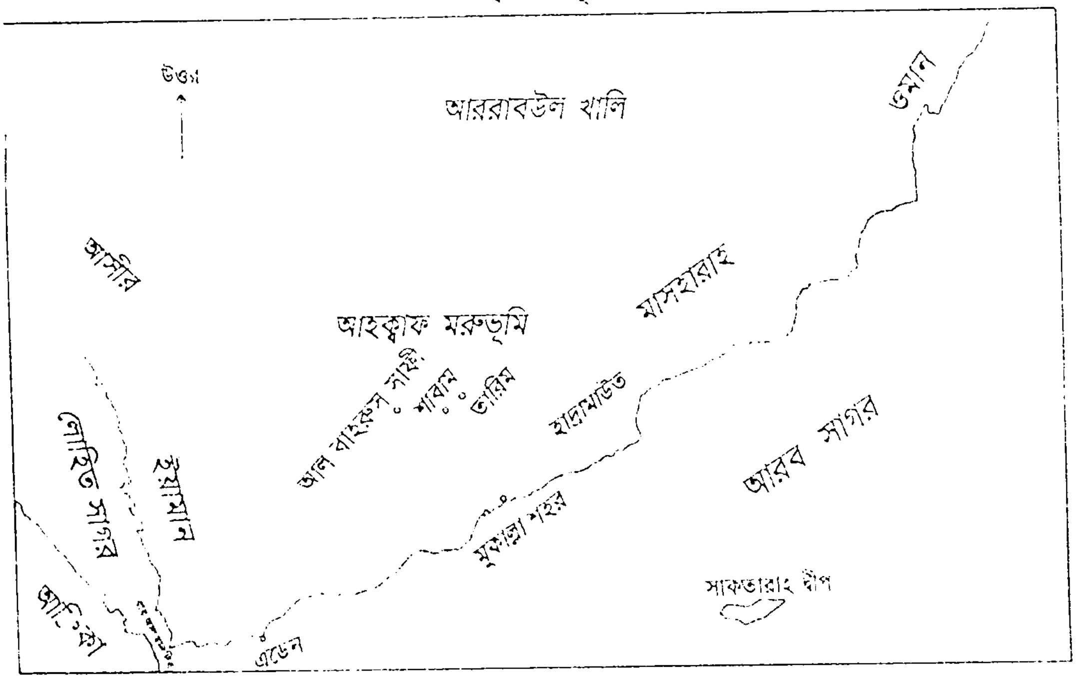

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর খলীফা (প্রতিনিধি) হিসেবে হযরত আদম (আ) কে প্রেরণ করেছেন। আর সেই খেলাফতের দায়িত্বই প্রতিটি মানুষের কাঁধে বর্তায়। খেলাফতের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগ-যুগ ধরে যে দিকনির্দেশনা পাঠিয়েছেন, সেই ধরাবাহিকতার চূড়ান্তরূপ ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে আল-কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথম মানব এবং প্রথম নবী হযরত আদম (আ) এর মাধ্যমে ইসলামের যাত্রা শুরু হয় এবং নবী রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতার পরিপূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি ঘটে সর্বকালে একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) কে প্রেরণের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তাঁকে প্রেরণের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ তাঁর দীনের পরিপূর্ণতা দান করেন। তিনি বলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমারদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"[১]

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে কল্যাণময় করার সকল ব্যবস্থা ইসলামী জীবন বিধানে রয়েছে। পবিত্র কুর'আন হলো ইসলামের প্রধান উৎস, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ। পবিত্র কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ, মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত হয়ে পুরো একটি গ্রন্থরূপে সংকলিত।

আল-কুরআন সর্বপ্রথম ৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নাযিল হতে শুরু করে, দীর্ঘ ২৩ বছরে ৬৩২ খিস্টাব্দে পরিপূর্ণতা লাভ করে। মানুষ কিভাবে সঠিক সরল পথে চলবে আল-কুরআনে রয়েছে তার যাবতীয় দিক নির্দেশনা। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে এর নির্দেশনাবলীর অনুসরণে রয়েছে সার্বিক সফলতা। এই সফলতা অর্জন করতে হলে প্রয়োজন আল কুরআনের ব্যাপক চর্চা, অর্থ বুঝা ও তা বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করা। কুরআনের ভাষা হল বক্রতা-জটিলতামুক্ত অত্যন্ত সহজ-সরল এবং প্রাঞ্জল। যার ফলে তৎকালীন প্রায় লেখাপড়া না জানা আরব সমাজও কুরআন আগ্রহ ভরে শুনেছে, সহজেই তার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তার অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সফলতা লাভে ধন্য হয়েছে।

আল-কুরআন মুহাম্মদ (সঃ)- এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মহান আল্লাহ গোটা মানব জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ নির্দেশ করেছেন। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের হেদায়েত এ গ্রন্থে রয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব পরিচালনার বিধান এতে রয়েছে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের সূত্র এতে বর্ণিত হয়েছে। সকল বিষয় বিশদ অথবা মৌলিক কথা এতে বলে দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থ মানবতার মুক্তির চাবিকাঠি। এটি মু'মিনের গাইডবুক। এর তিলাওয়াত মু'মিনের মনে প্রশান্তি এনে দেয়। এর বিধান মু'মিনকে পরিচালিত করে জান্নাতের পথে। এটি হচ্ছে চিরন্তন মোজেযা।

---

১. আল-কুর'আন, ৫:৩

Dhaka University Institutional Repository

তমসাবৃত্ত জীবন থেকে মানুষকে আলোর পথে বের করে আনার জন্য এবং সরল-সঠিক পথে পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ আল-কুরআন নাযিল করেন। উক্ত মিশন সামনে রেখে রাসূল (সঃ) তাঁর সাহাবীদের নিকট আল-কুর'আনের বাণী পৌঁছেছেন। তারা ছিলেন খাঁটি আরব, ফলে কুরআনের বাচন রীতি দ্বারাই কুর'আনকে বুঝে ফেলতেন, উপলব্ধি করতেন এবং তা কাজে পরিণত করতেন।

মানুষের সার্বিক জীবনের সকল সমস্যার নিখুত সমাধান নিয়ে আল-কুর'আন অবতীর্ন হয়েছে। রাসূল (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায় নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল-কুর'আনের আলোকে মানুষের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে বাস্তবে প্রমাণ করে গেছেন যে, জীবন সমস্যার পূর্ন সমাধান নিহিত রয়েছে পবিত্র কুর'আনে। সারা বিশ্বে মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার কোনটিই মানুষের সকল সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করতে পারেনি। একমাত্র আল-কুর'আনেই রয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল সমস্যার বাস্তব ও যুক্তিসম্মত সমাধান। আল-কুর'আন হল মানব জাতির ইহ ও পরকালীন মুক্তির সনদ, ভারসাম্যপূর্ণ একমাত্র জীবন বিধান, জগত ও জীবনের নির্ভুল বিশ্লেষণ, শাশ্বত আইন, নির্ভুল ভবিষ্যৎ বাণী ও উন্নত সাহিত্য।

একটি সত্য, সুন্দর, ন্যায়, ইনসাফ ও শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হল পবিত্র কুরআন। কুর'আনের ভাষা যেমন রাসূল (স:)-এর রচিত নয়, তেমনি এর আয়াতসমূহের ক্রমবিন্যাস ও সূরাভিত্তিক বিভক্তিও রাসূল (সঃ) করেননি। সবই আল্লাহর নির্দেশে হয়েছে।

পবিত্র কুর'আনে উল্লেখিত জনপদগুলোতে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহে মানবজাতির জন্য রয়েছে শিক্ষা, যা জীবন যাপন ও সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনপদগুলোর কোনটিকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন, আবার কোনটিকে ধ্বংস করেছেন। যার মাধ্যমে বুদ্ধিমান মানুষের জন্য স্থাপন করেছেন দৃষ্টান্ত।

পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ অনেকগুলো জনপদের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এ জনপদগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং বর্তমান ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা জানা একান্ত প্রয়োজন। সে প্রয়োজন বিবেচনা করে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার প্রয়াস পাই।

যে কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের হেদায়েতের জন্য, আজ মানবজাতি সে কুর'আনের হেদায়েত থেকে দূরে সরে গেছে। কুর'আনের হেদায়েত তো দূরের কথা কুর'আন শিক্ষা থেকেও মানুষ গাফেল। এর কারণ হলো কুর'আনের বাণীকে সহজে না বুঝা, কুর'আনের তথ্যগুলো তাদের কাছে দুর্বোধ্য হওয়া এবং কুর'আনে উল্লেখিত বিভিন্ন শিক্ষামূলক ঘটনা সম্পর্কে অবগত না থাকা। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের অবস্থা এবং জনপদের মানুষগুলোর পরিণতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন, অত্র গবেষণা কর্মের মাধ্যমে তা সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কুর'আনে উল্লেখিত জনপদসমূহ এবং জনপদের মানুষগুলোর কার্যকলাপ ও তাঁদের পরিণতি উপলব্ধি করে তার শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে এবং ইহ-পারলৌকিক উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান সময়ে বিষয়টি অত্যন্ত আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ কোন পুস্তক অথবা গবেষণাকর্ম এখনো দেখা যায় নি, তাই এ বিষয়ের গবেষণা সাধারণ মানুষকে কিছুটা হলেও কুর'আনের শিক্ষা এবং এর থেকে হেদায়েত গ্রহণে আগ্রহী করে তুলবে বলে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুর'আনুল করীম	:	ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, ১৯৯৯
জালালুদ্দিন সুয়ূতী, জালালুদ্দীন মাহাল্লী	:	*তাফসীরে জালালাইন*, আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ইন্ডিয়া।
মুহাম্মদ আল-শাওকানী	:	*তাফসীরে ফাতহুল কাদীর*, মাতবা'আতুল মুস্তাফা আলবাবী, মিসর: ১৯২৪
আত-তিরমিযী, আবু ঈসা, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, (আল-ইমাম)	:	সুনানে তিরমিযী, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০
আন-নাসায়ী, আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শুয়াইব, (আল-ইমাম)	:	সুনানে নাসায়ী, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০
আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশ'আস, (আল-ইমাম)	:	সুনানে আবু দাউদ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০
আল-বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল, (আল-ইমাম)	:	আল-জামি আল-মুসনাদ আল-সহী আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়্যামিহী, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০
আত-তাবারী, আবু জাফর, মুহাম্মদ ইবনে জারীর, (আল-ইমাম)	:	জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন, বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৩৯৮/১৯৮০
	:	তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, দারুল-কালাম, বৈরুত তা. বি.
ইবনে কাসীর, 'ইমামুদ্দীন, আবুল ফিদা ইসমাঈল', (আল্লামা)	:	তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম, বৈরুত : দারুল কলম, তা:বি:
	:	আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, কায়রো: দারুল ফিক্র আল-আরাবী, তা:বি:
ইবনে মাজাহ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ, আল-কাযবীনী, (আল-ইমাম)	:	সুনানে ইবনে মাজাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০
ইমাম মুহাম্মদ, আবু আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ- শায়বানী	:	আল-মুয়াত্তা (বাংলা অনু. আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা), ঢাকা : আহ্সান পাবলিকেশনস্, ২০০৩
মুসলিম, আবুল হুসাইন, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আল-কুশাইরী আন-নীসাপুরী, (আল-ইমাম)	:	আস-সহীহ লি- মুসলিম, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০
মুহাম্মদ শফী, মাওলানা, (মুফতী)	:	তাফসীরে মা'আরিফুল কুর'আন (বাংলা অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৩/১৯৮৬
পবিত্র বাইবেল	:	পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নতুন নিয়ম, ঢাকা : বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, তা:/বি:
আন-নাজ্জার, আব্দুল ওয়াহ্হাব	:	কাসাসুল আম্বিয়া, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা:/বি:

Dhaka University Institutional Repository

মূসা আনসারী	:	*আধুনিক মিসরেরঐতিহাসিক বিকাশধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: জানুয়ারি ১৯৮৮
Yahya Armajani	:	*Middle-East Past and Present মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান*, (অনু. মুহাম্মদ ইমাম-উল-হক), ২য় প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৪
মুফতী মুহাম্মদ শফী,	:	*তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন* (অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), মদীনা মোনাওয়ারা ১৪১৩ হিজরী।
আহমাদ ইব্‌নে আলী ইবনে হাজার আবুল ফজল আসকালানী (আশ-শাফেয়ী)	:	*ফাতহুল বারী শারহু সহীহ্ আল-বুখারী*, দারুল মা'আরিফা, বৈরূত: ১৩৭৯ হি.
'আব্দুল 'আযীম যারকানী	:	মানাহিলু'ল ইরফান ফী উলুমিল কুর'আন, খ. ১, পৃ. ১৬, প্রকাশ ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৭২ হি.
R.Payne Smith	:	*A compendious Syriac dictionary founded upon the Thesaurus Syriacus of R.Payne Smith*. Oxford University Press, Jessie (Ed.), 1903
Noldeke	:	*Theodore History of Qoran*, Göttingen: 1860
Christoph Luxenberg	:	*Die Syro-Aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache*. Berlin: Verlag Hans Schiler. 2004
Ahmad Von Denfeer	:	*Ulum al-Qur'an: An Introduction to the Sciences of the Qur'an*, Published by the Islamic Foundation, UK: 2004
মান্না' আল-কাত্তান	:	*মাবাহিস ফী উলুমি'ল কুর'আন*, মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন্নাসরী ওয়াত-তাওযী', রিয়াদ: ১৪৩১ হি.
জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী	:	*আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুর'আন*, প্রকাশ, হিজাজী কায়রো, ১৩৬৮ হি.
জালালুদ্দীন আল-বুলকায়নী	:	*মাওয়াকি'উ'ল 'উলূম মিন মাওয়াকি'উ'ন-নুজূম*, প্রকাশ, হিজাজী কায়রো, ৮০২ হি.
বদরুদ্দীন আইনী (আল-হানাফী)	:	*উমদাতুল কারী শারহু সহীহ্ আল-বুখারী*, ১৪২৭/ ২০০৬
মুহাম্মদ তাহির কারদী,	:	*তারিখে কুরআন ওয়া গারায়েবু ইসমুহু ওয়া হুকমুহু*, মাওকিউ' ইয়াসুব, ১৪২১ হি.
ইসা বাউলাতা	:	*Literary Structure of Qur'an*, এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দ্য কুরআন, vol.3
Rosalie	:	*David*. প্রকাশক: Routledge. ১৯৯৭
ভবেশ রায়	:	*দেশ দেশান্তর*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা : ১৯৯৭
মাওলানা হিফযুর রহমান	:	*কাসাসুল কুরআন*, (অনু. মাওলানা নূরুর রহমান), এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা : ২০০৯
পি. কে. হিট্টি	:	*আরব জাতির ইতিহাস*, (অনু. জয়ন্ত সিং, সেজুতি ভট্টাচার্য এবং সৌমিত্র সেন গুপ্ত), মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা: ২০০৩

ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত	:	*সীরাত বিশ্বকোষ*, সকল খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ২০০৩
কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপতী	:	*আত-তাফসীরুল-মাজহারী*, মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান: তা. বি., সকল খণ্ড
আসলাম ইবনে শাহল আল-ওয়াযার আল-ওয়াসাতী,	:	*তা'রীখুল ওয়াসাত*, 'আলিমুল কুতুব, মিশর : ১৪০৬ হি.
মাওলানা আবু নায়ীম	:	*কাসাসুল আম্বিয়া*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা : ১৯৯৯
আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই	:	*রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, (অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), নাকিব পাবলিকেশন, ঢাকা: সর্বশেষ ২০০৬
আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী	:	*আর রাহীকুল মাখতুম*, (অনু. খাদিজা আক্তার রেজায়ী), আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ঢাকা : চতুর্থ প্রকাশ- ২০০০
ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল	:	*মুসনাদু আহমাদ*, দারুল মা'আরিফ, কায়রো : ১৯৫০
The Cambridge Ancient History: Prologomena & Prehistory	:	*The Cambridge Ancient History: Prologomena & Prehistory*: Vol. 1, Part 1. Accessed 15 Dec 2010
Dietz Otto Edzard	:	*Geschichte Mesopotamiens. Von den Sumerern bis zu Alexander dem Großen*. Beck, München 2004
'House of God' Kaaba gets new cloth	:	*'House of God' Kaaba gets new cloth* প্রকাশক: The Age Company Ltd. ২০০৩, সংগৃহীত হয়েছে: ২০০৬-০৮-১৭
জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া	:	নিবন্ধ "*মুসা এবং The Talmud selections*. চ.১২৩-২৪;৮২
ইবন খালদুন	:	*আল মুকাদ্দিমা*, (অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী), বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮২
সৈয়দ আমীর আলী	:	*দি স্পিরিট অব ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৯
আয্-যামাখশারী	:	*আল-কাশ্শাফ*, লেবানন, বৈরূত, দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ২০০১/১৪২১
সাইয়েদ কুতুব শহীদ	:	*তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, (অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমাদ), আল-কোরআন একাডেমী, লন্ডন।
নাফিস আহমদ	:	*ভুগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, (অনু. নজরুল ইসলাম ও জামাল খান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৯৪
ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান রহমান.	:	*কুরআন পরিচিতি*, ঢাকা: নুবালা পাবলিকেশন্স, ৩৭/বি, ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, মে-১৯৯২।
	:	*কুরআনের পরিভাষা*, ঢাকা, নুবালা পাবলিকেশন্স, ৩৭/বি, ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ,
ফাখরুদ্দীন আর-রাযী	:	আত-তাফসীরুল-কাবীর, দারু ইহয়া'ইত-তুরাছ আল-আরাবী, লেবানন, বৈরূত, দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি.
Pandit jawaharlal Nehru	:	*Glimpses of World History*, London, 1931

Dhaka University Institutional Repository

Nadvi, Syed Muzaffar-Ud-Din	:	*A Geographical History of the Qur'an*, Publisher: Sh. Muhammad Ashraf . Date Published: 1992
'য়াকৃত আল-হামাবী	:	*মু'জামুল-বুলদান*, দারুল-কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত তা, বি.
ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্	:	*উলূমুল কুরআন*, আল-মাকতাবাতশ্-শাফিয়া, রাজশাহী: দ্বিতীয় মুদ্রণ-২০০২, খ. ১
মাওলানা মুহম্মদ তক্বী উসমানী	:	*উলূমুল কুর'আন এবং উসূলে তাফসীর*, (অনু. আলহাজ মাওলানা হাসান আবদুল খালেক), মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা :২০০৫
সীরাতে ইবনে হিশাম	:	সীরাতে ইবনে হিশাম, (অনু. আকরাম ফারুক), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা : দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯০
ড: আকরাম জিয়া আল উমরী	:	*রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ রূপ ও বৈশিষ্ট্য*, (অনু. মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম), বি আই আই টি, খ. ১
ড: আব্দুল হামিদ আহমাদ আবু সুলাইমান	:	*ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, (অনু. মোঃ জয়নুল আবেদীন), বি আই আই টি, ঢাকা
আল-কুরতুবী	:	*আল-জামি লিআহকামিল-কুরআন*, দারু ইহয়াইত-তুরাছ আল আরাবী, বৈরুত : তা. বি.
আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার	:	*কাসাসুল-আম্বিয়া*, দারুল-ফিকর, বৈরূত : তা. বি.
Andrew Peterson	:	*Dictionary of Islamic Architecture*. প্রকাশক: Routledge. London : 1996
G.R Hawting	:	*Ka`ba. Encyclopaedia of the Qur'an* PP. 76
A. J Wensinck	:	*Ka`ba. Encyclopaedia of Islam,* IV PP. 317
The Kiswa	:	Kaaba Covering, প্রকাশক: Al-Islaah Publications, সংগৃহীত হয়েছে: ২০০৬-০৮-১৭
ডঃ জাওয়াদ আলী	:	*আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আরাব কাবলাল ইসলাম*, পাদটীকা, ১খ., ৩২৪ ;
সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ সম্পাদিত	:	*ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া*, শাহকার বুক ফাউন্ডেশন, করাচী, তা. বি.,
কাযী যয়নুল আবিদীন সাজ্জাদ মীরাঠী	:	*কাসাসুল-কুরআন*, মারকাযুল-মা'আরিফ, হোজাঈ, আসাম, দেওবান্দ শাখা, ১ম সং ১৯৯৪ খৃ.
আছ-ছা'লাবী	:	*আরাইসুল মাজালিস বা কাসাসুল আম্বিয়া*, আল-মাতবা আল-কাসতুল্লিয়্যা ঃ ১২৮২ হি.
ড. শাওকী আবু খলীল	:	*ইটলাসুল কুর'আন*, দারূল ফিকর আল-মা'আসির, লেবানন, বৈরূত : ১৪২৭/২০০৬
মুফতি মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ	:	কোরআন সংকলনের ইতিহাস, দারুল কিতাব, ঢাকা :দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০০০
ডঃ মাযহারউদ্দীন সিদ্দীকী	:	কুর'আনের ইতিহাস দর্শন, (অনু. সিরাজ মান্নান), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা সাইয়্যেদ শামসুল হক আফগানী	:	মানব জীবনে আল কোরআনের প্রয়োজনীয়তা, (অনু. মাওলানা আবুল কালাম মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী), এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা : দ্বিতীয় দ্রুণ- ২০০২
The Encyclopedia of Religion	:	*The Encyclopedia of Religion*, New York 1986, vol. 10
Encyclopedia of Islam	:	*Encyclopedia of Islam*. New Edition, Leiden 1995, vol. 8
ইবন কুতায়বা	:	*আল-মা'আরিফ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত : ১ম সং ১৪০৭/১৯৮৭
আল-আলূসী	:	*রূহুল মাআনী*, দার ইহয়া'ইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত তা. বি ৮খ
ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী	:	*আল-মুফরাদাত*, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত তা. বি.
Holy Bible	:	*Holy Bible*, Cambridge University Press, Genesis
Encyclopedia of Religion and Ethics	:	*Encyclopedia of Religion and Ethics*, New York. vol. 9
শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহলাবী	:	*তারীখুল-আহাদীছ ফী রুমূযি কাসাসিল-আম্বিয়া*, দিল্লী : তা. বি